সিন্ধুর গম্ভীর গর্জ্জনটুকু অবধি যেন সুরের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে!

সিন্ধু-সঙ্গীত শুনিয়া কবি বায়রণকে মনে পড়ে! ভাবে ভাষায় তেমনি তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে!

'বাণী'তে বিশ্বরাজের সন্ধান-রত কবির কাতর চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। "কল্যাণী"-তে সে পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বরাজ এখন আর দূরে নহেন—কুহেলিকার মধ্যে তিনি নাই, তিনি এখন মনে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপমূর্ত্তিতে বিরাজমান! এই ঐশীভাব সনাতন ধর্ম্মের ছায়াপাতে দিব্য স্নিগ্ধ মনোরম। 'বাণী'তে তিনি গাহিয়াছেন,—

"(মম) সুপ্ত হৃদয় করি নয়ন নিমীলন,
না করিল তব করুণা অনুশীলন;
মোহ ঘিরিল মোরে রহি চির ঘুমঘোরে
ব্যর্থজীবন গেল ফুরাইয়ে হায়।"

'কল্যাণী'তে কবি তাঁহার হারানিধি ফিরিয়া পাইয়াছেন—তাঁহার প্রাণভরা তৃষা ব্যাকুলতার শান্তি হইয়াছে—তাই 'কল্যাণী'তে বিভুসৃষ্টির দর্শনে মুগ্ধ কবি গাহিয়াছেন,

"তুমি সুন্দর তাই তোমারি বিশ্ব
সুন্দর শোভাময়,
তুমি উজ্জ্বল তাই নিখিল দৃশ্য-
নন্দন প্রভাময়।
তুমি অমৃত বারাধি হার হে,
তাই তোমারি ভুবন ভরি হে—
পূর্ণচন্দ্রে পুষ্পগন্ধে সুধার লহরী বয়,
ঝরে সুধাজল ধরে পুষ্পফল পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি সর্ব্বস্ব গতিমূল হে
তাহে শৃঙ্খলা কি বিপুল হে!
যে যাঁহার কাজ নীরবে সাধিছে
উপদেশ নাহি লয়;
নাহি ক্রম-ভঙ্গ পূর্ণ প্রতি অঙ্গ
নাহি বৃদ্ধি অপচয়।
তুমি প্রেমের চিরনিবাস হে,
তাই প্রাণে প্রাণে প্রেমপাশ হে,
তাই মধুমমতায় বিটপি-লতায়
মিলি প্রেম কথা কয়;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয় গাহে তব
প্রেমময়!"

এই গানে আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা মধুর লাগিয়াছে 'জননীর স্নেহ,' 'সতীর প্রণয়'। এই দুইটিই প্রাচ্য কবির বিশেষত্ব। এ বিশ্বরাজকে বুঝিতে কষ্ট হয় না! ইনি তার্কিকের কূটতর্কজালের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন নহেন, বিজ্ঞ দার্শনিকের পুঁথির পৃষ্ঠায় আবৃত নহেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ধূমে অস্পষ্ট নহেন, সারা বিশ্ববাসীর হৃদয়ই ইঁহার পূজার মন্দির।

ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার সৌন্দর্য্যে ও সহজ স্পষ্ট অভিব্যক্তিতে 'বাণী' ও 'কল্যাণী' রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য" গ্রন্থের অনুরূপ। তবে 'কল্যাণী'তে আর একটু বিশেষত্ব আছে, সেটি ইহার সহজ সরল সুর—ইহা পড়িলে প্রাচীনকালের বাঙালার রামপ্রসাদকে বারবার মনে পড়ে।

'রহস্যে'ও রজনীকান্তের অসামান্য প্রতিভা! মাঝে মাঝে হাসি ও অশ্রুতে মিশিয়া এমন সৌন্দর্য্য বিকাশিত করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা উপভোগ্য। হাস্যের সহিত নয়নে অশ্রুতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। রজনীকান্ত গাহিয়াছেন,

"আছত বেশ মনের সুখে!
আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও
বুকটি ঠুকে!
দিয়ে লোকের মাথায় বাড়ি,
আনলে টাকা গাড়ী গাড়ী
প্রেয়সীর গয়না সাড়ী হলো,
গেল লেঠা চুকে!
সমাজের নাইক মাথা কেউ ত আর
দেয় না বাধা,
সবি টের পাবে দাদা সে রাখছে
বেবাক টুকে!
* * *
"এর মজা বুঝবে, সেদিন, যেদিন
যাবে সিঙ্গে ফুঁকে।"

'পুরাতত্ত্ববিৎ' 'বুয়ার যুদ্ধ' "মৌতাত"

"খিচুড়ী" "উকিল" "কন্যাদায়" প্রভৃতি কবিতাগুলিতে উজ্জ্বল হাস্যরস হীরকখণ্ডের ন্যায় দেদীপ্যমান।

আমরা সর্ব্বাপেক্ষা হাসিয়াছি রজনীবাবুর "ঔদরিকে"র কথায়! বেচারা ভাবিতেছিল, 'পানতোয়া যদি কুমড়োর মত হ'ত, ছানাবড়া তালের মত আর চবনুক রসগোল্লা হ'ত, তাহা হইলে ক্ষেতে কুঁড়ে বেঁধে পাহারা দিতাম, 'সারারাত্ত তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম, খেঁকশিয়াল আর চোর তাড়াতাম, পাহারা দিতাম।—আরো বলিতেছে,

যেমন সরোবর মাঝে কমলের বনে
শত শত পদ্মপাতা,
তেমনি ক্ষীর সরসীতে শত শত লুচি
যদি রেখে দিত ধাতা—"

এবং "যদি বিলিতি কুমড়ো হত লেডিকেনি
পটোলের মত পুলি,
আর পায়েসের গঙ্গা বয়ে যেত, পান
কর্ত্তাম দুহাতে তুলি।"

কিন্তু ইহাতেও বেচারার স্বস্তি নাই—তাহার প্রধান ভাবনা,—

"সকলিত হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম্ম,
শুধু এই খেদ, কান্ত, আগে মরে যাবে
(আর) হবে না মানব জন্ম।
(আর খেতে পাবে না, কান্ত আর খেতে
পাবে না;
• • শেয়াল কি কুকুর হবে আর খেতে
পাবে না;
আর সবাই খাবে গো, তাকিয়ে দেখবে
খেতে পাবে না!
ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইবে খেতে
পাবে না;
সবাই তাড়া হুড়ো করে খেদিয়ে দেবে গো
খেতে পাবে না)

সুরলয়ে এই গানে হাস্যরস চরম উথলিয়া উঠে!

কবির নূতন ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ "অমৃত" সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সার্থকনামা। ইহার কবিতাগুলি প্রকৃতই অমৃতের ন্যায় মধুর উপাদেয়।

নিদারুণ রোগশয্যায় শায়িত হইয়া এগুলি রচনা করিয়াছেন—তাই বুঝি সংসারনির্লিপ্ত নির্ব্বিকার কবিত্ব-মহিমায় ইহা এমন সমুজ্জ্বল।

গ্রন্থখানি শিশুদিগের জন্য লিখিত। কিন্তু কেবল বালকগণ কেন—আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি,—আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই এই অমৃত পানে পরিতৃপ্ত হইবেন। প্রাচ্যভাবই "অমৃতে"র বিশেষত্ব। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দাম্ভিকের পরাজয়।

গিরি কহে, "সিন্ধু তব বিশাল শরীর,
আমার চরণে কেন, লুটাইছ শির?
এ অভয় পদে যদি লয়েছ শরণ
কি প্রার্থনা, কহ আমি করিব পূরণ।
সাগর হাসিয়া কহে—"আমি রত্নাকর
আমার অভাব কিছু নাহি গিরিবর;
তব পিতৃপিতামহ ডুবেছে এ নীরে—
সেই বার্ত্তা দিতে আমি আসি ঘুরে ফিরে!

প্রকৃত পক্ষে একটি কবিতা তুলিয়া তৃপ্তি হয় না; ইহার প্রত্যেক কবিতা—এক একটি ক্ষুদ্র হীরক খণ্ড; কোনটি রাখিয়া কোনটি গ্রহণ করিব—তাহা যেন বুঝিয়া উঠা যায় না; এইরূপ ৪০টি কবিতা মণিকাহারে গ্রন্থখানি গ্রথিত। আশাকরি বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে ইহা সমাদরে রক্ষিত হইবে।

সংক্ষেপত আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি কাব্যের মধ্যে ভক্তি করুণ ও হাস্যরসের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল! আমরা কবির নূতন কাব্যগ্রন্থ "আনন্দময়ী" পাঠের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী

৩৪শ বর্ষ]　　ভাদ্র, ১৩১৭　　[৫ম সংখ্যা

পরিসমাপ্তি।

ওগো আমার এই জীবনের পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা!
সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বহে বেড়াই
দুঃখ সুখের ব্যথা;
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা
যা পেয়েছি, যা হয়েছি,
যা কিছু মোর আশা
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালবাসা।
মিলন হবে আমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।
বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্ত মাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে
আস্‌বে বরের সাজে!
সেদিন আমার রবেনা ঘর,
কেইবা আপন, কেইবা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিল্‌বে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রসভঙ্গ।

১

রমেন্দ্রনাথ কবি না হইলেও কবিতারসজ্ঞ বটে! তাহার ঘরের পরিচ্ছন্ন আলমারিগুলি নানাবিধ কবিতাপুস্তকে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের "মানসী", "খেয়া" হইতে আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি মকরন্দ ঘোষের "পট্টাম্বরা," "অট্টহাসি" অবধিও বাদ পড়ে নাই!

তরুণ বয়স ও স্বাস্থ্য-ধন-জনের অধিকারী হইয়া এবং কলিকাতা সহরে বাস করিয়াও, নগর-সুলভ উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-বিলাসে ভাব-প্রবণ রমেন্দ্রনাথের কখনো অনুরাগ দেখা যায় নাই! তাহার উপর, আর একটি অমূল্য সামগ্রী বিধাতা তাহাকে দান করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন,—সেটি তাহার শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী, মায়া!

আজ পাঁচ বৎসর রমেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে।

মায়াকে সে ঠিক আপনার মনের মতই গড়িয়া তুলিয়াছিল। প্রথম যেদিন মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় 'শ্রীমতী মায়াদেবী' স্বাক্ষরিত কবিতা প্রকাশিত হইল, সেদিন রমেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে নিপীড়িত করিয়া কবির সুরে গাহিয়াছিল, "আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো!"

পুরাতন ডেস্ক খুঁজিলে বিস্তর কাগজ-পত্র রমেন্দ্রনাথের কবিযশোলাভের বিফল প্রয়াসের প্রচুর সাক্ষ্য প্রদান যে না করে, এমন নহে! এমন কি, বিবাহের অব্যবহিত পরেই,পত্র লিখিবার সময়,রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাঙিয়া-চুরিয়া সে আপনার বিকচোন্মুখী কবি প্রতিভার পরিচয়-প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু যেদিন সে মায়ার বাক্সে, তাহার রচিত "পাখীর প্রতি," ও "আকাশের তারা" প্রভৃতি কবিতার দর্শন পাইল, সেইদিন হইতে, নিতান্ত বুদ্ধিমানের মত, কবিতার লেখক হইবার বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সে ভক্ত পাঠক মাত্র হইয়া উঠিল! কবিতা-রচনার স্বত্বটুকু স্ত্রীর নামেই সে দানপত্র লিখিয়া দিল!

কিন্তু এত কথা বলিবার আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তবে এক পরিপূর্ণ বর্ষার দিনে রমেন্দ্রনাথের এই কাব্য-রসজ্ঞতার মাত্রা অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল! সেই কথাই এখন আমরা বলিতে বসিয়াছি!

২

শ্রাবণ মাসের শেষ! সারাদিন মেঘ আর বৃষ্টি! মুহূর্ত্ত বিরাম নাই! রৌদ্র যেন চিরকালের জন্য দেশত্যাগ করিয়াছে! দর্দ্দুরের নিরবচ্ছিন্ন সঘন রব,—চারিধারে একটা নিরানন্দ ভাব জাগাইয়া তুলিতেছিল!

দিবা দ্বিপ্রহর! আপনার কক্ষে খাটে শুইয়া রমেন্দ্রনাথ 'কাব্যগ্রন্থ' পাঠ করিতেছিল। মায়া নিকটে নাই! ভগ্নীর বিবাহোপলক্ষে সে চাঁপাতলায় পিত্রালয়ে গিয়াছিল। ফিরিতে এখনো দুই-তিন দিন বিলম্ব হইবে!

কাব্য পড়িতে পড়িতে রমেন্দ্রনাথের চিত্ত উদাস হইয়া উঠিল! দক্ষিণের জানালা খোলা ছিল। তাহারি মধ্য দিয়া সে মাঝে-মাঝে আকাশের পানে চাহিতেছিল। ঘরের নীচে ছোট বাগান। বাগানের কোণে একটা কদম

ফুলের গাছ, অজস্র ফুলে ভরিয়া গিয়াছে; তাহারি মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। সোনাগাছে বসিয়া একটা কাক নিঝুম ভাবে ভিজিতেছিল! পাতার ফাঁক দিয়া বৃষ্টির ফোঁটা তার কালো পালকের উপর পড়িতেছিল—কাকটা মাঝে-মাঝে চক্ষু মুদিতেছিল—আর কখনো-বা সিক্ত শাখায় চঞ্চু ঘসিতেছিল। চারিধারে কোন সাড়া-শব্দ নাই, শুধু বৃষ্টির একটা ঝমঝম শব্দ! নিরীহ কাকটাকে অবলম্বন করিয়াই রমেন্দ্রনাথের কল্পনা ধীরে ধীরে আসরে নামিল! সে ভাবিল, আহা বেচারা পাখী! নিতান্ত নিঃসঙ্গ, আশ্রয়হীন! কোথায় তার গৃহ, কোথায় তার সঙ্গীর দল, কোথায় তার প্রিয়া, আর কোথায়ই বা সে! তাহারি মত নিঃসঙ্গ, অসহায় অবস্থা আজ রমেন্দ্রনাথের! বিশ্বের বিরহব্যথা আজ এমন বর্ষা পাইয়া তাহার হৃদয় ঐ সুদূর কালো মেঘের মতই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে! উঠিয়া জানালার ধারে আসিয়া রমেন্দ্রনাথ দাঁড়াইল! ভাবিল, একবার চাঁপাতলা ঘুরিয়া আসি! কিন্তু মায়া বারণ করিয়াছে। মায়া লিখিয়াছে,—চিঠিখানি তখনো 'কাব্যগ্রন্থের' মধ্যে রক্ষিত ছিল—রমেন্দ্রনাথ আবার চিঠি পড়িল,—অন্যান্য কথার পর মায়া লিখিয়াছে,—"তুমি চিঠিতে যা-তা অমন করে লিখোনো—তোমার চিঠি এলে সকলে এখানে বড় টানাটানি করে, বিশেষ সেজদিদি। তার কাছে ছাড়ান্ পাবার যো নাই! আর তুমি এখানে বেড়াতে আসবে কি না আমার মত চেয়েছ তাই লিখছি—তুমি এসো না—আর ত তিন দিন পরেই আমি যাব! এমনি ত তুমি এদিকে বড় একটা আসনা, বিয়ের সময় যা দুদিন এসেছিলে, তার পর আবার-এখন যদি আস ত, সবাই ঠাট্টা করবে—বলবে, মায়া আছে বলেই এত ঘন-ঘন আসে। লক্ষ্মীটি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এলে আমি ভারী লজ্জা পাব।' ইত্যাদি।

রমেন্দ্রনাথের বুকটায় ভিতর কে যেন পাথরের ঘা মারিতেছিল। পকেটে চিঠি রাখিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিল! নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, চিঠিতে দুইটা প্রাণের কথা বলিয়া, তৃপ্তি পাইবার চেষ্টা করি, তাহাতেও তোমার লজ্জা! একবার গিয়া একটা চকিত চাহনিমাত্র আকাঙ্ক্ষা করি, তাহাতেও তোমার আপত্তি! কেন এমন কর, মায়া! উদ্যত, উন্মুখ, পিয়াসী প্রাণীকে নিরাশার শাসনে এমন অযথা ব্যথিত কর! বেশী নয়, দীর্ঘ নয়, শুধু এতটুকু মৃদু স্পর্শ! ওগো প্রিয়া, ওগো চিরপ্রিয়া, তাহা হইতেও বঞ্চিত করিয়া তুমি কি সুখ পাও! একটা বীণা যেমন নিজে একখণ্ড কাষ্ঠ ও তারের সমষ্টিমাত্র, বাদকের কর-স্পর্শে কেমন বিচিত্র সঙ্গীতে সে মুখরিত হইয়া উঠে, রমেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল সে-ও যে ঠিক তেমনি! মায়ার বিরহে সে-ও তেমনি অচেতন জড়মাত্র!

এমন কাজল-ঘন মেঘ, এমন সীমাহীন স্বপ্নময়তা,—প্রাণটাকে যে কিছুতেই বাঁধিয়া রাখা যায় না! রমেন্দ্রনাথ কাব্য রাখিয়া হার্মোনিয়মের পাশে গিয়া বসিল—গান ধরিল,—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,
সখি, জাগো জাগো"—

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "প্রিয়বাবু এসেছেন!"

রমেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল, "প্রিয়বাবু! এই বৃষ্টিতে!"

প্রিয় রমেন্দ্রনাথের বন্ধু। উভয়ে এক সঙ্গে কলেজে পড়িত। ল পাশ করিয়া আজ তিন বৎসর সে হাইকোর্টে মিথ্যা যাতায়াত করিতেছে!

রমেন্দ্র বাহিরে আসিয়া কহিল, "কিহে ব্যাপার কি? এই বৃষ্টিতে! কোর্টে যাওনি?"

প্রিয় কহিল, "ক্ষেপেছ! এই বর্ষায় কোর্ট! আর, তা ছাড়া একটু কাজ আছে!"

রমেন্দ্র কহিল, "কি কাজ?"

প্রিয় কহিল, "তোমাকে একবার আমার সঙ্গে বারাশত যেতে হবে!"

রমেন্দ্র কহিল, "অপরাধ?"

প্রিয় কহিল, "আরে—এক ফ্যাসাদে পড়েছি, ভাই! আমার ঐ পিসতুতো ভাইটার বিয়ের জন্ম পাত্রী দেখতে! তাঁরা আবার চলে যাবেন, পিসিমারও বড্ড জেদ—তাই, একলা কোথায় যাব, এই বৃষ্টিতে! তোমাকে পাকড়াতে এসেছি, নাও, নাও, আর দেরী নয়—ধড়াচুড়ো পরে নাও'—

রমেন্দ্র কহিল, "আহা, দাঁড়াও! এই বৃষ্টি!"

"আর দাঁড়াবার সময় নাই" বলিয়া প্রিয় তাড়াতাড়ি ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "এই ত একটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে! দুটোয় ট্রেণ! আমার রথ প্রস্তুত। তুমি শুধু কাপড়টা ছেড়ে চট্ করে এসো। তোমায় প্রথম রাত্রেই পৌঁছে দিয়ে যাব! আর হার ম্যাজেষ্টিও ত এখানে নেই হে! আহা, এমন বর্ষাটা,দাদা, মাঠে মারা গেল! যাও, যাও,—ওরে ভুলো, বাবুর জামা কাপড় ঠিক করে দে, শীগগির!"

রমেন্দ্রনাথ ট্রেণে চড়িয়া হাঁফ ছাড়িল। এই যে লাইনের দুই ধারে মাঠের পর মাঠ,দূরে কোথাও গ্রামের সীমা নিমেষের জন্ম জাগিয়া উঠিয়াছে,—এই অনাড়ম্বর উদার সৌন্দর্য্য, বর্ষায় সবুজ প্রাচুর্য্যের এমন শোভা—এই চিরপরিচিতা পল্লীশ্রী,—নয়নে কখনো ইহা পুরাতন হইবার নহে!

বিজন মাঠের প্রান্তে কুটির দেখিয়া রমেন্দ্র কহিল, "বাঃ, কি সুন্দর!"

প্রিয় কহিল, "ঐ ট্রেণ থেকেই দেখতে বেশ! ওখানে বাস করতে হলে, ব্যাপার ভীষণ হয়ে উঠবে! না আছে, কাছে বাজার, না ডাক্তার—"

রমেন্দ্র কহিল, "তোমরা অতি হতভাগ্য! এমন সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারো না! কেবল ডাক্তার আর বাজারের ভাবনাতেই আকুল হয়ে ওঠ! কবি কি বলেছেন, জানো,

"নিরালা বনের মাঝে, তৃণগুল্ম যেথা রাজে,
রচিব কুটির, প্রিয়ে,তোমারি লাগিয়া,
একান্তে দুজনে রব, যত কথা সবি কব,
বিশ্বেরে রাখিব দূরে, দুয়ার রুধিয়া।"

প্রিয় কহিল, "তাহলে প্রিয়াকে নিয়ে একবার কবিত্ব-বিকাশের অবসরটুকু আয়ত্ত কর, কবিবর!"

প্রিয় ঠাট্টা করিয়া কথাটা বলিল বটে, কিন্তু রমেন্দ্রের মাথায় বেশ একটি সুন্দর মতলব জাগিয়া উঠিল।

৩

মায়া ঘরে বসিয়া কবিতা নকল করিতেছিল। রমেন্দ্র আসিয়া কহিল, "আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, মায়া।"

মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া মায়া কহিল, "কি ?"

রমেন্দ্র ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল,কহিল, "কলকাতার এ একঘেয়ে জীবন অসহ্য হয়ে পড়েছে ! তাই—"

মায়া হাসিয়া নিকটে আসিল, কহিল, "তাই, কি করতে হবে, শুনি !"

রমেন্দ্র কহিল, "একটু পল্লীবাসের আয়োজন স্থির করেছি—!"

মায়া বিস্মিতভাবে কহিল, "সে আবার কিগো ?"

রমেন্দ্র কহিল, "বজ্‌বজ্‌ যাবার পথে সন্তোষপুর ষ্টেশন। সেখানে আমার এক বন্ধুর বাগানবাড়ী আছে,—যখন কলেজে পড়তুম, তখন দু-একবার গিয়েছি,—সেখানে চল, দু-চার দিন বাস করে আসা যাক ! শুধু তুমি আর আমি, সঙ্গে আর কেউ নয় !"

মায়া কহিল, "খাওয়া-দাওয়ার উপায় ? কাব্যে ত পেট ভরবে না !"

রমেন্দ্র কহিল, "ঐ জন্যই ত তোমাদের কোন উন্নতি হয় না ! যেখানে যাবে, অমনি সাত-শ অক্ষৌহিণী সঙ্গে নিতে হবে ! কেন, নিজেরা দুদিন আর খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারব না ?"

মায়া কহিল, "তার পর বিদেশ-বিভুঁই, পাঁড়া গাঁ হোক, যাই হোক্, ফাই-ফরমাসটার জন্যও ত একটা লোক নিয়ে যেতে হবে !"

রমেন্দ্র কহিল, "কোন দরকার নাই—তাদের মালী সেখানে আছে—সব সে ঠিক করে দেবে !"

মায়া কহিল, "বাঃ ! তুমি সব ঠিক করে ফেলেছ—আমার জন্য আর কিছু বাকী রাখনি !"

রমেন্দ্র কহিল, "যথেষ্টই রেখেছি—এখন, একটা ফর্দ্দ করে ফেল দেখি,এক সপ্তাহ অন্ততঃ থাকব—তার মত ফর্দ্দ করলেই হবে !"

মায়ারও মতলবখানা মন্দ লাগিতেছিল না ! তাহা হইলে, কিন্তু বেশ হয় ! সেই ছেলেবেলা, কবে, মায়া একবার পল্লীগ্রামে, তার পিসিমার বাড়ী গিয়াছিল,—কত বাগান, পুষ্করিণী, খোলা জায়গা, পল্লীরমণীগণের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ! চারিধারে হাসি-আনন্দ যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে ! পরস্পরের মধ্যে কি সে এক গভীর প্রীতির বন্ধন,—কলিকাতায় যাহা একান্ত বিরল ! পাখীর বিচিত্র কলরবে নিত্য-মুখরিত ছায়া-নিবিড় ঘাটে রমণীগণের স্বচ্ছন্দ নিরাপদ মজলিস, সে যেন আর এক রাজ্য, সম্পূর্ণ এক নূতন জিনিস ! অবরোধের লৌহকপাট কোন জায়গায় চাপিয়া ধরে নাই ; দিব্য মুক্ত স্বাধীনতার বিশাল উদার সুখ ! কি সুন্দর !

স্বামীস্ত্রীতে মিলিয়া তখনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা করিয়া ফেলিল। বিছানা, ষ্টোভ, হরিকেন লণ্ঠন, বাতি, কুইনিন, চায়ের সরঞ্জাম, কণ্ডেন্সড্‌ মিল্ক, সোডা, লেমনেড, সাবান, অল্প পরিমাণে মসলা, চাল, ডাল, ঘৃত, লবণ, জলের কুঁজা, গেলাস প্রভৃতি অর্থাৎ যাহা না লইলে নয়, এমন জিনিসমাত্র ! থালা প্রভৃতি বহিবার কোন প্রয়োজন নাই, সেখানে কদলীপত্র নিশ্চয়ই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় !

প্রিয় শুনিয়া বারণ করিল, "এ সময়টা

ম্যালেরিয়া ধরে হে, ও বাই ছাড়ো।" কিন্তু রমেন্দ্র হঠিবার পাত্র নহে! বুধবার যাইবার দিনস্থির হইল।

৪

বিছানাপত্র বাঁধিয়া ভৃত্য ষ্টেশনে চলিয়া গেল। সেগুলি পূর্ব্বাহ্ণেই পাঠাইয়া দেওয়া হইবে! রমেন্দ্র ও মায়া ৩.৪০ মিনিটের গাড়ীতে রওনা হইবে!

রমেন্দ্র ও মায়া যখন বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বজবজের ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে। রেলোয়ে ও কলিকাতার সময় লইয়া রমেন্দ্র গোল বাধাইয়া বসিয়াছিল। পরবর্ত্তী ট্রেণ ছাড়িবে, ৫-৫৪ মিনিটে। চারিধারে তখন মেঘ জমিতেছিল। এতক্ষণ ধরিয়া ষ্টেশনে বসিয়া থাকাও ত সহজ ব্যাপার নহে!

মায়া বলিল, "প্রথমেই যখন বাধা পড়ল, তখন বাড়ী ফিরে চল, বাবু, আর কাজ নেই সন্তোষপুর গিয়ে!"

রমেন্দ্র কহিল, "বাড়ী থেকে যখন বেরিয়েছি, তখন যাবই!"

পাঁচটা চুয়ান্নর গাড়ীও বেলিয়াঘাটা ছাড়িল, আর মাথার উপর আকাশও যেন ভাঙিয়া পড়িল! কি সে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি! মেঘে চারিদিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। সেকেণ্ড ক্লাশের এক কক্ষেই রমেন্দ্র ও মায়া উভয়ে বসিয়াছিল। বাহিরে চারিদিক দেখিতে মন্দ নয়! দুইধারে বড় বড় হোগলা-বন! মায়া এই প্রথম হোগলা দেখিল! এই হোগলা! কাজকর্ম্মের সময়, ইহাদ্বারাই ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হয়! বাঃ, বেশ ত! কালিঘাট ও মাঝেরহাট ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকু মায়ার বেশ লাগিল।

রেলোয়ে লাইনের পাশ দিয়া খাল বহিয়া গিয়াছে, খালের উভয় পার্শ্বে স্তূপাকার মাটি কাটিয়া জমা করিয়াছে! মায়া এ দৃশ্য-বৈচিত্র্যে বৃষ্টির কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

গাড়ী যখন মাঝেরহাট ষ্টেশন ছাড়িল, তখন বৃষ্টি আরো চাপিয়া আসিল। গাড়ীর ছাদ ভেদ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে লাগিল। ষ্টোভ, লণ্ঠন কোন্‌টাই বা সামলাইয়া রাখিবে? একদিককার সাশি এমন আঁট হইয়াছিল যে, তাহা বৃথা টানাটানি করিতে গিয়া রমেন্দ্র ভিজিয়া সারা হইল। মায়া কহিল, "আমি তখনি বলেছিলুম—এই বর্ষায় বেরিয়ো না!"

রমেন্দ্র কহিল, "কেন, এ মন্দ কি? একঘেয়ে জীবনের চেয়ে ভালো নয় কি?"

কথাটা মুখে সে বলিল বটে, কিন্তু তাহারো মনে ভয় হইতেছিল! এই বর্ষার রাত্রি—অপরিচিত স্থানে কি করিয়া কাটিবে! কিন্তু ফিরিবার মুখ ত, সে রাখে নাই! বেলিয়াঘাটা হইতে মায়ার কথায়, যদি সে ফিরিত! কুগ্রহ আর কাহাকে বলে!

ট্রেণ যখন সন্তোষপুরে থামিল, তখনো বৃষ্টির বিরাম নাই! রমেন্দ্র ভাবিতেছিল, বরাবর বজবজ গিয়া এই ট্রেণেই আবার সে ফিরিবে! কিন্তু সন্তোষপুর পৌঁছিবামাত্র দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়া সে মায়ার হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িল। অতিকষ্টে মোটপত্র নামাইয়া টিনের সেডের তলায় বেঞ্চে আসিয়া বসিল। ট্রেণও ছাড়িয়া দিল!

চারিধার হইতে তখন ভেকের দল রাগিণী

তুলিয়াছিল! জীর্ণ টিনের সেডখানি বর্ষার আক্রমণ হইতে আপনাকে যেন আর রক্ষা করিতে পারে না! একটা প্রকাণ্ড বাঁশের ছাতা মাথায় দিয়া, ষ্টেশনমাষ্টার অদূরস্থ বাসায় চলিয়াছিলেন, এমন সময়, এই অভাবনীয় অতিথিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন! এমন স্থানে এমনটি দেখিবার আশা করাই যে বাতুলতা! ষ্টেশনে একটা জমাদার ছিল—আর জনপ্রাণী না! ষ্টেশনের নিম্নে জমিগুলা জলে ভরিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে সরু পথ কোনমতে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। আকাশের গতিক একটুও আশাপ্রদ নহে! বরং, রীতিমত আশঙ্কাজনক!

ষ্টেশনমাষ্টার কহিল, "মশায়, এখানে—আপনি—?"

রমেন্দ্র কহিল, বিশেষ প্রয়োজনে এখানে সস্ত্রীক সে আসিয়া পড়িয়াছে। পথিমধ্যে এই দুর্য্যোগ! সন্তোষপুর গোয়ালাপাড়ায় কলিকাতার হংসেশ্বর চৌধুরীর বাগানবাড়ী—সেখানে সে যাইবে! জমাদার সে বাগান চিনিত। কহিল, "সে যে পোড়ো বাড়ী, বাবু!"

মায়া ভড়কাইয়া গিয়াছিল! ষ্টেশনে ওয়েটিং রুম নাই, এবং গাড়ী নাই, এমন দেশ, ইংরাজের আমলে কলিকাতার কাছে যে থাকিতে পারে, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই! এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? তবু স্ত্রীলোকের সকল বল-ভরসা যে স্বামী, তিনি নিকটে, এইটুকুই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা! নহিলে সে এতক্ষণে কাঁদিয়া-কাটিয়া হুলস্থূল বাধাইয়া তুলিত। রমেন্দ্র সন্ধান লইয়া জানিল, তাহার নামে বিছানার লগেজ বা কোন লগেজ এখানে আসে নাই! শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহার অর্থ কি?

ভিজা জিনিসপত্র—কতক ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মায় রাখিয়া, কতক জমাদারের মাথায় চাপাইয়া, স্বামীস্ত্রী জলপথেই যাত্রা করিল। ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় একখানি পর্ণ-কুটিরে কোনমতে মস্তক রক্ষা করিতেন, কাজেই সেখানে আতিথ্যগ্রহণ একেবারে সম্ভাবনার বাহিরে! মায়া বলিল, "বাড়ী ফিরে চল!"

রমেন্দ্র কহিল, "আবার ও কথা? ছিঃ—এরা পাগল মনে করবে যে!" রমেন্দ্রেরও ফিরিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করাও ত সম্ভব নহে!

৫

পথে রমেন্দ্রের পাম্পসু ভিজিয়া আপনার জুতা-জন্ম বিসর্জ্জন দিবার উপক্রম করিল!

জলে হাঁটিয়া বাসায় পৌঁছাইয়া রমেন্দ্র জমাদারকে বর্থশিস্ দিয়া বিদায় করিল।

হরিকেন লণ্ঠনটিকে কোনমতে জ্বালাইয়া রমেন্দ্র দেখিল, গৃহটি চামচিকার আবাসস্থল! আরশুলা-মাকড়সা প্রভৃতিরো অন্ত নাই! ছাদ দিয়া ঘরের মধ্যে বেশ জল পড়ে! একখানি ভগ্ন পালঙ্কমাত্র অতীত গৌরবের শেষ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার একখানি পদ অদৃশ্য! পাঁচ-ছয়খানি ইষ্টকখণ্ডে পালঙ্ক আপন পদমর্য্যাদা কোনমতে রক্ষা করিয়াছে!

কাব্যরসজ্ঞ হইলেও রমেন্দ্রনাথ ক্ষুধার সময় আহার না পাইলে অস্থির হইয়া পড়ে! এইটুকুই তাহার বিশেষত্ব! কিন্তু তাহারো যেমন দুর্ভাগ্য, একটা হাঁড়ির মধ্যে কয়েকখানা

লুচি ও কিছু তরকারী কলিকাতা হইতে অন্ত রাত্রির জন্ত আনা হইয়াছিল, সেটির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না—হয়, বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে, নয় ট্রেণে নিশ্চয় সেটি ফেলিয়া আসা হইয়াছে!

মায়া বলিল, "তুমি বলেছিলে, মালী আছে—কই সে?"

রমেন্দ্র কহিল, "তাইত, বেটা হয়ত কোথায় ভেগেছে!"

মায়া কহিল, "মাগো, এখানেও জনমানব থাকে! যেন বনবাসে এসেছি।"

রমেন্দ্র মায়ার অধরে চুম্বন করিয়া কহিল, "বেশ ত মায়া, এটা আমাদের পঞ্চবটী।"

অনাহারে রাত্রি কাটাইবার সঙ্কল্প করিয়া পালঙ্কে স্বামিস্ত্রী কোনমতে নিদ্রার আয়োজন করিয়া লইল! নিদ্রাই কি হয়! বাহিরে সোঁ সোঁ করিয়া বায়ু গর্জ্জিতেছে! বৃষ্টির অবিশ্রাম ধারা! মেঘের বিকট গর্জ্জন! আর ভিতরে মশারো তেমনি দৌরাত্ম্য! আর একি মশা! যেন এক-একটা পাখী! মায়ার মনে হইতেছিল, বুঝি মহাপ্রলয়ের দিন আসিয়াছে! রমেন্দ্র ভাবিতেছিল, "হায়, হায়, সাধ করিয়া কেন এ বিপদ ডাকিয়া আনিলাম!"

একবার মায়ার মনে হইল, বাহিরে কে যেন কাঁদিতেছে,—ঐ না দ্বারে কে ঠেলা দেয়! সে প্রাণপণ বলে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিল। একান্ত নিরুপায় রমেন্দ্রনাথ চারিটী বাতি জ্বালাইয়া স্ত্রীর ভরসার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইল।

৬

ভোর হইল! তবু বৃষ্টির বিরাম নাই! তাহার উপর আবার ঝড় আরম্ভ হইয়াছে! রমেন্দ্র কহিল, "তুমি দোর দিয়ে বসে থাক, আমি একটু আহারের যোগাড় দেখি!"

মায়া কহিল, "না—চল, বাড়ী ফিরে যাই!"

রমেন্দ্র কহিল, "আমারই কি অসাধ, মায়া? তবে এই ঝড়-বৃষ্টি,—কোথায় ষ্টেশন—পথ চিনি না—তোমাকে নিয়ে শেষে বিপদে পড়ব! একটা মানুষকেও ত তাহলে খুঁজে দেখা দরকার! এ যে অন্ধকূপ-হত্যার জোগাড়!"

মায়া কহিল, "তাইত, এখন উপায়? তোমাকে তখনি বলেছিলুম!"

রমেন্দ্র কহিল, "বাহিরে একটু দেখি—লোকালয়ের কিছু চিহ্ন আছে কিনা।" উভয়ে বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। দূর হইতে দুই-একটা ছেলের চীৎকার শুনা যাইতেছিল! আর সেই দূরে কদলী কুঞ্জের আড়ালে একটা চালাঘর না ঐ দেখা যায়!

রমেন্দ্র কহিল, "তুমি একটু সাহস করে এইখানে বস, মায়া। আমি আহারের সন্ধানে যাই, নহিলে কি এই বনের মধ্যে মরিয়া থাকিব, দুজনে!"

মায়া কহিল, "কিন্তু শীঘ্র এস—নহিলে আমি ভয়েই হয়ত মরিয়া থাকিব।"

ভিজিতে-ভিজিতে রমেন্দ্র চলিয়া গেল! কিছু দূরে পথটা ঘুরিয়া গিয়াছে। সেই মোড়ের উপর রাঙচিত্রের বেড়া-ঘেরা পাতার কুটির,—সেখানে একঘর গোয়ালার বাস! রমেন্দ্রের ডাকাডাকিতে গোপরমণী আসিয়া দ্বারান্তরালে অবগুণ্ঠন টানিয়া দাঁড়াইল!

রমেন্দ্র কহিল, "বাড়ীতে পুরুষ মানুষ আছে কি কেউ ?"

সে রমণী—পরপুরুষের সহিত কথা কহে কি বলিয়া! দ্বার হইতে নড়িতেও চাহে না, অথচ,মাথা নাড়িয়া উত্তরটা দেওয়াও প্রয়োজন মনে করে না! রমেন্দ্র ভাবিল, কি অদ্ভুত জীব!

বিরক্ত হইয়া রমেন্দ্র ফিরিল! দেখে, অদূরে একটা লোক টোকা মাথায় দিয়া এদিকে আসিতেছে। লোকটা আসিয়া কহিল, "বাবু, আপনার বিছানার মোট আজ ভোরে এসে পৌঁচেছে। গোলমালে একেবারে বজবজ চলে গিয়েছিল—সেখানে সারারাত্রি বৃষ্টিতে ভিজেছে। সকালে হঠাৎ গার্ড-সাহেবের চোখে পড়ায় ভোরের ট্রেণে সন্তোষপুর এসেছে। ষ্টেশনমাষ্টার মশায় খপর দিয়ে পাঠালেন!" লোকটা কল্যকার ষ্টেশনের জমাদার!

ইতিমধ্যে গোয়ালা আসিয়া পড়িল। হংসেশ্বর বাবুর বাড়ীতে অতিথি,—শুনিবামাত্র গোয়ালা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বাবুদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিল! পরে বলিল, "বাবু, রাত্রে ও বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব হয়, শুনেছি—তবে দেখিনি! মালীর কাছেই শুনেছি। সে দু-তিনদিন ভয় পেয়ে জ্বরে পড়ে—সেজন্য আজ সাত-আট দিন সে পালিয়েছে!"

রমেন্দ্র ভাবিল, কথাটা ভাগ্যে কাল তাহারা শুনিবার অবসর পায় নাই!

গোয়ালা ও জমাদারের সাহায্যে বাজারের ব্যবস্থা হইল। মৌরলামাছ, পুঁইশাক ও দুই-চারিটি মাত্র কাঁচকলা!

রমেন্দ্র কহিল, "খিচুড়ী চড়ানো যাক! বেশী লেঠায় কাজ নাই!"

উভয়ে ভীষণ উদ্যমে লাগিয়া যে আহার্য্য প্রস্তুত করিল, তাহা মনুষ্যের মুখে রুচিবার মত ত নহেই! ডাল ও চালে মিলিয়া যে এমন বীভৎস দ্রব্যের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না! কিন্তু ক্ষুধাতিশয্যে তাহাও এতটুকু পড়িয়া রহিল না।

রমেন্দ্র কহিল, "খাসা হয়েছে, মায়া!"

মায়া লজ্জায় মরিয়া গেল! তাহার মনে ধিক্কার জন্মিয়াছিল! কবিতা লিখিয়া কত সম্পাদকের নিকট হইতে সে বাহবা লইয়াছে, কিন্তু নারীর কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সে এত অপদার্থ! স্বামীকে একদিন রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যে তৃপ্তিদান করিবে, সে সামর্থ্য-টুকুও তার নাই! ছিঃ!

বিকালের দিকে ঝড় ও বৃষ্টি থামিল! এবং কম্প দিয়া মায়ার জ্বর আসিল! রমেন্দ্র পাগলের মত হইয়া উঠিল! এখন, উপায় কি? এমনো দেশ—না আছে, গাড়ী, না পাল্কী!

গোয়ালার সাহায্যে একখানা ডুলি সংগ্রহ করিয়া, স্ত্রীকে লইয়া রমেন্দ্র ষ্টেশনে আসিয়া পড়িল! এবং সাড়ে সাতটার টেণে উঠিয়া একেবারে কলিকাতায়! জিনিষপত্র পাঠাইবার ভার ষ্টেশন্‌-মাষ্টারবাবুটি গ্রহণ করিয়া রমেন্দ্রকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিলেন!

কলিকাতায় আসিয়াই রমেন্দ্রের আমাশয় হইল! সে দিনকার লুচির হাঁড়ির সন্ধান মিলিয়াছিল; সেটা বাড়ীতেই পড়িয়াছিল; ষ্টেশনে হারায় নাই।

দশ-বারো দিন রোগ ভোগ করিয়া উভয়েই আরোগ্য-লাভ করিল। আরোগ্যলাভ

করিয়াই মায়া পঞ্জিকা আনিয়া রমেন্দ্রকে দেখাইল,—যেদিন তাহারা স্বামীস্ত্রীতে সন্তোষপুর গিয়াছিল, সেদিন যাত্রার পক্ষে মহা অশুভ দিন! কারণ, সেদিন ত্র্যহস্পর্শ যোগ ছিল! পঞ্জিকা না দেখাতেই যে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, ইহা প্রমাণ করিয়া রমেন্দ্রের লজ্জা ও সঙ্কোচটুকু সে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিনা, তাহার সঠিক সংবাদ আমরা বলিতে পারি না। তবে, আরোগ্য-লাভের পর, কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। যথা, পল্লীগ্রামের নামে সেই অবধি রমেন্দ্রনাথের প্রাণ শিহরিয়া উঠে; মাসিক পত্রিকার সম্পাদকবর্গ নানা অনুরোধ-উপরোধেও মায়া দেবীর কবিতা পান না, এবং রমেন্দ্রনাথের বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই রমেন্দ্র-ভবনে নিমন্ত্রণে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত হইয়া থাকেন,—নানাবিধ নিরামিষ তরকারী, দই মাছ, কাটলেট, চপ, পোলাও,—কোনটিই রসনার পক্ষে অল্প লোভনীয় নহে! এবং ইহাও আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, সকল খাদ্যই স্বহস্তে প্রস্তুত করেন, বাঙলা মাসিক পত্রিকাদির ভূতপূর্ব্ব কবি, শ্রীমতী মায়া দেবী!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বরলিপি।

সিন্দুড়া—তেতালা।

গাহিবার সময় রাত্রি ২য় প্রহর। সম্পূর্ণ জাতি। কোমল—গ, দুই নি। বাদী—প, সংবাদী—রি। বাকি সুর সকল অনুবাদী।

আজ মন বশ গয়ী রী
সাবরকি সুরতিয়া প্যারী প্যারী
সখিরি কা কহুঁ তোসে অপনে জীয়াকি
বিতী (১) সগরী (২) ও আহুকে বিন দেখে কলন
পরত মোহে।
আহা করত তোরে পৈঁয়া (৩) পরত হুঁ
জো পিয়া আন মিলেরি মো সোঁ
হুঁতো চেরী (৪) সনদ ভয়ী তেরী॥

দয়াসখী—কৃত।

০ ১ ২´ ৩ ॥
II ণা -া -া পা। মা জ্ঞা রা সা I না সা´ -া -া। র্সরা´ -র্সণা ধপা পধা।
আ • • জ ম ন ব শ গ য়ী • • রী • • • • • • •

০ ১ ২´ ৩
। নসা´ -ণধা -ণা -পা। জ্ঞমা জ্ঞরা সন্া সা I না সা´ -া সা´। না রা´ সা´ রা´।
আ• • • ০ জ ম • ন • ব • শ গ য়ী • সা • ব র কি

(১) বিতী=গত। (২) সগরী=সমস্ত। (৩) পৈঁয়া=পদ, চরণ। (৪) চেরী=দাসী।

১ ২´ ৩
। না র্সা ধা ণা। পা ধা ণা র্সা। পা ধপা মা মা। -জ্ঞা মা পা রমা।
সু র তি রা প্যা রী প্যা রী স খি॰ রি কা • ক হুঁ তো॰

১ ২´ ৩
। -জ্ঞরা সা মা মা। পা ধা মা পা I না না র্সা র্রা। র্রমা র্রজ্ঞা র্রা র্সা।
• • সে অ প নে জ্ঞী য়া কি বি তী স গ রী • • • ওআ হ

০ ১ ২´ ৩
। র্রা না র্সা পা। -পা ধা ণা ণর্রা। র্সা ণা ধা পা। রমা -জ্ঞরা রা -া II
কে বি ন দে ০ খে ক ল ০ ন প র ত মো॰ ০ ০ হে •

০ ১ ২´ ৩
II । পা পা ধা। মা পা না সা I র্রা র্রমা -র্রজ্ঞা র্সা। র্রা না র্সা -া।
• আ হা ক র ত তোরে পৈ য়া॰ ০ ০ প র ত হুঁ •

০ ১ ২´ ৩
। র্মা -র্মা র্রা র্সা। ণর্সা -ধণা পা মা I রমা -জ্ঞরা জ্ঞা -া। রা -া সা -া।
জো ০ পি য়া আ॰ ০ ০ ন মি লে॰ ০ ০ রী ০ মো ০ সোঁ •

০ ১ ২´ ৩
। -া পা -া ধা। না -া র্সা র্রা। র্সা ণা ধা পা। রমা -রজ্ঞা রা -া IIII
০ হুঁ ০ তো চে ০ রী স ন দ ভ য়ী তে॰ ০ ০ রী ০

২´ ৩
১ তান I সরা মপা -ধণা -র্রসা। র্রণা -র্সণা -ধপা -মপা I
আ॰ • ০ ০ ০ ০ আ॰ ০ • ০ ০ • •

২´ ৩
২ তান I র্মজ্ঞা -র্রসা -ণধা পধা। ণর্রা -র্সণা -ধপা -মপা I
আ॰ • • • ০ ০ ০ আ॰ ০ • ০ ০ ০ ০

২´ ৩
৩ তান I সরা -মপা -র্সর্রা -ণধা। পমা -ধপা -মজ্ঞা -রসা I
আ॰ ০ ০ • ০ ০ ০ আ॰ • ০ ০ ০ • ০

"আজ মন বণ" এই অংশ পর্য্যন্ত গাইয়া তান সকল ধরিতে হইবে।

সঙ্গীত-বিদ্যার্ণব

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

খন্দ মহল ভ্রমণ।

১৯০৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বেলা আট টার সময় মাদ্রাজ মেল হইতে বহরমপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ডাকবাংলা অভিমুখে চলিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে যাইয়া দেখি সমস্ত বাংলাটি দুইজন শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। ষ্টেশনের নিকটেই একটি ধরম শালা আছে শুনিয়া ফিরিয়া তদভিমুখে চলিলাম। একটি মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ—গলদেশে উপবীত লম্বমান—দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আমার পোষাকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "এ ধরমশালা হিন্দুর জন্য"। বিজাতীয় পোষাক পরিধান করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল। বলিলাম "আমি ব্রাহ্মণ"। ব্রাহ্মণ আমার কথ বিশ্বাস করিলেন না, বোধ হইল। তখন অগত্যা কোট ও সার্টের বোতাম খুলিয়া মলিন উপবীতটি বাহির করিতে বাধ্য হইলাম। উপবীত দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখ প্রসন্ন হইল। দরজা দেখাইয়া ভিতরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রাঁধিয়া খাইবেন অথবা ধরমশালায় ব্রাহ্মণের পাক খাইবেন? বেলা তখন দশটা। বাজার সেখান হইতে এক মাইল। ক্ষুধার তীব্রতায় কহিলাম "আপনার ব্রাহ্মণের পাকই খাইব"। জিনিস পত্র একঘরে রক্ষা করিয়া গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইলাম।

বহরমপুরে এক রকম অশ্বচালিত শকট আছে তাহার উপরে মাদুরের আচ্ছাদন। তাহাকে ঝট্‌কা বলে। খন্দমহল পর্য্যন্ত ঝট্‌কা যাইবে না জানিতাম—কাজেই গরুর গাড়ীর অনুসন্ধান করিতে হইল। দেখিতে পাইলাম বাঙ্গালী বেশধারী একটি ভদ্রলোক আমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। ত্বরিতগমনে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলাম "মহাশয় বাঙ্গালী?" উত্তর পাইলাম "হাঁ"। ধরমশালায় গিয়াছি বলিয়া ভদ্রলোকটি তখন অনুযোগ করিতে লাগিলেন এবং হুকুম করিলেন "এখনি ঝট্‌কা করিয়া জিনিস পত্রসহ "বাঙ্গালী বাবুর" বাসায় চলিয়া আসুন"। বহরমপুরে তাঁহাদের বাটীকে বাঙ্গালী বাবুর বাটী বলে। তৎক্ষণাৎ ধরমশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমার সঙ্গীসহ বাঙ্গালী বাবুর বাটী পৌঁছিলাম। প্রবাসী বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে যত্ন করে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্বে কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। বাঙ্গালী বাবুর বাটীতে দুইবেলা পরিতোষ-পূর্ব্বক আহার করিয়া সন্ধ্যার সময় দুইখানা গোযানে সঙ্গীসহ যাত্রা করিলাম।

বাঙ্গালী বাবুর ছোট ভাই বহরমপুর কলেজে পড়েন। তাহার সমপাঠী কয়েকটি মান্দ্রাজী ছাত্র তাঁহাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের সহিত আলাপ হইল। কৃষ্ণবর্ণ মস্তকের সম্মুখ ভাগের অর্দ্ধেক কামানো; কিন্তু দিব্য প্রতিভোজ্জ্বল মুখ।

দেখিয়া অনেক কথা মনে হইল। ইঁহারা দ্রাবিড় জাতীয়—যে জাতি আর্য্যদিগের পূর্ব্বে অধিকাংশ ভারতবর্ষ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারাই যে ভারতের আদিম অধিবাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এসম্বন্ধেও নিঃসন্দিগ্ধ নহেন। ছেলেবেলায় ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম আর্য্যদিগের ভারত জয়ের পূর্ব্বে, যে সমস্ত জাতি ভারতে বাস করিত তাহারা একান্ত

অসভ্য ছিল। কিন্তু দ্রাবিড়িগণ যে সুসভ্য ছিলেন আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। দ্রাবিড়ীয়গণ ও প্রাচীন মিশরিয়গণ একজাতি ভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা অনুমান করেন। বেবিলনীয়গণ একপ্রকার মসলিন ব্যবহার করিত, তাহার নাম ছিল "সিন্ধু"। সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী স্থান হইতে রপ্তানি হইত বলিয়া উহার সিন্ধু নামকরণ হইয়াছিল। তখনও আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। এত প্রাচীন কালে যে জাতি মস্‌লিন বয়ন করিতে শিখিয়াছিল তাহারা যে সুসভ্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্রাবিড়ীয়গণ স্বনির্ম্মিত জাহাজে তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্য বেবিলনে রপ্তানি করিত। ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যগণ দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রাবিড়ীয়গণও উন্নততর আর্য্য-ধর্ম্মনীতি গ্রহণ করিয়া কালে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে আর্য্যদিগেরই সমকক্ষ হইয়াছিলেন। বেদ ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ও বৈদান্তিক শঙ্কর ও রামানুজ এই দ্রাবিড় বংশোৎপন্ন।

মাদ্রাজী ছাত্রদিগের মধ্যে একটি বহরমপুরের একজিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ারের ভাগিনেয় ও তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। মাতুলকন্যা বিবাহ বঙ্গদেশে নিষিদ্ধ কিন্তু আর্য্যরীতি বিরুদ্ধ নহে। সিদ্ধার্থ স্বীয় মাতুল কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

বহরমপুর ও ছত্রপুর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গঞ্জাম জেলার সদর সহর। রাজকীয় কার্য্যালয় অর্দ্ধেক বহরমপুরে ও অর্দ্ধেক ছত্রপুরে স্থাপিত।

রাত্রি নয়টার সময় গোশকটে যাত্রা করিলাম। পরদিন বেলা নয়টার সময় আস্কায় পৌছিলাম। আস্কায় একটী মদ ও চিনির কারখানা আছে। অবশ্য সাহেবের। আস্কার বাংলায় আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে পুনরায় শকটে আরোহণ করিলাম। রাসেনকান্দা আস্কা হইতে ২৫ মাইল। পরদিন বেলা নয়টার সময় তথায় পৌছিলাম। গঞ্জাম জেলার পথিকদিগের জন্য কি চমৎকার বন্দোবস্ত। প্রত্যেক সহরে ধরমশালা অথবা চৌলটী আছে। তথায় থাকিতে এক পয়সা ব্যয় নাই। চাউল ডাল কিনিয়া রাঁধিয়া খাইলেই হইল। বাংলা দেশ হইতে অতিথি সংকার ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। গৃহস্থের বাটীতে অতিথির আগমন হইলে আজিকালি গৃহস্থের মুখভার হয়। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের বাটী হইতে অতিথিকে এখনও বড় ফিরিতে হয় না; কিন্তু নগরে অতিথির নাম করিবার যো নাই। সমস্ত কলিকাতা সহরে বিদেশী লোকের দুই এক বেলা থাকিবার স্থান নাই। পূর্ব্বে যখন অভ্যাগত সর্ব্বত্র গুরুবৎ পূজনীয় ছিলেন তখন ধরমশালার প্রয়োজন ছিলনা। বর্ত্তমানে প্রতি সহরে ধরমশালার প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজন।

রাসেন নামক এক ইংরাজ রাসেনকান্দার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খন্দ-দিগের মধ্যে নরবলি বন্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাসেনকান্দা আমাদের সাধারণ জেলা সহর অপেক্ষা বড় সহর। ইহা গঞ্জাম জেলার একটি মহকুমা।

রাত্রিতে রাসেনকান্দা হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন বেলা দশটার সময় কলিঙ্গা নামক স্থানে পৌছিলাম। এক "ঘাটি" (পাহাড়)

অতিক্রম করিয়া তবে কলিঙ্গা পৌছিতে হয়। রাসেনকান্দা হইতে কলিঙ্গা বিশ মাইল। কলিঙ্গা একটী পল্লী মাত্র; দুই একটি দোকান ও একটি ডাকবাংলা আছে। কলিঙ্গার ঘাটিতে বড় দস্যুর উপদ্রব। কয়েকজন পুলিশ কনেষ্টবল অনবরত ঘাটি পাহারা দিতে নিযুক্ত আছে। কিন্তু তাহাতে দস্যুতা কমে নাই। মধ্যরাত্রে গাড়োয়ান দিগের চীৎকারে জাগরিত হইয়া শুনিতে পাইলাম, দুইটী শার্দ্দূলপুঙ্গব আমাদিগের গাড়ির সমান্তরাল ভাবে পার্শ্বস্থ জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতেছেন। বহরমপুর হইতে কলিঙ্গা পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল। পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা আসিয়াছে কিন্তু কলিঙ্গার "ঘাটি" ব্যতীত অন্যান্য পাহাড় বেশী উচ্চ নহে। ব্যাঘ্রের উপদ্রব ভয়ে একাধিক শকট একসঙ্গে যাত্রা করে। আমাদের সঙ্গে খন্দমহল যাত্রী এক মহাজনের একখানি শকট ছিল। ব্যাঘ্রের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া কয়েকবার রিভল্ভারের আওয়াজ করিলাম। ব্যাঘ্রদ্বয় আমাদের অভদ্রতায় ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন।

কলিঙ্গা হইতে অপরাহ্নে যাত্রা করিয়া মধ্যরাত্রিতে গুমাগড় ও পরদিন সকালে বিষপাড়ায় পৌছিলাম। বিষপাড়ায় পূর্ব্বে খন্দমহলের সদর আফিস স্থাপিত ছিল—কিন্তু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। শুনিয়াছি এক বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হঠাৎ বিষপাড়ায় প্রাণত্যাগ করায়, তাঁহার স্ত্রী বন্ধুবান্ধববিহীন স্থানে একাকী পড়িয়া অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করেন। অধুনা মহকুমার সদর আফিস বিষপাড়া হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী ফুলবাণী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। বিষপাড়া হইতে দুই মাইল গোশকটে আসিয়া সঙ্গীসহ আমি পদব্রজে ফুলবাণী পৌঁছিলাম।

ফুলবাণীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। চারিদিকে ঘন বৃক্ষ সমাচ্ছাদিত পর্ব্বতশ্রেণী মধ্যস্থানে ক্ষুদ্র সহর ফুলবাণী। ফুলবাণীকে প্রকৃতপক্ষে সহর বলা যায় না। সরকারী আফিস ব্যতীত ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ফুলবাণীতে নাই। চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র উপত্যকায় ফুলবাণী স্থাপিত। এক পার্শ্বের পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত। নদীতে অতি সামান্যই জল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া অনতি-গভীর জলরেখা খরবেগে ধাবিত। মৃত্তিকার বর্ণ লাল। পর্ব্বতোপরিস্থ অরণ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের অধিবাস। মাঝে মাঝে ময়ূরের কেকারব বনমধ্যে উত্থিত হইয়া পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হয়। রাত্রিকালে ঘন কৃষ্ণ পর্ব্বতের উপরে বহুদূর বিস্তৃত বক্রগতি অগ্নিরেখা মেঘের কোলে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। খন্দগণ জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দেয়। অনেক প্রকাণ্ড মহীরুহ সে আগুনে ভস্মীভূত হয়। সেই ভস্ম নববর্ষাগমে পর্ব্বতগাত্র হইতে বৃষ্টি স্রোতে সমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করে ইহাই খন্দদিগের বিশ্বাস। কিন্তু ভস্মের অধিকাংশ নদীগর্ভে পতিত হয়, এবং উড়িষ্যার সমতলক্ষেত্রে নীত হইয়া তত্রত্য ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। খন্দগণ তদ্দারা অতি সামান্য উপকার লাভ করে। সমস্ত খন্দমহল একটি অরণ্য বিশেষ।

অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী অবস্থিত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালতরু মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে—তাহাদের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অত্যধিক। বঙ্গদেশে অত বড় শাল গাছের আমদানি দেখি নাই। খন্দগণ নির্দ্দয় ভাবে সে অরণ্যের ধ্বংস সম্পাদনে ব্যাপৃত। কিন্তু সে অক্ষয় অরণ্য ধ্বংস হইবার নহে। যুগযুগান্তর হইতে খন্দকুঠারাঘাত সহ্য করিয়া তাহা এখনও তেমনি বিপুলই আছে। অনেক অরণ্যে বোধহয় এখনও পর্য্যন্ত খন্দকুঠার প্রতিধ্বনিত হয় নাই—সেগুলি মহা-ভীষণ। বোধ হয় পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ যখন সমতল ক্ষেত্র হইতে খন্দদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন তখনও ইহারা বর্ত্তমান ছিল।

খন্দগণ গৃহনির্ম্মাণে এই বৃক্ষ বহুল-পরিমাণে ব্যবহার করে। বিপুলকায় বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া উর্দ্ধভাবে মৃত্তিকা প্রোথিত করে। খণ্ডগুলি অতি ঘনঘন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া প্রোথিত হয় এবং বহুসংখ্যক বৃক্ষখণ্ডদ্বারা গৃহের দেয়াল নির্ম্মিত হয়। অনেকে এই কাষ্ঠনির্ম্মিত দেয়ালের উপরি-ভাগে রক্তবর্ণ মৃত্তিকার লেপ দিয়া থাকে। সূত্রধরের যন্ত্রের মধ্যে কুঠারের ব্যবহার মাত্র খন্দগণ অবগত আছে। করাতের ব্যবহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। নাতিস্থূল বৃক্ষ কুঠার দ্বারা তিনখানি অথবা চারিখানি তক্তায় বিভক্ত হয় এবং সেই পুরু তক্তার দ্বারা গৃহের দরজা নির্ম্মিত হয়। দরজায় লৌহের কব্জা অথবা হঁসকল নাই। কাষ্ঠের মধ্যে ছিদ্র করিয়া এক প্রকার হঁাসকল নির্ম্মিত হয় তদ্দ্বারা চৌকাঠে কপাট সংলগ্ন হয়; খন্দগণ বোধহয় সভ্য প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে কিছুই শিক্ষালাভ করে নাই। সূত্রধরের যন্ত্রের অভাবে যে বিপুল পরিশ্রম অযথা ব্যয়িত হয় তাহা দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হয়। খন্দমহলের সবডিভিসন্যাল অফিসার মিঃ ওলেনব্যাকের চেষ্টায় সম্প্রতি দুইএকজন খন্দ করাত ও অন্য দুই একটি যন্ত্রের ব্যবহার শিখিয়াছে। ওলেনব্যাক সাহেব ফুলবাণীতে একটি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের চেষ্টায় আছেন। কৃতকার্য্য হইলে খন্দদিগের শিল্প-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। দুই একটি খন্দ ইষ্টক নির্ম্মাণও শিখিয়াছে।

খন্দমহল অঙ্গুল জেলার একটি মহকুমা। কিন্তু অঙ্গুল ও খন্দমহলের মধ্যদেশে বৌধরাজ্যের একাংশ বিস্তৃত। খন্দমহাল ও জেলার সদর মহকুমা পরস্পর সংলগ্ন নহে।

খন্দমহল পূর্ব্বে বৌধরাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। উড়িষ্যায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদরাজ্য আছে, বৌধ তাহাদিগের অন্যতম। খন্দ-দিগের মধ্যে নরবলিপ্রথা প্রচলিত আছে—এই সংবাদ ভারত গভর্ণমেণ্টের গোচর হইলে তাঁহারা বৌধরাজকে উক্ত জঘন্য প্রথা রহিত করিতে আদেশ করেন। রাজা অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গভর্ণমেণ্টকে অগত্যা খন্দমহলে একটি সৈনিক মিশন প্রেরণ করিতে হয়। খন্দগণ অস্ত্রধারণ করে। চতুর ইংরাজ সেনাপতি বহুকৌশলে যৎসামান্য রক্তপাতের পর উক্ত প্রথা রহিত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পরে আবার খন্দগণ পূর্ব্ব প্রথা অবলম্বন করে। এবং পুনরায় তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়।

কয়েকবার সৈন্য প্রেরণের পর বিদ্রোহের সফলতায় হতাশ হইয়া খন্দগণ শান্তভাব অবলম্বন করে। কিন্তু উক্ত প্রদেশ বৌধ-রাজ্যের অন্তর্গত থাকিলে নরবলি প্রথা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইবে এই আশঙ্কায় বৌধরাজ ভারত গভর্ণমেণ্টকে প্রদেশ প্রদান করেন। তদবধি খন্দমহল বৃটিশ রাজত্বের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। এখন নরবলিপ্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সভ্যতা ও করুণার দাবী পূরণ করিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট খন্দমহলের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। জমীর উপর তথায় কোনও কর ধার্য্য হয় নাই। চাষ কর নামক একমাত্র কর তথায় আদায় হয়। প্রতি হলের উপর ৵৹ আনা অথবা ৶৹ আনা মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। হলের সংখ্যা যাহার বেশি তাহাকে বেশী কর দিতে হয়। যাহার হল নাই তাহাকে কিছুই দিতে হয় না। এতদ্ভিন্ন আবকারী হইতে গবর্মেণ্টের কয়েক সহস্র টাকা লাভ হয়। কিন্তু খন্দমহলের আয় অপেক্ষা ব্যয় অত্যধিক। প্রায় প্রতি গ্রামে স্কুল হইয়াছে। বিনা বেতনে তাহাতে বালক-বালিকাগণ পড়িতেছে। খন্দ মহলের সব-ডিভিসনাল অফিসার মিঃ ওলেনব্যাক বাড়ী বাড়ী যাইয়া অনুরোধ করায় তবে সমস্ত বালক বালিকা স্কুলে আসিতেছে। গবর্মেণ্ট হইতে বিনা মূল্যে তাহাদিগকে পুস্তক স্লেট কাগজ কলম প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে। স্কুলে বেতন নাই। যে রকম ভাবে কাজ চলিতেছে তাহাতে ১৫।১৬ বৎসর পরে খন্দমহলে বর্ণ জ্ঞানহীন পুরুষ অথবা স্ত্রী দুষ্প্রাপ্য হইবে বলিয়া বোধ হয়। রাস্তা ঘাটেরও ক্রমে উন্নতি হইতেছে। অসভ্য প্রজার প্রতি সুসভ্য গবর্মেণ্টের যত কর্ত্তব্য আছে খন্দ মহলে তৎসমস্তই পালন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

নরবলি প্রথাকে খন্দগণ "মেরিয়া" বলে। অনাবৃষ্টি হইলে তাহারা মনে করিত পৃথিবী দেবী (তুর্কী-পেন্নু) ক্রুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরশোণিতে তাহার বক্ষদেশ সিক্ত না করিয়া দিলে তাঁহার ক্রোধোপশম হইবে না। খন্দ মহালে "পান" নামক এক জাতি আছে। ইহাদের অনেকে বলির উপযোগী নরশিশুর ব্যবসা করিত। পিতা মাতার নিকট হইতে শিশুদিগকে চুরি করিয়া আনিয়া কিছুদিন তাহারা পালন করিত, পরে বলিদানেচ্ছু খন্দের নিকট বিক্রয় করিত। ক্রীত শিশু পুষ্টিকর খাদ্যে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিলে, বলির দিনে মৃত্তিকা প্রোথিত কাষ্ঠ খণ্ডে তাহাকে দৃঢ় ভাবে বদ্ধ করিয়া ছুরিকা দ্বারা তাহার গাত্রের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করা হইত। কর্ত্তিত মাংস লইয়া সমাগত জনগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ জমিতে প্রোথিত করিত। তাহাদের বিশ্বাস তাহাতে জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এই নৃশংস লোমাঞ্চকর নরযজ্ঞে যাহারা পুরোহিতের কার্য্য করিত তাহাদিগকে দেহেরী বলিত। দেহেরী এখনও আছে—কিন্তু নরবলি আর নাই।

খন্দমহাল কতিপয় সংখ্যক মুঠায় বিভক্ত। প্রত্যেক মুঠা একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত। প্রতিমুঠায় একজন "মালিক" আছেন, মুঠার সমস্ত লোক মালিকের অনুগত। মালিক ব্যতীত প্রতি মুঠায় একজন সর্দ্দার আছে। বর্ত্তমানে সবডিভিসনাল অফিসারকর্ত্তৃক সর্দ্দার নিযুক্ত হয়। মুঠার ন্যায় প্রতি গ্রামেও একজন

"গ্রাম মালিক" ও একজন সর্দ্দার আছে। সমগ্র মুঠায় মুঠামালিক ও মুঠাসর্দ্দারের যে প্রতিপত্তি, গ্রামে গ্রামমালিক ও গ্রাম-সর্দ্দারেরও তদ্রূপ। খন্দগণ তাহাদের মালিক ও সর্দ্দারের আজ্ঞানুবর্ত্তী,—প্রায়ই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করেনা।

খন্দদিগের শপথ করিবার প্রথা একটু নূতন রকমের। শস্য ও দুগ্ধাদি মাপিবার জন্য তাহারা একপ্রকার মৃত্তিকাভাণ্ড ব্যবহার করে তাহাকে তামলি বলে। এই তামলির মধ্যে কিয়দংশ ব্যাঘ্র চর্ম্ম, কিছু ধান, লবণ, কয়েকটী তুলসীপত্র ও "সবিনো" নামক গাছের কয়েকটী পত্র ও অন্য দুই একটী দ্রব্য রাখিয়া শপথকারীর হস্তে তামলিটি প্রদান করা হয়; এবং তামলি ও তৎস্থিত প্রত্যেক পদার্থের নাম করিয়া আদালতে তাহাদিগকে শপথ পড়ান হয়। অন্যত্র মদ্য স্পর্শ করিয়া শপথ করিবার নিয়মও প্রচলিত আছে। আমি যখন খন্দমহলে ছিলাম তখন কতকগুলি খন্দ শপথ করিয়া মদ্য ত্যাগ করিয়াছিল। শুনিয়াছি ওষ্ঠদ্বারা মদ স্পর্শ করিয়াই তাহারা মদ ত্যাগের শপথ করে।

খন্দগণ অপরিমিত মদ্যপায়ী। সুখের বিষয় তাহাদের স্ত্রীলোকেরা মদ খায় না, তাহা না হইলে মদের প্রভাবে এতদিনে খন্দ জাতি বোধ হয় বিলুপ্ত হইয়া যাইত। মদ খাইবার পূর্ব্বে তাহারা কিয়দংশ মৃত্তিকার উপর ফেলিয়া "তুর্কীপেণু"কে নিবেদন করে। তাহাদের বিশ্বাস মদ্যদানে পৃথিবীকে তুষ্ট না করিলে তিনি রুষ্ট হইয়া শস্যাদি কিছু দান করিবেন না। পূর্ব্বে খন্দগণ নিজেই মদ্য প্রস্তুত করিত। অধুনা গবর্মেণ্টের আবকারী আইনানুসারে খোলা ভাঁটীতে মদ প্রস্তুত হয়। খন্দগণ বলে শৌণ্ডিকহস্ত কলুষিত মদ্য পৃথিবী তত তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করেন না এবং তজ্জন্য পূর্ব্বমত শস্যাদি দান করিতেছেন না। তুর্কীপেণুকে মদ না দিলে যখন চলিবে না তখন তাহারাই বা মদ ত্যাগ করিবে কেন? করিলে তুর্কী-পেণুর পূজার ব্যাঘাত হইবে।

খন্দমহালের অধিবাসীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, উড়িয়া ও খন্দ। উড়িয়াদিগের অধিকাংশই মহাজন। অত্যধিক সুদে টাকা ধার দিয়া খন্দদিগের সর্ব্বনাশ সাধনে তাহারা বড়ই পটু। খন্দ মহলের অধিকাংশ জমী অধুনা তাহাদেরই হস্তগত। মদ্য পিপাসা যখন প্রবল হইয়া উঠে তখন খন্দগণ শস্য ও জমী বন্দক দিয়া সে পিপাসা নিবৃত্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে খন্দদিগকে রক্ষা করিতে সরকারী কর্ম্মচারীগণ আজ কাল বিশেষ চেষ্টিত আছেন। খন্দমহলে প্রচুর পরিমাণে হলুদ উৎপন্ন হয়; গাড়ী করিয়া উড়িয়া মহাজনগণ অন্যত্র রপ্তানী করে।

কোনও রকম তরকারী ব্যবহার খন্দগণ অবগত নহে। ফুলবাণীতে যে কয়েকটী রাজকর্ম্মচারী আছেন তাঁহারা স্বীয় ব্যবহারের জন্য কলিকাতা হইতে বীজ লইয়া তরকারীর চাষ করেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে তরকারীর ব্যবহার খন্দদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে। মৎস্য একপ্রকার অপ্রাপ্য। বহুকষ্টে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য দুই একটী পাওয়া যায়।

খন্দদিগের বাসগৃহে জানালা নাই; একমাত্র দরজা। গৃহ অনবরত ধূমে পরিপূর্ণ থাকে।

মশা তাড়াইবার জন্যই ঘরে অগ্নি রাখা হয়। ধূম পরিপূর্ণ ঘরে নিদ্রা যাইতে তাহারা বিন্দু মাত্র অসুবিধা বোধ করে না।

খন্দগণ অত্যন্ত স্বাবলম্বনপ্রিয়। পুত্র বিবাহ করিয়াই পিতা মাতা হইতে পৃথক্ বাস করে। খন্দ ভিক্ষুক দুর্লভ।

ব্যভিচার খন্দরমণীর মধ্যে বিরল। একবার একটি খন্দরমণী একজন উড়িয়া কনট্রাক্টরের সহিত চলিয়া যায়; তাহাতে খন্দদিগের মধ্যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটী এখনও সেই উড়িয়ার সহিত বাস করিতেছে; কিন্তু কোনও খন্দ তাহার সংশ্রবে আসে না।

খন্দগণ প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু উজ্জ্বল রক্তাভ গৌরবর্ণ খন্দরমণীও দেখিয়াছি।

খন্দগণ বহুদেবে বিশ্বাস করে। তাহাদের উপাস্য কয়েকটী দেবতার নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। তুর্কীপেণু—পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

২। পর্ব্বত দেবতা—পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি কাঠুরিয়াদিগকে হিংস্র পশুর কবল হইতে রক্ষা করেন। জঙ্গলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কাঠুরিয়াগণ তাঁহাকে স্মরণ করে।

৩। গ্রাম দেবতা—যাবতীয় গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী একদেবতা।

৪। উষাপেণু—ইঁহার পূজা করিলে পুত্র লাভ হয়। আমাদের ষষ্ঠী।

৫। বরাবালী—ইনি রুষ্ট হইলে গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে মড়ক উপস্থিত হয়

৬। পিতাবালী—পূজা দ্বারা ইঁহাকে তুষ্ট না করিলে অরণ্যে ব্যাঘ্রকবলে পতিত হইতে হয়।

৭। খমশেরী—ইঁহাকে তুষ্ট না করিলে ইনি মানুষকে নানা বিপদগ্রস্ত করেন।

৮। ডুম্বালনী—খোস পাঁচড়ার দেবতা।

৯। দারাকুম্ব—ইনিও খমশেরীর ন্যায় মানুষকে বিপদে ফেলেন।

১০। লিঙ্গাপেনু—প্রতি খন্দগৃহে ইঁহার মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। ইনি কোনও সময় মানুষ ও কোনও সময় পশু মূর্ত্তি ধরিয়া খন্দদিগকে দেখা দেন। গৃহে যত অল্পই শস্য থাকুক না কেন ইঁহার অনুগ্রহ হইলে তাহাতে বহুদিন চলিয়া যায়। ইনি তাহাদের লক্ষ্মী।

১১। ধর্ম্মপেনু—জয়দাতা।

১২। ঝাকরকুঠি—ইনি গ্রাম রক্ষা করেন।

খন্দগণ বহু দেবতায় বিশ্বাস করে বটে—কিন্তু সকল দেবতার উপরে যে একজন আছেন তাহাও বিশ্বাস করে। এই পরম দেবতাকে তাহারা "রটাপেনু" বলে। শূকর বলিদ্বারা এই দেবতার পূজা হয়। এই সমস্ত দেবতার কয়েকটী, বিশেষতঃ ধর্ম্মদেবতাকে, খন্দগণ যে হিন্দুদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

খন্দদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে "মহাপ্রভুর" স্কন্ধদেশ হইতে তাহারা জন্মগ্রহণ করে এবং "কন্দ" খাইয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত বলিয়া "কন্দ" নামে অভিহিত হয়। খন্দগণ আপনাদিগকে কন্দই বলে। খন্দ মহলে কচুর মত এক রকম বৃক্ষমূল খন্দগণ কর্তৃক খাদ্যরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাহাকে কন্দ বলে। শুনিয়াছি কন্দ খাইতে

বেশ সুস্বাদু। খন্দগণ শুধু কন্দ খাইয়া অনেক দিন কাটাইতে পারে। মহাপ্রভু কে তাহা জানিতে পারি নাই। তিনি মহাপ্রভু নামেই খন্দদিগের নিকট পরিচিত। সম্ভবতঃ উপরোক্ত 'রটাপেনু' হইবেন। যাহা হউক প্রবাদ আছে খন্দগণ পূর্ব্বে কন্দ ও বনফল খাইয়া জীবনযাপন করিত। বহু দিন পরে তাহাদের মধ্যে কতিপয় জ্ঞানীলোক—আবির্ভূত হইয়া অন্ন ভোজন প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তদবধি খন্দ সমাজে অসন্তোর উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে অনুতভাষী খন্দের সংখ্যা এখনো বেশী নহে।

খন্দগণ বিশ্বাস করে তাহাদের পূর্ব্বে কূর্ম্ম নামধারী একজাতি পৃথিবীতে বাস করিত। তাহাদের "যুগ" শেষ হইলে খন্দগণের আবির্ভাব হয়। এই প্রবাদের মূলে কি কোনও সত্য নাই? কূর্ম্মজাতির অধ্যুষিত কালকে খন্দগণ কূর্ম্মাবতার বলে।

খন্দগণ গোমাংস ভক্ষণ করে না। শুনিয়াছি সাঁওতাল বা ভীলগণও গোমাংস ভক্ষণ করে না। অথচ আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কালে গোমাংস ভক্ষণ করিতেন তাহার প্রমাণ আছে। আর্য্যগণ যে অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চিত। গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ কি দ্রাবিড়ীয় আচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেচ্ছার অভিব্যক্তি?

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

নবীন প্রভাত।

প্রথম যেদিন তোমায় আমায়
হয়েছিল দেখা।
আমি তখন ঘুমিয়েছিনু
তুমি জেগে একা।
আমি তখন দেখছি স্বপন
ফিরছি কত দেশ।
রচছি কত নূতন ভুবন
ধরছি কত বেশ।
আপন মনে ভাঙ্গা গড়া
স্বপন দেশের খেলা।
দিনে সেথা রাতের আঁধার
রাতে দিনের মেলা।
আধেক আলো আধেক ছায়া
আধেক স্বপন ঘোর।
দেখায় কত কুহক শত
পবার কত ডোর।
এলে তুমি কাছে আমার
শিরে দিলে হাত।
ভাঙ্গলে আমার এতদিনের
স্বপন ঘেরা রাত।
জেগে এখন তুমি আমি
বসেছি এক সাথে।
মধুর হাওয়া বইছে আজি
নবীন প্রভাতে।

শ্রীহেমলতা দেবী।

জাপানে শিক্ষা।

প্রকৃত পক্ষে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জাপানের সর্ব্ব প্রথম ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময় হইতেই বর্ত্তমান জাপানবাসীগণের উন্নতির সূত্রপাত। তিন বা সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কনফিউকাস সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ মিলিত হইয়া কার্য্য করিত। অতঃপর দিনেমারেরা জাপানবাসীগণের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ উপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে তথায় দিনেমার ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। অবশেষে যখন ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাবাসীগণ জাপানে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিলেন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড এলগিন সপারিষদ যখন জাপানে আগমন করিলেন তখন তথায় খাস ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ও ব্রিটিস-জাপ সন্ধি স্থাপিত হইল। তখন হইতেই জাপানবাসীগণের মধ্যে নবভাবের উন্মেষ।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে অস্থায়ী শিক্ষা সমিতি গঠিত হইবার তিন বৎসর পরে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ স্থাপিত হইল, এই বিভাগকে জাপানীভাষায় "মম্বুসো" (Mombusho) কহে। রাজমন্ত্রী ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা আইন (Educational Code) প্রচারিত হয়। জাপানের রাজা তাহাতে নিম্নলিখিত রূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন :—তিনি বলেন, "কর্ম্মচারী, কৃষাণ, শিল্পী ভাস্কর, কবিরাজ অথবা চিকিৎসাব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেরই স্ব স্ব প্রসার বৃদ্ধিকরণ মানসে জ্ঞানার্জ্জনের আবশ্যক। আমি আশা করি বিদ্যালয় বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের জ্ঞানলিপ্সাও এমন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে যে তখন গ্রামে গ্রামে, সুদূর পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষা ব্যাপৃত হইয়া পড়িবে। কি ধনী কি দরিদ্র তখন কোন পরিবারেই একটি নিরক্ষর লোক থাকিবে না। শিক্ষার ইচ্ছায় দেশ মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে।" জাপানরাজের বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গিয়াছে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ষড়্‌বিংশ বৎসরের মধ্যে জাপানে ৭৯ লক্ষ, ২৫ সহস্র, ৪ শত, জন পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। ইউরোপের পণ্ডিতগণ বলেন, সেই বর্ষে জাপানে কেবল বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে শত করা ৮২ জন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর দৌত্যকার্য্য (World's Embassy) পরিপালন মানসে ৪৯ জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি দ্বারা একটি সমিতি স্থাপিত হইল। ইহারাই সমগ্র জাপানের মুখপত্র বা প্রতিনিধি স্বরূপ। তন্মধ্যে রাজপুত্র ইয়াকুরা (Iwakura) ও মার্কুইস্ ইটো (Ito) প্রধান ছিলেন। ইহারা সকলে মিলিত হইয়া যাহাতে জাপানে উচ্চ শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পায় তদুপায় বিধানে মনোযোগী হইলেন। শত শত জাপছাত্রগণকে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বিভিন্নদেশে জাপছাত্র প্রেরণের ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষা

করিবার জন্যই জাপানের ছাত্রগণ ইউরোপ আমেরিকায় প্রেরিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে জাপানে বিদ্বান লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে এবং তাঁহারাই জাপান বিশ্ববিদ্যালয় তত্বাবধান করিয়া সুন্দর রূপে পরিচালিত করিতেছেন। সুতরাং অধুনা আর প্রায়ই জাপান হইতে শিক্ষার্থীছাত্র আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশে প্রেরিত হয় না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আড়াই শত ছাত্র রাজবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন দেশে গমন করিয়াছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বসমেত একাদশটিমাত্র ছাত্র উক্ত বৃত্তি লইয়া বিদেশে গমন করে। সর্ব্ব প্রথমে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক লইয়া আসিয়া জাপানছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছিল পরে সে ব্যবস্থাও রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১ জন বৈদেশিক শিক্ষক ছিল তন্মধ্যে ১৮ জন গ্রেটব্রিটানবাসী ১১ জন আমেরিকান। ইহাই হইল তথাকার সরকারী কলেজের কথা। বেসরকারী কলেজাদিতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬৭ জন পুরুষ ১০১ জন স্ত্রীলোক শিক্ষকতার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে জাপানে আনা হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট ইবুকা আমেরিকায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,— জাপানবাসীগণকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে গ্রেটবিটানের নিকট নৌ-বিদ্যা ও আমেরিকার নিকট হইতে বিজ্ঞান শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে।

জাপানের এলিমেণ্টারী (Elementary) স্কুল সমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) সাধারণ ও (২) উচ্চ। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সমষ্টি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ সহস্র ৩ শত ২২টি ছিল। ইহার ব্যয় ১৭ লক্ষ, ১৫ হাজার, ৩ শত, ৭০ পাউণ্ড। তন্মধ্যে ১৭ লক্ষ, ৫০ হাজার, ৪ শত, ৩৬ পাউণ্ড করদাতৃগণের নিকট হইতে চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল। অনুমান পঞ্চ সহস্র এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হয়। তাহাতে বিজ্ঞানসম্মত কৃষি-কর্ম্ম, কৃষিঅর্থ, নীতি এবং অধিকন্তু অপরাপর পরিশ্রমসাধ্য শিল্পাদি শিক্ষা প্রদান করা হয়। জাপবালিকাগণকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক গৃহস্থালী ও সূচী কার্য্যাদি শিক্ষা প্রদান করা হয়। জাপান গবর্ণমেণ্ট, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়াদিতে বিনা বেতনে সকলেই শিক্ষালাভ করিতে পারিবেক এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। জাপবালিকাগণ পূর্ব্বে বিনা কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিত। সত্বরই ইহার প্রতিবিধান করণে অনেকেই বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের মন্ত্রী বলিলেন, "জাপানে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিতে না পারিলে সমগ্র জাপানে শিক্ষা ব্যাপৃত হইতে পারিবে না। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কি বালক, কি বালিকা সকলেরই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এই প্রকার আদেশ প্রচারিত হওয়ায় বালকবালিকাগণ সকলেই বিদ্যার্জ্জনে মনোনিবেশ করিল। পুরাকালে ললনাগণের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। জাপানীগণ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে উপযাচক হইয়া ১ লক্ষ ৫৪ হাজার পাউণ্ড বা স্বর্ণ মুদ্রা বিদ্যালয়াদির জন্য প্রদান করে। কেবল তাহাই নহে,

এই এক বৎসরের মধ্যে জাপানীগণ শিক্ষাকল্পে ৩৬ লক্ষ ৭৭ হাজার 'একাব' জমি, ১৪ হাজার পুস্তক এবং ১৬ হাজার শিক্ষ-কার্য্যের যন্ত্রাদি দান করিয়াছিল। লিউইজ সাহেব বলেন, "জাপানের শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবার জন্য এককালীন দানের সংখ্যাই অধিক। তাহার এক পঞ্চমাংশ বেতনাদি বাবদ কলেজাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বৈদেশিক শিক্ষক শতকরা ১৫ জন হইতে ১৯ জনে পরিণত হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়াদির কিঞ্চিদূর্দ্ধে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। (১) মধ্যবৃত্ত স্কুল ও (২) উচ্চ বিদ্যালয় সমূহ। এই সময় হইতে তাহা দিগকে সৈন্যদলভুক্ত হইয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন সময় বিভাগ করিয়া লইতে হয়। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে কেহই ২৮ বৎসরের পূর্ব্বে স্কুল হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে না। নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের সহিত উচ্চ বিদ্যালয়াদির সংযোগ এবং একতা সংবদ্ধিত না হইলে দেশের উন্নতির অন্তরায় হইতে পারে সে কথা জাপানের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোন ছাত্র নিম্ন স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অপর উচ্চ বিদ্যালয়ে বিনা পরীক্ষায় প্রবেশাধিকারলাভে সমর্থ হইতে পারে। এমন কি, যদ্যপি কেহ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠাদি নিয়মমত অধ্যয়ন করিয়াছে বলিয়া কোন প্রশংসাপত্র (Certificate) প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান না করিয়াই কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে এবং তাহার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সহজেই হইতে পারে। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ যে সকল কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে সেও তদপেক্ষ নিম্নপদ প্রাপ্ত হইবে না। নিম্ন স্কুলের সঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়ের এমন সহানুভূতি সকলেরই অনুকরণীয়। অপর কোন দেশে ঈদৃশ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। কোন বেসরকারী বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় হইলে তাহাকে অপর উচ্চ বিদ্যালয়াদি সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ সম্পদে বিপদে ছোট বড় সকলেই পরস্পরে মিত্রতাসূত্রে সম্বদ্ধ আছে বলিয়া তথাকার অবস্থা এতাদৃশ উন্নত।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্বসমেত ১৬২টি সাধারণ মধ্যবিদ্যালয় এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহার শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৬১ জন; তন্মধ্যে দ্বাদশজন বিদেশী পুরুষ; আর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ২ শত ৮১ জন। এই সকল ছাত্র মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। পরে ইহার $\frac{৩}{৫}$ অংশ উচ্চ বিদ্যালয়ে গমন করিল; $\frac{১}{১৫}$ অংশ সৈন্য দলভুক্ত এবং $\frac{১}{১৮}$ অংশ বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইয়াছিল। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে ৫৬ জন আইন ১২৭ জন স্থপতি বিদ্যা (Engineering), ১ হাজার ৪ শত ৫৯ জন ডাক্তারী এবং ২ হাজার ৫ শত ৮৯ জন সাধারণ বিভাগে সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিত। ইহাই হইল পূর্ব্বকার অবস্থা।

মধ্যম শ্রেণীর বিদ্যালয়াদিতে ইংরাজী ভাষারই প্রচলন আছে। জাপ ভাষা

চৈনিক ভাষার পরস্পর নিকট সম্পর্ক বলিয়া উভয়েরই সমভাবে প্রচলন আছে। জাপানের সাধারণ লোক জিমনাষ্টিক বা অঙ্গ চালনাদি ব্যায়ামে যেরূপ মনোযোগী,—গণিত বা ইতিহাস পাঠে সেরূপ নহে। দর্শন ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠে আরও অবহেলা দেখা যায়। ব্যবসায় বাণিজ্যাদির জন্য যতটুকু বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যক সেইটুকু জ্ঞানলাভ হইলেই তাহারা যথেষ্ট বিবেচনা করে। তাহাদের বিশ্বাস শারীরিক বলাধান হইলেই বহিঃশত্রু এবং বিভ্রমাদি বিদূরীত হইতে পাবে। কিন্তু সরকারী উচ্চবিদ্যালয়াদিতে সকল বিষয়ই তুল্যরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। তন্মধ্যে পাঁচটি বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী সাধারণ বিদ্যাসকল বহু যত্নে শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি সর্ব্বোচ্চ আইন ও স্থপতিবিদ্যা শিক্ষার স্থান। তাহার ফলে কাইটো বিশ্ববিদ্যালয় (Kyoto University) সৃষ্ট হইয়াছে। মধ্য এবং উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা-পদ্ধতি ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করতঃ তথাকার উচ্চ শিক্ষার পথ প্রসার করিয়া দিয়াছে।

জাপানে দুইটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একটি টোকিয়ো ও অপরটি কাইটো সহরে অবস্থিত। তন্মধ্যে প্রথমটিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। রাজকীয় টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আদর্শানুযায়ীরূপে গঠিত হয়। পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সঙ্গে কৃষিবিদ্যা বিষয়ক উচ্চ কলেজের সংযোগ করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর হইতে দশবৎসর পর্য্যন্ত জাপানবাসীগণ আমেরিকা খণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। তাহার পরবর্ত্তী সময় হইতে এখানে জর্ম্মাণ দেশ প্রচলিত প্রথায় কার্য্য চলিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় বহু অংশে বিভক্ত। আইন, বিজ্ঞান, স্থপতিবিদ্যা, ডাক্তারী, কৃষিকার্য্য, সাহিত্য, পুস্তকরক্ষণ প্রণালী, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, মানমন্দির সংশ্লিষ্ট জ্যোতিষ, (Astronomical observatory), সামুদ্রিক রসায়ন, হাস্পাতালের রোগীচর্য্যা প্রভৃতি বহু বিষয় এখানে পঠিত হইয়া থাকে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে ১ শত ৬২ জন অধ্যাপক ছিলেন;—আইনে ২২ জন, ডাক্তারীতে ৩০ জন, স্থপতিবিদ্যায় ৩৫ জন, সাহিত্যে ২৫, বিজ্ঞানে ১৮, কৃষিবিদ্যায় ৩১ জন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ; ২ শত, পাঁচজন। আর টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কি প্রকার বাড়িতেছে একটি তালিকা প্রদান করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

কলেজের নাম ও বিষয়		১৮৮৫	১৮৯০	১৮৯৫	১৮৯৬	১৮৯৭
ইউনিভারসিটি হল (কলেজ)		০	৪৭	১০৫	১৪৬	১৭৪
আইন	”	২১৭	৩০১	৪৭২	৫৬১	৭৩১
বিজ্ঞান	”	৪৩	৭৭	১০২	১০৫*	১০৫
স্থপতিবিদ্যা	”	৩০	১০৬	২৯৫	৩৪৫	৩৮৫
ডাক্তারী	”	৭২৬	১৮৮	১৭৮	২২৩	৩৯৭

সাহিত্য	কলেজ	১২৯	৮৮	২১৯	২৩৮	২৭৮
কৃষি	”	০	৪৮২	২৪৯	২১৫	২৩২
মোট ৭	কলেজ	১,১৪৫	১২৯২	১৬২০	১৮৩৩	২২০৮

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ৩০ জন ছাত্র আইন, ৯ জন ডাক্তারী, ৩১ জন স্থপতি বিদ্যা, ৭ জন বিজ্ঞান এবং ৪ জন কৃষিশিল্প অধ্যয়ন করিত।

লিউস সাহেব বলেন, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সকল ছাত্র গ্রাজুয়েট হইয়া ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৩০৮ জন। তন্মধ্যে ১০৭ জনকে জাপান গভর্ণমেণ্ট শাসন বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছেন। ৪৮ জন বিশ্ববিদ্যালয় হল নামক কলেজে বিবিধগ্রন্থের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ৪৫ জন ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যাদি সংক্রান্ত কার্য্যে বিনিযুক্ত। ৪৪ জন কোন কার্য্যাদিই করিতেছেন না। ৪২ জন স্কুল ও কলেজের অধ্যাপক হইয়াছেন। ১৫ জন গ্রাজুয়েট হইয়া সরকার হইতে বৃত্তিভোগ করতঃ রিসার্চ্চ বা গবেষণার কার্য্য করিতেছেন। ইহাকে ইংরাজীতে Post-graduate এর কার্য্য কহে। অবশিষ্ট ৭ জন অপর ব্যবসায়াদি গ্রহণ করিয়াছেন। এই হইল ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পূর্ব্বে এইপ্রকারে কার্য্য চলিত। বর্ত্তমান সময়ে জাপানের ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেশের বহুবিধ মঙ্গলকার্য্যে রত হইতেছে। কেহ যাবজ্জীবন কৌমার্য্য অবস্থায় কলেজ-লাইব্রেরীতে বিবিধ গবেষণায় কালাতিপাত করিতেছেন। কেহ বিজ্ঞানচর্চ্চায় গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেছেন।

শ্রীগণপতি রায়।

মানস দর্শন।

(মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালী)

(কবে) চিরমধুমাধুরীমণ্ডিত মুখ তব
রাজিবে মলিনমরমতলে।
পাতকীপুলকে শিহরি হেরিবে
মুগ্ধমানসে নেত্র জলে॥
সঞ্চিতপুঞ্জিত দুষ্কৃতি-বেদনা
রাখিবে চরণে তোমারি দান,
সকল হৃদয় আশা, সকল ভাবনা ভাবা,
সফল হইবে হরি করুণাবলে
সফল হইবে হরি করুণাবলে॥

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

পরিচয়।

তুমি যে সুন্দর তাহা দেখিনু নয়নে
নয়ন-ভুলান এই তোমার ভুবনে;
তুমি যে অসীম তাও জেনেছি হৃদয়ে
আপনার হৃদয়ের প্রেমের বিস্ময়ে;
করুণা সাগর হয়ে তবু ন্যায়বান
বুঝিলাম দেখি তব এ বিশ্ব মহান,
উচ্চনীচ, ভালমন্দ যেথা নির্ব্বিচার
ভুঞ্জে অবারিত দান আলোক আঁধার,
জল, বায়ু, পুষ্প, ফল, তব বনচ্ছায়া
নীলকান্ত আকাশের সীমাহীন মায়া,
জরা মরণের চির অমোঘ বিধান
সম্রাট দরিদ্র’পরে নিয়ত সমান।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ইংরাজের দৌত্য।

(১)

সময়—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

তখন নূতন ও পুরাতন দুই কোম্পানিতে বিশেষ গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছিল। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গবর্ণমেণ্টের দুই কোটী টাকার আবশ্যক হইয়াছিল। এই টাকার জন্যই তথাকার গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়া নূতন একটী কোম্পানি গঠনের অনুমতি দিতে হয়। এই নূতন কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্টের সমক্ষে উপনীত হইলে পুরাতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একখানি আবেদনপত্র উক্ত মহাসভায় পেশ করেন। নূতন এবং প্রতিদ্বন্দী কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইলে যে বিস্তর অসুবিধা হইবে—সেই সমুদয় বিষয় উল্লেখ করিয়া আবেদন প্রেরিত হইলেও নূতন কোম্পানির সনন্দ পাইতে কোন বিঘ্নই হইল না। প্রকৃত পক্ষে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশীদার প্রভৃতির মধ্যে অনেক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি থাকিলেও, সাধারণে কোম্পানীকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং সহজেই পার্লিয়ামেণ্ট ১৬৯৮* খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় একটী কোম্পানি স্থাপনে অনুমতি দিলেন।

ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। পুরাতন কোম্পানি নূতন কোম্পানিকে ভয় করিয়া চলা দূরে থাকুক, তাঁহাদের দূরদেশস্থ এজেণ্টদিগকে যে ভাবে পত্র দিয়াছিলেন তাহা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে নূতন কোম্পানির সহিত বিবাদ বাধাইতেই তাঁহারা সমুৎসুক। "যেমন এক রাজ্যে দুইজন রাজা থাকিতে পারেন না, তদ্রূপ এদেশেও দুইটী কোম্পানী একত্র থাকিতে পারে না। পুরাতন এবং নূতনে শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে এবং ২।৩ বৎসরের যুদ্ধে যে হয় একদল জিতিবেই। পুরাতন কোম্পানীর সকল কর্ম্মচারীই দক্ষ সুতরাং যদি কর্ম্মচারীগণ রীতিমত ভাবে কার্য্য করেন, তাহা হইলে পরাজয়ের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই প্রকার অন্তর্বিরোধে পৃথিবী হাসিবে, হাসুক—উপায় নাই।"*

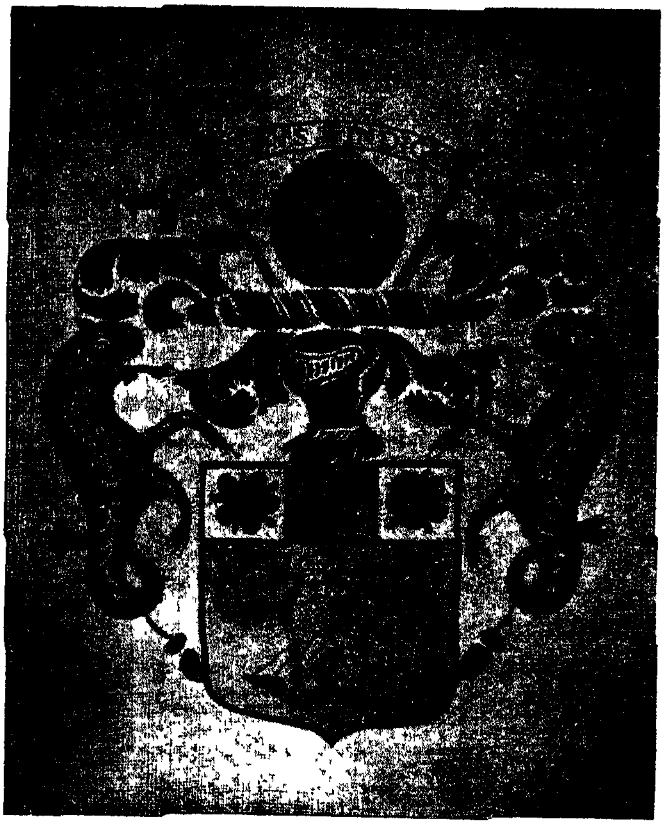
একই উদ্দেশ্যে ২টী কোম্পানি স্থাপিত হওয়াতে ভারতবর্ষে বিশেষ গোলমাল বাধিয়া গেল। নরপতি তৃতীয় উইলিয়াম নূতন কোম্পানিটির দিকেই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং তিনি ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হিন্দুস্থানের সম্রাট আউরঙ্গজীবের নিকট এই সদ্যোজাত শিশুর জন্য ফার্ম্মাণ

* "The truth is, that the whole of this contest was only one division of the great battle, that agitated the state, between the tories and the whigs ; of whom the former favored the new Company the latter the old"...Grants' "A sketch of the History of the East India Company."

ইত্যাদি লইবার প্রত্যাশায় স্যার উইলিয়ম নরিশকে পাঠাইয়া দিলেন।

স্যার উইলিয়াম নরিস, ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাহাজ হইতে মছলিপট্টমে অবতরণ করিলেন। দুই কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাধ্য হইয়া, তাঁহাকে ১৭০০ সনের শেষভাগ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই নিশ্চল হইয়া থাকিতে হইল। ১০ই ডিসেম্বর তিনি সুরাট পৌছিলেন। কিন্তু পুরাতন কোম্পানির এজেণ্ট স্যর জন গেয়ারের চক্রান্তে সুরাটের

Reproduced by kind permission of the Government of India.



পুরাতন কোম্পানির তকমা।

শাসনকর্ত্তা নরিশকে প্রথমে রাজপ্রতিনিধি বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পরে তাঁহার নিকট উইলিয়াম প্রেরিত পত্রাদি দেখিয়া তাঁহাকে বন্দরে নামিতে অনুমতি দিলেন। তখন নূতন কোম্পানির কনসাল সার্ নিকোলাস ওয়েট যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত রাজপ্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

১৭০১ সনের ২৬শে জানুয়ারী সার উইলিয়াম নরিস ৬০ জন ইউরোপীয়ান এবং ৩০০ শত দেশীয় সিপাহীসহ বাদসাহের ছাউনি অভিমুখে যাত্রা করিয়া ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সুরাট হইতে ৬০ ক্রোশ দূরে কোকেলি নামক স্থলে উপনীত হইলেন।

Reproduced by kind permission of the Government of India.



নব কোম্পানির তকমা।

এই স্থানে সংবাদ আসিল যে সুরাটের শাসনকর্ত্তা, পুরাতন কোম্পানির এজেণ্ট সার জন গেয়ার এবং কোম্পানির অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে আটক করিয়া কয়েদ করিয়াছেন; এবং দুই লক্ষ টাকার হুণ্ডি লইয়া, তাঁহাদের উকীল রাজদরবারে তাঁহাদের মুক্তির জন্য যাত্রা

করিয়াছেন। সম্রাটের নিকট এ সম্বন্ধে উপযুক্ত আর্জি করিবার অভিপ্রায়ে ফেব্রুয়ারী মাসের চতুর্দ্দশ দিনে নরিস সাহেব বানকোলীতে পৌঁছিয়া, কাহার আদেশে সুরাটের শাসনকর্ত্তা, সার জন গেয়ার ও কোম্পানির কর্ম্মচারীগণকে আটক করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য পত্রবাহক প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে তাঁহার সঙ্গী পদাতিকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। কিন্তু নরিস সাহেবের শরীর রক্ষকগণ অচিরেই সেই বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়। পথে সার নিকোলাস ওয়েট, তাঁহাকে সুরাট হইতে সংবাদ দেন যে দক্ষিণ ভারতসমুদ্রের জলদস্যুর আক্রমণ নিবারণের জন্য সুরাটের শাসনকর্ত্তা তাঁহার নিকট জামিন চাহিয়াছেন। যে সমস্ত জাহাজ লণ্ডন কোম্পানির জাহাজ কর্ত্তৃক ধৃত হইবে কেবলমাত্র তাহাদের জন্য নরিস সাহেব জামিন হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং এই সকল বিষয় সাহান সা সম্রাটের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন তাহাও আভাষ দিলেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী নরিস সাহেব আওরাঙ্গাবাদের নিকটবর্ত্তী গেল গাঁ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সার নিকোলাস ওয়েটকে সংবাদ দিলেন যে, সার জন গেয়ার এবং লণ্ডন কোম্পানীর কর্ম্মচারীবৃন্দ মুক্ত হইলে হয় ত তাঁহারা প্রতিশোধ কামনায় সুরাট বন্দর আক্রমণ করিতে পারেন। কিন্তু রাজদরবারে ইহাতে কার্য্যের বিশেষ বিঘ্ন হইবে। সুতরাং ইহা নিবারণকল্পে ওয়েট সাহেব যেন বন্দরের নিকট একটী যুদ্ধ জাহাজ রাখিয়া দেন এবং ওরূপ চেষ্টা করিলে যেন তাহাতে অবশ্য অবশ্য বাধা প্রদান করেন। ২১শে তারিখে সার নিকোলাস ওয়েট নরিস সাহেবকে সংবাদ পাঠান যে ফার্ম্মাণ পাইবার জন্য যতটাকারই প্রয়োজন হউক না কেন, তাহা দিতে নরিস সাহেব যেন বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হন; এবং যাহাতে সম্রাট এ প্রস্তাব সহজেই গ্রাহ্য করেন, তজ্জন্য প্রতি বৎসরে ৬৲ টাকা দরে ছয় হাজার মণ করিয়া সীসা দিবেন, যেন এইরূপ অঙ্গীকার করেন।

৩রা মার্চ্চ নরিস সাহেব ব্রামপুরে পৌঁছেন। সেই স্থানে উজীর গাঁজিখাঁ অবস্থিতি করিতেছিলেন। নরিস সাহেব সপারিষদ্ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। উজীর এই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে মিঃ নরিস ইহাতে বিশেষ অপমানিত বোধ করিয়া উজীরের সহিত দেখা না করিয়াই ব্রামপুর পরিত্যাগ করিয়া ৭ই এপ্রিল পার্ণেলায় উপনীত হইলেন। সম্রাট তখন ছাউনি করিয়া এইখানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজ-প্রতিনিধি নরিসের আগমন সংবাদ সম্রাট সমীপে প্রেরিত হইবামাত্রে সম্রাট তাঁহাকে ছাউনি ফেলিতে অনুমতি দিলেন। শীঘ্রই আউরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারিত হইল এবং শোভাযাত্রা সংক্রান্ত শিষ্টাচার বিধিও ঠিক হইয়া গেল।

১৭০১ সনের ২৮শে এপ্রিল ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়াম প্রেরিত রাজদূত ভারতবর্ষের সাহনসা সম্রাটের সহিত দর্শনাভিলাষে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গের দলবল নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহার সহিত যাত্রা করিলেন।

১। অশ্বপৃষ্ঠে রাজপ্রতিনিধির গোলন্দাজ সৈন্যের সেনানায়ক।

২। দ্বাদশ খানি শকটে উপহারার্থ দ্বাদশটি পিত্তলের-কামান।

৩। পাঁচখানি শকটে নানাবিধ বস্ত্রাদি।

৪। কতকগুলি শকটে নানাবিধ কাচের দ্রব্য ও দর্পণাদিসহ একশত ব্যাক্স।

৫। সুসজ্জিত দুইটী উৎকৃষ্ট আরব দেশীয় অশ্ব।

৬। রাজপতাকাধারী সাজসজ্জাবিহীন উৎকৃষ্ট আরব দেশীয় ২টী অশ্ব।

৭। উপহাররক্ষক চারিজন অশ্বারোহী গোরা সৈন্য।

৮। লোহিত, শ্বেত, এবং নীলবর্ণের পতাকা সমূহ ও সুসজ্জিত সাতটী মূল্যবান অশ্ব।

৯। রাজা উইলিয়াম ও রাজপ্রতিনিধির শিরস্ত্রাণ।

১০। বহুমূল্য রৌপ্যনির্ম্মিত জরীর কারুকার্য্যখচিত ইংরাজী ধরণে সুসজ্জিত পাল্কী।

১১। অন্য দুইটী শিরস্ত্রাণ।

১২। সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাদ্যকরগণ।

১৩। অশ্বপৃষ্ঠে রাজপ্রতিনিধির পদাতিক সৈন্যের লেফটেনান্ট।

১৪। অশ্বারোহণে সুসজ্জিত দশটি ভৃত্য।

১৫। রাজা উইলিয়াম এবং প্রতিনিধির কুলচিহ্ন। (arms)

১৬। সুসজ্জিত অশ্বারোহী ডঙ্কাবাহী। সুসজ্জিত তুরীবাদক তিন জন অশ্বারোহী সৈন্য।

১৭। রাজপ্রতিনিধির শরীররক্ষকদিগের সেনানায়ক।

১৮। ইংরাজী ধরণে বিশেষ রূপে সজ্জিত দ্বাদশ জন অশ্বারোহী সৈন্য।

১৯। রাজপ্রতিনিধির অশ্বারোহী সৈন্যের সেনানায়ক।

২০। রাজা উইলিয়াম এবং রাজ প্রতিনিধির সুবর্ণ গিল্টি করা অস্ত্র। (Arms ,*

২১। মূল্যবান পোষাক পরিহিত অশ্বারোহণে মিঃ মিল, এবং মিঃ হুইটেকার।

২২। উন্মুক্ত অসি হস্তে মূল্যবান পোষাক পরিহিত অশ্বারোহীসৈন্যের অধ্যক্ষ মিঃ হেল।

২৩। বহু মূল্যবান সুসজ্জিত পাল্কী আরোহণে রাজপ্রতিনিধি।

২৪। সুসজ্জিত চারি জন ভৃত্য—পাল্কীর সহিত।

২৫। রাজার পত্র সঙ্গে লইয়া মূল্যবান পাল্কিতে সেক্রেটারী এডোয়াড।

২৬। এই পাল্কির উভয় পার্শ্বে অশ্বারোহী দুই জন সাহেব।

২৭। সুসজ্জিত শকটারোহণে কোষাধ্যক্ষ ও রাজপ্রতিনিধির খাস সেক্রেটারী।

আউরংজাব ইংরাজ রাজপ্রতিনিধিকে প্রকাশ্য দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সমাদরের সহিত তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ দিলেন। সার নরিস তখন নূতন কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্যের জন্য ফার্ম্মাণ প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনার উত্তর উজীরকে জানাইবেন সম্রাট এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। কয়েক দিবস

* প্রথমটী বহন করিতে ষোল জন বাহক লাগিয়াছিল।

পরে নরিস সাহেব সম্রাটকে নজর স্বরূপ ২০০ মোহর প্রদান করাতে আউরংজেব কিছু সন্তুষ্ট হইয়াছেন বোঝা গেল। কিন্তু এই ইংরাজ দূতের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়েই সুরাট হইতে সংবাদ আসিল—যে মক্কাযাত্রীসহ তিন খানি জাহাজ ইংরাজ জলদস্যু আটক করিয়াছে। এই জাহাজগুলি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে আইসে তাহার জন্য উজীরগণ নরিস সাহেবের নিকট প্রতিভূ চাহিলেন ও ভবিষ্যতে ইংরাজ দস্যু যাহাতে মোগলের বাণিজ্যের কোন রূপ বাধাবিঘ্ন না জন্মায় তাহার জন্যও জামিন চাহিলেন। ইংরাজ দূত এ প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে সম্রাট কোন রূপ ফার্ম্মাণই দিলেন না। বাধ্য হইয়া এই নবেম্বর সার নরিস মোগলছাউনি পরিত্যাগ করিলেন। সম্রাটের মন্ত্রীগণ নরিসকে জলদস্যুর জামিন লইতে সম্মত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ব্রামপারে কয়েক দিন তাঁহাকে এক প্রকার আটকাইয়াও রাখিলেন। ইতি মধ্যে ইংলণ্ডেশ্বরের জন্য সাহানসা প্রেরিত এক পত্র ও তরবারি পৌঁছিল এবং ৭ই জানুয়ারী নরিস তাঁহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। ১২ই এপ্রিল সুরাট পৌঁছিয়া তিনি ২৯শে তারিখে জন্মভূমি অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি সেণ্ট হেলেনা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

এই দৌত্যকার্য্যে কোন সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক ইংরাজ কোম্পানীর যথেষ্ট অর্থধ্বংস হইয়াছিল। পরন্তু সম্রাটের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়াতে এবং ইংরাজ জলদস্যুগণের অত্যাচার দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়াতে সম্রাট ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক ইউরোপীয়ানকেই কারাগারে নিক্ষেপের আদেশ দেন।*

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা অন্য দৌত্যের বিবরণীতে দেখাইব যে সেবার ইংরাজ ইচ্ছানুযায়ী সফল কাম হইয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের সহিত আমরা নূতন ও পুরাতন কোম্পানির তখনকার তকমা (Arms) চিত্র সংযোজিত করিলাম।

পুরাতন কোম্পানির তকমা উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণের আর নব কোম্পানির তকমার রংচং অপেক্ষাকৃত কম। এ সম্বন্ধে Sir George Birdwood যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। "The change of arms and particularly in the dominant colours of the arms of the East India Company, as shown in Plates I and II foreshadowed its transformation from a mercantile corporation into a great military power."

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

---

* Stuart. Also Broome P. 32.

প্রেম।

কাল রজনীতে উঠেনিক চাঁদ, ফুটেনি একটি তারা,
আঁধারের মাঝে বিরহী বাতাস হয়েছিল দিশাহারা ;
জোনাকি জ্বলেনি যুথিমালঞ্চে ঝিঁঝিট ডাকেনি ঝাড়ে,
টিটিপাখী শুধু টিট্‌কারি দিয়ে কেঁদেছে দীঘির পাড়ে ;
তারি মাঝে আমি ইমন-বেহাগে সেধেছিনু বাঁশীখানি,—
কেহ না শুনুক্ তুমি শুনেছিলে, মনে মনে তাহা জানি।

আজ রাতে যবে ঝরঝরধারে বাদর ঝরিছে মেঘে,
হরষ-সরস কণ্ঠ তুলিয়া ভেকেরা উঠেছে জেগে ;
ঘরে ঘরে ঘরে শিকল বাজিয়ে বায়ু দিয়ে যায় নাড়া,
আদ্র পাতায় সিক্ত শাখায় পাখীরা না দেয় সাড়া,
কাহার হৃদয় কাঁপিছে সেতারে মল্লারে মীড় টানি ;—
সে ব্যথা কাহার, কেহ না জানুক—আমি তাহা ভাল জানি।

কোথায় কাঁপিছে করুণ সেতার, কোথায় কাঁপিছে বাঁশী,
দুটি অন্তর কতদূর থেকে তবু কত পাশাপাশি !
দুটি হৃদয়ের ইঙ্গিত দিয়া হৃদয়ের বিনিময়,
দুটি সুকরুণ সঙ্গীত মাঝে সুনিবিড় পরিচয় !
কোথা প'ড়ে আছে দেহের সীমানা, কোথা মিলে আসি' প্রাণ,
অন্তরায়ের অন্তর টুটি' মিলনের মহা গান !

এমনি যেন গো চিরদিন ধরে' দূরে থেকে থাকি কাছে,
এর বেশী যেন চেয়ে কোনদিন কাঁদতে না হয় পাছে !
অন্তর মাঝে থাকিতে আলোক দূরে কেন তারে খুঁজি ?
ভাল করে' যেন বুঝিবারে গিয়ে মূলেই ভুল না বুঝি !
দূরে থেকে যেন চিরদিন রাত দুজনারে বাসে ভালো,—
দুখানি হৃদয় উজলিয়া রাখে প্রেমের অমৃত আলো !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ।

পোষ্যপুত্র।

২৯

জল খাবাবের কাছে দাঁড়াইয়া রজনীনাথ যখন প্রত্যাশা পূর্ণ উৎসুকনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন তখন সে ঘরের চারিদিককার অসম্পূর্ণতা তাঁহাকে প্রায় বিহ্বল করিয়া তুলিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একহাতে একটা পাথরের গ্লাসে বরফ দেওয়া জল ও অপর হস্তে পুত্রের হাত ধরিয়া শিবানী সেই ঘরে প্রবেশ করিল, রজনীনাথ তাহাদের দিকে সস্নেহে একবার চাহিয়া দেখিয়া আসনের উপরে বসিলেন। যেখানটাকে মরুভূমি বলিয়া মনে একটা সন্দেহের আতঙ্ক জাগিয়া উঠিয়াছিল সেটা যদি হঠাৎ নদীতীরের বালুকা বলিয়া জানিতে পারা যায় তাহা হইলে তৃষ্ণার্ত্ত যেমন আরামের নিশ্বাস পরিত্যাগ করে তাঁহার ও সেই রকম একটা নিশ্বাস বাহির হইল। শিবানী জলের গ্লাসটা নামাইয়া দিয়া রজনীনাথের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। ছেলেও মায়ের দেখাদেখি মাটিতে মাথা ঠুকিয়া একটা দীর্ঘচ্ছন্দের প্রণাম করিয়া অভ্যাস মতন এই অপরিচিতের সম্মুখে চুম্বনের দাবীতে মুখ বাড়াইয়া দিল। প্রণাম প্রাপ্তির পর চুম্বন প্রত্যর্পণ যে একটা অকাট্যনীতি সে বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। হাসিয়া রজনীনাথ বিনোদের পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। মুখের ভাব গায়ের রং চোখের দীপ্তি তাঁহার স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া আবার একটা নিশ্বাস বহন করিয়া আনিল। কিছুই ফুরায় না; পুরাতন নূতন হইয়া দেখা দেয় মাত্র! শিশুর দাবী মিটাইয়া দিয়া তাহাকে নিজের রেকাব হইতে ফল ও মিষ্টান্ন দিয়া বশ করিবার চেষ্টায় তাঁহাকে ব্যর্থ হইতে হইল। ন্যায়পরায়ণ হাকিমের মতন সে ঘুষের প্রলোভন জয় করিয়া নিজের পাওনাটি মাত্র আদায় করিয়া লইয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিল। রজনীনাথও তখন ভাল করিয়া সেই দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। একি! তপস্যাপরায়ণা উমার সজীব যোগিনী মূর্ত্তি কোন সুনিপুন চিত্রকর এখানে সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে? এই কি বিনোদকুমারের অনাদৃতা পত্নী! রজনীনাথ অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিলেন। বিনোদকে তিনি জানিতেন, সুধু তাহার বাহিরটা নয় তাহার অন্তঃপ্রকৃতির সহিতও তাঁহার কিছু কিছু পরিচয় ছিল। তাই কল্পনায় যে ঈষৎ স্থূলাঙ্গী গৌরবর্ণা লজ্জাসঙ্কুচিতা অশ্রুম্লান নারীমূর্ত্তি কোন এক অজ্ঞাত সময়ে আপনা আপনি তাঁহার মনে চিত্রিত হইয়া গিয়াছিল—এখন অত্যন্ত সহসা এই রমণী তাহাকে ধিক্কারের সহিত বিদূরিত করিয়া সেইখানে ফুটিয়া উঠিল। অবিচার করিয়া কাহারও দণ্ড বিধান করিবার পর তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিতে পারিলে বিচারক যেমনতর একটা উৎকট আত্মগ্লানি অনুভব করিতে থাকেন রজনীনাথ সেই রকম এই স্বামীত্যক্ত রমণীর দিকে চাহিয়া মাথা নীচু করিলেন। এতো উপেক্ষিতা মুখ নয়! এ দৃষ্টির নির্ভীকতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও একান্ত দৃঢ়ভাব তাঁহার মানব চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ণ অনভিজ্ঞতার কথাই



বিবাহ-খেলা—ফুলের মালা

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস অঙ্কিত চিত্র হইতে

ব্যক্ত করিতে লাগিল। মনে মনে পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আমি আশ্চর্য্য হইলাম, বিনোদ কি তবে আমি যেমন মনে করি তেমন নয়? সাধারণ লোকের মত একজন খেয়ালি যুবক মাত্র?" রজনীনাথ যে পরিমাণে বিনোদের পরিত্যক্ত স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা মমতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন সেই পরিমাণেই বিনোদের চরিত্রের লঘুতা তাহার প্রতি তাঁহাকে শ্রদ্ধাহীন করিয়া তুলিল। এমন রত্ন পাইয়াও তাহার মর্য্যাদা বুঝিল না সে এমনি পাষণ্ড? এমনি সময় শিবানী তাহার আনত নেত্রদ্বয় তুলিয়া একটু অনুযোগের স্বরে কহিল "আপনি বসলেন না?" রজনীনাথ শিবানীর কথায় ও স্বরে একটু খানি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু বিস্ময় বোধ করিলেন না,—এই রকমই সুর যেন এ রকম মুখ হইতে ঠিক মানায়,—অনুযোগ পূর্ণ আদেশের স্বর। হাত ধুইয়া রেকাবটা একটু খানি কাছে টানিয়া লইলেন ও তারপর একটু খানি কি ভাবিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া শিবানীর অকুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন "আমার ছোট মেয়ে তার দিদির কাছে যে দোষ করেছে তার ক্ষমা পেতেও বোধ হয় বেশি দেরি হয়নি, নয় মা?" শিবানী কখনও পিতৃস্নেহ জানিত না; শ্বশুরের নিকট আসিয়া অবধি সে তাঁহার স্নেহোদ্বেলিত হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সে স্নেহে সে যেন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইত না। যেখানে অধিকারের অকুণ্ঠিত গর্ব্বে সে স্থান পায় নাই, সেখানে চোরের মতন প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত সে অপরাধকুণ্ঠিত হইয়া আছে। পরের পূর্ণ অধিকারকে খর্ব্ব করায় সে দারুণ আত্মগ্লানি অনুভব করিতেছিল—তাই তাহাকে এখানকার কোন পাওনাই হাসিমুখে লইতে দেয় না। কিন্তু রজনীনাথের কথা কয়টা তাহাকে আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে চকিত করিয়া তুলিল। কে জানে কেন সহসা তাহার সর্ব্ব শরীরকে কণ্টকিত করিয়া আনন্দের একটা তাড়িৎ শিরার ভিতর দিয়া দিয়া বহিয়া গেল ও আচমকা তাহার কঠিননেত্র অশ্রুজলের একটা প্রবল উচ্ছাসে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। শিবানী এক মুহূর্ত্তকাল আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে চুপ করিয়া রহিল ও তার পর নতনেত্রে কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল "দিদি আমার কাছে আসবার জন্যে কত ব্যগ্র হয়ে রয়েছে তা কি আমি জানি না বাবা? কিন্তু ঠাকুরপো আমার সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছুক নন। আপনি আমার একটা কিছু বন্দোবস্ত করে দিন। আমার জন্যে এতবড় সংসারটা না নষ্ট হয়ে যায়—

শিবানী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিলেও শত বার সঙ্কোচ ও আত্মাভিমান আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতে লাগিল ও সমস্ত শরীরের ভিতর যেন হিম হইয়া আসিতেছিল তথাপি কোন বাধাই আজ সে গ্রাহ্য করিল না।

শিবানীর কথাগুলা কিন্তু রজনীনাথের কানে একটু অদ্ভুত রকম শুনাইল। কি যেন একটা অজানিত আশঙ্কার আভাসে তাঁহার চিত্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া তার পর ধীরে ধীরে সস্নেহকণ্ঠে বলিলেন,—

"মা, জগতে ন্যায় সত্য ও ভালবাসারই জয় হয়ে থাকে। অন্যায়ের প্রশ্রয় বা পুরস্কার

বিধাতার হাতে কেউ কখনও পায়নি। তোমার স্নেহ তাদের তোমার পাশে দাঁড়াবার উপযুক্ত করে গড়ে নেবে মা, আমি আজ থেকে তাদের জন্ম আরও বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারব। সেতো তার অন্যায় আচরণের ক্ষমা চাইতে কুণ্ঠিত হয়নি ?”

ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শিবানী একটু ভাবিয়া বলিল “সেতো কিছু দোষ করেনি বাবা! ঠাকুরপো তাকে ত জোর করে নিয়ে গেল। সে যে কিছুতেই যেতে চায়নি! সেদিনকার সে মুখ যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারচি না”—বলিতে বলিতে অশ্রুভাবাক্রান্ত রুদ্ধকণ্ঠে ব্যথিতা শিবানী সহসা থামিয়া গিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার আত্মবিস্মৃত অশ্রুবিন্দু ক্রোড়স্থ শিশুর অঙ্গে পড়াতে সে তাহার সম্মুখস্থ অপরিচিত “দাদাবাবুর” উপর হইতে বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া মায়ের মুখে স্থাপন করিয়া বিস্ময়-নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। এ রকম কাণ্ডটা বড় একটা তাহার চোখে পড়ে না, মায়ের কোল ও তাহার চোখের জল দুইই এখন তাহার কতকটা অপরিচিত। রজনীনাথের গম্ভীর বিচারকের দৃষ্টি মুহূর্ত্তে বিস্ময় চকিত হইয়া উঠিল, ঈষৎ কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন “সেকি তবে বাড়ির লোকদের অনাদর সহ্য করতে না পেরে চলে যায়নি? সেতো এ কথা আমায় বল্লে না!”

শিবানী তীব্রভাবে কহিল, “আপনি কি তাই মনে করেছিলেন নাকি? সে কি সেই রকম মেয়ে?” এ ভর্ৎসনা রজনীনাথকে খুব আঘাত দিয়াই বিঁধিল। কয় দিন হইতে একটা নিদারুণ অনুতাপে তিনি দগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার অন্তর তাঁহাকে বলিতেছিল “সে কি এমন কাজ করিতে পারে! তিনি সম্ভবত তাহাকে বৃথা দোষী করিয়াছেন!”

শিবানীর কথায় তাঁহার মনেরই যেন প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল! সত্যই তো সে তো এ রকম দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করিবার মত মেয়ে নয়। এ কথাটা তিনি কেন ভাবিয়া দেখিলেন না? পরের ছেলের উপর রাগ করিয়া কেন নিজের সন্তানকে এমন কঠোর দণ্ড দিলেন? রজনীনাথ অস্পর্শিত আহার্য্য ছাড়িয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অনুতাপবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, “তাই বুঝি রাতি রাগ করে আমার কাছে আসেনি! মা তাকে একবার ডাক তো! বল তার অনুতপ্ত বাপ তার জন্যে তার চিরস্নেহের কোল পেতে রেখেছে; তাকে বুকে নেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে তার প্রতীক্ষা করচে।” পিতার কণ্ঠস্বর বাষ্পজড়িত হইয়া রুদ্ধ হইয়া আসিল, মনের দুর্ব্বলতা চাপিয়া ফেলিবার জন্য তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কি বিস্ময়! শিবানী বিস্ফারিত নেত্রে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিল, অসাবধানে তাহার মাথার কাপড়টা মাথা হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল তাহা সে জানিতে পারে নাই, এলোচুলগুলা বাতাসে উড়িয়া মুখে বুকে ছড়াইয়া পড়িয়া সেই যোগিনী মূর্ত্তির অসম্পূর্ণতা পরিপূরণ করিয়াছিল। অমূল্য মার কোল হইতে নামিয়া তাহার পিঠের উপর পড়িয়া সেই জটাবাঁধা চুলগুলা লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল, শিবানী ভাল করিয়া সে সব কিছু জানিতেও পারে নাই। কিছুক্ষণ সে নির্ব্বাক

হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কাকে ডেকে দিতে বলচেন?" বিস্মিত হইয়া রজনীনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "শান্তিকে শান্তিকে!" "এখানে শান্তি কোথায়? তারা তো কদিন হলো আপনার কাছেই গ্যাছে"—

রজনীনাথের বুকের ভিতরে একটা আঘাত পড়িল,—"সে কি! আমি যে তাদের সেই রাত্রেই এখানে ফিরিয়ে পাঠিয়েছি, হেম এখানে আসেনি?"

রজনীনাথের বিলম্ব দেখিয়া ও নিজের মনের দুর্ব্বলতায় তাঁহার প্রতি সমুচিত সমাদর না দেখাইতে পারায় অনুতপ্ত হইয়া শ্যামাকান্ত তাঁহার অনুসন্ধানে আজ কয়েকদিন পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছিলেন, দ্বারে রজনীনাথের কথা কয়েকটা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হরি হরি এমন কাজও করে! সে পাষণ্ড সকল আক্রোশ আমার মার ওপোরেই মেটাবার জন্যে তাঁকে এখানে আনেনি।" বৃদ্ধ হতাশ্বাসে কপাট ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। বাসার কাছে আসিয়া পক্ষীমাতা তাহার ছোট শাবকটিকে অপহৃত দেখিলে এই রকমই অনুপায় ক্ষোভে বুঝি লুটাইয়া পড়ে। শ্বশুরের আগমনে শিবানী আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়াছিল, মাথার কাপড়টা যথাস্থানে স্থাপন করিয়া রুক্ষ চুলগুলাকে অবহেলার সহিত হস্ত তাড়নায় বিতাড়িত করিয়া অকম্পিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমূল্য ব্যাপার কি না বুঝিয়াও ব্যাপার কিছু কঠিন ইহা বুঝিতে পারিয়া মাতার কাপড়ের একটা প্রান্ত শক্ত করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকার মুখের দিকে এক একবার করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার প্রতিও সকলকার একটা অবহেলার ভাব তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল না। তাহার পর সকলকার মুখেই যেন একটা আসন্নপ্রায় ঝড়ের চিহ্ন—অভিমানে তাহার রাঙ্গা ঠোঁট ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রজনীনাথ শিশুর দিকে চাহিয়া দেখিয়াই তাহার নিকটে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "এসতো দাদা আমরা বাইরে যাই ঘরে বড় গরম হচ্চে।" বলিয়াই তাহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে শ্যামাকান্তর দিকে না ফিরিয়াই কহিলেন "আসুন চৌধুরী মশায় ভাইটিকে নিয়ে একটু খেলা করা যাক।" শিবানী ও শ্যামাকান্ত অনেকখানি বিস্ময়ের সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে ঝড়ের মতন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধেশ্বরী সংক্রোধকণ্ঠে কন্যাকে বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁলো শিবি তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দোব নাকি লো? বলি এই কি তোর বুদ্ধি সুদ্ধি হচ্চে? এতদিন ধরে যে এত শিখানু পড়ানু তার কি এই প্রতিফল দিলি?" শিবানী মাটি হইতে চোখ তুলিয়া দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি করেছি?" "কি করিস্‌নি তাই বল। ও মিন্সে-কে অত আপ্যায়িত করে তোর কি লাভ বল দেখি? শত্তুর গেছে সাতটা সমুদে সে গঙ্গাছান করে আয়গে—তা না মেয়ের সপ্তসিন্ধু উথলে উঠলো! দেখ্‌, ওসব অসইরণ দেখতে পারিনে! এখন ছেলে যে ডাইনের হাতে

পড়ল তার হুঁস্ আছে! যা ছেলেকে চেয়ে আনাগে; যদি ছেলে বাচাতে চাস্ তো ওঠ।”

শিবানী শক্ত হইয়া পা দিয়া মাটী চাপিয়া দাঁড়াইল। তাহার শীতল হাত পা গরম হইয়া আসিল, কঠিন কণ্ঠে সে কহিল “না মা আমি ছেলে চেয়ে আনাব না! কেন তুমি অমন করে কেবলি ওঁদের অপমান কর! কেন তুমি ওসব কথা বল!” বলিতে বলিতে সহসা সে রুদ্ধবাক্ হইয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সিদ্ধেশ্বরী অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীহরি! এত করিয়াও মেয়ের মন পাইলেন না! এমন বোকা একগুঁয়ে মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলেন! একেই বলে “যার বে তার মনে নেই পাড়াপড়সির ঘুম নেই! চুলোয় যাক—তোর যদি পেটের পোর ওপোর দরদ নেই তবে আমারই বা কিসের গরজ এত! আমার তোরা কি কর্‌বিবে বাবু! বড় কল্লেন পেটের পো আর বল্লেন নাতি। আমার যা আছে তাই কে খায় ঠিক নেই! হরি বল মন!” অভুক্ত আহার্য্য পাত্রটার দিকে চোখ পড়ায় এবং বারান্দায় মাসির গলার সাড়া পাইয়া তাঁহাকে শুনাইয়া বলিলেন “মিন্‌সের দেমাক দেখেচো, ওমা মেয়েটা এতটা খেটেখুটে খাবার তৈরি করলে গো একটু খুঁটেও মুখে দিয়ে দেখলে না! হিংসে স্রেফ হিংসে! পোড়া মেয়ে আবার ওদের জন্যেই মরেন!” মাসিমাতা চিন্তা রক্ষা পূর্ব্বক এক হাতে হরিনামের মালা ও অন্য হস্তে বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া উঁকি দিয়া ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, “কলকেতার লোকদের বেন ধরণই ঐ!” তাঁহার মনে পড়িল এই ঘরেই রজনীনাথকে তিনি নিজে কাছে বসিয়া কত যত্ন করিয়া খাওয়াইয়াছেন। তাঁহার পুরাণ রসিকতায় যোগ না দিয়া রজনীনাথ মেয়ের সামনে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ায় বেরসিক বলিয়া সে দিনও কত উপহাস করিয়াছিলেন। তাঁহার রন্ধনের সুখ্যাতি শুনিবার জন্য, “তোমার খাবার কষ্ট হল—এ রান্না খাবে কি করে” এইরূপ কত কথা বলিয়া নানা ছলে অজস্র প্রশংসালাভ করিয়া মন খুলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন,—খাইয়ে এমন সুখ কিন্তু কারুকে হয় না বাবু! আজ তাই সেই রজনীনাথের রুচি হইতে চরিত্র পর্য্যন্ত মসীলিপ্ত করিবার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে তাঁহার মনেও একটু বিঁধিল, তাই ঠিক সায় দিয়া যাইতে পারিলেন না।

সেদিন বাড়িবন্ধনের মন্ত্রটি মাসিমার পরিবর্ত্তে মামিমাকে শিখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী অপ্রসন্ন নীরসমুখে সন্ধ্যা করিবার জন্য ঠাকুরঘরে যাইবার সময় তুলসীতলায় প্রণাম করিয়া কন্যার মতি গতি পরিবর্ত্তনের মূল্যস্বরূপ সওয়া পাঁচ টাকার হরিরলুট তুলসী ঠাকুরকে মানত করিয়া গেলেন। নিজের দ্বারা যাহা সাধন করা যায় না মানুষমাত্রেই সেখানে দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। সিদ্ধেশ্বরী এতখানি বয়সের অশ্রান্ত চেষ্টাদ্বারাও যখন তাঁহার এই একরোখা জেদী মেয়েটিকে নিজের আয়ত্তগত করিয়া উঠিতে পারিলেন না তখন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়া একান্ত অসহায় ভাবে দেবতার শরণাপন্ন হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন “দেখি তুমি কত জাগ্রত

ঠাকুর, আমার একটা মাত্তর মেয়ে ওকে নিয়েই আমার সংসার, - ওর যাতে সংসারের ওপোর মন হয় তাই কর ঠাকুর, তাই কর।" ঠাকুর কি অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন "তথাস্তু"।

(৩০)

নদীটি নিতান্ত ছোট না হইলেও খুব বড় নয়। বর্ষায় পাহাড়ের জল নামিয়া যেমন পূর্ণ দেখাইত শীতের আরম্ভে তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়া তীরের নুড়ি শামুক ও বেলেমাটির অনেক দূর পর্য্যন্ত বাহির হইয়া গিয়াছে। পরিষ্কার জলের নীচে বাতাসের হিল্লোলে জলের সঙ্গে সঙ্গে বালির উপর নুড়িগুলি পর্য্যন্ত যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে; তীরে মৃদু ঢেউগুলি ক্রীড়াচ্ছলে আঘাত করিতে করিতে অস্ফুটবাক্ শিশুর মত আধ আধ কলকণ্ঠে টলিয়া পড়িতেছে। স্নেহময়ী জননী ধরিত্রী কখনও সোহাগের আলিঙ্গন কখনও অভিমানের ক্রন্দন কখনও ক্রোধের নিষ্ফল তাড়না অচঞ্চল হাসিমুখে চিরদিন ধরিয়া গ্রহণ করিতেছেন,—বিকার নাই বিরাগ নাই মাতৃ স্নেহের মতনই তাহা অকুণ্ঠিত, সহিষ্ণুতাপূর্ণ ও দ্বিধাহীন। মা জননীর জননী! তোমার ঐ নীরব স্নেহধারায় অভিষিক্ত হইয়া পলে পলে কতখানি গ্রহণ করিতেছি তাহার কতটুকুই বা আমরা ভাবিয়া দেখি মা! নদীর নাম বিরূপাক্ষী! বিরূপাক্ষীর পূর্ব্বতীরে একটি নূতন বাঁধান ঘাট। উপরে আম নারিকেল প্রভৃতি ঘন বিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া একটি মাঝারি রকম দোতলা বাড়ি দেখা যাইতেছিল। পূর্ব্বে এইখানে একজন নীলকর সাহেবের কুঠি ছিল, তারপর বাঙ্গলা দেশ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া গেলে সাহেব কুঠি তুলিয়া দিয়া দেশে গিয়াছেন। সেই পর্য্যন্ত এখানে কেহ বাস করে নাই। বাগানটা জঙ্গলে ও বাড়িটা ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইবার আর খুব বেশি দেরী নাই—এমন সময় বিরূপাক্ষীর নৌকা-যাত্রীর কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টির উপর দেখিতে দেখিতে বাড়িখানা মেরামত হইয়া ঝকঝকে হইয়া উঠিল এবং বাড়ীর আশেপাশের জঙ্গলও দিব্য একটি সুন্দর ফুলবাগানে গড়িয়া উঠিল। নদীতে বর্ষায় ভিন্ন অন্য সময়ে নৌকাও বেশি চলিত না। কিন্তু যাহারা সেপথে যাতায়াত করিত আশ্চর্য্য হইয়া মুগ্ধনেত্রে নব নির্ম্মিত উদ্যানে ক্রীড়াপরায়ণ বালকগুলির দিকে চাহিয়া দেখিত। দেখিত ছেলেরা নিজের হাতে মাটি নিড়াইতেছে, নিজের হাতে জল আনিয়া থাইতেছে, নিজেরাই গাছ বাটিতেছে, আবার ফুল তুলিয়া, মালা গাঁথিয়া, তোড়া বাঁধিয়া, পরস্পরকে দান করিয়া, লাফাইয়া খেলিয়া, হাসিতে কথায় নির্জ্জন নদীতটে স্বপ্নরাজ্য রচনা করিতেছে। নির্জ্জীবতম প্রশান্ত বালকগণ ম্লান পাণ্ডুর মুখে তাহাদের দিকে চাহিয়া ভাবিত, তাহারা কি আরব্য উপন্যাসের মধ্য হইতে বাহির হইয়া সদ্য এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে? মৃত্তিকা কলসে জল আহরণ বেড়াবাঁধা হইতে সমকণ্ঠে সন্ধ্যাবন্দনা, সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি মুগ্ধযাত্রীগণের বিস্মিত চক্ষে পুরাকালিন পুণ্যাশ্রমবাসী ঋষিকুমারগণের সৌম্যসুন্দর তরুণ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তুলিত। কোন কোন প্রবীন ব্যক্তি মুগ্ধকর্ণে "চিদানন্দরূপ শিবোহং শিবোহং"

শুনিতে শুনিতে অশ্রুবিগলিত গদ্ গদ্ স্বরে বলিয়া উঠিতেন "আবার হবে রে, আবার আসবে, সেদিন আবার ফিরে আসবে।"

নিকটে দ্বিতীয় লোকাবাস নাই, বাগানের পশ্চাতে দু-একটা সরিষাক্ষেত্র পার হইলে গ্রামের সীমানা চোখে পড়ে ও কোলাহলধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করে। সকালে সন্ধ্যায় কিন্তু সেই নির্জ্জন তট হাসির কাশীর কলহের ও ইষ্টমন্ত্র পঠনের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক প্রকার শব্দদ্বারা মুখরিত হইতে থাকিত। গ্রাম্য শিশুগণের বাহু দ্বারা তাড়না প্রাপ্ত ঘুমন্ত তরঙ্গ শিশুগণ ছলছল কলকল শব্দে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উছলাইয়া পড়িত। নদী সুন্দরীর সুন্দর প্রতিবিম্ব বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপে শীতলতা দান করিত; বৃদ্ধার ভক্তি জলাঞ্জলি ইষ্টদেবতার চরণে নীরবে অর্পণ করিয়া মানবের সুখদুঃখের নিত্য ভাগ গ্রহণ করিত। তার পর নদীতীরের গাছগুলি যখন দীর্ঘচ্ছায়া জলে ফেলিয়া উত্তপ্ত ক্লান্ত শ্বাস ফেলিতে থাকে এবং আমবাগানের মধ্য দিয়া নিমগাছের ছায়াবহুল ঘন শাখা পল্লবে ঢাকা শীতল অঙ্ক দিয়া, বটফল-বিছানো সেফালিকা ছড়ানো আঁকাবাঁকা পথ দিয়া, তাবিজ লঙ্কফুল কলসীর গাত্রে বাজাইয়া, সিক্তবসনা হাস্যাধরা গ্রাম্যবধূরা পরস্পরে সুখদুঃখের আলোচনা করিতে করিতে গ্রামের ভিতর ফিরিয়া যায় ও গ্রামের কৃষাণযুবকগণ কাঁচালঙ্কা ও লবণের সাহায্যে বাসীভাতে উদর পূর্ণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বাগানের উত্তর দিকে ফিরিয়া মোটা সুর হাঁকিয়া ক্ষেতের পথ ধরে, সেই সময় এই নির্জ্জন নদীতীর যোগা-শ্রমের মতন নিস্তব্ধ হইয়া যায়। নিঃশব্দ প্রকৃতি তাঁহার শান্ত করুণ চোখ দুখানির পাতা মুদিয়া বিশ্রাম শয়নে যেন বালিকার মতন ঘুমাইয়া থাকেন, রৌদ্রতপ্ত বাতাস নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়ায় স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়া ললাটে মৃদু মৃদু হাত বুলাইতে থাকে, দূর শস্যক্ষেত্র হইতে বা ছায়ানিবিড় বটবৃক্ষ তলস্থ বিশ্রাম শয্যা হইতে কচিৎ কোন একটা পরিচিত রাগিণীর একটি চরণ আকুল করুণ সুরে ভাসিয়া আসিতে থাকিলেও সেই বিশ্রাম সুখের কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় না। শ্যামল লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যালোক ঝিলমিল করিয়া সকৌতুকে উঁকি দিয়া রাঙ্গামুখে চাহিয়া চাহিয়া সরিয়া যায়। মুখের উপর রেখাপাত করিতে যেন সাহসী হয় না। ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া পাখীরা কূজন করিয়া উঠিলে বাতাস একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া ঘনঘন নিশ্বাসে তাহাদের সতর্ক করিয়া দিয়া আবার নিজের সস্নেহ পরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে বহিতে থাকে। কোলের ছেলেটিকে ঘুম পাড়াইয়া মা যেমন সতর্কস্নেহে সজাগ হইয়া থাকেন সেও যেন তেমনি করিয়া জাগিয়া মাথার কাছে বসিয়া আছে। কোথাও একটা সাড়া পাইলে নিশ্বাস টানিয়া উৎকর্ণ হইয়া ফিরিয়া চাহে ও নিঃশব্দে তর্জ্জনি তুলিয়া নিবারণ করিয়া থামাইয়া দেয়।

কিন্তু দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ প্রকৃতির বিশ্রাম সুখ অব্যাহত রাখিয়াও সেই শান্ত তপোবনের মধ্যস্থ গৃহ হইতে একটা স্ফুট অস্ফুট শব্দলহরী তাহার স্তব্ধতার কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকিয়া সুদূর মধু-চক্রে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের মতন একটা

মৃদু তানলয়যুক্ত শব্দবহন করিয়া আনিত! শিশুকণ্ঠের অস্পষ্ট আবৃত্তি হইতে ভিন্ন ভাষার সুস্পষ্ট উচ্চারণ আবার একবার সেই পুরাকালের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া যায়। সে শব্দ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার। কারণ এই বাড়িখানি একটি স্কুলবাড়ি বা স্কুল বোর্ডিং।

অপরাহ্নের ক্ষীণচ্ছায়া দূরে সরাইয়া ফেলিয়া হীনতেজ সূর্য্যকিরণ দেয়ালের উপর হইতে সরিয়া সরিয়া ক্রমে ছাদের আলিসার উপর—আরও দূরে আরও দূরে সরিতে সরিতে অবশেষে নদীতীরের উচ্চশীর্ষ নারিকেল গাছের মাথার উপর হইতে নদীর শীতল স্থির জলের উপর ছায়া ফেলিয়া দিয়া ওপারের বিস্তীর্ণ বালুকাতীরের উপর ছড়াইয়া পড়িল ও জলের একটুখানি রৌপ্যময় করিয়া তীরের নুড়িপাথর ভাঙ্গা পাত্র ও বালুকাকণায় সেই রশ্মি হীরকখণ্ডবৎ জ্বলিতে লাগিল। নদীজলের কোথাও একখানা ভাসন্ত সাদা মেঘে সূর্য্যালোকের লাল ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিয়াছে কোথাও নীল আকাশের সৌম্যতা স্থির হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। শীত সায়াহ্নের অন্ধকার এপারের গাছপালাকে ইহারি মধ্যে কাছে টানিয়া আঁচলে ঢাকিয়া ঘুম পাড়াইতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

স্কুলের ছেলেদের মধ্যে সকলের ছোটগুলি মিলিয়া *তাহাদের পণ্ডিত মহাশয়কে বুড়ি করিয়া লুকাচুরি খেলিতেছিল। জনকতক বালক ও কয়েকজন যুবকছাত্র ও মাষ্টারে ফুটবল খেলিবার জন্য একত্র সমবেত হইয়াছিল। একদিকে কয়েকটি বালকে মিলিয়া কপিচারার তলায় জল দিয়া মাটি নিড়াইয়া দিতে দিতে বটানি অগ্নিকুলচার সম্বন্ধে যথাজ্ঞান আলোচনা করিতেছিল। সকলেই কার্য্যে নিযুক্ত, উৎসাহপূর্ণ প্রফুল্ল এবং কর্ত্তব্যের নিয়ম শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনে সংযত। কেবল রুগ্ন সুধীর একপাশে একটি কাঠের বেঞ্চের উপর বসিয়া বিষন্নমুখে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে বহুদিন ম্যালেরিয়া ভুগিয়া জ্বরগায়েই এখানে আসিয়াছে, প্লীহা যকৃতের আয়তন ঈষৎ হ্রস্ব হইলেও এখনও আরোগ্য পাইতে অনেক বিলম্ব আছে। এই উদ্দীপনাপূর্ণ মুখগুলি তাহার নিরুদ্যম হৃদয়ের ভবিষ্যতের সম্বলস্বরূপ হইলেও বর্ত্তমানকে সমধিক পরিমাণে নিরানন্দকর করিয়া তুলিতেছিল। সে কর্ম্মহীন।

জল দেওয়া হইয়া গেছে; ওদিকে একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল তাহাও আবার থামিয়া গিয়াছে, ননী 'চোর' হইয়া রাগিয়া গিয়াছিল বুড়ি তাহাদের সে কোন্দল মিটাইয়া দিয়াছেন। ঠিক হইয়া গিয়াছে ননী কাপুরুষের মতন পলাইয়া আত্মরক্ষা না করিয়া সম্মুখ বিচারে আত্মসমর্থন করিবে।

দু একটি ক্রীড়াশ্রান্ত বালক নূতন দলের উপর ভার দিয়া ক্রীড়াস্থল ত্যাগ করিয়া একটু দূরে একখানা বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল। স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিয়া ইহাদের বেশিক্ষণ খেলিতে নিষেধ আছে। নলিন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া অন্য একজনকে প্রশ্ন করিল "কৈ হে গুরুদেবকে যে আজ দেখচি না?" নলিন গুরুদেব বলার লোভটুকু সহজে দমন করিতে পারিত না—তাই তাহার গুরুদেবের অপছন্দ স্বত্বেও সকল ছেলেদের মধ্যেই এই শব্দটার প্রচলন করিয়া তুলিয়াছিল। সতীশ বলিল "আজ স্বামীজি এসেচেন,

তাই বোধহয় তিনি বাইরে আসেন নি"। এমন সময় চশমা পরিয়া একজন যুবক মাষ্টার ও একটি তাঁহারই সমবয়স্ক ছাত্র আসিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল "বলোতো নলিন, কুরুপ্যাটকিনের চেয়ে অ্যাডমিরাল টোগো বড়টা কিসে হলো? ওরা আজ হেরে গেছে বলে কি বীরের অসম্মান করতে হবে। এ আপনার নেহাৎ Prejudice স্যার।"

মাষ্টার আর একটু গলা চড়াইয়া কহিলেন, "O'i ho sir no,—শুধু তো তর্ক করলেই হবে না প্রমাণ করা চাই। কুরপ্যাটকিন্ তোমার কিসে অ্যাডমিরাল টোগোর চেয়ে বড় বলো?"

জন্মোৎসব।*

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা উৎসব করে আমাকে আহ্বান করেছ—এতে আমার অনেক দিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

জন্মদিনে বিশেষভাবে নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করবার কথা অনেকদিন আমার মনে জাগেনি। কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড় করে আমার কাছে প্রকাশ করেনি।

বস্তুত নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড় নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

যেদিন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম সেদিন নূতন অতিথিকে নিয়ে যে উৎসব হয়েছিল সে আমাদের নিজের উৎসব নয়। অজ্ঞাত গোপনতার মধ্য থেকে আমাদের সদ্য আবির্ভাবকে যাঁরা একটি পরমলাভ বলে মনে করেছিলেন উৎসব তাঁদেরই। আনন্দলোক থেকে একটি আনন্দ উপহার পেয়ে তাঁরা আত্মার আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে বড় করে উপলব্ধি করেছিলেন তাই তাঁদের উৎসব।

এই উপলব্ধি চিরকাল সকলের কাছে সমান নবীন থাকে না। অতিথি ক্রমে পুরাতন হয়ে আসে—সংসারে তার আবির্ভাব যে পরমরহস্যময় এবং সে যে চিরদিন এখানে থাকবে না সে কথা ভুলে যেতে হয়। বৎসরের পর বৎসর সমভাবেই প্রায় চলে যেতে থাকে—মনে হয় তার ক্ষতিও নেই, সে আছে ত আছেই—তার মধ্যে অন্তরের প্রকাশ আর আমরা দেখ্‌তে পাইনে। তখন যদি আমরা উৎসব করি সে বাঁধা প্রথার উৎসব—সে এক-রকম দায়ে পড়ে করা।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে ততক্ষণ তাকে আমরা নূতন করেই দেখি; তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না, সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগিয়ে রেখে দেয়।

জীবনে একটা বয়স আসে যখন মানুষের

---

* বক্তার জন্মদিনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত।

সম্বন্ধে আর নূতন প্রত্যাশা করবার কিছুই থাকে না—তখন সে যেন আমাদের কাছে এক রকম ফুরিয়ে আসে। সে রকম অবস্থায় তাকে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার চল্‌তে পারে কিন্তু উৎসব চল্‌তে পারে না—কারণ, উৎসব জিনিষটাই হচ্চে নবীনতার উপলব্ধি—তা আমাদের প্রতিদিনের অতীত। উৎসব হচ্চে জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেইখানেই তার প্রকাশ।

আজ আমি উনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে পড়েছি। কিন্তু আমার সেইদিনের কথা মনে পড়চে যখন আমার জন্মদিন নবীনতার উজ্জ্বলতায় উৎসবের উপযুক্ত ছিল।

তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যে, আজ তোমার জন্মদিন। আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ সেই রকম আয়োজনই তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য সেদিন অনুভব করতুম। যেদিকে সংসারে আমি অসংখ্য বহুর মধ্যে একজনমাত্র সেদিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই, যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ত—নিজের গৌরবে সেদিন প্রাতঃকালে হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠত।

এমনি করে আত্মীয়দের স্নেহ দৃষ্টির পথ বেয়ে নিজের জীবনের দিকে যখন তাকাতুম তখন আমার জীবনের দূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ তার অনাবিষ্কৃত রহস্যলোক থেকে এমন একটি বাঁশি বাজাত যাতে আমার সমস্ত চিত্ত দুলে উঠ্‌ত। বস্তুত জীবন তখন আমার সাম্‌নেই—পিছনে তার অতি অল্পই। জীবনে যেটুকু গোচর ছিল তার চেয়ে অগোচরই ছিল অনেক বেশি। আমার তরুণ বয়সের অল্প কয়েকটি অতীত বৎসরকে গানের ধুয়াটির মত অবলম্বন করে সমস্ত অনাগত ভবিষ্যৎ তার উপরে অনির্ব্বচনীয়ের তান লাগাতে থাক্‌ত।

পথ তখন নির্দ্দিষ্ট হয় নি। নানাদিকে তার শাখাপ্রশাখা! কোন্‌দিক দিয়ে কোথায় যাব এবং কোথায় গেলে কি পাব তার অধিকাংশই কল্পনার মধ্যে ছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর জন্মদিনে জীবনের সেই অনির্দ্দিষ্ট অসীম প্রত্যাশায় চিত্ত বিশেষ ভাবে জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ত।

ঝরনা যখন প্রথম জেগে ওঠে, নদী যখন প্রথম চল্‌তে আরম্ভ করে তখন নিজের সুবিধার পথ বের করতে তাকে নানা দিকে নানা গতি পরিবর্ত্তন করতে হয়। অবশেষে বাধার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যখন তার পথ সুনির্দ্দিষ্ট হয় তখন নূতন পথের সন্ধান তার বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের খনিত পথকে অতিক্রম করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমারও জীবনের ধারা যখন ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে আপনার পথটি তৈরি করে নিলে, তখন বর্ষার বন্যার বেগও সেই পথেই স্ফীত হয়ে বইতে লাগ্‌ল এবং গ্রীষ্মের রিক্ততাও সেই পথেই সঙ্কুচিত হয়ে চলতে থাক্‌ল। তখন নিজের জীবনকে বারম্বার আর নূতন করে আলোচনা করবার দরকার রইল না। এই জন্যে তখন থেকে জন্মদিন আর কোনো নূতন আশার সুরে বাজ্‌তে থাক্‌ল না। সেইজন্যে জন্মদিনের

সঙ্গীতটি যখন নিজের ও অন্যের কাছে বন্ধ হয়ে এল তখন আস্তে আস্তে উৎসবের প্রদীপটিও নিবে এল। আমার বা আর কারো কাছে এর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

এমন সময় আজ তোমরা যখন আমাকে এই জন্মোৎসবের সভা সাজিয়ে তার মধ্যে আহ্বান করলে তখন প্রথমটা আমার মনের মধ্যে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হল, জন্ম ত আমার অর্দ্ধ শতাব্দীর প্রান্তে কোথায় পড়ে রয়েছে, সে যে কবেকার পুরাণো কথা তার আর ঠিক নেই—মৃত্যু দিনের মূর্ত্তি তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে এসেছে—এই জীর্ণ জন্মদিনকে নিয়ে উৎসব করবার বয়স কি আমার?

এমন সময় একটি কথা আমার মনে উদয় হল—এবং সেই কথাটাই তোমাদের সাম্‌নে আমি বল্‌তে ইচ্ছা করি।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি, জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতাটা কিসে? জগতে আমরা অনেক জিনিষকে চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই; কিন্তু অতি অল্প জিনিষকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ—তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক; তারা আমাদের চারিদিকেই আছে কিন্তু তাদের আমরা পাইনি, তারা আমাদের আপন নয়, তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

তাই বল্‌ছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্চে একমাত্র লাভ, তার জন্যেই মানুষের যত কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মুহূর্ত্তেই আপনার লোককে পায়,—পরিচয়ের আরম্ভকাল থেকেই সে যেন চিরন্তন। অল্পকাল পূর্ব্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না—না-জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াসেই প্রবেশ করলে; এজন্যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সাধনার, কোনো দেখাসাক্ষাৎ আনাগোনার, কোনো প্রয়োজন হয়নি।

যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব। ঘর সাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে সেই পাওয়াটিকে মানুষ সুন্দর করে তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে যখন চিরদিনের মত আপন করে পাওয়া যায় তখনো এই সাজসজ্জা এই গীতবাদ্য। "তুমি আমার আপন" এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বল্‌তে পারে না—এতে সৌন্দর্য্যের সুর ঢেলে দিতে হয়।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল তোমাকে আমরা পেয়েছি—সেইদিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ঐ একই কথা আওড়াতে চায় যে, তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা তুমি যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসব করচ তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দ-

কেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোন গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয় তা বল্‌তে পারিনে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয় —তেমনি মানুষকে বারবার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম—কোন্ রহস্যধাম থেকে প্রকাশ হয়ে ছিলুম, কে জানে! কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখদুঃখ ও স্নেহপ্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতনক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপমায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মত আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও একত্র কতলোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে! সেই জন্যেই আজকের এই আনন্দ।

আমার প্রথম বয়সে, সেই পূর্ব্বজীবনের মধ্যে আজকের এই নবজন্মের সম্ভাবনা এতই সম্পূর্ণ গোপনে ছিল যে তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না। এই লোক আমার কাছে অজ্ঞাত লোক ছিল।

সেই জন্যে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নূতন করে পেয়েছ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরা-জীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকালে তোমাদের আনন্দ উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করচি।

এই যেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বসেছি এ আমার সংসারলোক নয়, এ মঙ্গললোক। এখানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এখানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে ভ্রূণই হচ্চে কেন্দ্রবর্ত্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার সেই নিজের একমাত্র কেন্দ্রত্ব ঘুচে যায়—এখানে সে অনেকের অন্তর্ব্বর্ত্তী। স্বার্থলোকেও আমিই হচ্চি কেন্দ্র, অন্য সমস্ত তার পরিধি, মঙ্গললোকে আমিই কেন্দ্র নই, আমি সমগ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী; সুতরাং এই সমগ্রের প্রাণেই সেই আমির প্রাণ, সমগ্রের ভালমন্দেই তার ভালমন্দ।

পৃথিবীতে আমাদের দৈহিক জীবন একেবারেই পাকা হয় না। যদিও মুক্ত আকাশে

আমরা জন্মগ্রহণ করি বটে তবু শক্তির অভাবে আমরা মুক্তভাবে সঞ্চরণ করতে পারিনে; মায়ের কোলেই ঘরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকি। তার পরে ক্রমশই পরিপুষ্টি ও সাধনা থেকে পৃথিবীলোকে আমাদের মুক্ত অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে।

বাইরের দিক্ থেকে এযেমন, অন্তরের দিক্ থেকেও আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সেই রকমের একটি ক্রমবিকাশ আছে। ঈশ্বর যখন স্বার্থের জীবন থেকে আমাদের মঙ্গলের জীবনে এনে উপস্থিত করেন তখন আমরা একেবারেই পূর্ণ শক্তিতে সেই জীবনের অধিকার লাভ করতে পারিনে। ভ্রূণত্বের জড়তা আমরা একেবারেই কাটিয়ে উঠিনে। তখন আমরা চল্‌তে চাই, কারণ, চারিদিকে চলার ক্ষেত্র অবাধবিস্তৃত — কিন্তু চল্‌তে পারিনে, কেননা আমাদের শক্তি অপরিণত। এই হচ্চে দ্বন্দ্বের অবস্থা। শিশুর মত চল্‌তে গিয়ে বারবার পড়তে হয় এবং আঘাত পেতে হয়; যতটা চলি তার চেয়ে পড়ি অনেক বেশি। তবুও ওঠা ও পড়ার এই সুকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়েই মঙ্গল-লোকে আমাদের মুক্তির অধিকার ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

কিন্তু শিশু যখন মায়ের কোলে প্রায় অহোরাত্র শুয়ে ঘুমিয়েই কাটাচ্চে তখনো যেমন জানা যায় সে এই চলা ফেরা জাগরণের পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার সঙ্গে আমাদের সাংসারিক সম্বন্ধ অনুভব করতে কোনো সংশয়মাত্র থাকেনা তেমনি যখন আমরা স্বার্থলোক থেকে মঙ্গললোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই তখন পদে পদে আমাদের জড়ত্ব ও অকৃতার্থতা সত্বেও আমাদের জীবনের ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন হয়েছে সে কথা একরকম করে বুঝতে পারা যায়। এমন কি জড়তার সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার বহুতর বিরোধের দ্বারাই সেই খবরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত স্বার্থের জঠরের মধ্যে মানুষ যখন শয়ান থাকে তখন সে দ্বিধাহীন আরামের মধ্যেই কালযাপন করে। এর থেকে যখন প্রথম মুক্তিলাভ করে তখন অনেক দুঃখ-স্বীকার করতে হয়, তখন নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়।

তখন ত্যাগ তার পক্ষে সহজ হয় না কিন্তু তবু তাকে ত্যাগ করতেই হয়, কারণ, এলোকের জীবনই হচ্চে ত্যাগ। তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ থাকেনা, তবু তাকে চেষ্টা করতেই হয়। তখন তার মন যা বলে তার আচরণ তার প্রতিবাদ করে, তার অন্তরাত্মা যে ডালকে আশ্রয় করে তার ইন্দ্রিয় তাকেই কুঠারাঘাত করতে থাকে; যে শ্রেয়কে আশ্রয় করে' সে অহঙ্কারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, অহঙ্কার গোপনে সেই শ্রেয়কেই আশ্রয় করে গভীরতররূপে আপনাকে পোষণ করতে থাকে। এমনি করে প্রথম অবস্থায় বিরোধ অসামঞ্জস্যের বিষম ধন্দের মধ্যে পড়ে তার আর দুঃখের অন্ত থাকেনা।

আমি আজ তোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি এখানে আমার পূর্ব্বজীবনের অনুবৃত্তি নেই। বস্তুত, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এই জন্যেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশালাইয়ের কাঠির মুখে যে আলো একটু-

খানি দেখা দিয়েছিল সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু একথা তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহই অগোচর নেই যে, এই নূতন জীবনকে আমি শিশুর মত আশ্রয় করেছিমাত্র বয়স্কের মত একে আমি অধিকার করতে পারিনি। তবু আমার সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং অপূর্ণতার বিচিত্র অসঙ্গতির ভিতরেও আমি তোমাদের কাছে এসেছি সেটা তোমরা উপলব্ধি করেছ—একটি মঙ্গললোকের সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের আপন হয়েছি সেইটে তোমরা হৃদয়ে জেনেছ এবং সেই জন্যেই আজ তোমরা আমাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছ একথা যদি সত্য হয় তবেই আমি আপনাকে ধন্য বলে মনে করব; তোমাদের সকলের আনন্দের মধ্যে আমার নূতন জীবনকে সার্থক বলে জানব।

এই সঙ্গে একটি কথা তোমাদের মনে করতে হবে, যেলোকের সিংহদ্বারে তোমরা সকলে আত্মীয় বলে আমাকে আজ অভ্যর্থনা করতে এসেছ, এলোকে তোমাদের জীবনও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে নইলে আমাকে তোমরা আপনার বলে জান্‌তে পারতে না। এই আশ্রমটি তোমাদের দ্বিজত্বের জন্মস্থান। ঝরণাগুলি যেমন পরস্পরের অপরিচিত নানাসুদূর শিখর থেকে নিঃসৃত হয়ে একটি বৃহৎধারায় সম্মিলিত হয়ে নদী জন্মলাভ করে—তোমাদের ছোট ছোট জীবনের ধারাগুলি তেম্‌নি কত দূরদূরান্তর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছে—তারা এই আশ্রমের মধ্যে এসে বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে একটি সম্মিলিত প্রশস্ত মঙ্গলের গতি প্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জান্‌তে—সেই জানার সঙ্কীর্ণতা ছিন্ন করে এখানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখ্‌তে পাচ্চ—এমনি করে নিজের মহত্তর সত্তাকে এখানে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ এই হচ্চে তোমাদের নবজন্মের পরিচয়। এই নবজন্মে বংশগৌরব নেই, আত্মাভিমান নেই, রক্ত সম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের কোন সঙ্কীর্ণ ব্যবধান নেই; এখানে তিনিই পিতা হয়ে প্রভু হয়ে আছেন, "য একঃ" যিনি এক, "অবর্ণঃ," যাঁর জাতি নেই, "বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি," যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজন সকল বিধান করচেন,—"বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ," বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি, "সদেবঃ" সেই দেবতা। "সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গল বুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন্। এই মঙ্গললোকে স্বার্থবুদ্ধি নয়, বিষয় বুদ্ধি নয়, এখানে আমাদের পরস্পরের যে যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

২৫শে বৈশাখ ১৩১৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লঙ্কায় বুদ্ধের দন্ত।

লঙ্কা দ্বীপের ক্যাণ্ডিনগরে ভগবান্ বুদ্ধের একটি দন্ত সুরক্ষিত আছে। ক্যাণ্ডিনগর মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। উহার প্রাচীন নাম শ্রীবর্দ্ধনপুর। ১৫৯২ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা সমগ্র লঙ্কা দ্বীপের রাজধানী ছিল। দন্তধাতু যে মন্দিরে সংরক্ষিত আছে উহার নাম মালিগাব মন্দির। উহা তত্রত্য বৌদ্ধ বিহারের অভ্যন্তরে অবস্থিত। আমি বিগত শ্রাবণ মাসে পেরহের (প্রাতিহার্য্য) মহোৎসব উপলক্ষে ক্যাণ্ডিনগরে গমন করিয়া মালিগাব মন্দির পরিদর্শন করি। কোলম্ব-নগরের বৌদ্ধ মহানায়ক মহাস্থবির সুমঙ্গলের বিশেষ চেষ্টায় আমি এই দন্তধাতু অবলোকন করিবার অধিকার পাই। তিনি আমাকে একখানি অনুরোধপত্র সহিত ক্যাণ্ডিনগরের প্রধান বৌদ্ধনায়ক মহাস্থবির সিদ্ধার্থের নিকট প্রেরণ করেন। দন্তধাতু যে মন্দিরে অবস্থিত উহার চাবি সিদ্ধার্থের হস্তে ন্যস্ত আছে। উঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৯০ বৎসর। সিদ্ধার্থের বিহারে অনেক ছাত্র আছে বটে কিন্তু তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা চাবি রক্ষণেই ব্যস্ত থাকেন। পাছে কেহ কোন ছলে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দন্তধাতু অপহরণ করে সর্ব্বদা তাঁহার মনে এই উদ্বেগ বিদ্যমান থাকে। দন্তধাতু দেখাইবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার না থাকিলেও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলের মত লইয়া তিনি মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে পারেন। মন্দির ৪।৫ বৎসর অন্তর কোন বিশেষ ঘটনায় উদ্ঘাটিত হয়। মন্দিরের চাবি সিদ্ধার্থের হস্তে থাকে বলিয়া লঙ্কাদ্বীপে সিদ্ধার্থের মহা প্রতিপত্তি। আমি ক্যাণ্ডিনগরে গমন করিয়া সিদ্ধার্থের সহিত পালি ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা উত্থাপন করি। কিন্তু দেখিলাম সিদ্ধার্থের অন্তঃকরণ উহাতে বিচলিত হইবার নহে। দিনে ও রাত্রে, উঠিতে ও বসিতে সকল সময়েই চাবি তাঁহার হাতেই থাকে। রাত্রিতে নিদ্রার সময়ে উহা কোথায় রাখেন জানা যায় না। সিদ্ধার্থ আমার সহিত অনেক কথা বলিলেন, আমাকে সঙ্গে করিয়া নগরের অনেক বস্তু দেখাইলেন কিন্তু বলিলেন দন্তধাতু দেখাইবার সুযোগ হইবে না। পরে আমি সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি প্রভৃতি সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মত করি। তদনন্তর সিদ্ধার্থও দন্তধাতু দেখাইতে সম্মত হন। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া বিহারের দ্বিতল কক্ষে মালিগাব মন্দিরে প্রবেশ করেন। রাজপথ হইতে মালিগাব মন্দিরে প্রবেশকাল পর্য্যন্ত আমাকে অনেক দ্বার ও সোপান অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন্দির বিহারের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বিহারটি আবার একটি হ্রদের পশ্চিম কূলে প্রতিষ্ঠিত। বিহার ও হ্রদের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা বিরাজিত। দন্তধাতুর মন্দিরের দ্বার হস্তিদন্ত নির্ম্মিত। এই দ্বারে নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিত আছে :—

সর্ব্বজ্ঞবক্ত্রসরসীরুহরাজহংসং
কুন্দেন্দুসুন্দররুচিং সুরবৃন্দবন্দ্যাম্।

সদ্ধর্ম্মচক্রসহজং জনপারিজাতং
শ্রীদন্তধাতুমমলং প্রণমামি ভক্ত্যা॥

মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি অতি বৃহৎ ও ভারি রৌপ্য টেবিল দেখিলাম। এই টেবিলের উপর একটি ঘণ্টাকৃতি অতি বৃহৎ সুবর্ণ করণ্ড প্রতিষ্ঠিত। এই সুবর্ণ করণ্ডের উপরে যে সকল কারুকার্য্য দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত। করণ্ডের উপরিভাগ মণিমাণিক্য মরকত বৈদূর্য্য ইন্দ্রনীল প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতুর দ্বারা সুশোভিত। বৃহৎ করণ্ডের অভ্যন্তরে আর ছয়টি সুবর্ণ করণ্ড যথাক্রমে একটির অভ্যন্তরে অপরটি অবস্থিত। প্রত্যেক করণ্ডই নানা ধাতুরঞ্জিত। সর্ব্বমধ্যস্থিত করণ্ড প্রায় ১ ফুট উচ্চ; উহার মধ্যে নানা ধাতু রঞ্জিত একটি সুবর্ণ পদ্ম অবস্থিত। সুবর্ণ পদ্মের অভ্যন্তরে বুদ্ধের দন্তধাতু নিহিত। এই দন্তধাতু কুন্দ কুসুমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। উহার উপর বৈদূর্য্য ইন্দ্রনীল প্রভৃতি প্রতিফলিত হওয়ায় বোধ হইল যেন দন্তটি ক্ষণে ক্ষণে নানা বর্ণ ধারণ করিতেছে। পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইলে দন্ত হইতে এক প্রকার আভা উদ্‌গীর্ণ হইতে দেখা গেল, আবার পশ্চিমমুখ হইয়া দাঁড়াইলে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকার আভার আবির্ভাব হইল। এই দন্তধাতু যে করণ্ডসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত উহাদের তুলনা জগতে নাই। অনেক ইউরোপীয় পরিদর্শক বলিয়াছেন ক্যাণ্ডিনগরের মালিগাব মন্দির পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম।

লঙ্কাদ্বীপে সর্ব্বজনবিশ্রুত একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ঐ দন্তধাতু যিনি অধিকার করিবেন তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন। উল্লিখিত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বিগত ২৫০০ বৎসর কাল অনেক দুরাত্মা এই দন্তধাতু অপহরণ করিবার প্রয়াস করিয়াছিল। অতীত কালে উহা কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছে তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। নিম্নে এই দন্তের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইল:—

যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব কুশীনগরে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। যখন তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হয় তখন তাঁহার এক শিষ্য একটি দন্ত তুলিয়া লইয়া কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দন্তপুরের রাজাকে অর্পণ করেন। ৮০০ বৎসর কাল এই দন্ত কলিঙ্গরাজ্যে পূজিত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ডুনামক একজন ব্রাহ্মণ রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এই দন্ত ধাতু অপহরণ করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া যান এবং উহার ধ্বংসের নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁহার অসৎ উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় তিনি স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং দন্তটী কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের দন্তপুরের রাজাকে প্রত্যর্পণ করেন। কিয়ৎকাল পরে আরও বহু আততায়ী আগমন করিয়া ঐ দন্ত ধাতু অধিকার করিবার নিমিত্ত দন্তপুর আক্রমণ করে। দন্তপুরের রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন তাঁহার জীবন যায় সেও শ্লাঘ্য তথাপি তিনি দন্ত স্থানান্তরিত হইতে দিবেন না। শত্রুকর্ত্তৃক নগর বেষ্টিত হইলে রাজা দন্তটী স্বীয় দুহিতার মস্তকস্থিত কেশ মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া ঐ দুহিতাকে জামাতা ও একটী ভিক্ষু সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণের বেশে জলযানে লঙ্কায় প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। ৩১০ খৃঃ অব্দে

দন্তধাতু লঙ্কায় উপস্থিত হইল। তত্রত্য রাজা কীর্ত্তিশ্রী মেঘবর্ণ ঐ দন্তধাতু সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং উহার যথোচিত পূজার নিমিত্ত অনুরাধপুরে এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। প্রতিবৎসর ঐ দন্তধাতু সাধারণকে দেখাইবার নিমিত্ত একটী দন্তমহোৎসবের প্রতিষ্ঠা হইল। যাহাতে এই উৎসব প্রতিবৎসর সংঘটিত হয় তজ্জন্ত তিনি রাজসরকার হইতে বহু অর্থ প্রদান করেন। ৪১৩ খৃঃ অব্দে চীন পরিব্রাজক ফা'হিয়ান্ লঙ্কা দ্বীপ পরিদর্শন করেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে অনুরাধপুরের দন্ত মহোৎসব উপলক্ষে অতি সমারোহে বুদ্ধের দন্ত রাজপথে হস্তিপৃষ্ঠে পরিদর্শিত হইয়া থাকে। ৪৫৯ ৪৭৭ খৃঃ অব্দে লঙ্কার রাজা ধাতুসেন এই দন্তধাতু রাখিবার জন্য রত্নখচিত একটী সুবর্ণ করণ্ড নির্ম্মাণ করেন। ১১৯০ খৃঃ অব্দে লঙ্কার রাজধানী পুলস্ত্যপুরে অবস্থিত ছিল। রাজা পরাক্রমবাহু পুলস্ত্যপুরে অত্যন্ত মনোরম একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দন্তধাতু অনুরাধপুর হইতে তথায় আনয়ন করেন। পুলস্ত্যপুরে এই মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ইহার কারু-কার্য্য দেখিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকেন। ১২৪০ খৃঃ অব্দে রাজা বিজয়বাহু ঐ দন্তধাতু পুলস্ত্যপুর হইতে দেবনেয় নামক স্থানে লইয়া যান এবং তথা হইতে রাজা ভুবনৈকবাহু উহা যপহু নামক স্থানে অন্তরিত করেন। ১২৬৮ খৃঃ অব্দে এই দন্তধাতু ক্যাণ্ডি নগরে আনীত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন ক্যাণ্ডিনগর শ্রীবর্দ্ধনপুর নামে খ্যাত ছিল।

১১৮৪ খৃঃ অব্দে মার্কোপোলো নামক ইউরোপীয় পর্য্যটক লঙ্কায় আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই দন্তধাতুর বিস্তারিত বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। মার্কোপোলো বলেন তাঁহার সময়ে বৌদ্ধগণ ঐ দন্তকে বুদ্ধের দন্ত মনে করিয়া পূজা করিতেন; মুসলমান মূরগণ উহা আদমের দন্ত বলিয়া মনে করিতেন। মূরগণের বিশ্বাস ছিল যে আদম সয়তানের চক্রান্তে স্বর্গ হইতে বিদূরিত হইয়া লঙ্কাদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার এই দন্ত লঙ্কাদ্বীপে রক্ষিত হইয়াছিল। তামিল হিন্দুগণ এই দন্তকে হনুমানের দন্ত বলিয়া পূজা করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় গমনপূর্ব্বক চিহ্নস্বরূপ একটী দন্ত তথায় রাখিয়া আইসেন।

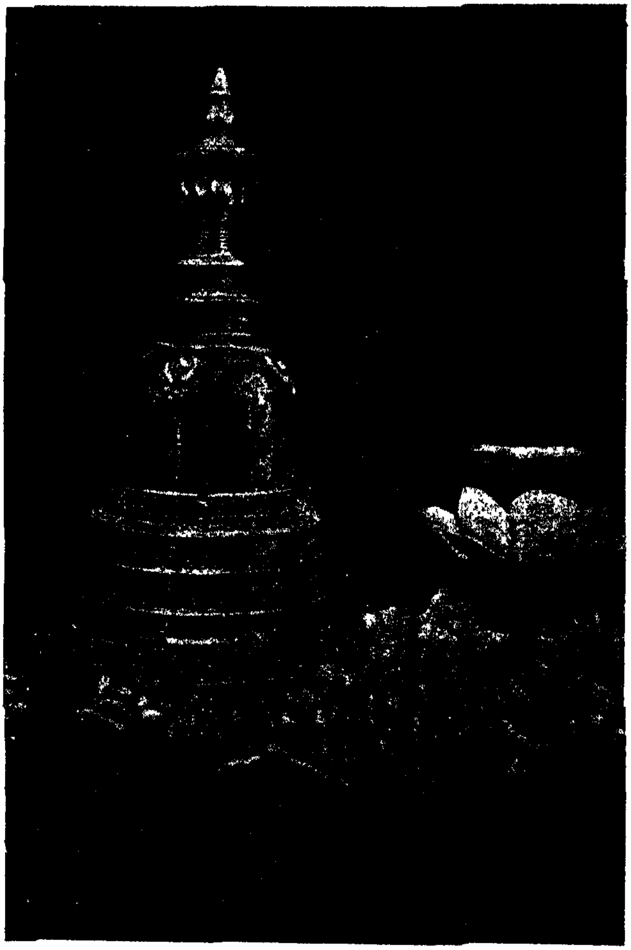
১৩০৩ ১৩১৪ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যের তামিল বংশীয় রাজা পাণ্ড্য লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণ করেন এবং বুদ্ধের দন্ত বলপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের রাজধানী মদুরায় লইয়া আইসেন। লঙ্কার রাজা তৃতীয় পরাক্রমবাহু স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া নানাপ্রকারে রাজা পাণ্ড্যের চিত্তবিনোদনপূর্ব্বক দন্তধাতু পুনরায় লঙ্কায় লইয়া যান। তাঁহার পুত্র ১৩১৯ খৃঃ অব্দে ঐ দন্ত হস্তিশৈলপুর নামক নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পরে লঙ্কায় নানাপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। এই দুঃসময়ে সিংহলিগণ দন্তটী নানাস্থানে গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করেন। পরিশেষে উহা লঙ্কার জাফ্‌না নগরের তামিল হিন্দুরাজগণের হস্তে আসিয়া পড়ে। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ আক্রমণকারিগণ জাফ্‌না-নগর অবরোধ করে। এই সময়ে দন্তধাতু উহাদের

হস্তগত হয়। পর্তুগীজ পুরাবিদ্‌গণ বলেন যে পর্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি Constantion da Bragancaর আদেশ অনুসারে এই দন্ত ভারতের গোয়ানগরে আনীত হয়; তথায় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উহা ভস্মীভূত করিয়া উহার অঙ্গার সমীপবর্ত্তী নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হয়। পর্তুগীজ পুরাবিদ্‌গণের মতে ১৫৬৬ খৃঃ অব্দে লঙ্কার রাজা বিক্রমবাহু একটী হস্তীর দন্ত বুদ্ধের দন্ত বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক ক্যাণ্ডি নগরের মালিগাব মন্দিরে সংস্থাপিত করেন। পক্ষান্তরে সিংহলী পুরাবিদ্‌গণ বলেন যে লঙ্কাদ্বীপে পর্তুগীজগণের আগমনের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের প্রকৃত দন্ত দেল্‌গাগা, সফ্রাগাম এবং অন্যান্য স্থলে লুকাইয়া রাখা হয়। পর্তুগীজগণ গোয়া নগরে যে দন্ত ভস্মীভূত করিয়াছিলেন উহা খাঁটী দন্ত নহে। আমি অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধহয় পর্তুগীজ আক্রমণকারীর সন্তোষ উৎপাদনের নিমিত্ত জাফ্‌নার তামিল হিন্দু রাজা একটী সাধারণ নরদন্ত পর্তুগীজগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের প্রকৃত দন্ত সিংহলী বৌদ্ধগণ স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

১৫৮৬ খৃঃ অব্দে সীতাবকের রাজা রাজসিংহ ক্যাণ্ডিনগর অধিকার করেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রোমান্ ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হন। রাজসিংহ বহু অনুসন্ধান করিয়াও ক্যাণ্ডিনগরে বুদ্ধের দন্ত দেখিতে পান নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা জয়বীরের পুত্রও রোমান্ ক্যাথোলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনিও দন্তের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তদনন্তর তাঁহার ভগিনী লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও রোমান্ ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়েও বুদ্ধের দন্ত ক্যাণ্ডিনগরে দৃষ্ট হয় নাই। ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে বিমলচন্দ্র নামক রাজা লঙ্কার অধীশ্বর হন। ইনি বুদ্ধের পরম ভক্ত। এই নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ নৃপতির সময়ে বুদ্ধের দন্তধাতু পুনরায় ক্যাণ্ডিনগরে আবির্ভূত হয়। তদনন্তর কীর্ত্তিশ্রী রাজসিংহ ক্যাণ্ডিনগরে অতি মহামূল্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঐ দন্তধাতু উহার মধ্যে স্থাপিত করেন। এই মন্দিরের নাম মালিগাব মন্দির। উহা ক্যাণ্ডির মনোহর রাজপ্রাসাদের সহিত সংলগ্ন। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে কীর্ত্তিশ্রী রাজসিংহ সাধারণের সমক্ষে ঐ দন্ত প্রকটিত করেন।

১৮১৫ খৃঃ অব্দে লঙ্কাদ্বীপ ইংরাজগণের হস্তগত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দন্তধাতুও তাঁহাদের অধীনে আসিয়া পড়ে। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে কেহ অলক্ষিত ভাবে মালিগাব মন্দির হইতে বুদ্ধদন্ত অপসারিত করে। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে দন্তধাতু পুনরায় মালিগাব মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। তদনন্তর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্যাণ্ডিনগরের ইংরাজ প্রতিনিধিকে (British Resident at Kandy) বুদ্ধদন্তের রক্ষক নিযুক্ত করেন এবং একজন ইংরাজ সৈন্য ঐ মন্দিরের দ্বারবান্ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮২৮ খৃঃঅব্দে মহাসমারোহে ক্যাণ্ডিনগরে দন্তপ্রদর্শনী নামে এক মহোৎসব হয়। ঐ সময়ে বুদ্ধের দন্ত সাধারণকে দেখান হইয়াছিল। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে কতিপয় সিংহলী বৌদ্ধ দন্তধাতু মালিগাব মন্দির হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য

গোপনে ষড়যন্ত্র করে। গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া যথোচিত শাস্তি প্রদান করেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে খৃষ্টীয় সমিতির ইচ্ছানুসারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট দন্তধাতুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রক্ষকতার ভার ত্যাগ করেন। তখন স্থিরীকৃত হয় যে মালিগাব মন্দির ক্যাণ্ডির ইংরাজ প্রতিনিধি, সিংহলী রাজবংশের প্রতিনিধি, স্থানীয় বৌদ্ধ মহা-নায়ক প্রভৃতি চারি ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবে। এই চারিজনের যুগপৎ অনুমতি



বুদ্ধদেবের দন্ত।

ব্যতীত কেহই দন্তধাতুর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অদ্যাপি এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়। লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধের দন্ত কিরূপ যত্নে রক্ষিত আছে তাহা উল্লিখিত ইতিবৃত্তদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে অনুমিত হয়। সিংহলী রাজগণ পরম্পরাক্রমে যে সকল স্বর্ণ রত্ন মণি মাণিক্য প্রভৃতিদ্বারা খচিত সুন্দর সুন্দর দ্রব্য দন্তধাতুর মন্দিরে উপহার দিয়াছেন উহা দেখিয়া আমার প্রতীতি হইল লঙ্কা যথার্থই স্বর্ণপুরী।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

চয়ন।

শিবমন্দির।

পবিত্র ভাগীরথীর উত্তর দেশে বিহার-প্রদেশের মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীটি এত পুরাতন যে সেটি যে কে কবে খনন করিয়াছিল তাহা স্থির করিবার আর কোনও উপায়ই নাই। সেই গভীর জলের চতুর্দ্দিকে খণ্ডগিরির ন্যায় উচ্চ পাহাড়দেশ নিবিড় জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন আছে; কালে বোধ হয় এই জঙ্গল বহুদূরব্যাপী ছিল। এখন সেখানে কৃষিক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম হইয়াছে;—পুষ্করিণীটির চারি পার্শ্বে কেবল সেই পুরাতন বনের অবশিষ্ট 'চিহ্ন'ই বর্ত্তমান। দক্ষিণ তটের গভীর বনের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন মনোহর পুরাতন মন্দির, তাহার দ্বারদেশ হইতেই এক সুন্দর ঘাটের সোপানাবলী সেই গভীর জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।

শীতের এক সুন্দর দিনে আমি এই স্থানে শীকার করিতে গিয়াছিলাম। কতকগুলি সুন্দর পাখী মারিবার পর আমার বৃদ্ধ মাঝি আমাদের নৌকাটিকে সেই সোপানের পার্শ্বে এক বৃদ্ধবিটপীর ছায়াতলে আনিয়া বাঁধিয়া আমাকে সেই স্থানটির ইতিহাস বলিতে বসিল। গল্পটি তাহার জন্মাইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে এই ভাবেই তথাকার অধিবাসীদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

"বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এক সময়ে যখন ইহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেশ বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং চতুর্দ্দিকে বাঘ ও বন্যহস্তী ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন একদিন নেপালের যুবরাজ প্রাণভয়ে অযোধ্যা হইতে এইখানে পলাইয়া আসেন। অযোধ্যারাজের এক কন্যা ছিল। মেয়েটি বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় রূপবতী, তাল-বৃক্ষের ন্যায় ঋজু ও ক্ষীণাঙ্গী, যুবতী ও পদ্মাক্ষী। সুতরাং তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অনেক রাজপুত্র আসিয়া তাহার পরিণয়ভিক্ষা করিতে লাগিল। নেপালের যুবরাজও তাহাদের মধ্যে একজন। যুবরাজ রূপবান এবং পিতৃসিংহাসনের ভাবী অধিকারী। এই দেখিয়া অযোধ্যারাজ তাঁহাকেই মনোনীত করিলেন। নেপালরাজ তখন প্রচলিত প্রথানুসারে বহু অনুচর ও উপঢৌকনাদি দিয়া পুত্রকে অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলেন।

অযোধ্যার চতুর্দ্দিকেই আনন্দ উৎসব। অনেকদিন পরে যুবরাজের সহিত তাঁহার ভাবী পত্নীর সাক্ষাতের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিনে উভয়ের শুভদৃষ্টি হইবে এবং যুবরাজ স্বহস্তে পত্নীর সীমন্তে সিন্দূর পরাইয়া দিবেন। রাজকুমারের বীরের ন্যায় আকৃতি ও সুন্দর রূপ দেখিয়া রাজপ্রাসাদের সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন কেবল রাজার দ্বিতীয় রাণী তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। রাণীটি বন্ধ্যা। সেইজন্য রাজকন্যা ও নূতন জামাতাকে তিনি মনে মনে ঘৃণা করিতেন। রাণীটি এক ডাইনি এবং প্রত্যহ দৈত্যদের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ ও কথা-বার্ত্তা চলিত। অনেক ব্রত ও যাগযজ্ঞ করিয়া রাণী এমন ক্ষমতা পাইয়াছিলেন যে দেবতারাও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। সেই

হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি রাজকুমারকে যাদু করিলেন। অপরে যখন এরূপ গুণবান জামাতা লাভের জন্য রাজার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিত, রাণী হিসায় হাসিয়া বলিতেন, "আগে দেখি মেয়ে তার রূপবান স্বামীকে কি রকম পছন্দ করে।" যাহা হউক শুভদৃষ্টির দিনে সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে পর রাজা নিজে রাজকুমারের হাত ধরিয়া পরদার নিকটে লইয়া গিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিলেন। এই পরদার পিছনে রাজকুমারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তার পর যা ঘটিল তাহাতে সকলেই ভীত ও বিস্মিত হইলেন। রাজকুমারকে ঠেলিবামাত্র পর্দ্দার পশ্চাৎ হইতে একটা ভীত ক্রন্দনধ্বনি উঠিল এবং রাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন—"হায় পিতঃ, এ কাহাকে আপনি আমার স্বামী মনোনীত করিয়াছেন? এ আমাকে আলিঙ্গন করিবে কি করিয়া? এ যে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত!" রাণীর মন্ত্রবলে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। রাজকুমার যখন পর্দ্দার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল তাঁহার বুকের পরিচ্ছদ ছিন্ন এবং অঙ্গে শ্বেত কুষ্ঠের চিহ্ন! এই দেখিয়া রাজা ক্রোধে ও ক্ষোভে তাঁহাকে অনুচরবর্গ সহ বনের মধ্যে তাড়াইয়া দিলেন। অনেক দিন বনে বনে ঘুরিয়া—এবং বন্যপশু ও দস্যুদের হস্তে অনেক অনুচর হারাইয়া, শেষে একদিন শ্রান্তদেহে ক্লিষ্টমনে যুবরাজ এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিন স্নানাদি না করিয়া যুবরাজের বড়ই কষ্ট হইতেছিল। সেইজন্য আহারের পর ভৃত্যদিগকে নিকটস্থ কোন স্থান হইতে জল আনিতে আদেশ করিলেন। জলাভাবে কুষ্ঠের ক্ষতগুলি শুকাইয়া বড়ই কষ্ট দিতেছিল। ভৃত্যেরা বহুক্ষণ ধরিয়া চতুর্দ্দিকে জল অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোথাও একটু নির্ম্মল জল খুঁজিয়া পাইল না। শেষে অনেক কষ্টে এক মহিষের ডোবা হইতে এক ভাঁড় কাদামাখা জল লইয়া আসিল। সেই জলেই রাজকুমার পা ধুইলেন। কি আশ্চর্য্য! তাঁর সেই কুষ্ঠের চিহ্ন সব মিলাইয়া গিয়া তাঁহার অঙ্গ বেশ সুস্থের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই দেখিয়া রাজকুমার বুঝিলেন যে কোন দেবতা নিশ্চয়ই তাঁহার উপর দয়াপরবশ হইয়া এইরূপ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং তখন সেই ডোবার নিকট আসিয়া মহাদেবের উপাসনা পূর্ব্বক সেই কর্দ্দমাক্ত জলে স্নান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইলেন।

কিন্তু তবু তাঁর কষ্টের শেষ হইল না। অনেক মাস ধরিয়া অনুচরদিগকে লইয়া যুবরাজ গভীর বনের মধ্যে দৈত্য ও পশুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—কখনও বনের মধ্যে হারাইয়া যাইতেছেন, কখনও জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন, কখনও ভয়ঙ্কর সর্পের মুখে পড়িতেছেন, আবার কখনও দস্যুহস্তে পড়িতেছেন। ক্রমে তাঁহার সেই অসংখ্য অনুচরের মধ্যে একে একে সকলেই মরিয়া গেল। কেবল রাজপুত্র স্বয়ং ও দুইটি অতি বিশ্বস্ত অনুচরমাত্র জীবিত রহিলেন। শেষে এই তিনটিতেও যখন জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া সেই গভীর অরণ্যের মধ্যেই মৃত্যু স্থির করিলেন, তখন একদিন হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় আসিয়া বহুদিনের পরে সূর্য্যালোক দেখিতে

পাইলেন। এই নির্জ্জন স্থানে এক ঋষি তাঁহার আশ্রম স্থাপন করিয়া একান্ত মনে ঈশ্বরারাধনা করিতেছিলেন। রাজকুমার তাঁহার নিকট আপন অবস্থা বর্ণনা করাতে ঋষি তাঁহাদের পথ দেখাইয়া দিলেন। এতদিনে রাজকুমার বনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। যুবরাজের অনুরোধ ক্রমে ঋষিবর তাঁহাদিগকে অযোধ্যার পথই দেখাইয়া দিয়াছিলেন। একদিন গভীর রাত্রে তিন জনে গোপনে ছদ্মবেশে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেদিন তিনি এই নগর হইতে লাঞ্ছিত হইয়া তাড়িত হইয়াছিলেন, সে আজ প্রায় এক বৎসরের অধিক হইল। আজ নগর আবার আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ। প্রাসাদের নিকটে যাইয়া রাজকুমার দেখিলেন চতুর্দ্দিক প্রহরী বেষ্টিত। এক প্রহরীকে এ উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল—"এঁ্যা, তুমি কি জান না যে কাল আমাদের রাজকুমারীর বিবাহ?" রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিবাহ হইবে কাহার সহিত?" "রাজমন্ত্রীর সহিত। আমার বাজে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিবার অবকাশ নাই।"

রাণী মন্ত্রীর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন এবং রাজাকে বুঝাইয়া তাঁহাকেই জামাতা করা স্থির করিয়াছেন।

ক্ষোভে ও ক্রোধে রাজকুমার জ্ঞানশূন্য হইয়া মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে এরূপ ঘটনা যেন না ঘটে, তাঁহার মনোনীতা পত্নী যেন অপরের না হয়। সেই রাত্রে স্বপ্নে মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন "আমি তোমার পত্নীর উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিব।"

পর দিন যখন উৎসবপ্রাঙ্গণে সকলে সমবেত হইয়াছে, রাজা কন্যাদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন এবং পাপচিত্ত মন্ত্রী রাজকুমারীর সীমন্তে সিন্দুর দিবার জন্য পর্দ্দার অন্তরালে যাইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ চীরপরিহিত ভস্মমাখা এক ফকির জনতা ভেদ করিয়া রাজসমীপে অগ্রসর হইতে হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"দোহাই, মহারাজ, দোহাই!" রাজা ন্যায়বিচার দানে বাধ্য, সুতরাং বলিয়া উঠিলেন—"কে তুমি বিচার প্রার্থনা করিতেছ?" "আমি ঐ দুষ্টানারী ও এই মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে মহাদেবের কৃপায় সে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আমার পত্নীভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে মহাদেবের শাপে রাণী ও মন্ত্রী ভয়ঙ্কর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইল। এতদিনে রাজার চক্ষু ফুটিল। তিনি রাণী ও মন্ত্রীকে অরণ্যে তাড়াইয়া দিলেন। যুবরাজের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইয়া গেল।

তৎপরে মহাদেবের কৃপার কথা স্মরণ করিয়া যুবরাজ সেই মহিষের ডোবা খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং তাঁহার আদেশে সেই স্থানে এই পুষ্করিণী খনিত হইল। তিনি ডোবার চতুর্দ্দিকের ভূমি কর্ষিত করিয়া তাহার মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছড়াইয়া দিয়া চতুর্দ্দিক পুনরায় মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। যুবরাজ প্রচার করিলেন যে এই মাটি খুঁড়িয়া যে যতগুলি মুদ্রা পাইবে সেগুলি তাহার নিজের পারিশ্রমিক হইবে। নানাদেশ হইতে লোক আসিয়া

মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণ তীরে এক মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সেখানকার বৃক্ষগুলি ছেদিত হইতে লাগিল। শেষ বৃক্ষটির অঙ্গে কুঠারাঘাত হইবামাত্র অমনি ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল এবং একটা অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শুনা গেল। এই সংবাদে যুবরাজ সেই বৃক্ষটির ছেদন বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই দিন রাত্রে স্বপ্নে মহাদেব আসিয়া বলিলেন—"আমি ঐ বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছি। উহা ছেদন করিয়া এমন একটি শিকড়ের অনুসন্ধান করিবে যেটি পৃথিবীর মধ্যস্থল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। সেই শিকড় কাটিয়া আমার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং ঐ মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে।"

যুবরাজ সেইরূপই করিলেন। আজও ঐ মন্দিব মধ্যে সেই দারু মূর্ত্তিই বিরাজিত!

মাঝি গল্প শেষ করিয়া আমার নৌকাটিকে আনিয়া তীরে লাগাইল। আমি সেই প্রাচীন কথা ভাবিতে ভাবিতে শিবিরে ফিরিলাম।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী।

মহারাষ্ট্র বীর রঘুজি ভোঁসলে ভাস্করের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং মুস্তাফার বিদ্রোহ ও বঙ্গে অশান্তি ও অরাজকতার সংবাদ পাইবামাত্র তিনি অবসর বুঝিয়া বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। আলিবর্দ্দী তখন তাঁহার রণক্লান্ত সৈন্য লইয়া পাটনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি রাজধানী রক্ষা করিবার এবং রঘুজি ও মুস্তাফার সংযোগ-নিবারণ উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। লুণ্ঠনকারী মহারাষ্ট্র বীর তিন ক্রোড় মুদ্রা নজর চাহিয়াছেন শুনিয়া নবাব তাঁহার কর্ম্মচারীকে রঘুজির সহিত কৌশলে কালক্ষেপ করিতে উপদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে মুস্তাফা নবাবকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধিস্থাপনে নিযুক্ত স্থির করিয়া এক প্রবল বাহিনী লইয়া বঙ্গদেশের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বীরবর শাউকৎজঙ্গ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ যাত্রা করিয়া জগদীশপুরের যুদ্ধে বিদ্রোহীগণকে পরাজিত করিলেন। মুস্তাফা নিজে রণক্ষেত্রে হত হইলেন এবং তাঁহার অনুচরবর্গ প্রভুর মৃতদেহ দেখিবামাত্র ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়ন করিল। পরে মুস্তাফার পুত্র মুর্ত্তাজা নেতা হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ উৎখাত করিতে লাগিল এবং অবশেষে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া পুনরায় নবাবের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

এদিকে জগদীশপুরের যুদ্ধের জয়বার্ত্তা শুনিবামাত্র নবাবের দুশ্চিন্তা অনেকটা দূর হইল এবং তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে শাসিত করিবার সুযোগ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ রঘুজিকে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। সেকালে মুসলমান আদবকায়দার এতই বাহুল্য ছিল যে যুদ্ধঘোষক বার্ত্তা পর্য্যন্ত চাটুবাক্যে মণ্ডিত হইত। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এই।

"শত্রুর নিকট যাহারা সন্ধিভিক্ষা করে তাহারা আপনার স্বার্থের ক্ষতি বা হীনতা বা ভবিষ্যতে সুযোগের আশার দ্বারাই চালিত হয়; কিন্তু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! সত্যধর্ম্মানুরাগী বীরগণ অবিশ্বাসীর সহিত সংগ্রাম করিতে ভীত নহে। সুতরাং সন্ধি এই ক্ষেত্রে সম্ভব,—যখন ইসলামধর্ম্মী সিংহগণ পৌত্তলিক দৈত্যগণের সহিত এরূপ কঠোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে যে তাহারা পরস্পরের রক্তস্রোতে সন্তরণ দিবে এবং একপক্ষ বিপর্য্যস্ত হইয়া শান্তি ভিক্ষা করিবে।"

ইহার উত্তরে রঘুজি লিখিলেন—"সেই নিষ্পত্তি

করিবার জন্তই তিনি তাঁহার স্বদেশ হইতে প্রায় সহস্র মাইল পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন কিন্তু নবাব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে এখনও একশত মাইলও অগ্রসর হন নাই।"

আলিবর্দ্দী উত্তরে লিখিলেন—"যেরূপ বর্ষা উপস্থিত হইয়াছে এবং এই দীর্ঘ যাত্রার ফলে রঘুজি যেরূপ শ্রান্ত ও পীড়িত হইয়াছেন, তাহাতে বর্ষার কয়মাস কোনও সুবিধাজনক স্থানে অতিবাহিত করাই তাঁহার পক্ষে সমীচীন। তাঁহার সৈন্তেরা বিশ্রামের পর নবতেজে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্ত প্রস্তুত হইলে তিনি সসম্মানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিবেন, এমন কি তাঁহার স্বরাজ্যে পর্য্যন্ত যাইতে তিনি প্রস্তুত।"

শীতের প্রারম্ভেই আলিবর্দ্দী রাজধানী ত্যাগ করিয়া বীরভূম যাত্রা করিলেন। নবাবের আগমনের সংবাদ পাইয়া রঘুজি বিহারে পলায়ন করিলেন। তথায় মুস্তাফার ধ্বংসাবিশিষ্ট সৈন্ত তাহার সহিত সংযুক্ত হইল। তখন উভয়ে নূতন সৈন্ত সংগ্রহ করিবার জন্ত সোন্ নদী পার হইবামাত্র, নবাব নদী-তীরস্থ আলিপুর নগরে যাত্রা করিলেন। এই স্থানে উভয় পক্ষে দুই চারিটি খণ্ডযুদ্ধ হইল। এক যুদ্ধে রঘুজি স্বয়ং বন্দী হন, কিন্তু নবাব সৈন্তস্থ দুই জন আফগান সেনাপতির সাহায্যে সে যাত্রা মুক্তিলাভ করিয়া হবিবের পরামর্শানুসারে অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। নবাবও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। সৌভাগ্য বশতঃ রাজধানী লুণ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই নবাব নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তখন নগরের সন্নিকটস্থ স্থানগুলি লুণ্ঠনে নিযুক্ত। নবাবসৈন্ত আসিয়াছে দেখিয়া তাহারা অচিরাৎ পলায়নপর হইল। এমন সময়ে স্বদেশে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া মহারাষ্ট্র সেনাপতি তৎক্ষণাৎ বেরার যাত্রা করিলেন; মীর হবির উড়িষ্যার অধিপতি নিযুক্ত রহিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই আকস্মিক দেশত্যাগে নিশ্চিন্ত হইয়া নবাব এইবার সেই দুই আফগান সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিদানে মানস করিলেন। তাহারা রঘুজির সহিত যে সকল পত্র দ্বারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সেগুলি সাউকতের সাহায্যে বাহির হইয়া পড়িল এবং তাহাদের অপরাধ নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইল। কিন্তু তাহাদের এই দুষ্কৃতি সত্ত্বেও আলিবর্দ্দী তাহাদিগের অতীত উপকার বিস্মৃত হইলেন না। তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া বিদায় দিলেন না। তাহারা তাহাদের সমস্ত ধনরত্ন, পরিবার ও অনুচরবর্গ লইয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্ত সমারোহের সহিত রাজধানী ত্যাগ করিয়া তাহাদের জন্মভূমি দ্বারভঙ্গে গমন করিল। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের বিহারবিদ্রোহের পূর্ব্বে আমরা তাহাদের আর কোনও সংবাদ পাই না।

এই প্রাচীন রাজধানীর ইতিহাসে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ চির-স্মরণীয় থাকিবে। এই সালেই সিরাজ-উদ্দৌলার বিবাহোৎসবে এরূপ সমারোহ হইয়াছিল, যে বিলাস বাহুল্যখ্যাত মুর্শিদাবাদ নগরীতেও তৎপূর্ব্বে এরূপ মহোৎসব আর হয় নাই। কয়েক মাস ধরিয়া নগরে কেবল গীতবাদ্য ও রোশনাই চলিয়াছিল। বৃদ্ধ নবাব প্রিয়তম দৌহিত্রের বিবাহোৎসবকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কোন যত্নের বা ব্যয়েরই ত্রুটি করেন নাই। কর্ম্মক্লিষ্ট আলিবর্দ্দীর জীবনে আরাম ও আনন্দ উপভোগ এই প্রথম।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নবাব পুনর্বার উড়িষ্যা উদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। উৎকলদেশ তখনও মহারাষ্ট্র কবলে। এই লুণ্ঠনকারীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য, নবাব তাঁহার ভগিনীপতি মিরজাফরকে সসৈন্যে উৎকলে প্রেরণ করিলেন। জাফর তখন মেদিনীপুরের ফৌজদার। প্রথম প্রথম জাফর খুব সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা দেখাইয়া কয়েকটি যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বল চিত্ত অল্পদিনের মধ্যেই ইন্দ্রিয় ভোগে উন্মত্ত হইল। শুদ্ধচরিত্র নবাব এই সংবাদ পাইয়া বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। নূতন ফৌজদারের অপদার্থতার সুযোগ গ্রহণ করিতে বেরার মহারাষ্ট্রীয়েরাও বিলম্ব করিলনা।

তাহারা অবিলম্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া জাফরকে উৎকল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। পলাতক জাফর বৰ্দ্ধমানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আলিবৰ্দ্দী তৎক্ষণাৎ আতাউল্লা নামে এক সুদক্ষ সেনাপতিকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিতাড়িত করিলেন বটে, কিন্তু এক ভবিষ্যদ্বক্তার কথায় প্ররোচিত হইয়া ম্যাকবেথের ন্যায় সিংহাসন লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আলিবৰ্দ্দী অনতিবিলম্বেই তাঁহার শক্তি খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। মিরজাফরকে কঠোর তিরস্কার করিয়া রাজদরবার হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। জাফর ইহাতে এত ক্রুদ্ধ হইলেন, যে তিনি আর কখনও দরবারে উপস্থিত হন নাই। কিছুকাল পরে জাফরের প্রতি অত্যধিক কঠোর ব্যবহার করার জন্য দুঃখিত হইয়া আলিবৰ্দ্দী একদিন জাফরের এক আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য স্বয়ং তাঁহার শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। জাফর তাঁহাকে সাদরে অভিবাদন করা দূরে থাক, অত্যন্ত অপমান সূচক ব্যবহারই করিয়াছিলেন। নবাব যখন দেখিলেন যে তাঁহার জাফরের সহিত মনোমালিন্য দূর করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তখন তিনি জাফরের সৈন্য কাড়িয়া লইয়া তাঁহার সহিত রাজ্যের সকল সম্পর্ক শেষ করিলেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রঘুজির পুত্র জানুজি ভোঁসলে পিতার ন্যায় বঙ্গ লুণ্ঠন উদ্দেশ্যে দেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নবাবের নিকট পরাজিত হইয়া মেদিনীপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সালে যে কেবল মহারাষ্ট্রীয়গণই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল তাহা নহে, পূর্ব্বোল্লিখিত বিহারের ভীষণ বিদ্রোহও এই সালেই হয়। নবাব যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধকল্পে মেদিনীপুর যাত্রা করেন, সেই সময়ে পথেই তিনি আফগান সেনাপতিদ্বয় সর্দ্দার খাঁ ও শমসের খাঁর রাজদ্রোহিতার সংবাদ পান। মহারাষ্ট্রদিগের সহিত ষড়যন্ত্রের অপরাধে ইহারা কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল, বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। বিহারের শাসনকর্ত্তা জাইনুদ্দিন জঙ্গ নিতান্তই দয়াশীল ছিলেন। তিনি এই দুই সেনাপতিকে ক্ষমা করিবার জন্য নবাবকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। নবাব ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন না।

নবাবের নিকট হইতে আফগানদ্বয়ের ক্ষমালাভ করিয়া শাউকৎ দেখাইতে চাহিলেন যে তাঁহার বিবেচনায় নবাব তাহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উভয়কেই পাটনাতে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং গোপনে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরদিন সর্দ্দার খাঁ শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশে পাটনায় গমন করিল। তাহার সকল সন্দেহ দূর করিবার জন্য শাউকৎ তাঁহার শরীররক্ষক প্রহরীগণকে পর্য্যন্ত বিদায় দিলেন এবং বিশেষ সমাদরের সহিত আফগান সেনাপতিকে রাজদরবারে অভিবাদন করিলেন। সমসের শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ছলে সশস্ত্র সৈন্যসমভিব্যাহারে পাটনা নগরে প্রবেশ করিল। নবাব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি শমসেরের এক সৈনিক তাঁহার হৃৎপিণ্ডের নিম্নে ছুরিকাঘাত করিল। নবাব তৎক্ষণাৎ অসিগ্রহণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অসি কোষমুক্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শির ভূমে লুটাইয়া পড়িল। আফগানেরা নগর অধিকার করিয়া নগরবাসীর উপর পীড়ন এবং বহু নির্দ্দোষীকে হত্যা করিতে লাগিল। নবাবের ধনরত্ন কোথায় লুক্কায়িত আছে তাহা না জানিতে পারিয়া তাহারা কেবাধাক বৃদ্ধ হাজি আমেদকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিয়া হত্যা করিল। শাউকতের বেগমদিগকে পর্য্যন্ত তাহারা অধিকার করিল। আলির প্রিয় কন্যা ও সিরাজের মাতা সুন্দরী আমিনা বেগমও তাহাদের হস্তগত হইলেন।

এই বিপদের সংবাদে আলিবৰ্দ্দী নিতান্ত বিহ্বল ও কাতর হইয়া পড়িলেন। প্রিয়তমা কন্যা বর্ব্বর ইন্দ্রিয়ভোগবস্তের কবলে,ভগিনী নিষ্ঠুরগণের ক্রীতদাসী,

এবং সহোদর ভ্রাতা দানবীয় পীড়নে প্রাণ হারাইয়াছেন এই সকল ভাবিয়া নবাবের জীবন দুর্ব্বিষহ ভারস্বরূপ বোধ হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন হয় তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন ও অত্যাচারীর শাস্তিবিধান করিবেন, আর না হয় সমাধির ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিবেন—'মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন'। এই স্থির করিয়া তিনি তাঁহার চির অনুগত কর্ম্মচারী ও সৈনিকগণকে ডাকিয়া সাশ্রুনয়নে মর্ম্মস্পর্শী স্বরে তাঁহার সংকল্প বুঝাইয়া বলিলেন। সমবেত প্রধানবর্গ সকলেই একবাক্যে কোরাণস্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, যতদিন জীবন থাকিবে ততদিন তাঁহারা বীর নবাবের অনুগত থাকিয়া যুদ্ধ করিবেন।

ইহার পরেই নবাব এক ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যাঁহাদের পক্ষে সম্ভব তাঁহারা অন্ততঃ কিছুকালের জন্য রাজধানী ত্যাগ করিয়া কোনও নিরাপদ স্থানে গমন করুন। মহারাষ্ট্রীয় হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করাই এরূপ ঘোষণার উদ্দেশ্য। আলিবর্দ্দীর বিচিত্রঘটনাসঙ্কুল রাজত্বকালের মধ্যে এই নগর ত্যাগের তুল্য শোচনীয় দৃশ্য বুঝি আর হয় নাই। ধীরে ধীরে সেই বিরাট নগরী জনশূন্য হইতেছে—শ্রেণীর পর শ্রেণী প্রজাবৃন্দ কাশিমবাজার বা কলিকাতার প্রাচীরবেষ্টিত ইংরাজ কুঠির মধ্যে আশ্রয় লইবার জন্য সাশ্রুনয়নে নগরের তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সেই সম্পদমণ্ডিত, আনন্দ কোলাহল মুখরিত রাজধানী নিস্তব্ধ, শোচনীয় শ্মশানে পরিণত হইল। কেবল মধ্যে মধ্যে পথে দুই একটি নগর রক্ষক বা নগরত্যাগে অশক্ত অসহায় বা আতুর ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে মাত্র। নবাব যখন নিত্য এই দৃশ্য দেখিতেন নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতেন। পরে সামুৎ ও আতাউল্লা রাজধানীর রক্ষক এবং শাউরেৎ জঙ্গ রাজপথ ও জলপথের রক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কারণ এই উভয় পথ দিয়া নবাবের নিকট যুদ্ধের আবশ্যকীয় বস্তু সকল সরবরাহ হওয়া আবশ্যক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বন্দী।

১৮

কারাধ্যক্ষ বা তার লোকজন—কাহারো কোন ত্রুটি যে থাকিতে পারে, এ কথা সে মোটে বিশ্বাসই করিবে না। ঠিক কথা! ত্রুটির কথা বলাই যে অন্যায়! তারা কর্ত্তব্য করিয়াছে মাত্র! সতর্কভাবে আমার প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, আমার প্রতি কোন পরুষ আচরণ করে নাই! আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট সন্তোষের কারণ নয় কি?

আর এই কারাধ্যক্ষ—এই ভদ্রলোকটি, মৃদু হাস্যের সহিত শান্ত আলাপ, সতর্ক অথচ প্রীতিমধুর দৃষ্টিটুকু, দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহু—কারাগৃহের প্রতিবিম্ব বলিলেই চলে—পাষাণ-কারা যেন মানুষের মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! চারিধারে কারাগৃহের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব—লোকজন, লৌহগরাদ, প্রস্তর-দেওয়াল,—সর্ব্বত্রই! চাবি-তালাগুলা পর্য্যন্ত,—যেন রক্তমাংসের জীব বলিয়া মনে হয়—আমাকে সকলে মিলিয়া পাহারা দিতেছে! আর এই কারাগৃহ,—নিষ্ঠুর কারাগৃহ, অর্দ্ধপ্রস্তর ও অর্দ্ধ মানবদেহবিশিষ্ট প্রাণীরই স্বরূপ মূর্ত্তি, আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, চারিধার হইতে জড়াইয়াছে, বাঁধিয়া রাখিয়াছে! লৌহহৃদয় লইয়া আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে! দরিদ্র, হতভাগ্য আমি, আমাকে লইয়া আজ ইহারা, করিবে কি?

১৯

শান্ত চিত্ত। কোন ভাবনা নাই, দ্বিধা নাই! জেলের কর্ত্তা আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর-মুহূর্ত্ত হইতেই ভালো আছি! পূর্ব্বে মনে যে আশাটুকু রাখিতাম, এখন সেটুকুও যে ছাড়িতে পারিয়াছি, ইহা শুধু তাঁহারি বচনে!

সাড়ে ছয়টা—কি পৌনে সাতটা—এমন সময় আমার কক্ষের দ্বার মুক্ত হইল—পলিত-কেশ একটি লোক ভিতরে প্রবেশ করিলেন; আসিয়াই, তাঁর প্রকাণ্ড ভারী কোট খুলিয়া, বসিলেন—পোষাক হইতে বুঝিলাম, ইনি আচার্য্য মহাশয়! বন্দীদিগের আচার্য্য নন, অবশ্য!

আমার সম্মুখে তিনি বসিলেন। মাথা নাড়িয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। এ দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না!

তিনি কহিলেন, "তুমি প্রস্তুত হয়েছ, বৎস?"

অনুচ্চ কণ্ঠে আমি কহিলাম, "প্রস্তুত ঠিক হই নাই,—তবে, হাঁ, এখনি উঠিতে সম্মত আছি।"

আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম হইতেছিল! প্রস্তুত,—একেবারে প্রস্তুত,—কিন্তু কিসের জন্য? আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল! প্রাণের মধ্যে কি-একটা বিকট শব্দ ধ্বনিত হইতেছিল!

আচার্য্য অনেক কথাই বলিতেছিলেন—তাঁহার ঠোঁট নড়িতেছিল, হাত পা ঘাড়ও সেই সঙ্গে নড়িতেছিল। কি বলিতেছিলেন, তাহা জানিনা, কারণ, আমার মনে কোন কথাই পৌঁছিতেছিল না।

আবার দ্বার খুলিল। এইবার জেলকর্ত্তা স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত। গায় দীর্ঘ কালো-কোট, হাতে এক বাণ্ডিল কাগজ—জোর করিয়া তিনি মুখে বিষাদের দাগ টানিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

জেলকর্ত্তা কহিলেন, "আদালত হইতে সংবাদ আসিয়াছে।" একটা তড়িতশিখা আমার হৃদয়ের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল।

আমি কহিলাম, "কি? আদালত কি এখনি আমার মাথাটা চাহে? সে-ত আমার পক্ষে গৌরবের কথা! এ মাথাটার উপর সরকারী উকিলের বিলক্ষণ লোভ—তা জানি—বেশ—আমিও প্রস্তুত!" তিনি কাগজের ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন,—আদালতের চির-জটিল অস্পষ্ট বর্ণাক্ষরমালা—কতকগুলা বিকট দীর্ঘ শব্দের ঝঙ্কার—অনেক কষ্টে অর্থ বাহির করিতে হয়! আধঘণ্টা কাগজ ঘাঁটিয়া, অর্থ বুঝা গেল,—আমার আপীল প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে! বেশ!

তিনি কাগজ হইতে মাথা না তুলিয়া এক নিশ্বাসেই বলিয়া গেলেন,—"প্লে দি গ্রীভে ফাঁসি হইবে! সাড়ে সাতটায় আমরা কাঁসিয়ারজারি জেলে যাইবে! অনুগ্রহ করিয়া অনুসরণ করিবেন।"

কয়েক মুহূর্ত্ত অবধি কাহারো কথায় আমি কাণ দিই নাই। জেলের কর্ত্তা ও আচার্য্যে বেশ গল্প জমিয়াছিল—দেশেরও দশের কথায় তাঁহারা মাতিয়া উঠিয়াছিলেন।

এমন সময় দ্বার খুলিয়া চারিজন সশস্ত্র প্রহরী ভিতরে আসিল। যেন যন্ত্রযুক্ত! অভিবাদন করিয়া তাহারা জানাইল, "সময় হয়েছে।"

আমি কহিলাম, "বেশ, আমিও প্রস্তুত—চল!"

তাহারা কহিল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা করিতে হইবে! তার পর সকলে বাহির হইয়া গেল।

এখন একবার শেষ চেষ্টা! ভগবান, সত্যই কি কোনো আশা নাই? পলাইব, নিশ্চয় আমি পলাইব! দ্বার, জানালা, ছাদ ভেদ করিয়া, যেখান দিয়া পারি, পলাইব! দেহের মাংসগুলাকে বাখিয়া যাইতে হয়, যদি, তবু এই অস্থিকয়খানা লইয়াই পলাইব!

কোথায় এখন যন্ত্র—অস্ত্র? রাক্ষসের মত বলে ও উদ্যমে যন্ত্রপাতি লইয়া যদি লাগিয়া যাই, তথাপি এ দেয়াল ভাঙ্গিতে একমাস সময় লাগিবে! কিন্তু আমার হাতে একটা পেরেক অবধি নাই—হারে দুরাশা—একান্ত দুরাশা!

২০

কাঁসিয়ারজারির জেলে আমি আসিয়াছি। নিজের ইচ্ছায় নয়—সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত বন্দী অবস্থাতেই আসিয়াছি! পথের কথাটুকু বলিবার মত।

সাড়ে সাতটার সময় আমার প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, "সঙ্গে আসুন, মশায়!" আদব-কায়দার কোন ত্রুটি নাই। আমি উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। মাথা এমনি ভার বোধ হইতেছিল, আর পা দুইটা এত দুর্ব্বল—যে চলা যায় না! তবু চেষ্টা করিয়া চলিলাম। বাহির হইতে একবার আমার নির্জ্জন ঘরটির দিকে চাহিলাম—এতদিনের আশ্রয়—কেমন একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছিল। আজ তাহা শূন্য রাখিয়া চলিলাম,—কি বিচিত্র, এ দৃশ্য! কিন্তু অধিকক্ষণের জন্য নয়—সন্ধ্যার সময়, আবার এক নূতন অতিথি আসিয়া শূন্য ঘর পূর্ণ করিবে! ধন্য বিধান!

প্রাঙ্গণের সম্মুখেই আচার্য্য বসিয়াছিলেন—তিনি তাঁর আহারটুকু শেষ করিতেছিলেন। জেল-কর্ত্তা আমার করকম্পন করিলেন—তারপর চারিজন সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমি চলিলাম।

হাঁসপাতাল হইতে একটি লোক অভিবাদন করিল। তখন আমি মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম! কিন্তু, কতক্ষণের জন্য?

বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। সেই গাড়ী—যাহার মারফত্ এখানে আসিয়াছিলাম। লম্বা গাড়ী, ভিতরটা রেলিঙের দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত! যেন লোহা দিয়া কে মাকড়সার জাল বুনিয়াছে! দুইটা ঘরের স্বতন্ত্র দ্বার—একটি পিছনে, অপরটি সম্মুখে। গাড়ীর মধ্যে যেমন অন্ধকার, তেমনি ধূলা ও আবর্জ্জনার রাশি! ইহার তুলনায় আমার সে নির্জ্জন ঘর ত, প্রাসাদ-কক্ষ! এই কবরে জীবন্ত সমাধিলাভের পূর্ব্বে বাহিরের দিকে একবার প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া দেখিলাম! এই মুক্ত গগনের স্মৃতিটুকু লইয়া আঁধার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে! দ্বারের সম্মুখে দর্শকের দল সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল! টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছিল—বোধ হয় সারাদিনে এ বৃষ্টির বিরাম হইবে না! পথ ও প্রাঙ্গণ কাদায় ভরিয়া গিয়াছিল—চারিধারে একটা অপরিচ্ছন্ন ভাব!

গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। সম্মুখভাগে সর্দ্দার প্রহরী, ও সশস্ত্র প্রহরীর দল, এবং আচার্য্য—পশ্চাতের কামরায়; আমি একেলা!

বাহিরে অশ্বপৃষ্ঠে আর চারিজন প্রহরী গাড়ীর সহিত চলিল! আমাকে পাহারা দিবার জন্য আটজন সশস্ত্র প্রহরী এবং তদতিরিক্ত লোকজন ত ছিলই! রাজার মত চলিয়াছি!

গাড়ী ছাড়িয়া দিল! জলে, রাস্তার পাথর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। পশ্চাতে সশব্দে জেলের ফটক বন্ধ হইল—সে শব্দও শুনিলাম। আমি যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া ছিলাম—কোন ভয় বা ভাবনা ছিল না। চোখে জল বা মুখে হাসিও ছিল না! যেন আমার জীবন্ত কবর হইয়া গিয়াছে, এমনি ভাবখানা! ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছিল—তাহার চাকার ও ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ সমস্ত একত্র মিলিয়া বেশ একটি বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি করিল। যেন ঝড়ের পিঠে চড়িয়া কোথায় আমি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়াছি! যেন কোন্ স্বপ্নলোকে, কোন্ ঘুমন্ত পরীকন্যার সন্ধানে চলিয়াছি!

গাড়ীর মধ্যে, ছিদ্র দিয়া পথ দেখিতেছিলাম। এক জায়গায় প্রকাণ্ড অক্ষরে, "বৃদ্ধদিগের জন্য হাঁসপাতাল," কথাটি লেখা রহিয়াছে! এ জগতে, তবে, লোক বৃদ্ধ হইবার অবকাশ পায়! আশ্চর্য্য ব্যাপার, সন্দেহ নাই! এই ত আমার তরুণ বয়স—কিন্তু যাক্, সে কথা!

গাড়ী মোড় ঘুরিল। দূরে নোতর-দামের চূড়া দেখা গেল—পারি সহরের কুয়াসা ভেদ করিয়া গগনস্পর্শী চূড়া উঠিয়াছে! আমি ভাবিলাম, "বাঃ, উহার উপর হইতে চারিধারটা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়!"

এই সময় আচার্য্য নূতন করিয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি অনর্গল বকিয়া চলিলেন, বাধা দিবার জন্য ত কেহ ছিল না—আমি সে কথায় কর্ণপাতও করি নাই! আচার্য্যের গল্প অপেক্ষা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে বেশ একটা মধুরতা ছিল! চারিধারেই ত বিচিত্র কোলাহল—মাত্রা আর একটু বাড়িলে, ক্ষতি কি?

সমস্ত শব্দ কাণে আসিয়া লাগিতেছিল! কিন্তু কোনটি স্বতন্ত্রভাবে নহে—বেশ একটী মিশ্র রাগিণী,—নির্ঝরের ধারাপাতের অনুরূপ!

সহসা শুনিলাম, আচার্য্য বলিতেছেন, "কি বিশ্রী গাড়ী,—একটা কথাও যদি শুনিবার জো থাকে!"

কথাটি সত্য—খাঁটি সত্য, এতটুকু অতিরঞ্জিত নহে।

আচার্য্য কহিলেন,"তুমি, বোধ হয়, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না! কি বলছিলাম,—হাঁ, ভালো কথা, সারা পারি কিসের সংবাদে আজ সরগরম, জানো কি?"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম! নূতন সংবাদ আবার কিছু আছে নাকি? বোধ হয়, আমারি কথা লইয়া পারিতে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে।

আচার্য্য কহিলেন, "কাগজখানাও ত সন্ধ্যার আগে দেখিবার সুবিধা হবে না! সন্ধ্যার পর, আমি খবরের কাগজ পড়ি, একেবারে দিনের শেষ খপরটি অবধি পাওয়া যায়—তাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।"

সর্দ্দার প্রহরীর কথা ফুটিল—সে কহিল, "কি? এমন মজার খপর কিছু শোনেননি, এখনো?"

আমি কহিলাম, "আমি জানি, বোধ হয়!"

সে কহিল, "আপনি জানেন ? আশ্চর্য্য—ব্যাপারখানা কি, বলুন দেখি!"

"তুমি শোনবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছ!"

সে কহিল, "কেন, মশায় ? রাজ্যের কথায় সকলেরি আলাদা মত আছে! তা সে যে-ই কেন হোক্ না! আপনি কয়েদী, তাতে কি এসে যায় ? আমি ত ন্তাশন্তাল গার্ডের দিকে। ছেলেবেলায় তাদের দলে কাপ্তেনীও করেছিলাম। ভারী ভালো লাগত!"

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, "না, মশায়, আমি অন্ত কোন সংবাদ মনে করছিলাম।" সে কহিল, "তাই নাকি ? বলেন কি, আপনি ? আপনি জানিলেন কি করিয়া ? কে সংবাদ দিলে, আপনাকে ? বলুন ত, আবার কি খবর ? শুনি!"

আচার্য্য কহিলেন, "তুমি কি মনে করছিলে ?"

আমি কহিলাম, "সন্ধ্যার পর, আর মনে করবার কিছু থাকবে না, এই কথাটাই মনে করছিলাম।"

আচার্য্য কহিলেন, "আহা, তোমার বড় দুঃখে, দুর্ভাবনায় সময় কাটছে,—কি করবে বল! এরি মধ্যে মনটাকে ভালো রাখবার চেষ্টা কর!"

সর্দ্দার প্রহরী কহিল, "আপনি একেবারে মনমরা হয়ে পড়েছেন—কাস্তের্গ সারা পথ রসের গল্পে হাসিয়ে মেরেছিল!"

তার পর সে আপনার প্রতিপত্তির কথা বলিল, পাপাভোঁর সঙ্গে সে গিয়াছিল—সারা পথ সে কি চুরুট টানিয়াছিল। তারপর স্কুলের সেই ছোকরাগুলা—বকিয়া, চীৎকার করিয়া, কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছিল!

আচার্য্য কহিলেন, "পাগলের দল! বেচারারা বুদ্ধির দোষে কষ্ট পায় বৈ ত নয়। কিন্তু—মশায়, আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখছি। এই অল্প বয়স, আপনার—"

আমি কহিলাম,—স্বরে বেশ একটু তীব্র রস ঢালিয়া দিয়াছিলাম—কহিলাম,—"অল্প বয়স! বলেন কি ? আপনার চেয়ে আমি বৃদ্ধ! প্রতি ঘণ্টায় আমার দশ বৎসর ক'রে আয়ু বাড়ছে।"

আচার্য্য কহিলেন, "তামাসা—তাই ভালো—আমি তোমার পিতামহের বয়সী!

আমি গম্ভীরভাবে কহিলাম "তামাসা নয়,—অন্ততঃ আমার এমনি ধারণা!"

আচার্য্য নস্তদানি বাহির করিয়া ডালা খুলিলেন। কহিলেন, "রাগ করো না—ভাই, বুঝলে ?"

আমি কহিলাম, "না, না, রাগের কথা নয়—আমি রাগ করিনি!"

এমন সময় গাড়ীর ধাক্কায় তাঁর নস্যদানি উল্টাইয়া গেল—সমস্ত নস্তটুকু পড়িয়া গেল। শশব্যস্তে নস্তদানি তুলিয়া আচার্য্য কহিলেন, "যাঃ, সব পড়ে গিয়েছে—এখন উপায় ?"

আমি কহিলাম, "সয়ে থাকুন—তুচ্ছ একটু আরাম সুখ,—আমাকে দেখে সহ্য করতে শিখুন।"

আচার্য্য গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "আরে রেখে দাও, সহ্য করা! তোমার কি কষ্ট হে, বাপু! বুড়ামানুষ—নস্ত না নিয়ে এতটা পথ চলি কি করিয়া ? হায়, হায়, হায়!"

আশ্চর্য্য! আমার তুলনায় আচার্য্যের

কষ্ট আরো অধিক। এমনি মানুষের স্বার্থান্ধতা বটে!

আচার্য্য মনের শান্তি সুখ হারাইয়া একেবারে স্থির হইলেন! ভিতরে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। একঘেয়ে শব্দ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল!

ক্রমে সহরের কম্র-কোলাহলের স্রোতে আসিয়া মিশিলাম। গাড়ী কষ্টম-হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইল। লোকজন আসিয়া পরীক্ষা করিয়া গেল! যদি আমরা ছাগল কিম্বা অপর কোন পশু হইতাম, তাহা হইলে এখানে কিছু দক্ষিণা দিতে হইত, কিন্তু মানুষ বিনাব্যয়ে মুক্তি পাইয়া থাকে।

তার পর, আঁকাবাঁকা অসংখ্য পথ ঘুরিয়া গাড়ী পাথরে বাঁধানো বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল! এই রাস্তা সোজা কাঁসিয়ারজারি গিয়াছে! গাড়ীর বিকট শব্দে পথিকের দল অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—আর খপরের কাগজ-ওয়ালারা বগলে কাগজ লইয়া পথের এধার-ওধার ছুটাছুটি করিতেছিল।

সাড়ে আটটায়, কাঁসিয়ারজারিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। দীর্ঘ সোপানের শ্রেণী, নিস্তব্ধ উপাসনা-মন্দির, এবং প্রকাণ্ড লৌহকপাট দেখিয়া আমার রক্ত হিম হইয়া গেল! গাড়ী থামিলে আমার মনে হইল, বুঝি হৃদয়ের স্পন্দনটুকুও এখনি থামিয়া যাইবে!

মনে সাহস আনিলাম। বিদ্যুতের ত্বরিত গতির মত, চকিতে দ্বার খুলিয়া গেল। আমি আমার অন্ধকার গহ্বর হইতে লাফাইয়া নীচে নামিলাম। দুইজন প্রহরী আসিয়া দুই হাত ধরিল। দুইধারে কাতার দিয়া সৈন্সের দল দাঁড়াইয়াছিল—তাহারি মধ্য দিয়া আমি চলিলাম। আমাদিগকে, অর্থাৎ, আমাকে দেখিবার জন্ত, বাহিরে, রীতিমত ভিড় জমিয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

উপবাসের উপকারিতা।

আমাদের ভারতবর্ষের ঋষিগণ মনুষ্যদেহে খাদ্যের ফলাফল সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়া ভারতবাসীর আহার বিধি স্থির করিয়া গিয়াছিলেন। পীড়া বিশেষে লঙ্ঘন বিধির উপকারিতা তাঁহারা যত বুঝিতেন, পাশ্চাত্যেরা এতদিন সেরূপ বুঝিতেন না। কবিরাজী চিকিৎসায় রোগীকে 'শুখাইয়া মারে' বলিয়া আমরা আজকাল আয়ুর্ব্বেদকে উপহাস করিতাম। কিন্তু এতদিনে পাশ্চাত্যগণেরও এ সকল বিষয়ে চৈতন্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আজকাল জীবের খাদ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করিতেছেন ও প্রতিদিনই নব নব সত্যে উপনীত হইতেছেন।

আমরা নিত্য যে সকল খাদ্য ভোজন করিয়া থাকি তাহা প্রায়ই আমাদের আবশ্যকের অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে। সেই অতিরিক্ত অংশটুকু জীর্ণ বা বহিষ্কৃত না হইলে দেহে বাত, অজীর্ণ ইত্যাদি নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। সেই জন্তই আমাদের ঋষিগণের ব্যবস্থায় মধ্যে মধ্যে উপবাস বিধিটা এক প্রকার ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ পরিগণিত হইয়াছিল। আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ উপন্তাস-লেখক লিখিয়াছিলেন—"আমার চতুর্দ্দিকে যখন

চাহিয়া দেখি, দেখিতে পাই পরিচিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই অসুস্থ।" সিনক্লেয়ার (Mr. upton Sinclair) সাহেবের কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, আজকালের উচ্চ সভ্যতাভিমানী নরসমাজের দশভাগের নয়ভাগ যে যথার্থ সুস্থ নহেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাল্যের সেই উদ্দাম চঞ্চল সবল স্বাস্থ্য আমরা যৌবনেই হারাইয়া ফেলি। যথার্থ যৌবনের পরিপূর্ণ বলদৃপ্ত স্বাস্থ্যের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেই না বলিলে চলে, পরিচয় ত' দূরের কথা! এরূপ হইবার কারণ কি?

আজ দশ বৎসর ধরিয়া সিনক্লেয়ার সাহেব তাঁহার নিজের ও পরিচিতগণের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এতদিনে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি এ অসুস্থতার কারণ ও প্রতীকার উভয়ই আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে যতদূর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে বুঝিয়াছেন যে "পোড়া পেট"-ই-যত অনিষ্টের মূল। কথাটা যে কেবল তাঁহারই সম্বন্ধে সত্য তাহা নহে—আমাদের অধিকাংশ অসুস্থতারই কারণ ঐ 'পোড়া পেট'।

ফ্লেচার নামে এক সাহেব (Mr. Horace Fletcher) বহুদিন অজীর্ণ রোগে পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সকলেরই খাদ্যকে এরূপ চিবাইয়া খাওয়া উচিত যে প্রত্যেক গ্রাস হইতে আমরা যথা সম্ভব সারাংশ লাভ করিতে পারি, এবং প্রত্যেকের যথার্থ আবশ্যকের অধিক কোন মতেই আহার করা কর্ত্তব্য নহে। এই নীতির অনুসরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক নীরোগ হইয়াছেন ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছেন। ফ্লেচার সাহেবের নীতির অনুসরণ করিয়া সিনক্লেয়ার বিশেষ উপকার না পাইলেও, উক্ত উপদেশেই আহারের প্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি পড়ে। যাহা হউক এ উপায়ে তিনি বিশেষ কোন ফললাভ না করিয়া অধ্যাপক মেচনিকফের পথ অনুসরণ করিলেন। মেচনিককের মতে কেবল শুষ্ক রুটি ও দধি বা ঘোল খাইয়া থাকিলে আমরা সকলেই এক শত কুড়ি বৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পারি। ইহা হইতে সিনক্লেয়ার বুঝিলেন যে অজীর্ণ খাদ্যাংশ আমাদের অন্ত্রমধ্যে থাকিয়া নানা প্রকার বিষাক্ত বীজের উৎপত্তি সাধন করে, এবং সেইগুলি রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা প্রকার রোগকে প্রসব করে। তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার স্বাভাবিক সুস্থাবস্থাতে অন্ত্রস্থ পদার্থের এক আউন্সের মধ্যে প্রায় ছয় কোটি বিষাক্ত বীজ রহিয়াছে, এবং একদিন অসুস্থ বোধ হওয়ায় দেখিলেন বীজাণু সংখ্যা প্রায় ১২০ কোটি হইয়াছে।

নানা প্রকার ঔষধ সেবন ও বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার সাময়িক উপকার হইল মাত্র, স্থায়ী ফল কিছুই হইল না। তিনি বুঝিলেন যে অধিক আহার হইতেছে নিশ্চয়, কিন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তি না হইলেই বা আহার বন্ধ করেন কি করিয়া? তবু তিনি অধিকাংশ লোকের অপেক্ষা অল্পাহারী ছিলেন। এইরূপ অবস্থায় দিন কাটিতেছে, এমন সময়ে একদিন এক মহিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল—মহিলাটির উজ্জ্বলবর্ণ ও অসাধারণ স্বাস্থ্য দেখিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করে। তিনি সেই মহিলার ইতিহাস সংগ্রহ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে দশ পনের বৎসর তিনি এত অসুস্থ ছিলেন যে প্রায়ই শয্যাগতা থাকিতেন। তাঁহার সন্তানাদি হইয়াছিল বটে এবং সংসার ধর্ম্মও করিতে হইত সত্য, কিন্তু দেহটি রোগের আধার হইয়া উঠিয়াছিল। রক্তহীনতা, দৌর্ব্বল্য, ভয়ঙ্কর বাত ইত্যাদি পাঁচ সাতটি রোগ আসিয়া নিতান্ত আত্মীয় ভাবে তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া ভয়ঙ্কর ঝড় দুর্য্যোগের রাত্রে পার্ব্বত্য প্রদেশের উপর দিয়া তাঁহাকে আটাশ মাইল যাইতে হয়। ইহার পূর্ব্বে চারি দিন তিনি সম্পূর্ণ উপবাসী ছিলেন। এই উপবাসের ও শ্রমের ফলে তিনি দেখিলেন তাঁহার সকল রোগ সহসা পলাইয়া গেল।

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সিনক্লেয়ার নিজে উপবাস করিয়া পরীক্ষা করিলেন। প্রথম দিন ভয়ঙ্কর ক্ষুধা বোধ হইল—অজীর্ণ রোগীদের যে একটা রাক্ষুসে বৃথা ক্ষুধা হয় ইহা অনেকটা সেই রকম। দ্বিতীয়

দিন প্রাতেও কিছু ক্ষুধা বোধ হইল, কিন্তু তাহার পরে আর ক্ষুধাবোধ হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে এক সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া ছিল, দ্বিতীয় দিনেই তাহা অদৃশ্য হইল। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে একটা দুর্ব্বলতা ও জড়তার ভাব দেখা দিল বটে, কিন্তু মনটা যেন খুব পরিষ্কার ও সতেজ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পঞ্চম দিনের পর তাঁহার অনেকটা সবল বোধ হইল। সেদিন বেশ বেড়াইয়া আসিলেন ও অনেকটা লিখিয়া ফেলিলেন। দ্বাদশ দিনের পর তিনি উপবাস ভঙ্গ করিলেন। প্রথমে একটু কমলালেবুর রস খাইয়া পরে ঘন ঘন প্রচুর দুগ্ধপান করিতে লাগিলেন। সেইদিন জীবনে যেন সর্ব্বপ্রথম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করিলেন। মনের শক্তিও যেমন তীক্ষ্ণ বোধ হইতে লাগিল, শারীরিক শ্রমের জন্যও সেইরূপ একটা প্রবল ইচ্ছা জন্মিতে লাগিল। সিন্‌ক্লেয়ার বলেন উপবাস যে কেবল আমাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক শক্তির জন্য আবশ্যক তাহা নহে, ইহার দ্বারা অনন্ত যৌবন লাভ করা যায়।

এরূপে উপবাস করিতে হইলে কিন্তু দুইটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্রথম মনটাকে ভীত হইতে দিলে চলিবে না। চতুর্দ্দিকে এরূপ আত্মীয় রাখা কর্ত্তব্য নহে, যাহারা সর্ব্বদাই সশঙ্ক চিত্তে বলিতে থাকিবে "ওমা এ রকম ক'রে উপবাস করে যে একেবারে মারা যাবে; এই ক'দিনেই শরীর একেবারে দড়ি হয়ে গেছে ইত্যাদি।" দ্বিতীয়তঃ উপবাস ভঙ্গের পরে প্রথম আহারের বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্রথমে কেবল প্রচুর দুগ্ধ পান করাই কর্ত্তব্য। আধ ঘণ্টা অন্তর এক গ্লাস করিয়া দুগ্ধপান করিলে আর ক্ষুধায় কোনও কষ্ট হইবে না এবং জীর্ণদেহ দেখিতে দেখিতে স্বাস্থ্যপূর্ণ সুগঠিত আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিবে।

চিকিৎসকগণের মতে শিশু, বালক বা বৃদ্ধের এরূপ উপবাস কর্ত্তব্য নহে। তদ্ভিন্ন যে সকল যুবক যুবতীর দেহে উপবাস হেতু দৌর্ব্বল্য প্রভাবে নানা প্রকার মূর্চ্ছা ও মোহ আসিয়া উপস্থিত হইবে—তাহাদিগকেও কিছু কিছু আহার্য্য দান করা আবশ্যক। কিন্তু সকলেরই পক্ষে যথেষ্ট জলপান করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহার দ্বারা দেহের সমল অংশগুলি ধৌত হইয়া বাহির হইয়া যায়। প্রকৃতিগত কোষ্ঠ-বদ্ধতা জনিত পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এরূপে উপবাস করা বিশেষ বিপজ্জনক। অজীর্ণ রোগীদের পক্ষেও প্রথমে অজীর্ণের কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা দূর করা আবশ্যক। তাহাতেও যদি আরোগ্য না হয়, তখন উপবাসনীতি অবলম্বন করিয়া দেখা যাইতে পারে।

নারীসৌন্দর্য্য।

আজকাল য়ুরোপে এক দলের মতে নারী বুদ্ধিমতী হইলেই তাহার সৌন্দর্য্যের অভাব হইয়া থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এতদিনে এই পুরাতন রহস্যের উত্তর বাহির করিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহাদের মতে চিন্তা একটা প্রবল, সৃষ্টিকারী ও ধ্বংসকারী শক্তি। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা মস্তিষ্কে উৎপন্ন হইয়া মুখে আসিয়া আপন প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। নারীরা যখনই কোন চিন্তা করেন তখনই তাঁহার মুখের সৌন্দর্য্যরেখা গভীর চিন্তা রেখায় পরিণত হয়। রূপ জিনিষটা নিশ্চিন্ত এবং চিন্তাহীনতাও নিষ্ক্রিয়তা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুন্দরী নারী নিদ্রাগতা হইলে মদনদেব রং ও তুলি লইয়া তাহার শিয়রে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ধীরে ধীরে তাহার মুখে সৌন্দর্য্য বিধান করেন। অবশেষে নিদ্রাভঙ্গে দেখা যায় সুন্দরীর রূপ চতুর্দ্দিকে উছলিয়া পড়িতেছে! জর্ম্মান দার্শনিক (Karl Von Hegelmann) এই দলের প্রধান। তবে, সুন্দরী নারীমাত্রেই মস্তিষ্কের শক্তিবিহীন—একথা অবশ্য তাঁহারা বলেন না। কেননা—একতরফ

একটা ভুল কথা বলিলে কথাটা একেবারেই বাতুলের কথা দাঁড়াইত। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ইঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, অনেক স্থলে সুন্দরী নারীকেও শিক্ষা, বুদ্ধি ও ভাবরসে শ্রেষ্ঠ পুরুষের সমকক্ষ হইতে দেখা যায়। চিন্তার প্রভাব তাঁহাদের মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে পারে না।

ইঁহাদের মতের সমর্থন স্বরূপ ইহারা বলেন, ফরাসী সুন্দরী মনটিসর্পা (Marquise de Montespan) কেবল রূপের বলে সম্রাট লুইকে করতলগত রাখিয়াছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার কেবল দুইটি মাত্র চিন্তা ছিল—কি করিলে নিজের রূপ ও সম্রাটের কৃপা তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন। একটি সামান্য রসিকতা করিবার মত বুদ্ধি শক্তিও তাঁহার ছিল না। কিন্তু পরে যে নারী আসিয়া সম্রাটকে তাহার হস্তচ্যুত করিয়া এবং ত্রিশ বৎসর কাল ফ্রান্সের রাজ্ঞীরূপে একাধিপত্য করিয়াছিলেন, তিনি সুন্দরী নহেন—বুদ্ধিমতী।

এই দুইটি নারীর মধ্যে আকৃতির কি প্রভেদ। মনটেসর্পার রূপ অতি মধুর, অতি কোমল, উন্মাদকর—ভ্রু হইতে চিবুক পর্য্যন্ত নিখুঁত, নিটোল, সুন্দর! আর দ্বিতীয় নারীর কর্কশ ভাব, ক্ষুদ্র চক্ষু, দীর্ঘ বক্র নাসিকা, বৃহৎ নাসিকা রন্ধ্র এবং ওষ্ঠের গঠন দেখিলেই বুঝা যায় যে ইহার মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি ভরিয়া আছে। ইতিহাসের প্রসিদ্ধা সুন্দরীগণের উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন; রূপ গৌরবে অতুলনীয়া লেডি হ্যামিলটনের ন্যায় অশিক্ষিতা ও বুদ্ধিহীন নারী খুব অল্পই দেখা যায়। সামান্য নীচ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া এই নারী এক স্থানে দাসীর কর্ম্ম করিতেন। তাহার পরে এক পান্থশালায় কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই স্থানে লণ্ডনের অভিনেতাগণ প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তথায় কিছুকাল যথেচ্ছভাবে কালাতিপাত করিয়া হ্যামিলটনকে মুগ্ধ করেন এবং হ্যামিলটন তাহাকে বিবাহ করিয়া রাজদরবারে আনয়ন করেন। যতক্ষণ "কিচির ভাষাতে" ততক্ষণ লেডি হ্যামিলটনকে দেখিলে সকলেই মুগ্ধ হইত।

উক্ত দলের মতে, ইতিহাসপ্রসিদ্ধা প্রায় সকল সুন্দরীরই ইতিহাস প্রায় এইরূপ। সর্ব্বজন স্বীকৃত বুদ্ধিমতী নারীর আলোচনা করিয়া তাঁহারা দেখাইতেছেন,—রোজা বনহুর (Rosa Bonheur) নামে একটি চিত্রকরনারীর বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ও প্রখর ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মুখে চিন্তা ও একাগ্রতার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইত। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার মুখের আকার ও ভাব ঠিক পুরুষের ন্যায় হইয়া আসিল। কবি এলিজাবেথ ব্রাউনিংও এইরূপ সৌন্দর্য্য গৌরবে বঞ্চিতা। ম্যাডাম কুরি (Curia) একজন বৈজ্ঞানিক প্রতিভাবতী নারী। রাসায়নিক তত্ত্বাবিষ্কারে তিনি আধুনিক জগতের একজন অগ্রগণ্য। তিনি ও তাঁহার স্বামীই রেডিয়াম আবিষ্কার করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে প্রদর্শন করেন। তাঁহার মুখের প্রতি রেখায় বুদ্ধি উছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্নই নাই।

ইতিহাস প্রসিদ্ধা চারিটি রাজ্ঞীর সম্বন্ধে তাঁহারা বলিতেছেন, কেথেরাইন ডি মেডিসির (Catherine de Medici) কূট রাজনীতি-কৌশলে ও শাসন কর্ত্তৃত্বে অসাধারণ প্রতিভা ছিল; কেথেরাইন অফ্ রাসিয়াও কূট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; ইংলণ্ডের এলিজাবেথ অসম্ভব বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং অষ্ট্রিয়ার মেরিয়া থেরেসা (Maria Theresa) রাজ্যগঠনে ও তত্ত্বাবধারণে ইয়ুরোপের অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু ইহাদের কেহই সুন্দরী ছিলেন না।

উপন্যাসলেখিকা জর্জ্জ এলিয়ট, জর্জ্জ স্যাণ্ড, শার্লট ব্রণ্ট ইঁহারাও রূপের ধার ধারিতেন না।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পক্ষপাতী সম্প্রদায় বিশেষের মত। অপক্ষপাত ভাবে দেখিলে এ মতের সমর্থন করা অসম্ভব। বুদ্ধি বা চিন্তার সহিত যে সৌন্দর্য্যের কোন জন্মগত বিরোধ আছে, ইহার প্রমাণ আমরা আজিও পাই নাই। মস্তিষ্কক্রিয়ার বিকাশ হইলেই যে অঙ্গ সৌষ্ঠবের ব্যাঘাত বা বিকৃতি জন্মিবে, দেহতত্ত্বে এরূপ কোন কথা আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। বরংচ আমাদের বিশ্বাস বুদ্ধিমতী হইলে কুরূপা নারীকেও সুরূপা দেখায়, বুদ্ধির এমনি উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য। পুরাকাল

অপেক্ষা আধুনিক জনসমাজে নারীগণ সাধারণ ভাবে যে অধিক মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই জন্য নারীসৌন্দর্য্য কি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে? উপযুক্ত বিচারকগণের মতে বরং তাহার বিপরীত। আমাদের অপেক্ষা ভাস্কর ও চিত্রকরগণই নারীসৌন্দর্য্যের তুলনায় অধিক সক্ষম। ইয়ুরোপের প্রসিদ্ধ কলাবিদ্‌গণের মতে সকল বস্তুই ধীরে ধীরে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, নারীর রূপও দিন দিন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। প্রবন্ধকার যেমন গুটিকয়েক রূপহীনা নারীর উল্লেখ করিয়াছেন, আমরাও শত শত রমণী রত্নের উল্লেখ করিতে পারি যাঁহারা রূপে ও গুণে জনসমাজের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। হিন্দুভারতে বিদুষী নারীর অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁহারা কেহই কুরূপা ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুসলমানের রাজত্বকালেও যাঁহারা বিদুষী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশেরই সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি ছিল। আধুনিক কালেও সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তবে সৌন্দর্য্য জিনিষটা সুলভ কোন দিনই নহে। কিন্তু সৌন্দর্য্য থাকিলে মস্তিষ্ক শক্তির বিকাশের দ্বারা তাহা বৃদ্ধি পায় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস এবং ফলেও কোন বৈলক্ষণ্য দেখি না। তবে কুবুদ্ধিতে শ্রী নষ্ট হয় একথা আমরা মানি,—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত,—কেথারাইন ডি মডিচিকে তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে

স্নেহের নিরীখ্।

(ক্যাপ্‌লন্)

কাঁটায় তুলে তৌল্ করে মহাজনের মাল,
নিখ্‌তি ক'রে সোনার ওজন জানে ;
ব্যাভারে পাপ ঢুক্‌লে পরে দেখ্‌ছি চিরকাল
আইন বহির নিরীখ্ লোকে মানে।
কিন্তু তোরা জানিস্ কিগো ?
বল্‌তে পারিস্ মোরে ?
পেয়ে কোলে প্রথম ছেলে
(ম'রে আবার বেঁচে)
মা হওয়ার যে নূতন সুখে
মায়ের পরাণ ভরে,—
সে ধন ওজন করার নিরীখ্-নিখ্‌তি
কোথায় আছে ?

খোকার আগমনী।

(ক্যাপ্‌লন্)

রামধনুকের রঙীন্ সাঁকো দিয়ে
নাম্‌ল কেগো সটান্ স্বর্গ থেকে !
মুখে মুঠায় সোহাগ-সুধা নিয়ে
উজল চোখে স্নেহের কাজল এঁকে !

এগিয়ে তারে আন্ দেবতা কত,—
কতই পরী নাইক লেখাজোখা !
পথ চেয়ে তার রয়েছে লোক যত ;
বাছনি ! আনন্দ-দুলাল ! খোকা !

'অমৃতং বালভাষিতং'।

(ক্যাপ্‌লন্)

রাজার কথা অটল-সুগম্ভীর,
শাস্ত্র-কথা প্রশান্ত-উদার ;
ন্যায়ের কথা নিলয় সে যুক্তির,
শিশুর কথা ?—পুলক-পাথারে !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

যবদ্বীপে।

বর-বোদোরের ধ্বংসাবশেষ।

রবিবার—৯ ডিসেম্বর

বর-বোদোর ঃ—ইহা সহস্র বুদ্ধের মন্দির, এবং ইহার ধ্বংসাবশেষ বহু 'কিলোমেটার' (এক কিলোমেটার ৩২৮০ ফুটের কিছু অধিক) প্রসারিত ও প্রতিমাদিতে পূর্ণ। ফ্রান্স হইতে যখন যাত্রা করিলাম তখন হইতেই এই মন্দিরের অদ্ভুত নামে আমি আকৃষ্ট হই। আমার বোধ হয়, যবদ্বীপে যাইবার যদি আর কোন গুরুতর উদ্দেশ্য নাও থাকিত, তথাপি শুধু বর-বোদোর দেখিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি একবার যবদ্বীপ ঘুরিয়া আসিতাম।

প্রাতে পাঁচটার সময়, আমি জকৃজকর্ত্তা ছাড়িলাম। এই নগরটি একজন দেশীয় রাজার রাজধানী। হোটেলে থাকিয়া আমি যে জাঁকালো গাড়িটি ভাড়া করিয়াছিলাম (ভাড়ার মূল্য ১৪ ফ্লোরিন্, ২৮ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ৩০,৩৫ টাকা) উহা চার ঘোড়ার গাড়ী; সম্মুখে কোচ্‌মানের আসন,—পিছনে সহিসের। এই প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষে পৌছিতে ৩৬ কিলোমেটার পথ অতিক্রম করিতে হইবে।

এই পথটা কতকগুলি দেশীয় গ্রামের ("দেশা") মধ্য দিয়া গিয়াছে- গ্রামগুলি বেশ জীবন উদ্যমে পূর্ণ। অধিকাংশ গ্রামেই এক একটি বাজার আছে। বাজারে বহুলোকের সমাগম। সুচালিত দোকানগুলি প্রায়ই চীনেদের। বাজারের পথ প্রায় শূন্য দেখা যায় না—বহু লোক ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে। লোকের আকৃতি খাঁটি মালাই ছাঁচের—অনেকটা হিন্দু ছাঁচের কাছাকাছি। পুরুষদের ঘোর-নীল রঙের কাপড়, কোমরে কিরীচ। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই সুশ্রী; দেহের গঠন অতি চমৎকার, একপ্রকার নীল কাঁচুলীতে গাত্র আঁটা। বক্ষের উপরি ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অনাবৃত। প্রায়ই উহারা শিশু সন্তানকে একটা চাদরে বাঁধিয়া কটিদেশে বহন করে। সুন্দর-সুন্দর অনেক ছেলে মেয়ে একেবারে বিবস্ত্র হইয়া রাস্তায় ছুটাছুটি করিতেছে।

গ্রামের মধ্যে-মধ্যে, ধানের ক্ষেত, ইক্ষুর ক্ষেত। একটা চিনির কারখানা—সমস্ত সাদা—তাহা হইতে একটা উচ্চ ধূম নল উঠিয়াছে;—এই কারখানাটা দেখিয়া বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। কেননা, এ জিনিষটা নিতান্তই বিলাতী—এখানকার দৃশ্যের সহিত আদপে খাপ্ খায় না।

বর-বোদোরে পৌছিবার কিছু পূর্ব্বে, (Mendoet) মেণ্ডোয়েট্ নামক একটি মন্দির প্রথমেই দেখা গেল; কিন্তু এখন উহার মেরামৎ চলিতেছে;—ভারা- মঞ্চাদিতে মন্দিরটি এরূপ আচ্ছন্ন যে ভাল দেখা যায় না। অতি কষ্টে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোটো কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করা গেল; সেখানে একটি অতীব সুন্দর বুদ্ধ-মূর্ত্তি এবং তাহার তলদেশে বুদ্ধের আশীর্ব্বাদগ্রাহী, স্বাভাবিক মানুষ-প্রমাণ, দুইটি রাজকুমারের মূর্ত্তি অতি কষ্টে চিনিতে পারা গেল।

প্রথম দৃষ্টিতে বর-বোদোরের সমস্তটা

দেখিয়া মনে যেরূপ ধারণা হয় তাহা একটু নৈরাশ্যজনক; ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে অনেকেই একথা স্বীকার করিয়াছেন।* আমারও ধারণা তাঁহাদেরই মত'। মন্দিরের ফোটো-চিত্র দেখিলে মনে হয়, যেন মন্দিরটি বেশ অটুট অক্ষত, খুব উচ্চ, খুব জাঁকালো; আমি ত মূর্ত্তিগুলির উচ্চতা, সমস্ত স্মৃতিমন্দিরের উচ্চতা, বাস্তব অপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া কল্পনা করিয়াছিলাম। শোনা গিয়াছিল, সমস্ত মূর্ত্তি-আদি লইয়া উহার আয়তন তিন Kilometre। কিন্তু উহার বাস্তব উচ্চতা ও প্রশস্ততা এত কম দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। মন্দিরটি ৩৫ metre-এর অধিক উচ্চ নহে; দেখিলে মনে হয়, গুরুভারে অতীব ভারাক্রান্ত; সমস্তই ধ্বংসদশাপন্ন। মনুষ্যকৃত উৎকৃষ্ট আদর্শের অধিকাংশ স্থাপত্য-কীর্ত্তি দেখিয়া যে ধারণা হয়, এই মন্দিরের সমস্তটা একসঙ্গে দেখিলে, তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই মনে হয়।—বালু ভূমি-সমুত্থিত সেই প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দির "পিরামিড্," প্রথম দৃষ্টিতেই কেমন একটা তীব্র বিষাদের ভাব মনে আনিয়া দেয়; উহাদের প্রকাণ্ড গঠন, উহাদের সুস্পষ্ট নিশ্চলতা, উহাদের নিঃসঙ্গতা, উহাদের চতুর্দ্দিকস্থ মরুভূমি, কত কত শতাব্দী হইতে কবরস্থ রাজকুমারগণ—এই সমস্তই মৃত্যুর বিরাট-গম্ভীর মূর্ত্তি চিত্ত-পটে অঙ্কিত করিয়া দেয়;—সেই মৃত্যু, যাহা অনিবার্য্য, বিশ্বব্যাপী ও নিত্য; পিরামিডের পাশেই Sphinx মূর্ত্তি সমুত্থিত—যেন তাহার অস্তিত্বের প্রহেলিকা মানুষ সমাধান করিতে কখনই পারিবে না এইরূপ মনে মনে স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন চারিদিকে রহস্যময় উপহাস-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরতম স্মৃতিমন্দির সেই তাজমহল যাহা একজন মোগল সম্রাট তাঁহার প্রিয়তমা বেগমের স্মৃতির উদ্দেশে আগ্রার নিকটস্থ একটি চমৎকার উদ্যানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—সেই স্মৃতিমন্দির যাহা সর্ব্বতো-ভাবে সুন্দর, পুরাতন গ্রীসীয় শিল্পকলার হিসাবে সুন্দর, প্রাচ্যদেশীয় সৌন্দর্য্যের হিসাবে সুন্দর, প্রকাণ্ডতার হিসাবে সুন্দর, লঘুতার হিসাবে সুন্দর, শুভ্রতার হিসাবে সুন্দর, কবিতার হিসাবে সুন্দর।—ভারতের দক্ষিণ প্রদেশস্থ মদুরার মন্দিরও এক হিসাবে সুন্দর; উহা অতীব রহস্যময় কোন এক জাতিবিশেষের কোন এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কলারুচির প্রবল ও জটিল অভিব্যক্তি। বর-বোদোরের মধ্যে এই প্রকারের কোন সৌন্দর্য্যই আমি দেখিতে পাইলাম না।*

---

* শ্যামদেশীয় ক্যাম্বোজায়, অ্যাঙ্করের (Angkor) যে ধ্বংসাবশেষ আছে, বর-বোদরের পরে, সেই ধ্বংসাবশেষটি দেখিবার আমার সুযোগ ঘটে। প্রথম দৃষ্টিতেই উহার ছবিখানি আমার চিত্তপটে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়:—এই Angkor-Wat তিন-তলাবিশিষ্ট একটি বিশাল মন্দির, ধ্বংসদশা হইতে বেশ সুরক্ষিত; উহার অনেকগুলি চূড়া, অত্যুচ্চ সোপান-সমূহ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বারাণ্ডা, বারাণ্ডার দেয়ালে রামায়ণের প্রসিদ্ধ দৃশ্যগুলি খোদিত;—নর বানরের যুদ্ধ, ক্ষীর-সমুদ্রের তরঙ্গ-সংক্ষোভ। Angkor-Thon, Angkor-Wat-এর মত ততটা সুরক্ষিত নহে, কিন্তু বেশী জাঁকালো;—অরণ্যের দ্বারা আক্রান্ত ও কবলিত বলিলেও হয়। বিষাদময় বড় বড় তরুপুঞ্জের মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চূড়া দৃশ্যমান; চূড়ার চরিমুখে ব্রহ্মার প্রকাণ্ড সম্মিত

অনাবশ্যক কিন্তু অপরিহার্য্য—একজন পাণ্ডাকে সঙ্গে করিয়া আরও নিকট হইতে খুঁটিনাটিগুলি দেখিবার জন্য, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ৫টা চৌকোণা ছাদ, ন্যূনাধিক প্রসারিত—একটার উর্দ্ধে আর একটা উঠিয়াছে; প্রত্যেক ছাদের দেয়ালে কতকগুলি কুলুঙ্গি আছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বুদ্ধ-মূর্ত্তি, দুই দেয়ালের মধ্যে, প্রত্যেক ছাদ ঘুরিয়া এক একটা বারাণ্ডা গিয়াছে; সেই বারাণ্ডার প্রস্তর-গাত্রে উৎকীর্ণ সারি সারি মূর্ত্তি বরাবর চলিয়াছে। চারিটা চৌকোণা ছাদের উপরে, তিনটা চক্রাকার ছাদ; এই ছাদগুলি কিছু ছোটো, তাহাতে কতকগুলি গম্বুজের ভগ্নাবশেষ; সেই গম্বুজের মধ্যে ভগবানের মূর্ত্তিসমূহ; সকলের উপরে, একটা প্রকাণ্ড গম্বুজ (দাগোবা)।

সমগ্র মন্দির অপেক্ষ মন্দিরের খুঁটিনাটি কাজগুলি আরও বেশী দ্রষ্টব্য সন্দেহ নাই। নিকটে গিয়া ঐগুলি যত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেছি, ততই আমার দেখিবার আগ্রহ বাড়িতেছে। প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলির অবস্থা সব সমান নহে—কতকগুলি ভগ্ন ও কতকগুলি ভগ্নদশা হইতে বেশ সুরক্ষিত। যাই হোক, অধিকাংশ মূর্ত্তি অনেকটা ভাল অবস্থাতেই আছে। অনেকগুলির তক্ষণকার্য্য অতীব সূক্ষ্ম ও যথাযথ,—সমস্তই অকপট ধর্ম্মের ভাবে অনুপ্রাণিত। দো-তলার মূর্ত্তিগুলিতে বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে; তিন-তলায়, বুদ্ধের মহিমা ও চৌতলায়, যে সকল বৌদ্ধ রাজারা এই স্মৃতিমন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহাদের মহিমা পরিঘোষিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা, দ্বিতীয় ছাদের উৎকীর্ণ মূর্ত্তিগুলি —বিশেষতঃ বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচারের কতকগুলি দৃশ্য আমার ভাল লাগিয়াছে; বুদ্ধদেবের মস্তক কিরণ-মণ্ডলে ভূষিত; তিনি মৈত্রী সম্বন্ধে—সন্ন্যাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন; তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছে; উহারা অর্দ্ধনিমীলিত লোচনে আনন্দের উচ্ছ্বাসে, গুরুদেবের রসনা-নিঃসৃত অমৃত ধারা পান করিতেছে; উহাদের মুখে নিগূঢ় আনন্দের ভাব সুন্দররূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই তক্ষণ কার্য্যে শুধু শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পায় বলিলে যথেষ্ট হয় না,—উহা দৈবপ্রতিভার দ্বারা অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীয় ভক্তগণের অন্তঃকরণকে যে সকল সুন্দর ভাব-সম্পদে বিভূষিত করিয়াছেন,—উহা হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতার জাদুঘরে এইরূপ কতকগুলি বৌদ্ধ উৎকীর্ণ মূর্ত্তি,—বিশেষতঃ বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথ স্তূপ হইতে আনীত কতকগুলি উৎকীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার এইরূপ মনের ভাব হইয়াছিল; বিশেষত আমার সেই ক্ষুদ্র উৎকীর্ণ চিত্রটি মনে পড়ে—যাহাতে কতক-গুলি ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার সমীপে আসিয়াছে—তিনি প্রসন্নদৃষ্টিতে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন……

অধিকাংশ বৌদ্ধশিল্পীর ন্যায়, বর-বোদোরের শিল্পীরাও কতকগুলি জীবজন্তুর মূর্ত্তি অতি

মুখমণ্ডল; ঝোপ্‌ঝাড়ের মধ্য হইতে চূর্ণ-বিচূর্ণ প্রাসাদ, ভগ্ন সোপান ও প্রাচীর প্রভৃতি বাহির হইয়াছে। প্রাচীরের গায়ে, সারিবন্দি হস্তী প্রভৃতি (স্বাভাবিক উচ্চতার প্রমাণ) বৃহৎ মূর্ত্তিসমূহ খোদিত রহিয়াছে।

যন্ত্রের সহিত গড়িয়াছে:—হাতী, ঘোড়া, বানর, পাখী; জীবমাত্রেরই উপর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের যেরূপ দয়া—সেই উদার জীব-দয়ার দ্বারাই উহাদের শিল্প-চেষ্টা সকল অনুপ্রাণিত।

ভগবানের মূর্ত্তিগুলি, প্রায়ই লুপ্তাঙ্গ; কিন্তু তাহা সত্বেও, বেশ চিত্তাকর্ষক, স্মৃতি-মন্দিরের এক মুখভাগের মূর্ত্তিগুলি একই ধরণের, কিন্তু অন্য মুখভাগের মূর্ত্তিগুলিতে এক-একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেব যোগাসনে বসিয়া—দক্ষিণ হস্তের দ্বারা একটা সাংকেতিক ভঙ্গী করিতেছেন। কোথাও বা দুই হাত কাছাকাছি করিয়া ধ্যান করিতেছেন। কোথাও বা দক্ষিণ করতল উন্মুক্ত করিয়া উপদেশ দিতেছেন,—যেন মহাসত্য সকল তাঁহার রসনা হইতে নিঃসৃত হইতে উদ্যত; কোথাও বা, বাহু উত্তোলন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন; অবশেষে কোথাওবা, চমৎকার গূঢ় অর্থযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেছেন: পায়ের উপর হাত রহিয়াছে, ভিতরদিকে করতল অবনত, অঙ্গুলিগুলি অলসভাবে পড়িয়া আছে:—একটি গভীর বৌদ্ধভাব, মানব হৃদয়ের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা এইরূপ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে,—জীবনে বিরক্তি, একটা শান্তি ও আরামের ইচ্ছা, সেই চরম পরিণাম—নির্ব্বাণের আশা... আর সর্ব্বোচ্চ চূড়ার উপরে বৃহৎ গম্বুজের মধ্যে যে বুদ্ধমূর্ত্তি—উহা অসম্পূর্ণ গঠন,—যেন ইচ্ছা করিয়াই উহাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখা হইয়াছে: ভগবানের মূর্ত্তিকল্পনা করা মানবশক্তির অতীত, ইহাই প্রকাশ করিবার জন্যই কি মূর্ত্তিটির এই অসম্পূর্ণতা? ভগবানের সমক্ষে মানববুদ্ধির নম্রতা স্বীকার করাই কি ইহার সাঙ্কেতিক তাৎপর্য্য?

এইরূপ স্মৃতিমন্দির,—একটা ধর্ম্মের ভাব মনে গভীররূপে মুদ্রিত করিয়া দেয়। একটু অনুকূল ইচ্ছা ও সহানুভূতির কল্পনা থাকিলে আজিও এইরূপ ধর্ম্মের ভাব উপলব্ধি করা যায়। আভাস ইঙ্গিতের দ্বারাই শিল্পকলা কাজ করে: যেরূপ ছন্দ সঙ্গীত ও কবিতায় সেইরূপ বাস্তুশিল্পে, ইচ্ছা করিয়া একই মূল-কল্পনার ক্রমাগত আবৃত্তি করায়, মানুষের ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ যেন নিদ্রিত হইয়া পড়ে, এবং চৈতন্য কতকটা সম্মোহন-সুপ্তির অবস্থায় উপনীত হয়; তখন তাহার নিকট যে কোন ধর্ম্মভাবের আভাস ইঙ্গিত উপস্থিত করিবে তাহাই সে গ্রহণ করিবে। এই সকল একই প্রকারের বড় বড় বুদ্ধমূর্ত্তি, এবং প্রস্তরে উৎকীর্ণ বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া, ক্রমশ চিত্ত যেন একপ্রকার স্বাপ্নিক মোহের দ্বারা অভিভূত হয়। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বৌদ্ধভাব ক্রমশ প্রবেশ লাভ করে। সিংহলে কোন বুদ্ধমূর্ত্তিতে সন্ন্যাসের অঙ্গভঙ্গী প্রথম দেখিয়া যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এখানে দেখিয়া তাহা অপেক্ষা আরও মুগ্ধ হইয়াছি; আমি যেন এখন মানুষকে বেশী বুঝিতে পারিতেছি, বৌদ্ধনীতির গভীরতা আরও বেশী উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। যে সকল যাত্রী এই মন্দিরে আইসে,—ফিরিয়া যাইবার সময়, বৌদ্ধধর্ম্মের অপ্রতিম প্রভাবে তাহাদের বিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত হয়, অনিবার্য্য দুঃখকষ্টে তারা আরও ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারে, সর্ব্ব-

জীবের প্রতি আরও সহৃদয়তা প্রকাশ করিতে পারে।

অনেকগুলি খুঁটিনাটি কাজ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, বুদ্ধের বহুপরবর্ত্তী শিষ্যেরা এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করে। তাঁহার আবির্ভাব এবং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে এই কীর্ত্তি স্থাপন—এই দুয়ের মধ্যে বহুকালের ব্যবধান। কাল-ক্রমে ধর্ম্ম পুরোহিত-তন্ত্রের অধীন হইয়া পড়িয়াছে; বর-বোদোরের এই ধর্ম্ম-কীর্ত্তি, এক্ষণে পৌরোহিতিক কীর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে সকল উৎকীর্ণ মূর্ত্তি, বুদ্ধের মানব-জীবন স্মরণ করাইয়া দেয় তাহার সংখ্যা কম এবং যে সকল দৃশ্যে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহারই সংখ্যা সমধিক। বুদ্ধ-জীবনের অনুকরণের গৌরব ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে, তাহার স্থলে বুদ্ধরূপ ভগবানের নাম কীর্ত্তনের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুরোহিত সম্প্রদায়, এই কীর্ত্তির মধ্যে আভিজাত্যের ভাব ও রাজকীয় ভাব আনিয়া ফেলিয়াছেন। সব মানুষই সমান—এই যে বৌদ্ধভাব, এই ভাবটি উহার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; যে সকল নৃপতি এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মূর্ত্তির সংখ্যা ও ভগবানের মূর্ত্তির সংখ্যা প্রায় সমান। আমাদের বর্ত্তমান ক্যাথলিক খৃষ্টসম্প্রদায়ও, যিনি দুঃখী জনের নিকট ও পতিতা রমণীদের নিকট প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই ন্যাজারেথের সূত্রধরের স্মৃতিরক্ষার জন্য যত না আগ্রহান্বিত, তদপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্মের একটা সর্ব্বশক্তিমান সমাজ সংগঠনের জন্য, খৃষ্টসমাজের মিত্রদিগের, মূলধনীদিগের, ও রাজাদিগের মহিমাকীর্ত্তনের জন্য অধিক লালায়িত···

হঠাৎ একটা ঝড় উঠায়, আমি এই ভগ্না-বশেষ হইতে পলাইয়া উহার সম্মুখস্থ একটি ক্ষুদ্র হোটেলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। প্রাতরাশের সময়, প্রাচীন হোটেল-কর্ত্তা আমাকে বলিলেন,—এই দশ বৎসরের পূর্ব্বে তিনি এখানে একটিও ফরাসী দেখেন নাই; আজ-কাল, প্রতিবৎসরেই ফরাসীরা বর-বোদোর দেখিতে আসেন; "ফরাসীরা নাকি ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন?"—এই কথা বৃদ্ধ ওলন্দাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভোজনের পর, আমি আবার বর-বোদোরে ফিরিয়া গেলাম—এবার আর সঙ্গে পাণ্ডা লইলাম না। পাণ্ডা সঙ্গে থাকিলে স্বাধীনতার বড়ই ব্যাঘাত হয়। সমস্ত এক সঙ্গে দেখিয়া যে মন্দিরে আমি নিরাশ হইয়াছিলাম, এক্ষণে সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি পৃথক্‌ভাবে দেখিয়া মন্দিরটি আমার ক্রমেই আরও ভাল লাগিতেছে।

এই বহুস্মৃতিপূর্ণ ভগ্নাবশেষের প্রতি আমার অন্তরে একটা অপূর্ব্ব সহানুভূতির ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া বেশ অনুভব করিতেছি। এই সকল অলিন্দের উৎকীর্ণ মূর্ত্তির মধ্যে একাকী বিচরণ করিয়া, সর্ব্বোচ্চ গম্বুজের চূড়া-দেশে আরোহণ করিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে। এখান হইতে, এই পরিত্যক্ত মন্দিরটির শোচনীয় জরাজীর্ণতা আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করা যায়। যবদ্বীপবাসীরা মুসলমান হইয়া গিয়া, তাহাদের পুরাতন ধর্ম্ম একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে। যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম

মৃত। উচ্চতম ধর্ম্মমতের উপরেও কালের জয়; প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমাদের খৃষ্টধর্ম্মও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে।

বর-বোদোরের উচ্চতম চূড়ায় বসিয়া, আমি ভাবিতেছি, য়ুরোপে কোন্ ধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবে; -অবশ্য এমন কোন ধর্ম্ম যাহা সত্যেতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানেতে শ্রেষ্ঠ, উদার বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, ন্যায়পরতায় শ্রেষ্ঠ, ভূতদয়ায় শ্রেষ্ঠ;—এমন কোন ধর্ম্ম যাহা বুদ্ধির অগম্য কেবল কতকগুলি দার্শনিক কথার সমষ্টি নহে, —যাহা কোন সংশয়পূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত নহে;—এমন কোন ধর্ম্ম যাহা জগৎসংসারকে স্বরূপত মন্দ বলিয়া বিবেচনা করে না, যাহা বিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে না, যাহা সৌন্দর্য্যকে অবজ্ঞা করে না, যাহা প্রেমের নিন্দা করে না, যাহা আনন্দকে দূষ্য মনে করে না, যাহা দেহমনের কষ্ট অপ্রতিবাদে সহ্য করে না; এমন কোন ধর্ম্ম, যাহা অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন সামাজিক অবস্থার পক্ষপাতী নহে—সামাজিক অবস্থায়, অতীব কঠোর শ্রম করিয়াও অধিকাংশ লোক জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না,—পক্ষান্তরে বিনাপরিশ্রমেও কতকগুলি লোক সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে;—এমন কোন ধর্ম্ম, যাহা কল্যাণকর বীর্য্যবান সমাজ বিপ্লবের বিরুদ্ধে অতিপার্থিব ললিত কোমল সুখের আশাকে দাঁড় করায় না, যাহা দুঃখময় মানবজীবনকে জঘন্য অনন্ত নরকের ভয় দেখাইয়া আরও তমসাচ্ছন্ন করে না... যে ধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবে, তাহা অনেকের মনে স্পষ্টাক্ষরে না থাকুক, কতকটা এখনি অস্পষ্ট অনুভূতির আকারে অবস্থিতি করিতেছে; ইহা সেই জ্ঞান মূলক মৈত্রী ও সখ্যতার গূঢ় ভাব যাহা আমাদের শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে পরস্পরের সন্নিকর্ষে আনিতেছে। সেই ধর্ম্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীমতা প্রতিপাদন করে; সেই ধর্ম্ম, মানুষের অসীম ব্যক্তিত্বকে জ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা অনন্তগুণে প্রসারিত করিতে বলে; সেই ধর্ম্ম, জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়, শিল্পকলার দ্বারা সমস্ত বাস্তবকে উপলব্ধি করায়, বিশেষতঃ প্রেমের দ্বারা সৌন্দর্য্যজনিত মুক্ত আনন্দের আস্বাদ প্রদান করে—সেই প্রেম সর্ব্বমনুষ্যের প্রতি প্রেম, সর্ব্বজীবের প্রতি প্রেম, সর্ব্বপদার্থের প্রতি প্রেম; সেই ধর্ম্ম ন্যায়পরতার দ্বারা, স্বাধীনতার শান্তিময় ঐক্যের দ্বারা, মানুষদিগের পরস্পরের মধ্যে মিল ঘটাইয়া দেয়; সেই ধর্ম্ম, সমস্ত মানবজীবনের—সমস্ত বিশ্বজীবনের শীর্ষদেশে সেই উদার আনন্দময় কর্ম্ম-চেষ্টাকে স্থাপন করে, যাহা দ্বারা মানুষ মানুষের মধ্যে ন্যায়ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, স্বকীয় প্রেম প্রকাশ করে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান বিস্তার করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবিধ।

প্রাচীন জগতে ভারতের প্রভাব।

কিছুকাল পূর্ব্বে লেকক্ (Lecoq) নামে এক ব্যক্তি মধ্য আসিয়ার তারফান (Tarfan) নগরে কতকগুলি সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কৃত করেন। সেদিন এক জর্ম্মাণ পণ্ডিত (Herr Lueden) নাকি সেগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেখিয়াছেন, সেগুলি কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নির্ব্বাচিত দৃশ্যের অনুলিপি। এই সকল নাটকের এক এক খানি ২০০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। কিন্তু ইহাতে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। ভারতের সভ্যতা যে ২৫০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা পাইয়া থাকি। তবে এই আবিষ্কারের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই প্রাচীন যুগের হিন্দু সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাব কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আসিয়া মহাদেশের সকল স্থানেই তাহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা আজ সেই হিন্দুসন্তান, এ কথা মনে করিলেও চক্ষে জল আসে।

হিন্দুর শাস্ত্র ও সামাজিক সংস্কার।

আধুনিক হিন্দু রীতিনীতি সম্বন্ধে শাস্ত্রের মতামত জানিবার জন্য কিছুদিন হইল বরোদার মহারাজা মহীশূরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রীকে স্বরাজ্যে আহ্বান করেন। আজকাল ভারতে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিরল। বহু অনুসন্ধানের পর তিনি স্থির করিয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান সমাজে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পুরুষ বা নারী, ধনী বা দরিদ্র বা শূদ্র সকলেরই আপনাদের নৈতিক, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার তুল্য অধিকার আছে। আজকালের জাতিভেদের কঠিন নিগড় সমাজের এ অধঃপতিত অবস্থারই উপযুক্ত,—শ্রুতিতে তাহার কোন উল্লেখই নাই।

আমাদের দেশের সংস্কারবিরোধীর দল বর্ত্তমান দুর্নীতিগুলির সমর্থনকালে সদা সর্ব্বদা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন। মহাদেব শাস্ত্রী সেই শাস্ত্র হইতেই প্রমাণ করিতেছেন যে, সেগুলি যে কেবল শাস্ত্রানুমোদিত নহে তাহা নহে—অধিকন্তু সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। শাস্ত্র হইতেই তিনি প্রতিপন্ন করিতেছেন; আমরা সকলেই একজাতির অন্তর্গত, অর্থাৎ আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ। একদিন আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলাম। কালে দিন দিন আমরা বেদের উচ্চ আদর্শ যতই বিস্মৃত হইতে লাগিলাম, ততই ক্রমে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান অসংখ্য জাতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। বিভিন্ন উপজীবিকার ফলেই এইরূপ ঘটিল। আজকাল আমরা এক পরিবারের পাঁচ জন যেরূপ বিভিন্ন প্রকার উপজীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকি, সেকালেও আর্য্যগণের মধ্যে তাহাই ঘটিত। এই কর্ম্মস্বাতন্ত্র্যের ফলে ক্রমে তাহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটিল। প্রথম প্রথম এই বিচ্ছেদের ফলে কোনও মনুষ্য অনন্তকালের জন্য আপন পদের উন্নতি বিধানে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইত না। ক্রমে আমাদের স্বার্থ ও সংকীর্ণতা শূদ্র ও শূদ্রবেষী দলের সৃষ্টি করিল। তৎসত্ত্বেও সেকালে নিষ্ঠাবান ও শুদ্ধাত্মা ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণ করিতেন—এমন কি সে খাদ্য দেবকর্ম্মে পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত পক্ষে তৎকালে রন্ধন ও অন্যান্য গৃহকর্ম্ম শূদ্রের দ্বারাই সম্পন্ন হইত।

উত্তরকালে এ সকল কর্ম্ম যখন শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল, তাহাদের কর্ম্মভার নারীদের স্কন্ধে আসিয়া

পড়িল। এই শূদ্র বিদ্বেষের ফলে আমাদের পুর-নারীগণকে—জননী, ভগিনী, পত্নীকে—আমরা শূদ্রে পরিণত করিলাম। আজিও তাঁহারা সেই শূদ্রই রহিয়াছেন এবং আমরা সগর্ব্বে তাঁহাদের এই অবস্থার সমর্থন করিতেছি।

বৈদিক যুগে যে কোন শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিত এবং যে কোন নারী ইচ্ছামত বিবাহিতা হইতে বা অবিবাহিতা থাকিতে পারিতেন। শ্রুতিতে কন্যা-দানের জ্ঞাপক কোন কথাটি পর্য্যন্ত নাই।

জীবনকে যথার্থ ধর্ম্মপথে অতিবাহিত করাই প্রত্যেক আর্য্যের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। আপনাকে এই উচ্চ আদর্শে গঠিত করিলে তাহার মনে আর শূদ্র বিদ্বেষ থাকে না বা নারীকে আর সে আপনার ভোগের বা সেবার যন্ত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না।

জীবনকে এইরূপে গঠিত করিতে হইলে প্রত্যে-কেরই যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইবার, ব্রহ্মের সহিত লীন হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যের তিনটি অবস্থা উত্তীর্ণ সহকারে তাহার তিনটি ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক; (১) ধর্ম্মোদ্দেশে সন্তান সৃষ্টি করিয়া পিতৃঋণ; (২) উপার্জ্জিত বিদ্যা বিতরণ করিয়া ঋষিঋণ; (৩) আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া দেবঋণ।

তাহার পর তিনটি জন্মলাভ করা আবশ্যক—(১) মাতৃগর্ভে; (২) উপনয়নে অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভে; (৩) সোমযাগ দীক্ষায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর মনুষ্যমাত্রেই এই ব্রাহ্মণত্ব লাভে অধিকারী।

প্রায় পঁচিশ বৎসর শাস্ত্রানুসন্ধান করিয়া মহাদেব শাস্ত্রী এই রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আর আমরা রঘুবংশের মল্লিনাথের টীকা পাতা কতক মুখস্থ করিয়াও গোঁফ হারাইলেও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকি। আর্য্যসন্তানের এ অন্ধতা আর থাকিবে কত দিন!

বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদ।*

প্যারীচাঁদ যখন মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় লেখনী ধারণ করেন, তখন বঙ্গদেশে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা প্রচলিত ছিল, একটী লিখিবার ভাষা অর্থাৎ সাধুভাষা অপরটী কথোপকথনের ভাষা বা চলিত ভাষা। তৎকালে পদ্যগ্রন্থ রচনায় সংস্কৃত মূলক সাধু ভাষাই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু উহা সহজে সাধারণের বোধগম্য হইত না। তৎসময়ে বাঙ্গালা গদ্য রচনাও নিতান্ত দীন ভাবাপন্ন ছিল। যাহারা ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশের সহিত বাঙ্গালা ভাষার কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে একটী ভাষা বলিয়া গণনার মধ্যে আনিতেন না। দু'দশজন লোক যদি বা দুই একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতেন, কিন্তু বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাদের মনে কোনরূপ আগ্রহ জন্মিত না। আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধময় কূপোদকের ন্যায় বঙ্গভাষাও তৎকালে পীড়াদায়ক ও অরুচিকর বোধে ইংরাজী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইত।

বঙ্গভূমির ক্ষণজন্মা সুসন্তান মহাত্মা রাম-মোহনরায়ের যত্নে বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ

* কিছুকাল হইল এই প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে লেখককর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

সাধনের সূচনা হইলেও তৎকালে জনসাধারণের রুচি প্রবৃত্তির কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। কিন্তু একথা অবশ্যই মানিতে হইবে যে এই মহাত্মার সময় হইতেই বঙ্গভাষা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনের কিছুকাল পরে পণ্ডিতাগ্রগণ্য দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনে বঙ্গসাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হন। পণ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্ত একজন চিন্তাশীল লেখক ছিলেন; তাঁহার সুনাম শিক্ষিত সমাজে শীঘ্রই প্রচারিত হইয়াছিল। এই সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি ক্রমান্বয়ে দ্বাদশবৎসরকাল দক্ষতার সহিত উহার পরিচালন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার গভীর চিন্তাপূর্ণ বিবিধ ধর্ম্মনৈতিক প্রবন্ধে উক্ত পত্রিকা সুশোভিত হইয়া বঙ্গভাষার বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে তৎকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ন্যায় একখানি ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকার পাঠকসংখ্যা অতি অল্পই ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও কথঞ্চিৎ প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া পাঠকগণের রুচি উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন প্যারীচাঁদ উল্লিখিত মহাত্মাদ্বয়ের রচিত গ্রন্থের ভাষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ইংরাজি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ক্যালকাটা রিভিউ, বেঙ্গল হরকরা ও হিন্দু পেট্রিয়ট্ প্রভৃতি নানা ইংরাজি পত্রে তিনি বিস্তর সার-গর্ভ প্রবন্ধ লিখিতেন। তৎপ্রণীত কতিপয় ইংরাজীগ্রন্থ হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার সমসাময়িক লেখকদিগের ন্যায় আজীবন ইংরাজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইতে পারিতেন। কিন্তু সহৃদয় প্যারীচাঁদ সেই প্রশংসা লাভের জন্যে ব্যাকুল হন নাই। মাতৃভাষার দুর্গতি



ও বঙ্গসাহিত্যের দীনতা দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ রচনা কিছুমাত্র সম্মান বা গৌরবের বিষয় না হইলেও তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে মাতৃভাষার পরিচর্য্যায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা যে কত

সুখের ও কত গৌরবের বিষয় তাহা তিনি প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এ জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে অভিনব প্রাণ, নবীন আলোক ও নূতন মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়া উহার প্রকৃত উন্নতির পথ প্রসারণে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তিনি তদীয় বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহিত তৎকালের উপযোগী সহজ চলিত ভাষায় লিখিত বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ পূর্ণ একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উহার নাম "মাসিক পত্রিকা" দিয়া তিনি স্বয়ং উহাতে নিয়মিত রূপে লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন যে তাঁহার অবলম্বিত ভাষা সংস্কৃতমূলক সাধুভাষাপ্রিয়-পণ্ডিত ও লেখকদিগের অনুরাগ আকর্ষণে সক্ষম হইবে না; পক্ষান্তরে অনেক সংস্কৃতাভিমানী ব্যক্তি উহার তীব্র সমালোচনা করিবেন। তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। পত্রিকার শীর্ষস্থানে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন লিখিত থাকিত;—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে। যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকলের রচনা হইবে। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে না।"

উল্লিখিত কৈফিয়েৎ দিয়া তিনি কথোপকথনের ভাষায় প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পত্রিকার প্রথম খণ্ড হইতেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "আলালের ঘরের দুলাল" নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এস্থলে একথা উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবে না যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার শিক্ষা, চিন্তা ও সাধনায় প্রিয় সহচরী করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান ছিলেন। বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীগণের সুশিক্ষা বিধান ও শিক্ষার সহায়তা করা উক্ত মাসিক পত্র প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

মাসিকপত্র প্রকাশের কিছুকাল পরেই প্যারীচাঁদ স্বীয় নামের পরিবর্ত্তে "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই কল্পিত নাম দিয়া "আলালের ঘরের দুলাল" "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়," "রামা রঞ্জিকা," "যৎকিঞ্চিৎ", "অভেদী" প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকারের পর উষার মধুর আলোক যেমন পথভ্রান্ত পথিককে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করে, মহাত্মা প্যারীচাঁদের প্রবর্ত্তিত তরল অথচ আবেগময়ী ভাষা তেমনই সন্দেহাকুল সাহিত্য-সেবিগণের সম্মুখে নূতন আলোক আনিয়া তাঁহাদের গন্তব্যপথ অবধারণে বিশেষ সহায়তা দান করিল। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃতাভিমানী বিজ্ঞপণ্ডিতগণের অবলম্বিত কর্কশ ভাষা এবং মহাত্মা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় প্রমুখ লেখকগণের অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিমার্জ্জিত ভাষা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন রুচির পাঠক, লেখক ও সমালোচকগণের মধ্যে বিষম মতভেদ ও বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। কত সমালোচনা, কত উপহাস কত শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপ স্রোতের ন্যায় অবাধে চলিয়াছিল, কিন্তু কোন পক্ষই সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই সময় "আলালের ঘরের দুলালের" আড়ম্বর

বিহীন ও কঠোরতা পরিশূন্য সহজ চলিত ভাষা স্বচ্ছন্দ বিহারিণী তরঙ্গিনীর ন্যায় তরতর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের অভিনব শোভা ও উন্নতি সম্বর্দ্ধন করিতেছে দেখিয়া একদল ইংরাজী শিক্ষিত লোক উহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। অন্যদিকে প্রবীণ সুবিজ্ঞ পণ্ডিতের দল উহা গাম্ভীর্য্য-বিহীন, নিতান্ত তরল ও গ্রাম্য ভাষা বলিয়া উহার অসারতা প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রাচীনতন্ত্রের সহিত নব্যতন্ত্রের ঘোরতর মতভেদ ও বিবাদ বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্যারীচাঁদ প্রবর্ত্তিত নূতন ভঙ্গিমাবিশিষ্ট সহজ ভাষার প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে অনেকে পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে প্যারীচাঁদের অবরোধমুক্ত সরলভাষা বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধন ও সম্পদবদ্ধনে এক নূতন যুগ আনয়ন করিল। প্যারীচাঁদের স্বচ্ছন্দ বিহারিণী আবেগময়ী ভাষার প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখিয়া কতকগুলি সংস্কৃতা-ভিমানী পণ্ডিত তাঁহার উপর তীব্র সমা-লোচনার বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে সোমপ্রকাশের সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তৎপ্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" প্যারীচাঁদ প্রবর্ত্তিত ভাষার "আলালী ভাষা" এই নাম দিয়া উহার বিস্তৃতরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদর্শন করিতেছি।

"আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতুম পেঁচার নক্সা, বল, আর মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ অনুভব করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই ওসকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জা-জনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে—ঐ ভাষাতে কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতেও লজ্জা বোধ হয়।"

অন্যত্র,—

"আলালী ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কিনা? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাড়া মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক। ফল কথা এই যে পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানাপ্রকার।"

কোন কোন সমালোচক "আলালী' ভাষার প্রতি নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরক্ষণেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে উহা বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তনে অনেকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে।" বস্তুতঃ উক্ত ভাষার যিনি যতই দোষ বাহির ও নিন্দাবাদ করুন না কেন, তাঁহাকে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্যারীচাঁদ বঙ্গভাষাকে কঠিন অবরোধ উন্মোচন

পূর্ব্বক সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত গণ্ডির বাহিরে আনিয়া উহাতে নূতন প্রাণ ও অপূর্ব্ব আবেগ ঢালিয়া দিয়া জাতীয় সাহিত্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন। সেই স্বদেশপ্রেমিক বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন যে প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যসন্তানগণের প্রতিভা ও সুকৃতির বিশালক্ষেত্র বঙ্গভূমি আহারে,বিহারে, আচারে ব্যবহারে আমোদে প্রমোদে, শিক্ষায় দীক্ষায়, সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক, সকল বিষয়ে যেরূপ বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ও স্বেচ্ছাচার-সম্মত কদর্য্য রীতিনীতি ও প্রথায় পরিপ্লাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সংশোধন না হইলে এদেশের শোচনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হইবে। তিনি ইহাও জানিতেন যে চলিতভাষায় সহজ কথায় সরলভাবে লিখিত হাস্য ও করুণরসোদ্দীপক প্রবন্ধ সহজেই জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক ও প্রীতিপ্রদ হইবে, এবং উক্তরূপ প্রবন্ধের বহুল প্রচারে বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ও তৎসঙ্গে বঙ্গভূমির বিস্তর কল্যাণ সাধিত হইবে।

অল্পদিনের মধ্যেই আলালের ঘরের দুলালের গৌরব বঙ্গদেশের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যে দেশে বর্ত্তমান সময়েও স্কুল বা কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন বিস্তর উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ অনাদরে উপেক্ষিত হয়, সেই দেশে এক সময়ে "আলালের ঘরের দুলালের" বিশেষ আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। তৎকালে এ দেশে যে সকল ভাগ্যবান পুরুষ "সুরসিক" বলিয়া পরিচিত ছিলেন, অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে যাঁহারা "রসিকচূড়ামণি" বলিয়া সম্মানিত হইতেন, ছাত্র সভায় বিবাহ বাসরে ও বরের আসরে বৈঠকখানায়, ও অন্যান্য প্রকাশ্য সম্মিলন স্থলে যাহারা রসাত্মক মধুমাখা কথার অবতারণা করিতে ভাল বাসিতেন, শুনিয়াছি "আলালের ঘরের দুলাল" এক সময়ে তাঁহাদের প্রধান উপভোগ্য ছিল; তদ্ভিন্ন সাধারণ পাঠকবর্গ এই গ্রন্থখানি বিশেষ অনুরাগ ভরে পাঠ করিতেন।

"আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হইবার পর দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে দুই প্রকার ভাষার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল—একটী বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাভিজ্ঞ লেখকগণের পরিমার্জ্জিত সাধুভাষা, অপরটী প্যারীচাঁদ প্রমুখ লেখকদিগের অবলম্বিত গ্রাম্য কথামিশ্রিত চলিত সরলভাষা। কোন ভাষা ভবিষ্যতে শিক্ষিত সমাজে বিজয়লাভ করিবে তৎসম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অন্তর দীর্ঘকাল গভীর সন্দেহে আন্দোলিত হইয়াছিল। দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া এই সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, উক্ত দুইপ্রকার ছাঁচের ভাষার সম্মিলনে একটী মিশ্র ভাষার উৎপত্তি হইবে; পরে তাহাই বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ আধিপত্য স্থাপন করিবে। এই মিশ্র ভাষা ব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গভূমির ক্ষণজন্মা সুসন্তান সুবিখ্যাত উপন্যাসলেখক স্বনামধন্য মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনিই ভক্ত শিষ্যের ন্যায় প্যারীচাঁদ প্রদর্শিত পথ আগ্রহের সহিত অবলম্বনে তৎপ্রবর্ত্তিত ভাষা অধিকতর পরিমাণে মার্জ্জিত, সুকোমল, শ্রুতিমধুর ও মনো-

মুগ্ধকর করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া উহার বিপুল গৌরব বর্দ্ধনে অমরতা লাভ করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবকালেও আলালীভাষা ও সাধুভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহা নিবারণের জন্য অনেকে অনেক প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী সুবিখ্যাত সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত জন্ বিম্‌স্ একটী সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালাভাষার দুইশ্রেণীর লেখকদিগের অবলম্বিত ভাষার সমালোচনা ও তাঁহাদের বিভিন্ন ভঙ্গিময় রচনার সামঞ্জস্য উদ্দেশ্যে যে যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

"সাহিত্য আলোচনা ও সভ্যতায় বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের অগ্রগামী—তাহার সাহিত্য ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিয়া ইয়ুরোপীয় আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই সময় বাঙ্গালা ভাষাকে একটী নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে ফেলিয়া উহাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট ভাবে গঠনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে সংস্কৃত শব্দের ও সমাসের অতিরিক্ত প্রসারণ রোধ করা যেমন কর্ত্তব্য, অপর দিকে প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের অযথা ব্যবহার তেমনই পরিহার্য্য। যাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় দলাদলি ভাব না থাকিয়া উহা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সুশৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এক ভাবে দাঁড়ায় তজ্জন্য আমি একটী সভা (Academy) সংস্থাপনের পরামর্শ দিতেছি—উহার সহায়তায় বাঙ্গালা ভাষা সুগঠিত ও একটী নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত হইবে।"

বঙ্গসাহিত্যের বন্ধু শ্রীযুক্ত বিম্‌স্ সাহেবের প্রস্তাব সর্ব্বথা সুসঙ্গত বিবেচিত হইলেও দীর্ঘকাল কেহই তদনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যোগী হন নাই। প্রায় বারবৎসর পরে তৎপক্ষে একটী সামান্য উদ্যোগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সাহিত্যসেবিগণের মতের বিভিন্নতা জনিত তাহা বিফল হইয়াছিল। উহার একুশ বৎসর পরে তৎসম্বন্ধে যে পুনরুদ্যম হইয়াছিল তাহার ফল স্বরূপ বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্যানুরাগী সহৃদয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের যত্ন-পরিপুষ্ট সাহিত্য সভার উৎপত্তি হইয়াছে। এই দুই সভা বিম্‌স্ সাহেবের পরামর্শ অনুরূপ প্রণালীতে পরিচালিত না হইলেও এতদ্দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা অলক্ষিত ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আলালী ভাষা ও মিশ্রভাষার সমালোচনায় আমি কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আলালের ঘরের দুলালের প্রতিপত্তি প্রদর্শনের জন্য আমি আর দুই একটী কথার উল্লেখ করিব। যে সকল ইংরেজ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার লাভের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া উক্ত পুস্তক তাঁহাদের প্রিয় পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহারা তদানীন্তন পণ্ডিতগণের কঠোর ও দুর্বোধ্য ভাষা পরিহার পূর্ব্বক আবেগময়ী আলালী ভাষার মধুরতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেন। ভারতবাসী ইংরেজ সমাজে উক্ত পুস্তকের বিশেষ আদর হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ কাউয়েল্ সাহেব একবার ইংরাজী-ভাষায় উহার অনুবাদ প্রণয়ন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সহজ-সাধ্য নহে

মনে করিয়া সে চেষ্টায় নিবৃত্ত হন। দীর্ঘকাল পরে শ্রীযুক্ত অস্‌ওয়েল্ সাহেব উহার আদ্যন্ত সুন্দর অনুবাদ করিয়া বিশেষ প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। আমি আলালের ঘরের দুলাল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, কারণ এই যে, এই পুস্তক খানিই ঘটনা বৈচিত্র্যে ও ভাষার অভিনব ভঙ্গিমা ও মাধুরীতে গ্রন্থকর্ত্তার সর্ব্বপ্রধান পুস্তক,—উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির পথে নূতন যুগ আনিয়া গ্রন্থকর্ত্তার মস্তকে চিরস্থায়ী যশের মুকুট পরাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে।

আলালের ঘরের দুলাল শেষ হইলে প্যারীচাঁদ ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেন:—১ মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, ২ রামারঞ্জিকা, ৩ কৃষিপাঠ ৪ গীতাঙ্কুর, ৫ যৎকিঞ্চিৎ, ৬ অভেদী, ৭ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা, ৮ ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত, ৯ আধ্যাত্মিকা, ১০ বামাতোষিণী। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি শ্লেষাত্মক ও হাস্য পরিহাস পূর্ণ হইলেও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। কি সামাজিক কি ধর্ম্মনৈতিক যে বিষয়ে তিনি যখন যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহাতেই তিনি লোক-চরিত্র, সামাজিক রীতিনীতি, দেশীয় আচার ব্যবহার ও সনাতন উদার ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় গভীর জ্ঞান ও সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে মহাত্মা প্যারীচাঁদের স্বর্গারোহণের কিছুকাল পরে তৎপ্রণীত গ্রন্থের অনেকগুলি বিলুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম করিয়াছিল। বিগত ১২৯৯ সালে মহাত্মা প্যারীচাঁদের পুত্রগণের উৎসাহে ক্যানিং লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় মহাত্মার গ্রন্থাবলী "লুপ্ত রত্নোদ্ধার নামে" পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের বঙ্গসাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি বিধাতা বঙ্গভূমির অদ্ভুত প্রতিভাশালী সুসন্তান, মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত "লুপ্তরত্নোদ্ধার" গ্রন্থের যে সুন্দর ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বঙ্গসাহিত্যে মহাত্মা প্যারীচাঁদের স্থান যে কত উচ্চ এবং উক্ত সাহিত্য তাঁহার নিকট যে কি পরিমাণে ঋণী তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

"বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।' অনন্তর তিনি বাঙ্গালা গদ্যের পূর্ব্বাবস্থার পরিচয় দিয়া উহার উৎকর্ষের কাল নির্দ্দেশ ও উহার প্রকৃত উন্নতির অবস্থার সূচনায় বিষয় উল্লেখ করিতে অগ্রসর হইয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—"... এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি মধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারিবে না। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার-কথা এ ভাষায় ব্যবহৃত হইত না বলিয়া ইহাতে সকলপ্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না, এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্য ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষার রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাযেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

"ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষার আরও একটী গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল ; সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, উহার বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃত এবং কদাচিৎ ইংরাজীর ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজী গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরেজী হইতে ও বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজীই একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া সকলেই ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু যাহা করিয়াছিলেন তাহা সময়ের প্রয়োজনানুযত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ভিন্ন অপ্রশংসার পাত্র নহেন ; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালী লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

"এই দুইটী গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালীকর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথমে তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে কি না সন্দেহ।"

"আমি এমন কথা বলিতেছি না যে "আলালের ঘরের দুলালের" ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্য এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময় পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহিত সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এইকথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। প্যারীচরণ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে, প্যারীচাঁদ তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ, ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

"আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে দেখাইলেন যে সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথমে দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল"। প্যারীচাঁদ মিত্রের ইহাই দ্বিতীয় কীর্ত্তি।"

সহৃদয় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করিয়া ছিলেন যে বঙ্গসাহিত্যের সেবা ও উন্নতি সাধনে মহাত্মা প্যারীচাদ তাঁহাকে পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সুকৃতিপুরুষ ছিলেন, সুতরাং গুণের আদর করিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন—তিনি প্যারীচাঁদের মন্ত্র শিষ্য রূপে তাঁহার প্রতিভা ও ক্ষমতা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। গত ১৩০১ সালের আষাঢ় মাসের ভারতীতে মৎলিখিত বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

প্রায় ৪ মাস গত হইল বঙ্গসাহিত্যের অন্যতর ভক্ত উপাসক স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বাটীতে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের যে একটী সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে যোগ্য পিতার যোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র স্বরচিত রাস-মিলনশীর্ষক একটী সুমধুর কবিতাময় প্রবন্ধে পরলোকগত প্রধান প্রধান সাহিত্যসেবিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উপলক্ষে দুই ছত্র মধুর কবিতায় মহাত্মা প্যারীচাঁদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধুর ঝঙ্কার এখনও আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"ভুলনা পিয়ারীচাঁদে—দুলাল সে বাংলার,
জননীর কণ্ঠে দিল গৃহ-জাত দিব্য হার।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কেবলমাত্র মহাত্মা প্যারীচাঁদের বঙ্গ-সাহিত্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছি—ইহাতে তাঁহার সমুন্নত জীবনের অন্যান্য মধুময় কাহিনীর পরিচয় দেওয়া হয় নাই। আমি উক্ত মহাত্মার সুবিস্তৃত জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—নানাবিধ প্রতিকূল ঘটনায় আমি এতদিন তাহা শেষ করিতে পারি নাই। মঙ্গলময় বিশ্বনাথের কৃপায় আমি তাহা শেষ করিয়া উঠিতে পারিলে, উক্ত মহাত্মা সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়াছিলেন, বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মহাশয়গণ তাহার বিস্তৃত পরিচয় পাইবেন।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

চিত্রব্যাখ্যা।

X বিবাহ-খেলা—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অঙ্কিত চিত্র হইতে।

ফাল্গুন মাস, নব বসন্তের হিল্লোলে বৃক্ষপত্র মর্ম্মর করিতেছে। প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। কোকিল পাপিয়া দিগন্ত ছাপিয়া ঝঙ্কার তুলিয়াছে। সেই মলয়হিল্লোলিত বসন্তপক্ষী-কূজিত পরিমলাকুল কাননতলে, বালিকা সখী চারিজন—রাজারাণী খেলা খেলিতেছিল এমন সময় বালক রাজকুমার গণেশদেব সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুসুম জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা রাজকুমার তুমিই বল—কে রাণী; শক্তি না নিরুপমা?" রাজকুমার কহিলেন—"কার রাণী? রাজা কে?"

দুজনে হাসিয়া বলিল—রাজা আবার কে? রাজা তুমি।—"

"আমি রাজা আর রাণী কে?"—নিরুপমা তক্ষণ ধরিয়া যে বকুল ফুলের মালাগাছি

গাঁথিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল—তাহা উঠাইয়া লইয়া শক্তির গলায় দিয়া রাজকুমার বলিলেন "এই দেখ"।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত ফুলের মালার এই দৃশ্যই চিত্রকর অঙ্কিত করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র হইতে।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্বাদ দিতেছেন ইহাই চিত্রের বর্ণনীয় বিষয়।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর।

গত ১৩ই শ্রাবণ শুক্রবার প্রাতে স্বনামধন্য মনস্বী রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতির সমসাময়িক লোক। বালককাল হইতেই মেধাশক্তিতে, চিন্তাশীলতায়, পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মিতায় তিনি অসাধারণ ছিলেন। ১২৫০ সালে কালীপ্রসন্ন যখন জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে দেশে সংস্কৃত ও ফার্সী অধ্যয়নই প্রচলিত ছিল—ইংরাজির আধিপত্য তখনও বৃদ্ধদিগের মনে বদ্ধমূল হয় নাই। সুতরাং বালককালে কালীপ্রসন্ন ইংরাজি পাঠের সুযোগ পান নাই। অবশেষে কিছুকাল পরে যখন ইংরাজি শিক্ষা করিবার সুযোগ ঘটিল, তখন তিনি এরূপ অস্তরের সহিত অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন যে অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজি সাহিত্য দর্শনে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। সেকালের ইংরাজি শিক্ষিতগণের মধ্যে মাতৃভাষা বড়ই হেয় ছিল, কিছু লিখিতে বা বলিতে হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ রাজভাষার আশ্রয় লইতেন। কালীপ্রসন্ন সেই স্রোতে ভাসিলেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই ইংরাজিতে এরূপ প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন যে তাঁহার অসামান্য প্রতিভাদর্শনে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ডাক্তার লালবিহারী দে ইত্যাদি মনস্বীগণ,—এমন কি, রেভারেণ্ড ডাফ প্রভৃতি ইংরাজগণও বিস্মিত হইতেন। তাঁহার ভাষার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য এত অসামান্য ছিল, ভাবের গভীরতা ও শব্দ যোজনাশক্তি এতই সুন্দর ছিল যে এক সময়ে তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতা শুনিয়া ঢাকার কমিশনার টয়নবি সাহেব বলেন "আমি ইতালির বাদ্য বড় ভালবাসি এবং অনেক দিন তাহা শুনিয়াছি; কিন্তু কালীপ্রসন্নের বক্তৃতায় যে একটা অপূর্ব্ব ও অসাধারণ মাধুরী আছে, ইতালির বাদ্য সঙ্গীতেও তাহা নাই।" বাঙ্গালীর ছেলের শিক্ষিত ইংরাজের নিকট হইতে এরূপ প্রশংসালাভ সহজ শক্তির পরিচায়ক নহে। কিন্তু দেশের পক্ষে, মাতৃভাষার পক্ষে তাঁহার এই অসাধারণ প্রতিভা এতদিন নষ্ট হইতেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ এক ইংরেজ বন্ধুর প্ররোচনায় কালীপ্রসন্ন কায়মনোবাক্যে মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত হইয়া বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে ঢাকা নগরে বান্ধব নামে এক মাসিক পত্র বাহির করিলেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন লিখিতেছেন। কালীপ্রসন্নের বাঙ্গালা রচনা দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "ভাষা সুন্দর, চিন্তা অসামান্য।"



রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই।

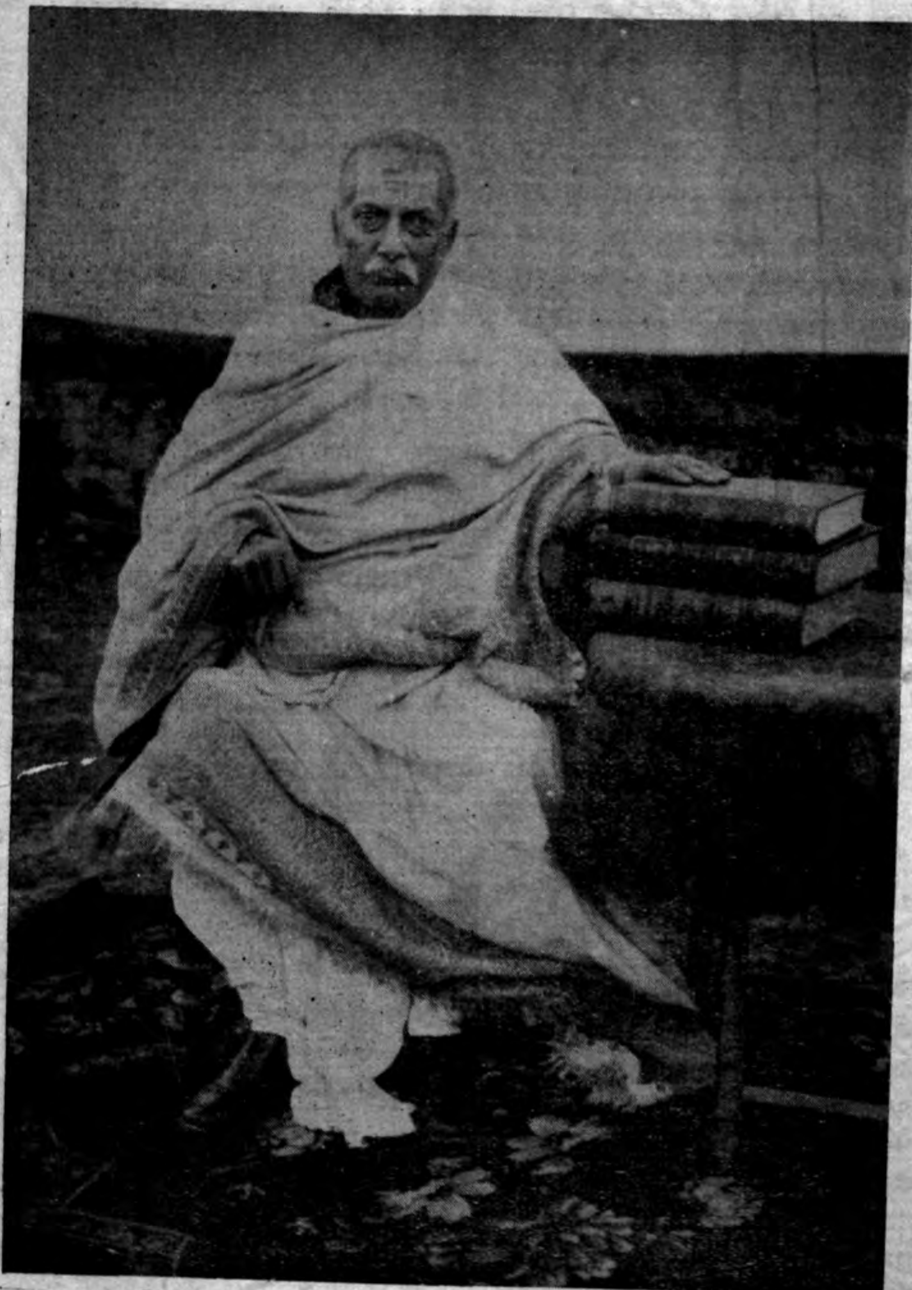
বঙ্কিমের ন্যায় কঠোর সমালোচকের নিকট এ প্রশংসার মূল্য অনেক। ক্রমে কালীপ্রসন্নের "প্রভাত চিন্তা," "নিভৃত চিন্তা," "নিশীথ চিন্তা" ইত্যাদি পুস্তক বাহির হইতে লাগিল। কালীপ্রসন্নের কবিত্ব ও ভাবুকতা ছিল সত্য, কিন্তু গভীর মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধানেই তিনি সমধিক আনন্দ পাইতেন এবং তাহাতেই তাঁহার প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকশিত হইত। তাঁহার চিন্তালহরী পাঠ করিলে তাঁহার ভাষার লালিত্যমাধুর্য্যে ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে মন মুগ্ধ ও পুলকিত হইয়া উঠে। মাতৃভাষার সেবার প্রতি, তাঁহার অনুরাগ এরূপ প্রগাঢ় ও আন্তরিক ছিল যে ঢাকা পরিত্যাগ করিলে পাছে তাঁহার সাহিত্যকর্ম্মে বিশেষতঃ বান্ধব পত্র পরিচালনে ব্যাঘাত ঘটে, সেই ভয়ে তিনি তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি হইতে অন্যান্য অযাচিত উচ্চ কর্ম্ম পর্য্যন্ত গ্রহণে অস্বীকার করেন। দুঃখের বিষয় পরে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এবং অন্যান্য কারণে বান্ধব পত্র তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। ইদানীং তিনি ভাওয়ালের প্রখ্যাতনামা জমিদারগণের ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। এ কর্ম্মেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ইঁহার মৃত্যুতে আমরা বঙ্গসাহিত্যের আর একটি পুরাতন গৌরবকে হারাইলাম। কিন্তু হারাইলাম বলিতেছি কেন? কীর্ত্তিমান পুরুষের কি মৃত্যু আছে। এই নবজগতে তাঁহারাই চিরঞ্জীব। কালিপ্রসন্নের সেই স্নিগ্ধ শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি আমাদের আর নয়নগোচর না হইলেও তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে তিনি চিরদিনই বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমান হইয়া অবস্থিতি করিবেন।

সমালোচনা।

ওয়ালটেয়ার-ভিজাগাপত্তন। শ্রী—দাস প্রণীত। কলিকাতা, উইলিয়ম্স্ লেন ৪নং ভবনস্থ দাস যন্ত্রে শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "যাঁহারা স্বাস্থ্যের জন্য ওয়ালটেয়ার ভিজাগাপত্তন যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন অসুবিধা ভোগ করিবেন না; খুঁটিনাটি সামান্য বিষয় হইতে উচ্চ বিষয় পর্য্যন্ত সকলেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহাতে বর্ণনা আছে।" ইহা একটুও অত্যুক্তি নহে; 'গাইড্'-হিসাবে গ্রন্থখানি সুন্দর, অমূল্য। এ গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে, যে, ওয়ালটেয়ারযাত্রীকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থকার পাকা সংসারী। কোথায় থাকিলে অল্প খরচ লাগিবে, অথচ স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটিবে না, কোথায় কোন্ দ্রব্য পাওয়া যাইবে, না-যাইবে, বাজার-দর কিরূপ, এসকলের তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়ালটেয়ারযাত্রীর পক্ষে গ্রন্থখানি সজীব রক্তমাংসবিশিষ্ট বান্ধবের মত হিতকারী। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এই গ্রন্থখানি, আমরা একাসনে বসিয়াই পড়িয়া ফেলিয়াছি।

মা। (মাতৃবিয়োগান্তে রচিত শোক-গীতি) শ্রীমোহিনীরঞ্জন সেন প্রণীত। চট্টগ্রাম, সনাতনপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। শোক-গীতি সাধারণতঃ



রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই।

বঙ্কিমের ন্যায় কঠোর সমালোচকের নিকট এ প্রশংসার মূল্য অনেক। ক্রমে কালী-প্রসন্নের "প্রভাত চিন্তা," "নিভৃত চিন্তা," "নিশীথ চিন্তা" ইত্যাদি পুস্তক বাহির হইতে লাগিল। কালীপ্রসন্নের কবিত্ব ও ভাবুকতা ছিল সত্য, কিন্তু গভীর মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধানেই তিনি সমধিক আনন্দ পাইতেন এবং তাহাতেই তাঁহার প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকশিত হইত। তাঁহার চিন্তালহরী পাঠ করিলে তাঁহার ভাষার লালিত্যমাধুর্য্যে ও ভাবের গাম্ভীর্য্যে মন মুগ্ধ ও পুলকিত হইয়া উঠে। মাতৃভাষার সেবার প্রতি, তাঁহার অনুরাগ এরূপ প্রগাঢ় ও আন্তরিক ছিল যে ঢাকা পরিত্যাগ করিলে পাছে তাঁহার সাহিত্যকর্ম্মে বিশেষতঃ বান্ধব পত্র পরিচালনে ব্যাঘাত ঘটে, সেই ভয়ে তিনি তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি হইতে অন্যান্য অযাচিত উচ্চ কর্ম্ম পর্য্যন্ত গ্রহণে অস্বীকার করেন। দুঃখের বিষয় পরে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এবং অন্যান্য কারণে বান্ধব পত্র তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। ইদানীং তিনি ভাওয়ালের প্রখ্যাতনামা জমিদারগণের ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। এ কর্ম্মেও তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ইঁহার মৃত্যুতে আমরা বঙ্গসাহিত্যের আর একটি পুরাতন গৌরবকে হারাইলাম। কিন্তু হারাইলাম বলিতেছি কেন? কীর্ত্তিমান পুরুষের কি মৃত্যু আছে। এই মরজগতে তাঁহারাই চিরঞ্জীব। কালিপ্রসন্নের সেই স্নিগ্ধ শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি আমাদের আর নয়ন-গোচর না হইলেও তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে তিনি চিরদিনই বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমান হইয়া অবস্থিতি করিবেন।

সমালোচনা।

ওয়ালটেয়ার-ভিজাগাপত্তন। শ্রী—দাস প্রণীত। কলিকাতা, উইলিয়ম্স্ লেন ৪নং ভবনস্থ দাস যন্ত্রে শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "যাঁহারা স্বাস্থ্যের জন্য ওয়ালটেয়ার ভিজাগাপত্তন যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন অসুবিধা ভোগ করিবেন না; খুঁটিনাটি সামান্য বিষয় হইতে উচ্চ বিষয় পর্য্যন্ত সকলেরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহাতে বর্ণনা আছে।" ইহা একটুও অত্যুক্তি নহে; 'গাইড'-হিসাবে গ্রন্থখানি সুন্দর, অমূল্য। এ গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে, যে, ওয়ালটেয়ারযাত্রীকে পর-মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থকার পাকা সংসারী। কোথায় থাকিলে অল্প খরচ লাগিবে, অথচ স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটিবে না, কোথায় কোন্ দ্রব্য পাওয়া যাইবে, না-যাইবে, বাজার-দর কিরূপ, এসকলের তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়ালটেয়ার-যাত্রীর পক্ষে গ্রন্থখানি সজীব রক্তমাংসবিশিষ্ট বান্ধবের মত হিতকারী। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এই গ্রন্থখানি, আমরা একাসনে বসিয়াই পড়িয়া ফেলিয়াছি।

মা। (মাতৃবিয়োগান্তে রচিত শোক-গীতি) শ্রীমোহিনীরঞ্জন সেন প্রণীত। চট্টগ্রাম, সনাতনপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। শোক-গীতি সাধারণতঃ

সমালোচনার সামগ্রী নহে। ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাস সাহিত্যের অঙ্গীভূত নহে। তবে টেনিসনের In Memoriam, সেলির Adonais, রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" প্রভৃতি ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাস হইলেও, ভাবের বিশালতায় তাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যমধ্যে গণনীয়। গ্রন্থের ছাপা ও বহিরবয়ব সুন্দর হইয়াছে।

অমর-বাণী। শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার বি,এ, বি,টি সঙ্কলিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। গ্রন্থকার টেনিসন, সেক্সপীয়র ইমার্সন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কয়েকটি মহান্ উক্তির বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থের সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ নাই। লেখকের উদ্যমও প্রশংসনীয়। তবে অনুবাদ অনেক স্থলেই যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে, কেমন যেন প্রাণহীন। তাহা ছাড়া উক্তিগুলি বেশ সুশৃঙ্খলভাবে সঙ্কলিত নহে।

বনফুল। শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কাসিমবাজার সত্যরত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। 'বনফুল' কবিতা-গ্রন্থ। ইহাতে সর্ব্বসমেত সাতাইশটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতাই মিষ্ট। ভাবে ছন্দে বেশ একটি বৈচিত্র্য আছে, সুর আছে। কষ্ট-কল্পনায় ভারাক্রান্ত নহে। তবে রবীন্দ্রনাথের অতিরিক্ত প্রভাবে কবির স্বাতন্ত্র্যটুকু না লোপ পায়, ইহাই আমাদিগের আশঙ্কা। "অবসান" "প্রবাহ", "বণিতা", "নাথের ছবি," "ভুল", "যাত্রা" প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতাই উল্লেখযোগ্য। আজকালকার দিনে, ইহা অল্প প্রশংসা নহে। কাব্যকুঞ্জে আমরা নবীন কবিকে সানন্দে অভিনন্দন করিতেছি। গ্রন্থের ছাপা ও কভার সুন্দর, নয়নাভিরাম।

মানবজীবন। অর্থাৎ বর্ত্তমানকালে ভারতে মানবজীবন যাপনের যেরূপ আদর্শ হওয়া আবশ্যক। শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম,এ, বি,এল, প্রণীত। কলিকাতা এস, কে, লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা। ভূমিকাপাঠে জানা যায় যে, "যুবকদিগের সমক্ষে একটি উৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গীন্ জীবনাদর্শ প্রদর্শন করা * * এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য।" গ্রন্থখানির প্রয়োজনিয়তা সকলেই সম্যক উপলব্ধি করিবেন। গ্রন্থকার মহাশয় এ পথের পথিক হইয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তবে তিনি অল্প-পরিসর স্থানে এত অধিক গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে, সর্ব্বত্র তাহার সম্যক্ অনুশীলন হইয়া উঠে নাই। অনেকস্থলেই, বক্তব্য অপরিস্ফুট ও জটিল রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে অধিকতর যুক্তিতর্কের সাহায্যে গ্রন্থকার আপনার বক্তব্য আরো ফুটাইয়া তুলিবেন। বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থের পক্ষে বর্ত্তমান সংস্করণটি উপযোগী হইয়াছে—কিন্তু সরসতার অভাব রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানি যাহাতে কেবল বিদ্যালয়-পাঠ্যের উপযোগী না হইয়া সাধারণের উপকারে লাগিতে পারে, এমনভাবে সুসংস্কৃত করিলে আমরা যথেষ্ট সুখী হইব।

আমিষ ও নিরামিষ ভোজন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, বি, এ; এল, এম, এস সঙ্কলিত। হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। আমিষ-ভোজন 'নরাধ্যাধারী' জীবমাত্রের "স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নহে—বরং ধর্ম্মবিরুদ্ধ * এই সময়োচিত সামাজিক সংস্কার জন্য এতাদৃশ সুদুর্লভ" পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিবিধ বচনের দ্বারা লেখক নিরামিষ ভোজনের সারবত্তা প্রমাণ করিয়াছেন। জীবহিংসা প্রভৃতি যুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমিষ ভোজন যে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ আচার্য্য মেচনিকফ্ও এই মতের সমর্থন করেন। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকার নানা যুক্তি-তর্কে আপনার মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গ্রন্থের ভাষা নীরস—আপনা হইতেই বেশ-একটা কৌতূহলের সৃষ্টি করে না—এইটুকুই ত্রুটি।

উষারাণী। শ্রীসীতানাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত। হিতবাদী লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য

বার আনা মাত্র। এখানি উপন্যাস। গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা কমল "পোড়ারমুখো গোকুল'কে ডাকিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'ইঁচড়ে-পাকা' কমল চতুর্দ্দশবর্ষীয়া উষার সহিত 'ছড়া কাটিতে বসিয়াছে'—বর্ণনীয় বিষয়, সেই উপন্যাস-বাজারের একচেটিয়া বেসাতি, প্রেম। একুশ বছরের ছোকরা নরেন্দ্র আসিয়া 'অশোক তরুর অন্তরালে লুকাইয়া' তাহাদিগের ছড়া শুনিতে লাগিলেন। এসব মামুলী গৎ অসহ্য! তারপর 'ফাজিল' ছোকরা,—ইনি উপন্যাসের নায়ক, কিনা—তাই আর কি করেন,—সন্ধ্যার পর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিরাশ প্রেমের soliloquy লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—কারণ, তাঁর চিরঈপ্সিতা উষার অপরের সহিত বিবাহ হইবে! পর পরিচ্ছেদে উষারাণী, মনের দুঃখে, "মা, আমি নদীগর্ভে প্রাণত্যাগ করিলাম" বলিয়া অদৃশ্য হইলেন! আপদ চুকিল। এমন মেয়ের নদীগর্ভে প্রাণত্যাগ করাই উচিত। আর পড়িবার প্রবৃত্তি হইল না। গ্রন্থের যেমনি, ভাষা বিন্যাস, ঘটনা-সৃষ্টিতেও তেমনি অসামঞ্জস্য—'কারে রেখে কারে দেখি।'

মেঘদূত। শ্রীনিতাইচাঁদ শীলকর্ত্তৃক অনুবাদিত। চুঁচুড়া, শীলগলি। মূল্য আট আনা। মেঘদূতের বিস্তর পদ্যানুবাদ হইয়াছে—তাহার মধ্যে সহজ ভাব এবং সরলতায় কয়েক খানি বাঙলা কাব্য সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান অনুবাদে বিশেষত্ব কিছুই নাই—নিতান্ত প্রাণহীন রচনা। চর্চ্চার উদ্দেশ্যে, নিভৃতে, এমন কবিতা রচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহা লেখা যায়, তাহাই যে, ছাপিতে হইবে এমন কি আইন আছে?

বীর বালক। (কাব্য)। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত। ৫নং কলেজষ্ট্রীট সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। স্বনামখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই রচনা পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। তিনি যে এই অল্প বয়সে মাইকেলের ছন্দোবন্ধ ও ভঙ্গী কিরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন" ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, আমরা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম না। চর্চ্চা করিলে লেখিকা কালে ভালো লিখিতে পারিবেন, সে আশা অসঙ্গত নহে, তবে বীর বালকে আমরা এমন কিছু প্রতিভার পরিচয় পাইলাম না। অনেক স্থলেই অবান্তর ও অসঙ্গত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য আছে। অর্থাৎ, অনেক প্রথম রচনা যে শ্রেণীর হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ। তবে ভাষাটুকু গম্ভীর। ছন্দে একটা সহজ প্রবাহ নাই—কষ্ট কল্পনার ভারে বহুস্থলই নিপীড়িত। বঙ্গসাহিত্যে মহিলা কবির অসদ্ভাব নাই, সেই জন্যই বীরবালকের কবির অতিরিক্ত প্রশংসা করিতে পারিলাম না। রচনায় বহু দোষ রহিয়া গিয়াছে।

বেদান্তের আমি। শ্রী ভগবৎদাস প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র। গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব লেখককর্ত্তৃক বৈদ্যনাথস্থ 'বাক চক' আখড়ায় উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থখানিতে 'আমি', 'ত্রিত্ব', 'অদৃষ্টবাদ' 'আহার', 'শয়ন' প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। সাধারণের পক্ষে সেগুলি সুবোধ্যও হইয়াছে লেখকের সহিত সর্ব্বত্র আমাদিগের মতের মিল না থাকিলেও, গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ইহাতে কোথাও পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার নাই, ইহাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব।

পুরাণদর্শন-সূত্র উপক্রমণিকা—অথবা আর্য্যধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মা। কাশীপ্রেসে, মুদ্রিত, বেনারস সিটি। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য, সাকারত্ব ওপুরুষ প্রকৃতি-তত্ব, যুগাদির দৈব বা জ্যোতিষিক ও ঐতিহাসিক কাল-নিরূপণ, তীর্থাদি ও পাপপুণ্যের আলোচনা ইত্যাদি। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে লেখকের সুগভীর অনুসন্ধিৎসা ও তাহার সুশৃঙ্খল বিন্যাস দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। 'আত্মা', 'গুরু', 'স্মৃতি' প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাগুলি সুন্দর, প্রাণস্পর্শী। সহজ করিয়া বলিবার লেখকের বেশ শক্তি আছে। তাঁহার অবতারিত তথ্যসমূহের যাথার্থ্য-নিরূপণের ভার বিশেষজ্ঞেরা গ্রহণ করুন। তবে আমরা এখানি পাঠ করিয়া

তৃপ্তি পাইয়াছি। আগাগোড়া দিয়া কৌতূহল জাগরূক থাকে। অনিবার্য্য হেতু প্রায় ৭০ পৃষ্ঠা গ্রন্থকার প্রকাশ করিতে পারেন নাই। দেশেরো দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারত ও শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে লেখকের ভূয়োদর্শিতা বাস্তবিকই উপভোগ্য। গ্রন্থের মূল্য কোথাও লিখিত দেখিলাম না।

বঙ্গীয় নাট্যশালা। শ্রীধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এমারেল্‌ড্‌ প্রিণ্টিংওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। গ্রন্থখানি সাধারণ বঙ্গীয় নাট্যশালার সমালোচনা। সমাজে নাট্যশালার যে একটি স্থান আছে, সে সম্বন্ধে কাহারো মতভেদ থাকিতে পারে না। আনন্দ-দান উদ্দেশ্য হইলেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষাদান কার্য্যও ইহার দ্বারা সাধিত হয়। বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা, অভিনয়কৃত্রিমতায়, শিক্ষাশৈথিল্যে, সুরুচি ও সুভাব-বর্দ্ধক পুস্তকের অভাবে ক্রমেই অধঃপতনের পথে চলিয়াছে। হিতোপদেশ যে সে কর্ণে গ্রহণও করে না, ইহাই তাহার অবশ্যম্ভাবী দ্রুত পতনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রুচি বিকৃত করিবার দিকে আধুনিক নাট্যশালার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি। বর্ত্তমান গ্রন্থে "পুস্তকনির্ব্বাচন" "অভিনয় শিক্ষা" "পোষাক পরিচ্ছদ," "দৃশ্যপটাদি," "নাচ-গান" প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় বিষয়েই লেখক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সর্ব্বত্র আমাদিগের মতের মিল না থাকিলেও তাঁহার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত, আলোচনা-যোগ্য। বাঙলা রঙ্গভূমি সম্বন্ধে, 'ভারতী'তে পূর্ব্বে বহু আলোচনা হইয়াছে; কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা'। বাঙলার প্রবল প্রতাপশালী রঙ্গালয়াধ্যক্ষ আপনার 'সবজান্তা' গিরি ছাড়িয়া সাধারণ মতামত ত গ্রাহ্য করিতে পারেন না। গ্রন্থকার-বর্ণিত চরিত্রাদির সম্যক ধারণা না করিয়া অভিনেতার দল কিরূপ হাস্য ও বিরক্তির উদ্রেক করেন, তাহা বুঝিবারো যদি তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকিত। অভিনয়-কলার প্রতি যাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ আছে, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তিনি যে সুখী হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রঙ্গালয়ের সমালোচনা, সাপ্তাহিক পত্রাদির কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া আমরা মনে করি, কিন্তু স্ত্রীপাশের কি মোহিনী শক্তি,—তাহারি মায়ায় মুগ্ধ সম্পাদক, বীভৎস নাটকে, সেক্‌সপিয়রের রচনা-কৌশল, চরিত্রবিকাশের ঘটা দেখিয়া আত্মহারা হইয়া উঠেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে "দর্শক ও সমালোচক" শীর্ষক নিবন্ধটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া রঙ্গালয়গুলির দ্বারদেশে বিনামূল্যে বিতরিত হইলে ভালো হয়। গ্রন্থখানি দুই একটি দোষ উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—প্রথমতঃ, গ্রন্থখানি up to-date হইয়া উঠে নাই—দ্বিতীয়তঃ, বিস্তর অপদার্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নামে গ্রন্থের পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত হইয়াছে। তাহাদিগকে এমন অযথা প্রশ্রয় দান করা এতটুকু সমীচীন হয় নাই বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

মিলন।

প্রেম ছিল সুনিভৃতে, সুখস্বপ্ন ঘোরে,
ভক্তি দোঁহে বাঁধি দিল সুমঙ্গল ডোরে।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



দময়ন্তী

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ইউ, রায় কর্ত্তৃক ব্লক] [কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩১৭ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

অক্ষয় রূপ।

সে ছিল সন্ন্যাসী। জপ তপ পূজা আরাধনা নিয়েই সে থাকত। পৃথিবীর কোনো মানুষের পানে, কোনো জিনিসের দিকে সে ফিরেও চাইত না। বনের মাঝে দেবতার মন্দিরে তার আস্তানা ছিল। বনের যত জন্তু তার মন্দিরদ্বারে এসে খেলা করত, যত পাখী মন্দিরচূড়ায় বসে কাকলী গাইত। মানুষের সমাগম বড় হত না।

মন্দিরের মধ্যে দেবতার কোনো বিগ্রহ ছিল না, সন্ন্যাসী বসে বসে যে কার পূজা, কার ধ্যান করত তা সেই জানে।

এমনি দিন যায়। বর্ষার বাদল ভাঙা মন্দির বেয়ে দুপুর রাতে কার চোখের জলের মতো এসে তার গায়ে উপচে পড়ে, গ্রীষ্মের রৌদ্র ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে এসে তার মাথায় সোনার কিরীট পরিয়ে দেয়, সে সব সে খেয়ালই করে না। দিনের আলো, রাতের আঁধার, বসন্তের বাতাস, চাঁদের জোছনা তার প্রাণের মধ্যে কোনো ভাবের লহরী তুলতেই পারত না। দেখলে বোধ হত যেন পাথরের মানুষ!

মাঝে মাঝে পথহারা পথিক দুপুর রাত্রে এসে তার মন্দিরে আশ্রয় নিত, ভোর না হতেই পথ খুঁজে চলে যেত, সন্ন্যাসী তাদের কাউকে কোন কথা শুধাত না, তারা কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিত না—চোখ বুজে বসে থাকত। কেউ যদি এসে ভক্তিভরে তার পদসেবা করতে যেত সে পা টেনে নিত। কেউ কিছু ভেট দিলে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

এক ভোর রাত্রে এক নর্ত্তকী রাজার বাড়ি গাওনা শেষ করে ফিরচে, পথে ঝড়বৃষ্টিতে পড়ে এই মন্দিরে আশ্রয় নিলে। সে শুনেছিল এইখানে এক সন্ন্যাসী থাকে। অনেকদিন থেকে এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করবার তার ভারি ইচ্ছা, কিন্তু দেখা ঘটে ওঠেনি। আজ দৈবযোগে দেখা হয়ে তার ভারি আনন্দ হল। মনে হল—আমি যা খুঁজচি এই সন্ন্যাসীর কাছে তার সন্ধান নিশ্চয়ই পাবো, নইলে আজ রাত্রে এরই কাছে বা এসে পড়ব কেন? নিশ্চয় এ ভগবানের খেলা!

নর্ত্তকী পরম রূপসী। তার রূপের প্রশংসা দেশজোড়া, সেই গরবে তার মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু তার বড় ভয় কখন সে গরব টুটে! রূপতো আর চিরদিন থাকে না! এরই মধ্যে তার রূপের প্রভা নিবে আসচে। এক একদিন আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে যখন দেখে নিটোল অঙ্গ

টোল খেয়ে আসচে, ঘনকৃষ্ণ কেশের মধ্যে থেকে শুভ্রতা উঁকি মারচে, কপালে, গালে বয়সের কুঞ্চন-রেখা ফুটে উঠচে, দেহলাবণ্য দিন দিন উবে যাচ্ছে, শত চেষ্টা করেও চোখ দুটো আর তেমন করে কটাক্ষ হানতে পারচে না, তখন তার বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে আসে; ভয়ে রূপ আরো মলিন হয়ে পড়ে। কি করলে রূপ অটুট থাকে এখন এই তার ভাবনা। সে যতই ভাবে কিছুতেই কিছু ঠিক করতে পারেনা—কেবল হতাশ হয়ে পড়ে।

একদিন তার দাসী তাকে বলেছিল কোনো সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যদি কোনো ওষুধ নিতে পারো তবেই রূপ বজায় থাকে; সন্ন্যাসীরা মহাপুরুষ, তাঁরা ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন। দাসীর এই কথা শুনে অবধি নর্ত্তকীর মনে একটু আশার উদয় হয়েছে। দৈবযোগে আজ সন্ন্যাসীর দেখা পেয়ে সেই আশা দৃঢ় হয়ে উঠল।

হাবভাব ছলাকলা যা কিছু সম্বল ছিল তাই দিয়ে নর্ত্তকী সন্ন্যাসীকে বশ করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সন্ন্যাসী এমনি উদাসভাবে তার পানে চাইলে যে সে চাহনি দেখে তার ভয় করতে লাগল। সে তখন সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বল্লে— "সন্ন্যাসী ঠাকুর! দয়া কর।"

সন্ন্যাসী সে কথা যেন শুনতেই পেলেনা। যেমন ভোলাভাবে বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

সন্ন্যাসী যতই তার কথা ঠেলে ফেলে দেয়, যতই উদাসভাব দেখায় নর্ত্তকীর মনের বিশ্বাস ততই বেড়ে উঠতে থাকে। সে ভাবে —এইই আসল সন্ন্যাসী বটে! এরই কাছে যা খুঁজচি তা পাবো। এ'কে ছাড়া নয়। এই ভেবে সে সন্ন্যাসীর পা দুটো খুব জোর করে চেপে ধরলে। সন্ন্যাসী দেখলে ভারি বিপদ! সে তখন ছুটে মন্দির থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে গিয়ে লুকোলো। নর্ত্তকী হতাশ হয়ে সেদিনকার মতো বাড়ি ফিরে গেল।

তারপর থেকে রোজই সে সন্ন্যাসীর কাছে আসে—তার পায়ে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকে। তার দাসী তাকে বলে দিয়েছিল সাধুপুরুষের কৃপা সহজে হয় না, তাই সে পড়ে পড়ে সাধ্যসাধনা করতে লাগল।

এমনি করে দিন যায়। রাজ্যের লোকে নর্ত্তকীর দেখা পায় না, রাজ্যের আমোদ বন্ধ, রাজার প্রমোদভবন শূন্য। সকলে হায় হায় করতে লাগল।

রাজা বল্লেন—"যেখান থেকে হ'ক নর্ত্তকীকে এনে হাজির কর। নইলে আমি তিষ্ঠতে পারচি না।"

রাজার লোক মন্দির ঘেরাও করে নর্ত্তকীকে রাজসভায় এনে হাজির করলে। নাচ গান আরম্ভ হল, কিন্তু নর্ত্তকীর মনে ফূর্ত্তি নেই বলে আসর তেমন জমল না।

নর্ত্তকী ছাড়া পেয়েই সন্ন্যাসীর কাছে ছুটল, রাজার লোক তার পর দিন আবার তাকে ধরে নিয়ে এল। এমনি রোজ হতে লাগল। তার মন টানে তাকে মন্দিরের দিকে, রাজা টানে রাজসভায়! টানাটানির মধ্যে পড়ে নর্ত্তকী অস্থির।

সন্ন্যাসী দেখলে মহা বিপদ! বন ছিল নির্জ্জন, জপতপের বেশ সুবিধে। এখন রাজার লোক এসে রোজ রোজ হল্লা করে;—

হাতী ঘোড়ার চীৎকারে কান ঝালাপালা! সে ভাবলে এ তো চলবে না। একটা উপায় করতে হবে—নইলে তিষ্ঠতে পারব না, জপতপ সব ঘুরে যাচ্ছে। নর্ত্তকী কি চায় সেকথা তাকে জিজ্ঞাসা করে তাকে তাড়াতে হচ্ছে। এই ভেবে সে নর্ত্তকীকে বল্লে—"কি চাও তুমি?"

সন্ন্যাসীর মুখে কথা শুনে নর্ত্তকীর মনে আশার উদয় হল। সে ভাবলে এতদিনের সাধনা আজ বুঝি সফল হল। সে বল্লে—"বাবা ঠাকুর! আমার রূপের যাতে ক্ষয় না হয় তাই তোমায় করতে হবে।"

সন্ন্যাসী বল্লে—"সে কি কথা! আমি তার কি করব!"

নর্ত্তকী বুঝলে এক কথায় কাজ হচ্চে না। তখন সে সন্ন্যাসীকে খুব করে ধরে পড়ে বল্লে—"তুমিই পারবে! ঠাকুর তাই ত তোমার শরণ নিয়েছি।"

কথা শুনে সন্ন্যাসী হো হো করে হেসে উঠল। বল্লে—"রূপ কখন অক্ষয় হয়!"

নর্ত্তকী বল্লে—"হয় ঠাকুর! হয়! তোমরা দেবতার জানিত লোক—তোমরা সব পারো। আমি কোনো কথা শুনচি না! অক্ষয় রূপ না দিলে কিছুতে ছাড়ব না—এই রইলুম পড়ে!"

সন্ন্যাসী একটুখানি হাসলে। বল্লে—"কৃপণ তার ধনকে কেমন করে অক্ষয় করে রাখে জান?"

নটী বল্লে—"জানি। কৃপণ টাকা মাটিতে পুঁতে রাখে।"

সন্ন্যাসী বল্লে—"কৃপণের টাকার মতো তোমার রূপকে সকলের দৃষ্টি থেকে যদি একেবারে লুকিয়ে ফেলতে পার তাহলে রূপ তোমার অক্ষয় হয়ে থাকবে।"

নটী চুপ করে বসে ভাবলে;—নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা কল্লে—"সকলকে লুকিয়ে যদি কেবল একজনের কাছে দেখাই তাহলে কি ক্ষতি হবে?"

সন্ন্যাসী বল্লে—"হাঁ, তাহলেও ক্ষয় হতে থাকবে।"

নটী বল্লে—"এমন করে লুকবো কি উপায়ে?"

সন্ন্যাসী হেসে বল্লে—"উপায় আমি ঠিক করে দেব। তুমি যদি মনের সঙ্গে ইচ্ছা কর তাহলে তোমার রূপ আমি এমন করে ঢেকে দেব যে কোথাও একটুও ছিদ্র থাকবে না;—তোমার রূপ আছে বলে কেউ সন্দেহও করতে পারবে না।"

নর্ত্তকী আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

সন্ন্যাসী বল্লে—"আজ রাতে চিন্তা করে দেখো, কাল সকালে এসে তোমার ইচ্ছা জানিয়ো।"

পরদিন সকালে নটী ফিরে এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলে। বল্লে—"আমার অক্ষয় রূপে প্রয়োজন নেই ঠাকুর!"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ভুবনেশ্বর।

মন্দির নির্ম্মাণ হইতে হইতে হইল না; মহাকালের আহ্বানে যযাতি কেশরীকে সংসার হইতে দোকানপাঠ তুলিতে হইল।

সে আজ পনেরো শত বৎসরের কথা। কেশরীবংশীয়গণের ললাট, তখন রাজশ্রীর পূত তিলকে উজ্জ্বল। সে রাজবংশের প্রায় সকলেই শিবের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তাহার ফলেই উৎকলের মন্দিরমালা আজ পৃথ্বী প্রখ্যাত।

ইতিহাস বলে, উৎকলীয়গণ, সম্রাট অশোকের সময় হইতে, গুপ্ত বংশীয়গণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত প্রধানত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। (খৃঃ পূঃ ২৫০—৩১৯ খৃঃ অব্দ) *

তাহার পর প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মে এবং নবজাগ্রত শৈবধর্ম্মে প্রবল বিরোধ আরম্ভ হয়। শঙ্কর কর্ত্তৃক উদ্বোধিত শৈবধর্ম্ম উৎকলে আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এই বিখ্যাত ধর্ম্ম বিপ্লবের কাহিনী চিত্তোত্তেজক উপন্যাস অপেক্ষা অল্প কৌতূহলজনক নয়। হাণ্টার সাহেব বলেন, "For 150 years Buddhism and Siva worship struggled for the victory."

সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধের সাম্যনীতি, উৎকলে তখন পুরাতন কাহিনী হইয়া উঠিয়াছিল। বৈরাগ্য বড় কঠোর, বিলাস অতি পেলব! বুদ্ধের সে ধ্যান-গম্ভীর প্রশান্ত আনন শৈল-প্রাচীরে শিবের মহিমাই মৌন ব্যক্ত করিতে লাগিল,—সে অর্দ্ধ-নিমীলিত পদ্ম-নেত্রের শান্ত নিষেধ যতিগণের পক্ষে প্রচুর হইল না,—নব-প্রাপ্ত তন্ত্রাচারে তাঁহাদের মন্ত্র-পূতঃ গেরুয়া-বসন তখন কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় রহিল ধর্ম্ম,—আর কোথায় রহিল কর্ম্ম! এ লব্ধ সুযোগ যযাতি কেশরী ছাড়িলেন না। শিব তাঁহার দেবতা,—উৎকলে তিনি শ্মশান-পতির ত্রিশূল রোপণ করিয়া দিলেন। এবং সাগরের ফেনা-ধবলিত নাদ-ভীষণ উত্তাল তরঙ্গে যেমন নদীর ক্ষুদ্র বীচিমালা গান-হারা হইয়া যায়,—তেমনি প্রবল ব্রাহ্মণ্য শক্তির সম্মুখে অনাচার দুর্ব্বল বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার সকল গর্ব্ব নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল।

উড়িষ্যার তালপত্রের পঞ্জিকা (Palmleaf Records) আমাদের জানাইয়া দিতেছে, কেশরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা যযাতি কেশরী ৫০০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা হইতে দশ হাজার ব্রাহ্মণ, উৎকলে আনয়ন করেন এবং এই উপবীতধারী সর্ব্ব-নমস্য নব আগন্তুকগণের জন্য যাজপুরে অনেকখানি যায়গা ছাড়িয়া দেন। যযাতি কেশরী নিজে উৎকলের অধিবাসী ছিলেন না। তাঁহার আদিনিবাস ছিল,—অযোধ্যায়। আপনার বাহুবল এবং পরাক্রমে, উৎকলভূমিতে তিনি একটি বহুশতাব্দীস্থায়ী রাজবংশের সৃষ্টি করিয়া যান। তাঁহারই নামানুকরণে যাজপুরের নামকরণ হইয়াছে। যাজপুর, তাঁহারই রাজধানী ছিল। বিদ্যমানকালে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। বৌদ্ধগণকে বিতা-

* History of Indian & Eastern Architecture.

ড়িত করিয়া তিনি ভুবনেশ্বরে, রাজধানী স্থাপন এবং মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন।

মন্দিরের কাজ কিছু কিছু হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। তালপত্রপঞ্জীর মতানুসারে তিনি ৪৭৪ খৃঃ অঃ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। যযাতি কেশরীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সূর্য্যকেশরী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মন্দিরের কোন কাজেই তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা অনন্ত কেশরী মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করেন এবং অলাবুকেশরীর রাজত্বকালে ইহা সম্পূর্ণ হয়। (৬৫৭ খৃঃ অঃ)। * জগৎ কেশরী কর্ত্তৃক ভোগমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। (৮৫০—৮৭০ খৃঃ অব্দ)। নাট মন্দিরটী কেশরী রাজবংশের এক রাজ্ঞী ("The wife of salini") কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ হয়। (১০৯৯—১১০৪)। † মন্দির নির্ম্মাণের ত্রিশ বৎসর পরেই কেশরী রাজবংশের পতন হয়। "And the last public act of the Dynasty was the building of the beautiful vestibule to the great shrine of Bhubaneswor between 1099 and 1104 A. D. or barely thirty years before the extiinction of the race" (Hunters Orissa)। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া একাদশ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে সমাপ্ত হইয়াছে। মধ্যে সুদীর্ঘ ছয় শতাব্দীর পরিবর্ত্তন বহিয়া গিয়াছে। জগতে আর কোন দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিতে বোধ হয় এত সময়ের আবশ্যক হয় নাই।

কেশরী বংশে ৪৩ জন রাজা হইয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেরই জীবনকাল, এই একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে শেষ হইয়াছে! এখন সে বংশের কেহই বিদ্যমান নাই। তাঁহাদের রাজধানীও কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। রামেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে বহু সংখ্যক ধ্বংসভগ্ন প্রস্তর স্তূপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। জনপ্রবাদ বলে, ইহাই কেশরীরাজগণের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

শুনা যায় এখানে আগে ক্ষুদ্র বৃহৎ এক লক্ষ মন্দির ছিল। এখন এক লক্ষ দূরে যাউক সাতশত মন্দির আছে কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি, ভীষণ আয়কাণ্ডে তাহাও ধ্বংস হইয়াছে। বৈদান্তিক বলেন, জগৎ মিথ্যা,—মায়ামাত্র। ভুবনেশ্বরের বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করিলে, তাহাই মনে হয়। এখানে ভগ্নস্তূপ, ওখানে চূর্ণ বিচূর্ণ প্রাসাদাবশেষ এবং তাহারই চারিদিকে কতকগুলা জীর্ণ ভগ্ন মন্দির; কাহারও চূড়া খসিয়াছে, কাহারও কারুকার্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে—কাহারও শিরে আরণ্য বৃক্ষ শিকড় রোপণ করিয়াছে—

* পুরুষোত্তম চন্দ্রিকায় অলাবু কেশরীর নাম পাওয়া যায়, ষ্টার্লিং সাহেব ইহাকে ললাটেন্দু কেশরী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (Asiatic Researchs XV 1866)। ফারগুসান সাহেবও বলেন, "It seems almost certainly to have been built by Lolat Indrakesari, who reigned from A. D. 617 to A. D. 657."

† পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা ৩৪ পৃষ্ঠা।

কাহারও দেব মহিমা বিগত—মানুষেরই মত দেবতার পাষাণদেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছে।

পদ্মক্ষেত্র অতি প্রাচীন স্থান। একাধিক পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে।

এই স্থানের "ভুবনেশ্বর" নাম আধুনিক। "ক্ষেত্রমেকাম্রকং"—অর্থাৎ "একাম্রক্ষেত্র"ই ইহার প্রাচীন নাম।

নীলগিরির দুই যোজন অন্তরে, একাম্র কানন অবস্থিত।

এই স্থানের একাম্রকানন নাম হইবার কারণ সম্বন্ধে কপিল সংহিতাকার এবং ব্রাহ্মপুরাণও বলেন :—

একটীমাত্র আম্রবৃক্ষ থাকার জন্য, ইহার নাম "একাম্র কানন" হইয়াছে।

"একাম্র-চন্দ্রিকা" নামক আর একখানি পুস্তকে, ইহার সীমা-নির্দ্দেশ আছে। যথাঃ

"খণ্ডাচলং সমাসাদ্য যত্রাস্তে কুণ্ডলেশ্বরঃ।
আসাদ্য বারাহীদেবী মহিরন্দেশ্বরাবধি॥"

এখানে "ভুবনেশ্বরে"র স্থিতি সম্বন্ধে নানা পুরাণে নানাবিধ কাহিনী আছে। সে সকল কাহিনীর উল্লেখ করিতে হইলে, আজ আর অন্য কথা হয় না। তবে প্রধানতঃ ইহাই জানা যায়, যে মুক্তজনতা বারাণসী ত্যাগ করিয়া, মহাদেব বিষ্ণুর নিকটে সত্যবদ্ধ হন, যে তিনি আর কখনো কাশীতে প্রত্যাগমন করিবেন না। তাহার পর হইতে তিনি এখানেই বাস করিতে থাকেন।

পুরাণ আরো অনেক মনোহারিণী কাহিনী বলিয়াছে। শিবরমা উমা এখানে গোষ্ঠলীলা করিয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ "শ্রীশ্রীকালী কীর্ত্তনে" একাম্র কাননে মায়ের গোষ্ঠলীলা, ভাবময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

জগন্নাথের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা উচ্চ বটে; কিন্তু তাহার উচ্চতা ভুবনেশ্বরের গৌরবকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। বহুকালব্যাপী পরিশ্রম ও চেষ্টায়, ভুবনেশ্বর দেবায়তনের স্তরে স্তরে শিল্পের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য পুষ্পপ্রতিম ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা স্বপ্নের মত, সুন্দর। প্রথম দৃষ্টিতে তাহা মানবহস্তগঠিত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এবং একদিন বা দুইদিন তাহার চারিপাশে না ঘুরিয়া বেড়াইলে কিছুই দেখা হয় না। তাই ফারগুসান সাহেব বলিয়াছেন;

"A weaks study of the Jagomohan, would every hour reveal new beauties"

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে, কপিলেশ্বর মন্দিরাভিমুখগামী একটী পথ আছে। পশ্চিমদিকে কতকগুলি ছোটছোট ধ্বংস-ভগ্ন মন্দির। উত্তর দিকে, বড় ভাণ্ডা নামধেয় একটী প্রশস্ত রাজপথ এবং দক্ষিণদিকে অনিবিড় জঙ্গল,—সেই স্থানে আগে রাজ-প্রাসাদ ছিল।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল ইহার সীমানির্দ্দেশ করিয়াছেন :

"Its present boundary may be roughly described to extend from the Temple of Ramesvara to a little to the west of that of Bhuvanesvara on the west; from the latter of Temple of Kapilesvara on the south; form the last to the temple of Bhaskaresvara on the east; and from the last to Ramesvara on the north."*

* The Antiquities of Orissa.

ভুবনেশ্বরের মন্দিরাবস্থানের পরিমাণ উনিশ বিঘা ভূমি। চারিদিক দুর্ভেদ্য উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীর-প্রসার ৭ ফুট ৫ ইঞ্চ। উর্দ্ধেও সামান্য নয়, ৩৩ হাত। বিধর্ম্মীর অত্যাচারের জন্য মন্দিরের নির্ম্মাতাগণকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইত। ভারতের অনেক দেবালয় মুসলমানগণের অন্ধ ধর্ম্মবেষিতায় বিধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই বিপদ নিবারণের জন্য ভারতের মন্দির-নির্ম্মাতাগণ, মন্দিরগুলিকে এক একটী ছোট-খাটো দুর্গের মত করিয়া তুলিতেন। সেই জন্যই মামুদ সহজে সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির করতলগত করিতে পারেন নাই। সোমনাথের পূজকগণ, মন্দির প্রাচীরের অন্তরালে আত্মগোপন পূর্ব্বক শাস্ত্র ছাড়িয়া শস্ত্র-ধারণ করিয়া, মোগলের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন।

এরূপ বিপদ ঘটিবার অবসর, বোধ করি ভুবনেশ্বরেও খুব সুলভ ছিল। তাই মন্দিরের চারিপাশে এইরূপ উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল।

শুধু তাহাই নয়,—প্রাচীরের গর্ভে, যাহাতে যোদ্ধাগণের অবস্থান হইতে পারে, এমন কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এ কাজ শেষ হয় নাই,—প্রাচীরের দু'এক দিকে তাঁহার চিহ্নমাত্র নজরে পড়িয়া যায়।

মন্দিরের দ্বারপথ তিনটী। তন্মধ্যে যেটী সর্ব্ববৃহৎ, সেটী পূর্ব্বমুখী। দ্বারপ্রসার ৩১ ফুট উপরে ছাদ আছে। দূর হইতে দেখিলে, দ্বার পথটীকে একটী ছোটখাটো মন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। দ্বার পথের দুপাশে দুটী কল্পনা-বিকৃত সিংহমূর্ত্তি আছে। দ্বার-গৃহটীর উচ্চতা ৫০ ফুট।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, উঠানের উপরে পড়িলে দেখা যায়, প্রধান দেবালয় বেষ্টন করিয়া চারিদিকে বহুসংখ্যক দেবালয়। সকলগুলিই ছোট,—তাহাদের উচ্চতা ৬ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ ফুট পর্য্যন্ত। প্রত্যেকটীর বিভিন্ন নাম,—এবং কাহারও নির্ম্মাণাদর্শ একরূপ নয়। সকলগুলিই বিভিন্নকালের বিভিন্ন শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

জনৈক লেখক বলেন, "কি ঐতিহাসিক, বা কি গঠন ও শিল্প হিসাবে, এই মন্দিরগুলির কোন মূল্য নাই।"* আসল কথা, মন্দিরগুলি লুব্ধ পুরোহিতগণের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল! কেবল ভুবনেশ্বর, সকলের অর্থলাভ বাসনা চরিতার্থ করিতে পারেন না দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ ব্যয়ে এই সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহাদের অভি-প্রায় ছিল, নূতন দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া, অর্থোপার্জ্জনের নূতন পথ মুক্ত করা,—সুতরাং মন্দিরগুলি শিল্পের সহিত সর্ব্বসম্বন্ধমুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল মন্দিরের ভিতরে দু'একটীর নাম উল্লেখ যোগ্য। একটী মন্দিরের গৃহতল,—অন্যান্য মন্দির অপেক্ষাও নিম্নাভিমুখী। এই মন্দিরটী এখানকার সকল মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন এবং অনেকে বলেন, ইহাই ভুবনেশ্বরের সর্ব্বপ্রথম মন্দির। মন্দিরের ভিতরে এখনো একটী শিবলিঙ্গ আছে।

* List of Ancient Monuments in Bengal.

লিঙ্গ একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে আর তাহাকে স্থানান্তরিত করা চলে না। সেই কারণেই উক্ত লিঙ্গ অদ্যাপি একস্থানেই বিরাজিত আছে। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মপিপাসু তীর্থযাত্রিগণের যে ভক্তি স্রোত আজ নূতন মন্দিরের বিরাট শিবলিঙ্গের উদ্দেশে প্রবাহিত হয় তাহা উক্ত "ভাঙা দেউলের দেবতারই প্রাপ্য! কিন্তু এই মতের মধ্যে কতখানি সত্য এবং কতখানি মিথ্যা আছে—তাহা আলোচনার বিষয়। আমাদের বিবেচনায় উক্ত মত ভিত্তিহীন।

ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের আশে পাশে যে সকল বৃহত্তম মন্দির দেখা যায়,—তন্মধ্যে পার্ব্বতীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মন্দিরটী প্রধান মন্দির নির্ম্মাণের দুই শত বর্ষ পরে, বিজয় কেশরীর রাজত্বকালে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার কারুকার্য্যের বৈচিত্র্য দর্শন করিলে, দর্শকমাত্রকেই স্তম্ভিত হইতে হয়। স্বভাব সুন্দর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি,—তাহাদের বিবিধ ভঙ্গী, বঙ্কিমলতা—তাহার সর্ব্বত্র সুপেলব পত্রপুষ্পসৌন্দর্য্য—উৎকল শিল্পীর অসাধারণ ক্ষোদন কৌশলের বিন্যাসপটুতার পরিচায়ক। এবং তাহার চারিধারেই প্রাচ্যশিল্পের একটী দর্শন-মধুর আলোক-ছায়া-মাধুরী যেন অজানিত পরীরাজ্যের একটা বিচিত্র বিভ্রম-জাল রচনা করিতেছে!

ইহার পর, ভোগ-মণ্ডপ। এখানে ভুবনেশ্বরের ভোগাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। তাহার পরে নাটমন্দির, মোহন এবং সর্ব্বশেষে প্রধান দেউল। পুরীর জগন্নাথের মন্দির চারিভাগে বিভক্ত। ভুবনেশ্বরও তাহাই। মোহন এবং প্রধান মন্দিরটীর নির্ম্মাণকাল এক; ভোগমণ্ডপ এবং নাটমন্দিরটীর নির্ম্মাণ আদর্শ এতদুভয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দুইটী আরো আধুনিক।

প্রধান মন্দিরের উচ্চতা ১৬০ ফুট, কলিকাতার মনুমেণ্টের উচ্চতা গৌরবও ইহার নিকটে খর্ব্ব। প্রাঙ্গণতল হইতে মন্দিরের দেওয়াল ৫৫ ফুট উচ্চে উঠিয়াছে। তাহার পর ছাদ! দেওয়াল হইতে মন্দিরের চূড়ার পরিমাপ ১০৫ ফুট। মন্দিরটি মণ্ডলাকার। সর্ব্বোচ্চ চূড়ার নিম্নভাগে চারিদিকে দ্বাদশটী বিনতজানু সিংহমূর্ত্তি।

মন্দির গাত্রে, চারিদিকেই অনেকগুলি কুলুঙ্গি বা কোটর আছে। তাহার ভিতরে ভিতরে সংখ্যাতীত পৌরাণিক মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি পাছে প্রাকৃতিক বিপ্লবে নষ্ট হইয়া যায়, সেই ভয়ে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতির এখানে প্রবেশ নিষেধ বটে,—কিন্তু তথাপি এমন মূর্ত্তি একটীও দেখিলাম না, যাহা অখণ্ড আছে। এই দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পাণ্ডারা বলিল, সেনাপতি কালাপাহাড়ের অত্যাচারে মূর্ত্তিগুলি ভগ্নচূর্ণ হইয়াছে।

মন্দিরের প্রায় মধ্যস্থলে একটী বিরাট সিংহমূর্ত্তি আপনার অর্দ্ধদেহ শূন্যে প্রসারিত করিয়া আছে। নিম্নভাগে কোনখানে ইন্দ্র, কোনখানে কুবের এবং কোনখানে বা অগ্নি ও যম প্রভৃতির ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি। একজায়গায় প্রস্তরের উপরে কেশরী রাজবংশের চিহ্ন-সূচক কারুকার্য্য। অনেকে বলেন, উহা কেশরী বংশের "Coat of Arms." নাটমন্দিরের কক্ষতলে, একটী শায়িত বলদ-মূর্ত্তি;

—হঠাৎ দেখিলে দ্বিধায় পড়িতে হয়, যে উহা জীবন্ত কি না। বাস্তবিক, এই বলদ মূর্ত্তিটী উৎকল-ভাস্কর্য্যের একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মন্দিরটি এখন জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে বসিয়া গিয়াছে। জগমোহনে, আলোক প্রবেশের জন্য যে গবাক্ষগুলি ছিল, তাহাও প্রস্তরাদি দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ বিরাট ছাদভারে গবাক্ষ পার্শ্ববর্ত্তী স্থান বসিয়া যাইতেছিল। একে ত মন্দিরের ভিতরে আলোক আসিবার সুযোগ এক প্রকার ছিল-ই না, তাহাতে গবাক্ষ গুলি রুদ্ধ হওয়াতে মন্দিরাভ্যন্তরে অমা-রজনীর অন্ধতামস প্রসারিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের কারুকার্য্যের পরম-পরিণতি নাটমন্দিরে দেখা যায়! এক জায়গায় নীল পাথরের উপরে শিল্প সুন্দর ক্ষোদন দেখিয়া আমরা মুগ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি সে শিল্প! যেন একটা প্রজাপতির পাখা! যেন একটা চিত্রিত স্বপ্ন!

আর এক জায়গায় একটি কুঠরির ভিতরে এক বৃহৎ রমণীমূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তির আপাদ-মস্তক অলঙ্কার জড়িত। আর সে অলঙ্কারের ক্ষোদনশিল্প এমন সূক্ষ্ম যে, তাহা বর্ণনাতীত। মন্দির গাত্রে, সর্ব্বত্রই যে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আছে,—তাহাও কি অবহেলার যোগ্য? দেখিলেই মনে হয়, তাহাদের প্রত্যেকটীর উপরেই শিল্পের কমনীয় সৌন্দর্য্য-রেখা মুদ্রিত করিয়া দিতে শিল্পিগণ সাধ্যমত যত্নের ত্রুটি করে নাই! প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখেই বিভিন্নপ্রকার ভাবের বিকশিত সৌন্দর্য্য। কেহ আলিঙ্গনোন্মত্ত, কেহ হর্ষোৎফুল্ল, কেহ জপমগ্ন। কেহ প্রণয়ভাষণপুলকিত, কেহ রণগমনোদ্যত, এবং কেহ ক্রোধকুটিলনেত্র। এমনি কত বিচিত্র লীলা। নিপুণ কর্ম্মিগণের হাতে অমন যে কঠিন প্রস্তর, তাহাও যেন ফুলের মত কোমল হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, উৎকলের ভাস্কর্য্যশিল্প তেমন উন্নত নয়। স্থাপত্যে উৎকলের প্রতিদ্বন্দ্বী জগতে নাই। কিন্তু ভাস্কর্য্যের উন্নত আদর্শ, উৎকল-শিল্পীর হাতে পরিণতি লাভ ত, করিতেই পারে নাই, পরন্তু খর্ব্বতা-লাভ করিয়াছে। হাণ্টার সাহেব বলিয়াছেন যে,—

"The warriors form models of manly grace and the ladies frequently exhibit that exquisite type of face which the Grecian Artists have left behind them alike in Eastern and western India." অর্থাৎ উৎকল ভাস্কর্য্যের যোদ্ধাগণ পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্থানীয় এবং গ্রীসদেশীয় শিল্পীরা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে পরম রমণীয় মুখের শ্রী-সৌন্দর্য্যের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, রমণী মূর্ত্তি সকলে প্রায়ই তাহা দেখা যায়।"

৺ বলেন্দ্রনাথও লিখিয়াছেন "ভুবনেশ্বরের দেওয়ালে কতকগুলি উন্নতগ্রীবা দীর্ঘাবয়বা নারীমূর্ত্তি দেখিলে এমনি য়ুরোপীয় ছাঁচের বোধ হয় এবং কোন কোনটীর ভঙ্গী এমনি য়ুরোপীয় যে, গ্রীকপ্রভাব অস্বীকার করিতে বিস্তর চেষ্টার আবশ্যক করে। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বতী-মূর্ত্তির সন্নিহিত নিভৃতকোণে কলানিপুণা রমণীগণের মধ্যে সহসা গ্রীসীয় লায়র যন্ত্রহস্তা নারীমূর্ত্তি দেখা যায়, তখন চমকিয়া উঠিতে হয়—এ কি গ্রীস না ভারতবর্ষ!"

উৎকল ভাস্কর্য্যে গ্রীসীয় শিল্পের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়, তাহা অস্বীকার্য্য নয়, কিন্তু গ্রীসীয় ভাস্কর্য্যকে অনুকরণ করিয়াও উৎ-

কলীয় শিল্পিগণ শ্রেষ্ঠতালাভ করিতে পারেন নাই। উৎকলভাস্কর্য্য প্রভৃত কয়েকটী সুগঠিত মূর্ত্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে,—কিন্তু সহস্র সহস্র মূর্ত্তির মধ্যে মাত্র সেই কয়েকটির শিল্পগৌরব কতটুকু? ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, একমাত্র সাঁচীর ভগ্নচূর্ণ ভাস্কর্য্যকীর্ত্তি এ বিষয়ে সমগ্র উৎকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতকথা, ভাস্কর্য্য শিল্প ভারতের অন্যান্য প্রদেশেই যথার্থভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল এবং উৎকলীয় শিল্পিগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াও শিল্পের শাশ্বত প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহারা যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে অক্ষম ছিলেন, তাহা নয়, পরন্তু মৌলিক পরিকল্পনার অভাবই তাঁহাদের অকৃতকার্য্যতার একটী প্রধান কারণরূপে বিবেচিত হইতে পারে। নতুবা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে এবং গঠন-পারিপাট্যে, তাঁহারা কোন দেশের শিল্পকর্ম্মীর অপেক্ষা হীন ছিলেন না।

এখন, বিন্দুসরোবর সম্বন্ধে কিছু বলিয়া, আমরা উপস্থিত অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

বিন্দু সরোবর বা সাগর, ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে ছয় শত হাত উত্তরে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বরে, প্রধান ও পবিত্র সরোবরের সংখ্যা আটটী। তাহার ভিতরে বিন্দুসাগরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উক্ত আটটী সরোবরের নামঃ—

১। বিন্দুসাগর। ২। গঙ্গা-যমুনা।
৩। কোটিতীর্থ। ৪। পাপ-নাশিনী।
৫। অলাবুকুণ্ড। ৬। ব্রহ্মকুণ্ড।
৭। মেঘকুণ্ড। ৮। রামকুণ্ড।

হিন্দুগণের শাস্ত্রমতে সকল তীর্থের পবিত্র সলিলে বিন্দুসাগর পূর্ণ হইয়াছে।

এই সরোবরের পরিমাপ, ১৩০০×৭০০ ফুট। ইহার গভীরতা, ১৬ ফুট। আগে, ইহার চারিদিকেই পাথরে বাঁধানো সোপান শ্রেণী বিরাজিত ছিল,—এখন অন্যান্য দিকের সোপান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কেবল একদিকে বর্ত্তমান আছে। সরোবরের মধ্যস্থলে একটী কৃত্রিম দ্বীপ আছে, তাহার পরিমাপ, ১১০×১০০ ফুট। দ্বীপের উত্তর পশ্চিম কোণে একটী ছোট মন্দির। মন্দিরের সমুখে একটী চাতাল এবং তাহার মধ্যস্থলে একটী শিল্পোৎকর্ষ-রম্য উৎস আছে। পুরীতেও এইরূপ দ্বীপ সমেত একটী সরোবর আছে, তাহার নাম "নরেন্দ্র তালাও। কিন্তু বিন্দুসাগর তদপেক্ষা বৃহৎ। বিন্দুসাগরের জল, এখন অযত্নে এবং অসংখ্য যাত্রীর স্বেচ্ছা-কৃত ব্যবহারে তেমন পরিষ্কার নাই। সরোবরের জলে নাকি অসংখ্য কুমীর আছে। কিন্তু পাণ্ডারা যথেষ্ট ভরসা দিয়া থাকে, যে এই কুমীরেরা পিতৃপিতামহ পর্য্যায়ক্রমে এখানেই পরমসুখে বসবাস করিয়া আসিতেছে এবং দেবাদিদেবের ভয়ে, তাহারা মানুষের কোন অপকার করে না। তাহারা একেবারেই পরম বৈষ্ণব শুনিয়া, আমার সঙ্গী বন্ধুবর্গ ধর্ম্মের অপার লীলা ভাবিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে জলে সাঁতার দিতে লাগিলেন।

আগে, এই সরোবরের দৃশ্য বড়ই চমৎকার ছিল। ইহার চারিদিকে ঘন-বন-শ্যামা ছায়ালোকক্রীড়াবিচিত্রা ভূমি। সেই বনের মাথায় মাথায়, মন্দিরের পর মন্দির,—তাহার পর মন্দির—এই রূপ সপ্তসহস্র দেবায়তনের সপ্ত-

সহস্র চূড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠিত,—এবং সন্ধ্যা সমাগমে যখন সেই সপ্তসহস্র দেবপীঠের অসংখ্য অর্চ্চকগণের ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠ হইতে ভগবানের অনাহত উদাত্ত মহিমাগাথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত,মন্দিরের অযুতদীপমালার উজ্জ্বল-আলোক যখন বিন্দু সাগরের অমলজলের সহিত তালে তালে নাচিতে থাকিত, তখন স্বর্গের সৌন্দর্য্যও বুঝি ম্লান হইয়া যাইত! আজ আর সে দিন নাই। এখন কয়েক শত মাত্র মন্দির আছে, তাহাও পতনোন্মুখ,—ধ্বংস,—ভগ্ন! এখন কেবল যেন একটা অটল গাম্ভীর্য্য বিপুলবেদনাভার বক্ষে চাপিয়া এই পুণ্য ভূমিতে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছে! আর তাহার চারিদিকে, শ্যামায়িত বনস্পতির শাখায় শাখায় উন্মাদ পবনের রোদন-মাখা বেহাগ তান যেন অন্তরের স্মৃতি-কাতর মৌন ভাষার সহিত করুণ সুর জুড়িয়া দিতেছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পোষ্যপুত্র।

৩১

বাড়িখানির দরজার উপরে পাথরের উপর সোনালি অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা আছে আশ্রম। আশ্রমের পশ্চাতে বাগানের শেষ-ভাগে পেয়ারা ও লিচু গাছের মধ্য দিয়া একটি ছোট কুটির দেখা যাইতেছিল,—সেই কুটিরে ছেলেদের কথিত স্বামীজি আসিয়া বাস করেন।

মাটির দাওয়ায় মৃগচর্ম্মে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর নিকট কম্বলের আসনে শিষ্য বসিয়া আছেন! বাঁশের খুঁটি জড়াইয়া তরুলতা ও ঝুমকাফুল খোলার চালের উপর পর্য্যন্ত ছাইয়া রহিয়াছে, মাটির দেওয়াল আইভি জড়িত হইয়া ছবিখানির মতন দেখাইতেছিল। ঘরের দরজাটি ভেজান আছে; ভিতরে সুমার্জ্জিত পিত্তলের কমণ্ডলু, একটি ধুনাচি ও পিত্তল পিলসুজের উপর একটি প্রদীপ ভিন্ন একখানি কম্বলের শয্যা মাত্র উপকরণ। শীতের স্বল্পায়ু সূর্য্যকিরণ সেই শাখা-নিবিড় বৃক্ষান্তরাল দিয়া সাদরে গুরু-শিষ্যের অঙ্গ বেষ্টন করিয়াছিল। চারিদিকের গাছগুলায় বুলবুল পাপিয়া চড়াই প্রভৃতি পাখীরা আনন্দ কলরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। একটি চক্রবাকমিথুন নদীতীরে তাহাদের সারারজনীর আগতপ্রায় বিচ্ছেদাশঙ্কায় মৌন-বিষাদে মুখামুখি বসিয়া আছে। মাছরাঙ্গা ও বকগুলা শিকারের চেষ্টায় তখনও জলের মধ্যে পা ডুবাইয়া উৎসুক নেত্রে ঘুরিতেছে। কর্ম্ম-ক্ষেত্র সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণীটি প্রতিনিয়ত তাহাদের কর্ম্মকেন্দ্রের চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহই কর্ম্মহীন নয়।

শিষ্য কিছুক্ষণ সেই সমস্ত চাহিয়া চাহিয়া দেখিল; তার পর দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল "তবে কি আপনি কর্ম্মযোগকেই প্রধান যোগ ও গৃহস্থাশ্রমকে প্রধান আশ্রম বলেই মনে করেন?" গুরু কহিলেন "আমার এই প্রকার ধারণা।"

"মার্জ্জনা করবেন, তবে সে আশ্রম ত্যাগ করে আপনি কেন এপথে এসেছেন?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন, বলিলেন,"ঈশ্বরের

অভিপ্রায়ে, বৎস ! আমাকে আদর্শ করোনা ; আমরা মহাজনের পদানুসরণ করতেই উপদিষ্ট হয়ে থাকি।"

"গুরুদেব সেই উপদেশ তো "শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মাকুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ:"। তাতো আমায় বলচেন না।"

"নীরদ ! তুমি যে ভুলপথ ধরে বসে আছ। তোমার যাবার দরকার কোন্নগর তুমি পঞ্জাবমেলে চড়ে বসলে। এখন অগত্যাই সেইখান থেকে ফিরে আবার পেসেঞ্জারে চাপতে হবে। তোমাদের মহাজন ভগবান্ শঙ্কর নহেন। নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রই হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ।"

শিষ্য ঈষৎ চমকিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কণ্ঠোত্থিত দীর্ঘ নিশ্বাসটা অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধ স্ফুটস্বরে আপনা-আপনি বলিল "রামায়ণের রামচন্দ্র, পিতৃবৎসল পত্নী-প্রেমের আদর্শ। গুরুদেব যে পথে মানুষের মুক্তিমার্গে পৌছবার শত বাধা সেই পথকেই আপনি কিজন্যে শ্রেষ্ঠ পথ বলচেন ?

গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "ভরত ও রামচন্দ্র দুজনকেই "বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন একটা পথ বিপদসঙ্কুল কিন্তু সেই পথেই শীঘ্র পৌছন যায়,—আর একটা পথ নিরাপদ কিন্তু গম্যস্থানে পৌছতে বিলম্ব হয়। ভরত কি বলেছিলেন তাত জান ?" তার পর একটু গম্ভীর মুখে বলিতে লাগিলেন "বৎস ! মনে কর তুমি আমি সকলেই আমরা সংসার ত্যাগী হইয়া কৌপীন গ্রহণ করিয়া এই বিরূপাক্ষের দুই তীরে যোগাসনে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার পর ? আমাদের আহার যোগাইবে কে ? তখন যদি ধার্ম্মিক গৃহস্থ আমাদের ডাকিয়া আহার না দেন তবে আমাদের সাধন ভজন যোগ উপাসনা সমুদয়ই তো নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দান করিয়া আহার্য্যান্বেষণে ছুটিতে হইবে ? তবেই দেখ যে নিজে নিষ্কাম নির্লিপ্ত থাকিয়া অন্যের ধর্ম্ম কর্ম্মের সহায় হয় সে বড়—না যে অন্যের উপরে নিজের ভার চাপাইয়া দিয়া নিজের ভাবনা মাত্র লইয়া রহিল সে বড় ?"

শিষ্য চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কথা কহিলেন না। গুরু পুনশ্চ কহিলেন "আমার নিজেরি উদাহরণ দেখ, পূর্ব্বে আমি দশজনকে অন্ন দিতাম, নিজের সঙ্গে অন্য পাঁচজন আত্মীয় স্বজনের শুদ্ধ জীবিকার উপায় করতাম,—কিন্তু এখন আমি কি করছি ? নিজের আহার অবশ্য বন্ধ হয়নি তা অন্য পাঁচজনে যোগাচ্চে ; কিন্তু অন্যের আহার যোগাবার আমার যেটুকু ক্ষমতা ছিল সেইটুকুই ত্যাগ করেছি। গৃহীই যথার্থ স্বার্থত্যাগী ; সে যা কিছু করে সকলি প্রায় অন্যের জন্য—পিতামাতা পত্নীপুত্র আত্মীয়পর কারও না কারও জন্য ; কিন্তু সন্ন্যাসী যা কিছু করে সে সমুদয়ই তার নিজের জন্য। গৃহীর ধর্ম্ম কি বড় নয় ?"

নীরদ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল,"কিন্তু সেরকম গৃহস্থ এখন আর কৈ ?" গুরু কহিলেন, "আছে বৈ কি বেটা অনেক আছে। অধার্ম্মিক গৃহস্থ ও ভণ্ড সন্ন্যাসী উভয়েরি সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, কিন্তু তুলনায় বোধ হয় ভণ্ড সাধুর সংখ্যাই অনেক বেশি। বৎস তোমার সঙ্গে আমার তো এ বিষয়ে অনেক বারই কথাবার্ত্তা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান্ বলিয়াছেন "কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস

পাওয়া অসম্ভব।" নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যুবক আবার বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে দিনান্তের শেষ আলোটুকু শীত-শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাজড়িত ম্লান কুহেলিকায় মিশাইয়া গেল। বারান্দার সম্মুখে শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ কুয়াসা ও হিম জাল ভেদ করিয়া অন্ধকার বনবীথির পরপার হইতে ভাসিয়া উঠিলেন, শীতের বাতাস ঝির ঝির করিয়া শুষ্ক স্থির গাছের পাতা কাঁপাইতে লাগিল, পল্লীবধূদের কোমল ওষ্ঠপুত মঙ্গল শঙ্খধ্বনি তখন থামিয়া গিয়া চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। ব্যগ্র কণ্ঠে নীরদ জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি আমি আমার কর্ত্তব্য করিতে গিয়া অন্যের ক্ষতি করিয়া ফেলি ?

"রামচন্দ্র বনবাসে যাইবার সময় পুরবাসীর শোক দেখিয়াও কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হন নাই, নিজের হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়াও সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে বর্জ্জন পূর্ব্বক রাজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। নীরদকুমার! যার দেশে এখনও সে চিত্র রয়েচে সে কেন বৃথা সন্দেহ পোষণ করে কষ্ট পায়!

শিষ্য নীরদকুমার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অধীর কণ্ঠে কহিল, "সন্ধ্যার সময় চলে যাচ্ছে আমি বিদায় নিই।" নীরদ অপ্রকৃতিস্থ ভাবে প্রণাম করিয়া সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ শেষ হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া গেল; সন্ন্যাসী ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত স্বাভাবিক গম্ভীর ভাবে উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

৩২

সন্ধ্যাবন্দনা সারিয়া বাড়ির মধ্যে না গিয়া নীরদ কুমার সেদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দক্ষিণের খোলা বারান্দায় পদচারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেকদিন পরে আজ আবার যেন তাঁহার স্মৃতিসাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল,- তাহার বৈচিত্র্যময়ী জীবননাটিকা আদ্যোপান্ত একে একে অঙ্কের পর অঙ্কে অভিনীত হইতে হইতে আজ এমন একটি জটিল সমস্যাপূর্ণ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে যে এখানে আটকাইয়া থাকা বা ইহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাওয়াও আর সম্ভব নয়। মহাসমুদ্রে যে ভেলা ইচ্ছাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল আজ হঠাৎ সে চড়ায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, এখানকার আশ্রয় সবলে ঠেলিয়া নীরদ সারাজীবন ভাসিতেও সম্মত ছিল; কিন্তু যে কঠিন আদেশের হস্ত তাহার বাহু ধরিয়া এই দিকেই আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে তাহাকে বাধা দিবার যে শক্তি নাই!

নীরদের সমুদয় শরীর পুনঃপুনঃ কাঁটা দিয়া শিহরিয়া উঠিল। যাহার কাছে মুখ দেখাইবার একটুখানি মাত্র উপায় রাখে নাই; যাহার প্রতি নিজের নিদারুণ ব্যবহার মনে করিলে জগতের সমুদয় অন্ধকার দিয়াও লজ্জিত মুখ ঢাকা পড়ে না,—কেমন করিয়া সে এই অপরাধের কালিমাখা মুখে তাহার সেই অবিচলিত স্থির অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে? সে কি তাঁহাকে ক্ষমা করিবে? সে কখনও ক্ষমা করিতে পারে? সে কি তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা পাইয়াছিল? না না দ্বিধা নয়, লজ্জা নয়, বল চাই, মনে বল চাই, জোর করিয়া হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতেই হইবে,—অপরাধের দণ্ড মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে। যে অহঙ্কার এতদিন

ধরিয়া এই নরক যন্ত্রণা সহ্য করাইল সেই গর্ব্বকে ভূলুণ্ঠিত না দেখিলে বুঝি তাহার ভাগ্য-বিধাতা প্রসন্ন হইবেন না। তবে তাই হোক, তবে তাই হোক! নীরদ একটা থামের গায়ে ভর দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া অনির্দ্দেশ্য অন্ধকারে চাহিয়া রহিল। যদি সে এখনও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে চিরজীবন অনুতাপ করা ভিন্ন তাহার আর দ্বিতীয় পথ নাই। একখানা পাতলা মেঘে চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল, ঝোপের ভিতর হইতে শৃগাল ডাকিতে লাগিল, আকাশে নক্ষত্র দেখা যাইতেছিল না, —বর্দ্ধিতান্ধকারে গাছের গায়ে জোনাকির পুঞ্জ ঝকমক করিয়া জ্বলিতেছিল; নিশ্বাস যেন বুকের মধ্যে আটকাইয়া আসিতেছিল; জোর করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া নীরদ অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল "মা!" মা বলিতেই এক-সঙ্গে অনেক দিনের অনেক কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, ক্রমে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল; আবার সে মৃদুস্বরে বলিল "মা মা মা"! এমন সময় কে তাহাকে স্পর্শ করিল, সে স্পর্শ কি স্নেহপূর্ণ কি সান্ত্বনা মাখান! নীরদ অভিভূত ভাবেই তাঁহার বাহুর মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া মুদিতনেত্রে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল 'মাগো!' সন্ন্যাসী ছোট ছেলেটির মতন তাহার মাথাটা নিজের কাঁধের উপর রাখিয়া কহিলেন "তোমার কি মা আছেন?" নীরদের দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; সে মাথা নাড়িয়া জানাইল যে "না"। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্ষের ভারও অনেকখানি কমিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসী কোন বাধা দিলেন না, গম্ভীর মুখে সস্নেহে তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নীরদের মনে হইল যে, যাকে সে এই মাত্র প্রাণের দারুণ জ্বালায় অস্থির হইয়া ডাকিয়াছিল তিনিই তাহার ব্যাকুল আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অদৃশ্য লোক হইতে মাতৃহৃদয়ের সমস্তটুকু স্নেহধারা এই স্পর্শের মধ্যে ঢালিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক অঙ্গুলীটি তাহার প্রতিশিরার ভিতর দিয়া একটি তাড়িত সঞ্চা-লিত করিয়া দিতেছিল,—এ রকম স্পর্শ সে কতদিন অনুভব করে নাই! এই টুকুর জন্যই যে তাহার মনঃপ্রাণ নিদারুণ তৃষ্ণায় শুখাইয়া উঠিয়াছিল,—সমস্ত জীবনের বিনিময়েও সে যে শুধু এইটুকুই চাহিয়াছে; শুধু এই টুকুই চাহি-তেছে,—তাহা আজ সে জীবনে এই প্রথমবার যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল। সারাজীবনটা বুঝি এই পাওনাটুকুর অভাবেই তাহার এমন ব্যর্থভাবে কাটিয়া গেল,—এইটুকু দাবীই বুঝি তাহার চিত্তে বাল্যাবধি দুর্জ্জয় অভিমানরূপে জাগিয়া রহিয়াছিল। মাতৃকরতলের স্নেহ তাড়-নায় তো তাহা প্রসুপ্ত হইবার অবসর পায় নাই; মাতৃ স্তন্যের ক্ষীর ধারায় তো সে শুষ্ককণ্ঠ আর্দ্র হইবার সময় পায় নাই, তাই সে বুঝি এতদিন বিশ্বস্তহৃদয়া বালিকার কল্যাণময় প্রীতি স্পর্শেও সঙ্কুচিত সন্দেহে কেবল নিষ্ক্রিয় কাঁটার দিকেই বদ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখিয়াছে, ওজনের ফাঁকি ধরিয়া লড়াই করিয়া বেড়াই-য়াছে, বিশ্রামের সুখ চিনে নাই। কেমন করিয়া চিনিবে? সে যে জন্মান্ধ, অভাব ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া আছে, অথচ জানে না যে সে কিসের আকাঙ্ক্ষা;

কোনখানটায় তাহার অভাব ঘটিতেছে। ধূলা-মলিন,কণ্টকক্ষত, ক্লান্ত চরণ, ঘূর্ণিত মস্তক, জীবন যুদ্ধে পরাভূতপ্রায় আজ সে বুঝিল, তাহার হৃদয় কেন ত্যাগের আনন্দ, ক্ষমার শান্তি উপভোগ করিতে,সহ্য করিতে পারে না। পৌরুষ,মনুষ্যত্ব,যশ সমস্তই যেন তাহার কাছে ছায়াবাজির মতন অস্পষ্ট, স্বপ্নের মতন মিথ্যা হইয়া দেখা দেয়। তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা, তাহার মানসিক বল, তাহার কর্ম্মের উদ্দীপনা তাহার নৈতিক উন্নতির "বর্ষ" প্রভৃতি লইয়া তাহার ভক্তগণের আন্দোলন,চারিদিকের অজস্র প্রশংসাবাদ ও ধন্যধ্বনি তাহার চিত্তে যেন জলন্ত লোহার বাড়ি মারে।

সন্ন্যাসী নিঃশব্দে তাহার শিথিল একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া আরো একটু কাছে সরিয়া আসিলেন। ঘরের ভিতর হইতে একটা ঘড়ি বাজিয়া আবার থামিয়া গেল। আকাশে তরল কোয়াশার পাতলা আবরণ সরাইয়া চাঁদ একবার কিছুক্ষণের জন্য পূর্ণ কৌতূহলে উজ্জল মুখে চাহিয়া দেখিলেন। নীরদ এতক্ষণে কথা কহিল "গুরুদেব"? গুরুদেব তাহার ঈষৎ স্থির মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া সকরুণ স্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন "নীরদ"?

"আমি যদি দূরে থেকে প্রায়শ্চিত্ত করি? কাছে যাবার আমার যে উপায় নেই—।" "তাতে কি প্রায়শ্চিত্ত ঠিক হবে নীরদ? তাই কি কর্ত্তব্য?" আবার সেই কর্ত্তব্য। অধীর হইয়া নীরদকুমার বলিয়া উঠিল। "অনেক যে দেরি হয়ে গেছে—এখন এ ভুল কেমন করে শোধরাব তা যে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনে"।

সন্ন্যাসী বলিলেন "নীরদ, মানবের প্রবৃত্তি মানবকে পদে পদে প্রলোভিত করিয়া থাকে, তাই বলিয়াই কি তাহার হাতে শিশুর মত আত্মসমর্পণ করিয়া দিবে? বিলম্বে অন্যায়ের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে থাকে—কমে না।" সন্ন্যাসী তাহার উত্তর প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিলেন। কোন উত্তর বা সাড়া না পাইয়া অবশেষে আবার বলিলেন "পথ খুঁজেছিলে,—সোজা সরল সত্যের পথ তোমার সম্মুখে। সাহস করে, দ্বিধাহীন হয়ে, কোন দিকে না চেয়ে চলে যাও। দেখবে গম্যস্থানে পৌঁছান কিছুই কঠিন নয়"।

মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া অবরুদ্ধ স্বরে ক্ষীণকণ্ঠে নীরদ কহিল "কিন্তু আমি যদি কাহারও সুখের হন্তারক হই? যদি কেহ আমার কার্য্য ফলে অসুখী হয়?"

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, এই মহাবাক্য ভুলিও না? কর্ত্তব্য কর্ম্মে দ্বিধা করিতে নাই।"

চাঁদের আলোয় যে মুখ মরণাহত রোগীর মুখের মতন ম্লান দেখাইতেছিল, মুহূর্ত্তে তাহা নবীন স্বাস্থ্যের উজ্জলতায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল, দুই পায়ের ধূলা লইয়া মস্তকে দিল, তার পর উঠিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল "আশীর্ব্বাদ করুন আপনার উপদেশে কর্ত্তব্য পালনে যেন আর দ্বিধাযুক্ত না হই। ভাগ্যে যা হয় হোক।" সন্ন্যাসী তাহার শ্রদ্ধান্বিত মস্তকে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন"।

ইংরাজের দৌত্য।

সময়—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

(২)

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাহাদুর যখন দেখিলেন যে উৎকোচ ও অন্যান্য অসদুপায়ে ইংরাজ কোম্পানি বাৎসরিক মাত্র তিন সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে অবাধ বাণিজ্যের অধিকারী হইয়াছেন এবং ইচ্ছামত দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতেছেন, তখন হিন্দু ও অন্যান্য বণিকগণ যে হারে শুল্ক প্রদান করিয়া বাণিজ্য করিতেন, তদ্রূপ হার ইংরাজ দিগের নিকট দাবী করিলেন। অবশ্যই ইংরাজগণ এ প্রস্তাবে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বিলাতে তাঁহাদের ডিরেক্টরগণের নিকট মত চাহিয়া পাঠাইলেন। ডিরেক্টরগণ নবাবের এই আচরণের বিরুদ্ধে দিল্লীতে বাদসাহ সকাশে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা দিলেন এবং যাহাতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের অধ্যক্ষগণ বাংলার অধ্যক্ষের সহিত একত্র হইয়া এই কার্য্য করেন তজ্জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন।

কলিকাতার শাসনকর্ত্তা বঙ্গদেশ হইতে সারমান ও ষ্টিভেনসন নামক দুইজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করিলেন। ইংরাজী ও পারসী ভাষাভিজ্ঞ খোজা সারহদ নামক একজন আর্ম্মানী এবং ডাক্তার হ্যামিল্টনও এই কার্য্যের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতার সদস্যগণ বা খোজা সারহদ তৎকালীন দিল্লিদরবারের আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না! কিন্তু একমাত্র লাভাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়াই খোজা সারহাদ এই দৌত্যকার্য্যে সহকারী হইলেন। ইঁহারা কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে যাত্রা করিয়া প্রথমে পাটনা পরে তথা হইতে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই দিল্লী পৌছেন। মাত্র তিন মাস সময় পথে অতিবাহিত হইয়াছিল! এই দৌত্যকার্য্য সংক্রান্ত পত্রগুলি মান্দ্রাজে রক্ষিত আছে;—ইহা হইতে আমরা দিল্লীর তৎকালীন অনেক অবস্থা অবগত হই।

দিল্লীর প্রথম পত্র—তারিখ ৮ই জুলাই, ১৭১৫ সন—"গত ২৪শে জুন আমরা আগ্রা হইতে আপনাদিগকে (কলিকাতায় সদস্যগণকে) পত্র দিয়াছি। জাঠদিগের হস্তে আমাদিগের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই; তবে এক রাত্রিতে কতকগুলা দস্যু তিনবার আমাদের বিরক্ত করিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। ৩রা জুলাই আমরা ফরক্কাবাদ পৌছি। তথায় পাদ্রী ষ্টিফেনাস্ আমাদের নিকট দুইটী সিরপাঁ আনেন—আমরা যথোচিত সমাদরের সহিত উহা গ্রহণ করি। ৪ঠা তারিখে আমরা দিল্লী হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বাওড়াপুলে পৌছি এবং দরবারে শীঘ্র প্রবেশাধিকারলাভের চেষ্টায় জন্য পাদ্রীকে দিল্লী পাঠাইয়া দিই। ৭ই তারিখে আমরা রীতিমত সাজসজ্জাসহ দিল্লী প্রবেশ করি। সম্রাট দুহাজারী মনসবদার এবং দুইশত অশ্বারোহী ও

পদাতিক সৈন্য আমাদের অভ্যর্থনার্থ প্রেরণ করেন।* নগরের মধ্যে পৌছিলে খানবাহাদুর সলাবৎ আমাদিগকে প্রাসাদ পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তথায় আমরা বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। ইতিপূর্ব্বে খানদৌরান বাহাদুর † আমাদের বিশেষ সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন এবং আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবেন এরূপ আশ্বাস দেন। দুইপ্রহরে সম্রাট দরবারী হইলেন এবং সেই সময়ে আমরা সকলেই উপঢৌকন দ্রব্যের কিছু কিছু নিজ নিজ হস্তে করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলাম। উপহারের মধ্যে হাজার এক স্বর্ণমোহর, মূল্যবান প্রস্তরাদি সমন্বিত ঘড়ী, পৃথিবীর মানচিত্র, গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য উপহার এবং তৎসহ গবর্ণরের পত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ‡ সারমান এবং সাদ্দহাদকে সম্রাট মূল্যবান খেলাৎ দিলেন এবং আমরা সকলেই বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইলাম। নির্দ্দিষ্ট বাসা বাটীতে উপনীত হইলে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ রসদ দেওয়া হইল। সন্ধ্যার সময় সলাবৎখান পুনরায় আমাদের তত্ত্বানুসন্ধানে আসিয়া নানারূপ গল্পে দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিলেন। আমরা প্রথমে খানদৌরানের ও পরে উজীর ও অন্যান্য সকলের সহিত সাক্ষাতের জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলাম। উজীরকে অসন্তুষ্ট করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু খানদৌরান যখন আমাদের প্রতি বিশেষ কৃপান্বিত, তখন ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দেখিলাম না।"

১৭ই জুলাই তারিখে দিল্লী হইতে যে পত্র লিখিত হয় তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে ইংরাজ দূতগণ জৌদি খাঁ নামক একজন সভাসদের পরামর্শে কার্য্য করিতেছিলেন। পত্র নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিত হইয়াছিল "দিল্লী ১৭ই জুলাই—আমরা পূর্ব্বেই দিল্লীতে নির্ব্বিঘ্নে পৌছা সংবাদ পাঠাইয়াছি এবং সেই পত্রে বাদসাহের সহিত সাক্ষাতের কথাও লিখিয়াছি। তৎপর, আমরা উজীর আবদুল্লা খাঁ ও খানদৌরানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি;

* সম্রাটের উপঢৌকনের আনুমানিক মূল্য সাড়ে চারি লক্ষ টাকা কিন্তু খোজা সারহাদ দিল্লীতে যে সমস্ত পত্র লেখেন তাহাতে জানান্ যে উহাদের মূল্য পনর লক্ষ টাকা। সম্রাট এই সংবাদ লোকপরম্পরায় অবগত হইয়া, যে যে প্রদেশের মধ্য দিয়া ইংরাজদূতদিগের দিল্লী যাইবার পথ নির্দ্দিষ্ট হয় সেই সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে তাঁহারা যেন এই দৌত্য-বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের রীতিমত বন্দোবস্ত করেন।

† খোজা হোসেন বঙ্গদেশ হইতে ফেরোকসিয়ারের সমভিব্যাহারে দিল্লি আইসেন। ইনি সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সম্রাট সিংহাসনারোহণ করিয়াই ইঁহাকে খানদৌরান উপাধি দেন। ইনি সম্রাটের বেতন বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন এবং সম্রাট ইহার পরামর্শ অনুসারেই সকল কার্য্য করিতেন।

‡ "1001 gold mohurs, the table clock set with precious stones, the unicorn's horns, the gold escretoire ,the large piece of amber greese, and chelumgie Manilla work and the map of the world.' Vide Wheeler's Early Records of British India. Escretoire অর্থাৎ লিখিবার টেবিল ambergreese সমুদ্রে ভাসমান একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। ইহা উষ্ণ-প্রধানদেশের সমুদ্রের উপকূলে অথবা তিমি মৎস্যের উদরে পাওয়া যায়।

উভয় স্থলেই আমরা সসম্মান অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছি এবং যাহাতে কার্য্যাদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহার ভরসাও পাইয়াছি। এপর্য্যন্ত যাহা করিতেছি তাহা জোদির্খাঁর পরামর্শানুসারেই করা হইতেছে। * গত ১১ই তারিখে আমরা ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। ইংরাজদিগের নিকট যে তিনি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ একথা তিনি বারংবার বলিলেন এবং এপর্য্যন্ত যদিও কোন প্রত্যুপকার করিতে পারেন নাই—এইবার করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। যাহাতে আমরা খানদৌরান এবং সালাবৎখার মন্ত্রণানুসারেই সকল কার্য্য করি তজ্জন্য বিশেষ উপদেশ দিলেন। যখন আপনার (গবর্ণরের) পত্র তাঁহার নিকট পাঠাই, তখন তিনি পত্রেও এই উপদেশ দেন। আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে তিনি বন্ধুর ন্যায়ই উপদেশ দিতেছেন। আমরা তাঁহার উপদেশানুযায়ীই কার্য্য করিতেছি। কিন্তু যাহাতে উজীর অসন্তুষ্ট না হন সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। জোদির্খাঁর দরবারে বিশেষ আধিপত্য এবং পূর্ব্ব হইতেই যাহাতে দরবারে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয় তজ্জন্য কোন্ সময়ে আর্জী পেশ করিব, তাহা তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছি।"

সম্রাট ফেরোকসায়ারের সহিত যে সৈয়দ ভ্রাতাদের মনোমালিন্য গুরুতর হইয়া উঠিতেছে তাহা পত্রপত্রে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই পত্র দিল্লী হইতে ১৭১৫ সনের ৪ঠা আগষ্ট লিখিত। "পূর্ব্বেই আমি জানাইয়াছি যে সম্রাট ধর্ম্মালোচনার ছলে নগর পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছেন। দুর্গে-বাস তিনি পছন্দ করিতেছেন না, কেননা সেস্থানে তিনি স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারেন না। রাজ্যের ওমরাহগণ তাঁহাকে নগরে প্রত্যাবর্ত্তনে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু বাদসাহ কোন সময়ে লাহোর যাইবেন, এবং কোন সময়ে আজমীরাভিমুখে যাইবেন এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। আমরা এই সমস্ত সংবাদে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছি। কি করিয়া যে মূল্যবান উপঢৌকনাদি স্থানান্তরিত করিব তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। যাহা হউক অবশেষে স্থির হইয়াছে বাদসাহ সহরে না থাকিলেও যথা সত্বর তাঁহার সহিত দেখা করা কর্ত্তব্য। এই সংকল্পে আমরা জাপানী টেবিল এবং বন্দুকাদি প্রভৃতি উপহার দ্রব্যসহ সম্রাটের সহিত তাঁহার ছাউনিতেই সাক্ষাৎ করিলাম। দ্বিতীয় দিনে একশত থান বস্ত্র, তৃতীয় দিনে আরও নানা প্রকার বস্ত্রাদি এবং চতুর্থ দিনে

---

* জোদির্খাঁর বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে তিনি ইংরাজদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাহা জানা যায়। Wheeler তাঁহার Early Recordsএ লিখিয়াছেন "Accordingly a friendly letter was sent to Mr. Pitt, by an influential official named Zoudi Khan. The Moghal minister professed great kindness for the English and made a tender of his services to the Madras Governor. Mr. Pitt promptly asked for a firman confirming all the privilege which had been granted by Aurangzeb. The request was acceded to with equal promptitude." *p. 116.*

নানা প্রকার বহু মূল্যবান বস্ত্রাদি উপহার দিয়া নগরে ফিরিয়া আসিয়া, আরও যাহা ছিল তাহা লইয়া গেলাম। এইবার আমরা ৫টী বৃহৎ ঘটিকা যন্ত্র, দ্বাদশ খানি দর্পণ এবং ভূমণ্ডলের মানচিত্র খানি উপহার পাঠাইলাম। সম্রাট সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিয়া যতদিন তিনি নগরে না ফেরেন ততদিন ঘড়িগুলি আমাদের জিম্মায় রাখিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ পাওয়াতে সম্রাটকে আমরা অন্যান্য দ্রব্যাদি উপহার দিতে পারিলাম না। সম্রাট ঘোষণা করিলেন যে দিল্লী হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরে একটী তীর্থস্থানে যাইয়া তথা হইতে সত্বরে প্রত্যাগমন করিবেন। আমরা ষ্টিফেনসন এবং ফিলিপ সাহেবকে সত্বরে দ্রব্যাদির হেপাজতে রাখিয়া সম্রাটের সহিত যাইতে মনস্থ করিলাম। আবশ্যক হইলে যেন ষ্টিফেনসন সাহেব দ্রব্যাদিসহ আমাদের নিকট যান এইরূপ উপদেশ দিয়া আমরা বাদসাহের সহিত দিল্লী হইতে বিশক্রোশ দূরে আসিয়াছি। আরজি দাখিল করিবার জন্য আমরা প্রস্তত হইতেছি। খান দৌরান এবং তাঁহার সহকারী সৈয়দ সলাবৎখান আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। অবশ্যই জোদিখান ত আছেনই,—কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার তত ক্ষমতা নাই। হোসেন আলিখাঁ * সম্পূর্ণ দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্ত্তা + নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত হইয়াছেন যে হোসেন খাঁ সাহানসা সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধেও কি প্রকার কার্য্য করিতেছেন। সেই জন্যই আমরা অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা হোসেনের সহিত সখ্যতা রাখিবেন। নতুবা আমরা যাহাই করিনা কেন, তাঁহার অমতে কিছুই হইবে না।"

দিল্লী হইতে ৩১শে আগষ্ট যে পত্র লিখিত হয় তাহাতে দিল্লীর তদানীন্তন অবস্থার চিত্র আরও পরিস্ফুট হইয়া পড়ে—"আমরা অবগত হইলাম যে হুসেন আলিখাঁ ও দাউদখাঁর সহিত শীঘ্রই বিবাদ ঘটিবে এবং সম্ভবতঃ যুদ্ধও ঘটিতে পারে। দাউদখাঁ দাক্ষিণাত্যের অনেক লোককে তাঁহার পক্ষভুক্ত করিয়াছেন। পরম্পরা শোনা যাইতেছে যে হোসেন খাঁর গর্ব্ব ও প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্যই এ চক্রান্ত। বাদসাহ পানিপথ পর্য্যন্ত যাইয়া ১৫ই তারিখে দিল্লী প্রত্যাগমন করিয়াছেন কিন্তু অসুস্থ থাকাতে দরবারে আইসেন নাই। এই জন্য আমরা বাকী উপঢৌকন দিতে বা স্বকীয় কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি নাই। আগামী ১লা তারিখে পারিব এমন আশা আছে।"

যাহা হউক এই দৌত্যকার্য্য সফল হইবার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছিল। বঙ্গদেশের নবাব ইংরাজদিগের এই অভিযান প্রীতিচক্ষে দেখেন নাই এবং উজীরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সাধ্যমত বাধা দিতেও ত্রুটি করেন নাই। অন্য কোন কারণ না হইলে নবাবের উদ্দেশ্যই সাধিত হইত; কিন্তু এই সময়ে এক অভাবনীয় ঘটনায় নবাব ত অকৃতকার্য্য হইলেনই, ভবিষ্যতে ইংরাজের সুখসূর্য্যও চিরদীপ্তিমান হইয়া উঠিল।

---

* অন্যতম সৈয়দ ভ্রাতা।

+ গুজরাটের শাসন কর্ত্তা। ফেরোকসায়ার হুসেন আলিখাঁকে গুপ্ত হত্যা করিতে ইঁহাকেই আদেশ দেন।

রাজা অজিৎসিংহের কন্যার সহিত ফেরোকসায়ার অনেকদিন হইতেই বিবাহে অভিলাষী ছিলেন। রাজকুমারীও দিল্লি পৌছিয়া ছিলেন। কিন্তু সম্রাট এই সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সম্রাটের কোনও চিকিৎসকই সম্রাটকে আরোগ্য করিতে সমর্থ না হওয়ায় খান দৌরানের পরামর্শে ইংরাজ ডাক্তার হ্যামিলটনকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। ডাক্তার সাহেব অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা সম্রাটকে আরোগ্য করায় তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন—এবং অনেক মূল্যবান উপহার লাভ করেন। * ডাক্তার সাহেব যাহা প্রার্থনাই করুন না কেন তাহাই পূর্ণ করিবেন সম্রাট এমনতর আশ্বাস পর্য্যন্ত দেন। এই সময় হ্যামিল্‌টন নিজস্বার্থ সম্পূর্ণরূপ বিসর্জ্জন দিয়া দূতের অভিলাষ পূর্ণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। † সম্রাট এই নিঃস্বার্থপরতায় মুগ্ধ হইয়া স্বীকৃত হইলেন যে, শুভ-বিবাহান্তেই এই বিষয় বিবেচনা করিয়া তাঁহার যতদূর সাধ্য ইংরেজকে বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিবেন।

নিম্নোদ্ধৃত পত্রে এই বিষয়ের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। "দিল্লী ৭ই ডিসেম্বর—সম্রাটের শুভ আরোগ্য সংবাদ আপনাদের প্রেরণ করিতেছি। সকলকে জ্ঞাত করাইবার জন্য তিনি গত ২৩শে তারিখে আরোগ্য স্নান করিয়াছেন। হ্যামিল্‌টনের যত্ন এবং কৃতকার্য্যতার জন্য ৩০ তারিখে তিনি হ্যামিল্‌টনকে প্রকাশ্য দরবারে মূল্যবান পোষাক, দুইটী হীরকাঙ্গুরীয়ক, একটী হস্তী, একটী অশ্ব, নগদ পাঁচ সহস্র মুদ্রা এবং কোট ও ওয়েষ্টকোটের জন্য স্বর্ণ বোতাম এবং মণিমুক্তা সংযুক্ত ক্রস উপহার দেন। খোজা সারহাদও সেই দিন একটী হস্তী ও একটী পোষাক উপহার পাইয়াছেন।

এই ব্যাপারকে আমরা বিশেষ শুভ মনে করিতেছি। খান দৌরানের অভিপ্রায়ানুসারে, সম্রাটের আরোগ্য লাভের পর বিবাহের সময়োপযোগী কিছু যৌতুক রাখিয়া অন্যান্য দ্রব্যাদি সম্রাটকে অর্পণ করিয়াছি। সেই সময়ে সলাবৎজঙ্গ কিছু অসুস্থ থাকায় নিজে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই কিন্তু আমাদের সুপারেশ পত্র দিয়াছিলেন। সম্রাটের আরোগ্য লাভের সময় হইতে খোজা সারহাদ খানদৌরানকে আমাদের কথা সম্রাটকে স্মরণ করাইয়া দিতে অনুরোধ করিতে ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে কিছুই হইতে পারে না খানদৌরান এইরূপ বলিয়াছেন। রাজ্যের সকল কার্য্যালয়ই বন্ধ এবং এই শুভ উৎসব সুসম্পন্ন না হইলে কোন কার্য্যই হইবে না।

রাজপুতেরা এই বিবাহে বিশেষ সম্মানিত হইবেন। অদ্য সন্ধ্যাকালে সম্রাট সপারিষদ তাঁহার ভাবী সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর

---

* "Among the presents given to Mr. Hamilton on this occasion were model of all his surgical instruments, made of pure gold. Vide Stewart.

† গ্রীসের ইতিহাসে এইরূপ একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্পার্টান লাইস্যাণ্ডারকে যখন সাইরাস উপহার দিবার প্রস্তাব করেন তখন লাইস্যাণ্ডার নিজস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করেন।

হইবেন। দুর্গ এবং রাজপথ আলোক মালায় সুশোভিত হইবে এবং যতদূর সম্ভব সমারোহ হইবে।"*

পরবর্ত্তী পত্রে দিল্লীর তৎকালীন অবস্থা আরও পরিস্ফুট।

"দিল্লী ১০ই মার্চ্চ—আপনারা অবশ্যই দিল্লীর অবস্থার বিষয় কিছু কিছু অবগত হইয়াছেন। তাতার সৈন্তগণ তাহাদের বেতনের জন্য বিদ্রোহী হইয়াছে এবং বলিতেছে যে উজীর কিম্বা খানদৌরানের নিকট হইতে তাহারা ইহা আদায় করিয়া লইবে। উভয় পক্ষেই সৈন্যসংগ্রহ এবং সমাবেশ হইয়াছে। উজীরের পক্ষে প্রায় বিংশতিসহস্র অশ্বারোহী একত্রিত হইয়াছে; ইহারা সদাসর্ব্বদাই উজীরের পার্শ্বচরের ন্যায় রহিয়াছে। খানদৌরান এবং অন্যান্য আমিরগণ তাঁহাদের সৈন্যসামন্ত লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছেন। উজীর তাতার সৈন্য-দিগের বেতন না দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাহা হউক সৈন্যদেরই হার মানিতে হইয়াছে। একটা আপোষ বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তাতারেরা ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। এবং আমির জুমলা।† লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তনে আদিষ্ট হইয়াছেন। সম্রাট চিনক্লিজখাঁকে আমির জুমলার সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়াছেন এবং মীর জুমলার জাইগির প্রভৃতির বাজেয়াপ্তের হুকুম করিয়াছেন। সহরে প্রকাশ,—এ সবই উজীরকে জব্দ করিবার জন্য এবং সুবিধা হইলে তাঁহাকে নিহত করা হইবে। আমিরজুমলা লাহোরাভিমুখী হইয়াছেন কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার পদগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই সমস্ত কারণে কাছারী প্রায় একমাস বন্ধ ছিল এবং আমরা একমাস পূর্ব্বেও যে অবস্থায় ছিলাম বর্ত্তমানেও তদ্রূপই আছি। খানদৌরান সকল সময়েই আমাদের আশ্বাস দেন কিন্তু দেখিতেছি তিনি বড় ঢিলে প্রকৃতির লোক। কিন্তু ইহার উপায় নাই কেননা রাজ্য মধ্যে তিনিই একমাত্র সম্রাটের প্রিয়পাত্র।"

এই পত্রেই শিখগুরু বান্দার কথা আছে। "শিখদিগের প্রধান গুরু বান্দা লাহোরের শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক সপরিবারে ধৃত হইয়াছেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হইল শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁহারা সহরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রকাশ,—তাঁহাকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করিয়া পরে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তাঁহার রাজ্যে যে সমস্ত ধন প্রোথিত আছে সেই ধনের ও সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের সন্ধান বাহির করিয়া লইবার জন্য এখনো তাঁহার প্রতি কোন গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করা হইতেছে না! প্রত্যহ তাঁহার একশত অনুচরকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ৭৮০ জন অনুচরের কেহই প্রাণের জন্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছে না এবং নির্ভীক হৃদয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে।"

---

* "All will appear as glorious as the riches of Hindusthan and two months indefatigable labour can provide."

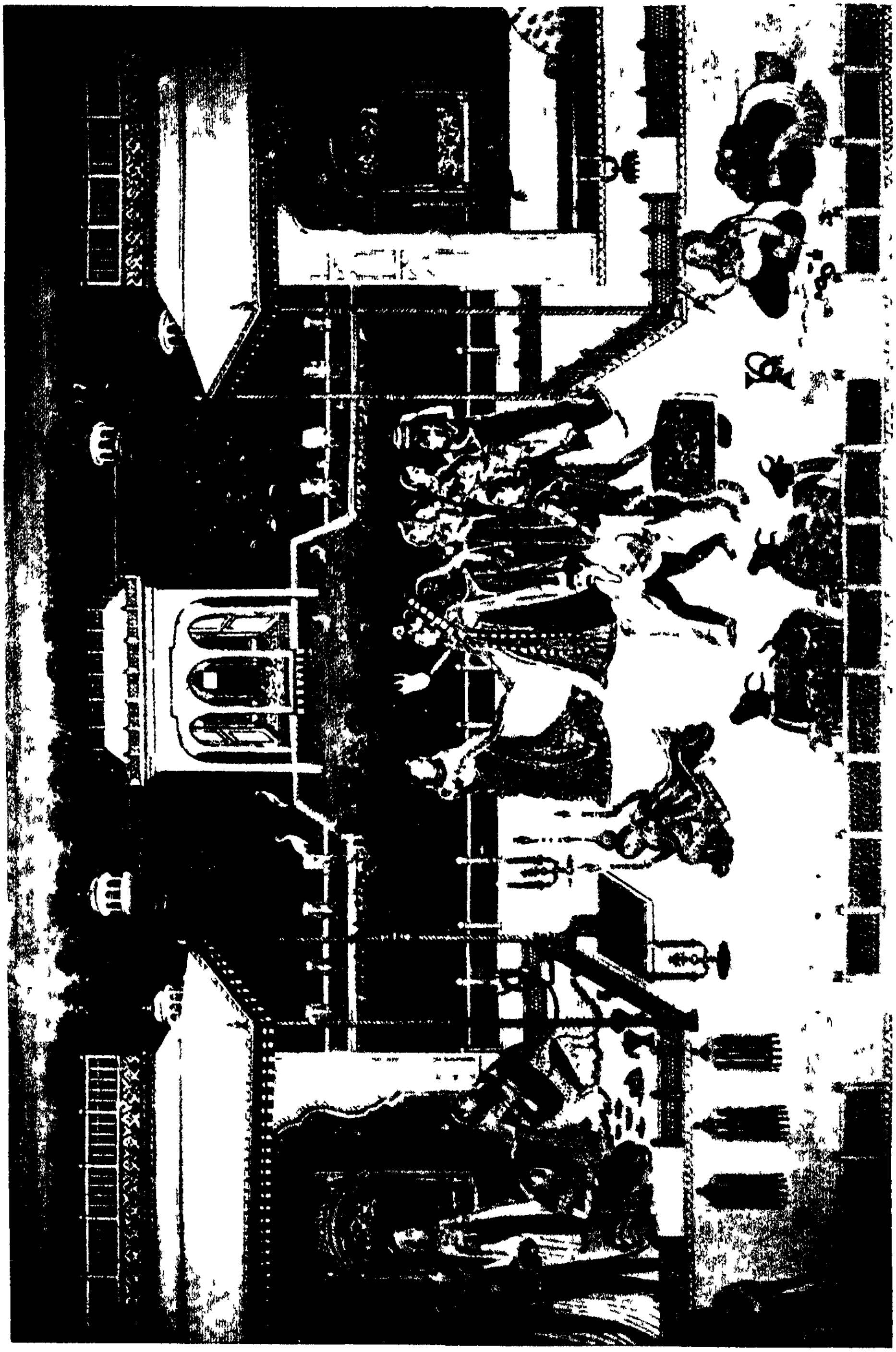
† "Two nights ago, Amir Jumla arrived in this place from Behar, attended by about eight or ten horesmen, much to the surprise of this city; for it is but at best supposed that he has made an elopement from his own camp for fear of his soldiers who mutinied for pay."

পরের পত্রে ইংরাজ দূতের যে সাত ঘাটের জল খাইতে হইতেছিল তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "দিল্লী ২১শে মার্চ্চ—আমরা কয়েকবার খানদৌরানের বিলম্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি। খানদৌরান কখনও প্রকাশ্য সভায় আইসেন না; সুতরাং পাল্কিতে উঠিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কোন কথা বলিবার সাবকাশ ঘটে না। সে অবসরও অনেক দিন পরে পরে পাওয়া যায়। তাঁহার সহকারী সালাবৎখাঁও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সুতরাং কথাবার্ত্তা পত্রাদিতেই হইতেছে। কেবল আশাতেই দিন কাটিতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে যখন খোজা সারহাদ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমাদের দরবারের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, তখন খানদৌরান উত্তর দেন "কেন? আমি তোমাদের সকল কাজই সমাধান করিয়া দিয়াছি।" খোজা সারহাদ বেশী কিছু উত্তর দিতে পারেন নাই। এত সময় নষ্ট করিয়া, এত খরচপত্র করিয়া কি যে করিয়া উঠিতে পারিব তাহা ত বলিতে পারি না! যাহা হউক, আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে খানদৌরানকে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ উপদেশ দিয়াছেন যে, তিনি নিজে কোন কার্য্যে অগ্রসর না হইয়া যেন উজীর দিয়া ইংরাজদিগের কার্য্য সম্পন্ন করান। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে খানদৌরানকে দিয়া কার্য্য সিদ্ধি হইলে উজীরকে কিছু উৎকোচ প্রদানে করায়ত্ত করা যাইবে:—কিন্তু এইক্ষণ কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।"

পর পত্রে দরবারের আভ্যন্তরিণ বৃত্তান্ত। ইহা ২০শে এপ্রিলে লিখিত। "দিল্লী হইতে চতুর্দ্দশ ক্রোশ দূরে সম্রাট শীকারে নিযুক্ত। খানদৌরান ও মাসুদ আমিনখাঁর লোকের কথায় কথায় বিবাদ হওয়াতে একটী খণ্ড যুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে। সম্রাটের নিষেধ সত্ত্বেও দুই ঘণ্টা ব্যাপী এই যুদ্ধে একশত লোক হতাহত হইয়াছে। সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

নানা কারণে এক বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আর্জ্জি খাসদরবারে পেশ হইল। অন্যান্য কথার মধ্যে ইহাতে প্রার্থিত হইল যে "কলিকাতা সভার সভাপতি কর্তৃক দস্তখত যুক্ত দস্তক থাকিলে যেন নবাবের কর্ম্মচারীগণ কোনরূপ খানাতাল্লাসী বা আটক না করেন। মুর্শিদাবাদের টাকশালের অধ্যক্ষগণ যেন সপ্তাহে তিন দিবস ইংরাজদের মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া দেন, ইউরোপীয় বা ভারতবর্ষীয় কোম্পানীর দেনদারকে চাহিবামাত্রই যেন কলিকাতায় সমর্পণ করা হয় এবং ইংরাজ কোম্পানি যেন ৩৮টী গ্রাম খরিদ করিতে পারেন।" সম্রাট তাঁহার সভাসদগণের নিকট এই আর্জ্জির প্রার্থিত বিষয়ের সম্বন্ধে মতামত চাহিলে উজীর গুরুতর বিষয় গুলিতে আপত্তি করিলেন। বাধ্য হইয়া ইংরাজদূত পুনরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় আর্জ্জি পেষ করিলেন, এবার আর উজীর কোন আপত্তি করিলেন না। হুকুম জাহির হইল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাতে সম্রাটের নিজ দস্তখত ছিল না।* খোজাসারহাদও

* উজীরের দস্তখত পরোয়ানা দূর প্রদেশে কার্য্যকরী হইত না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা উজীরের আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হইতেন, কিন্তু সম্রাটের দস্তখতি আদেশ অলঙ্ঘনীয়।



এই সময়ে গুপ্ত পরামর্শ সকল অপরকে জানাইয়া দেওয়াতে ইংরাজদিগের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। বঙ্গদেশের নবাবের কর্ম্মচারীগণও বিশেষ প্রতিবন্ধক দিতে লাগিল। অবশেষে ইংরাজেরা খাস অন্তঃপুরের এক খোজাকে প্রচুর উৎকোচ প্রদান করিলেন। উজীর ইহার পরে আর কোন আপত্তি করিলেন না এবং শীঘ্রই ৩৪টী বিশেষাধিকার সহ পত্র প্রদত্ত হইল এবং ইহাতে সাহনসা সম্রাটও দস্তখত করিয়া দিলেন।

প্রায় দুই বৎসর এই দৌত্যকার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই ইংরাজদূতেরা দিল্লী পৌঁছেন। ১৭১৭ ৭ই জুনের পত্রে তাঁহারা যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

"দিল্লী—৭ই জুন ১৭১৭। গত ২'শে তারিখে সারমান সাহেব সম্রাট হইতে সম্মান স্বরূপ একটী অশ্ব উপহার পাইয়াছেন। অন্যান্য সকলেরই উপহার মিলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী পরিত্যাগের আদেশ ও ছাড়পত্র পাইয়াছেন। কেবল ডাক্তার হ্যামিল্‌টনকে সম্রাটের দরবারে থাকিতে হুকুম হইল। এই আদেশে আমারা মর্ম্মাহত হইলাম। যাহা হউক উজীরের অনেক খোসামোদ করিয়া সম্রাটকে প্রার্থনা জানাইতে তিনি ডাক্তারকে প্রস্থানের অনুমতি দিলেন। ৬ই জুন এই আদেশ পৌঁছিয়াছে।"

ইংরাজদের কার্য্য সাধিত হইল।

এই প্রবন্ধের সহিত আমরা "মোগল-অন্তঃপুরের একখানি পুরাতন চিত্র প্রদান করিলাম। চিত্রখানি ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও চিত্তাকর্ষক। এ চিত্রখানি কোন্ সময়ে চিত্রিত তাহা জানিবার উপায় নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম হজেস নামে এক জন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি এই চিত্রখানি স্বদেশে লইয়া যান। তিনিও লিখিয়াছেন যে এই চিত্রখান বহুপূর্ব্বে চিত্রিত। মোগল চিত্র প্রণালীর সহিত এই চিত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

দুর্লজ্ঘ্য।

দিনের আলো নিভিয়া আসিতেছিল। দুইজনে নদীর তীরে বসিয়াছিল। মাথার উপর দিয়া পাখীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে বাসায় ফিরিতেছিল।

রজ্জব কহিল, "এত বিষয়-সম্পত্তি—তুমি বিবাহ না করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে!"

মীর আলি কহিল, "বিশেষ অসুবিধা ত দেখি না!"

রজ্জব কহিল, "অথচ নারীজাতির প্রতি তোমার এত সম্ভ্রম! আশ্চর্য্য!"

মীর আলি কহিল, "আশ্চর্য্য নয় মোটে! নারী পূজার যোগ্য! তুমি কি কথাটা স্বীকার কর না?"

রজ্জব কহিল, "অস্বীকার করি না—তবে দোষে-গুণে পুরুষও যেমন, নারীও তেমন—কবিদের মত বাড়াবাড়ি করা আমার

স্বভাব নয়! যোদ্ধা সে কথা যাক্—বদরুদ্দিন তার মেয়ে সোফির জন্ম অত পীড়াপীড়ি করেছিল—আমরা ভেবেছিলাম,—"

বাধা দিয়া মীর আলি কহিল, "রজ্জব, লোকে ভালবাসে একবার এবং একজনকে মাত্র! দুজনকে ভালবাসা যায় না!"

রজ্জব কহিল,"সে কি! তুমি আবার কবে কাকে ভালবাসলে!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মীর আলি কহিল, "বেসেছিলাম, রজ্জব!"

রজ্জব চমকিয়া উঠিল! একটু আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "বলতে কোন আপত্তি আছে কি?"

মীর আলি জলের দিকে চাহিয়াছিল। ছোট ঢেউগুলি নদীর তটে আসিয়া লাগিতেছিল!

মীর আলি কহিল, "না, আপত্তি আর কি!"

সন্ধ্যার আঁধার নিবিড়তর হইতেছিল। আকাশে চাঁদ ছিল না! বাতাসটুকু আরো শান্ত শীতল হইয়া আসিল। মীর আলি কহিল, "সে যেন স্বপ্ন! তখন আফগান যুদ্ধ বাধিয়াছে। আফগান বালিকা মরিয়মকে প্রথম দেখি, এক ঝরণার ধারে। শ্রান্ত হইয়াছিলাম। ঘোড়াটাকে নিকটে একটি গাছে বাঁধিয়া পাহাড়ের পাথরে ঠেস দিয়া আমি বসিয়াছিলাম! রোদ পড়িয়া আসিতেছিল। দুই একটা পাখী ডাকিতেছিল—তাহাই শুনিতেছিলাম। মন হইতে সকল দুর্ভাবনা, সকল বাসনা দূর করিয়া দিয়াছিলাম! অশ্বের হ্রেষা নাই, নররক্তলোলুপ সৈনিকের হুঙ্কার নাই! রণবাদ্যের সে উন্মাদ ঝন্‌ঝনা নাই! যুদ্ধ সেদিন বন্ধ ছিল। চারিধারে অপূর্ব্ব শান্তি! আমি ভাবিতেছিলাম, মানুষের নিষ্ঠুরতার কথ! এই শান্তি-সুখ, নষ্ট করিতে তার কি পৈশাচিক আগ্রহ!

এমন সময় মরিয়মকে দেখিলাম। সে জল লইতে আসিয়াছিল। সহসা তাহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন আকাশ হইতে হুরী নামিয়া আসিয়াছে! এমন রূপ!

আমাকে দেখিয়া সে যেন শিহরিয়া উঠিল। বন্দুকটা আমার পাশেই পড়িয়াছিল। সে চলিয়া যাইতেছিল। আমি আশ্বাস দিলাম! সে কহিল, না জানিয়া সে আসিয়াছে। নিকটেই তার কুটির। সেখানে, বৃদ্ধা বিধবা পিতামহী, তাঁহারি জন্য সে জল লইতে আসে। একটি ভাই আছে, মহম্মদ,—সে আফগান সৈন্যবিভাগে কাজ করে। প্রত্যহই এমন সময়, সে এখানে আসে। এধারে কোন সৈনিক যাতায়াত করে না। বনের প্রান্ত পথও নাই,—তাই কোন পথিকেরো এদিকে আসিবার বড় একটা প্রয়োজন হয় না!

তার পর হইতে প্রতিদিন কি এক বিচিত্র আকর্ষণে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে, সকলের অলক্ষ্যে সেই ঝরণার ধারে আসিয়া আমি বসিতাম! চারিধার পাখীর গানে ভরিয়া উঠিত! ঝরণার জল শতধারে ঝরিয়া পড়িত! এই নিভৃত নির্জ্জনে, আফগান-কন্যা মরিয়মকে নিতান্ত আপনার জন করিয়া তুলিলাম! এক-একবার মনে হইত,এই দানবী হিংসা-দ্বেষ ছাড়িয়া, মরিয়মকে লইয়া, দূর বনের কোণে কোথায় চলিয়া যাই! মরিয়মকে একদিন কথাটা বলিলাম।

সে কহিল, যতদিন তার পিতামহী বাঁচিয়া

আছে, ততদিন সে নিজের সুখের কথা ভাবিবে না! আমার সঙ্গে যে তার দেখা হইত, সে কথা পিতামহী জানিত না।

মরিয়ম আমার জন্ত আঙুর, আপেল, বেদানা প্রভৃতি লইয়া আসিত, আমিও পাহাড়ী ফুলে-লতায় তাহাকে সাজাইয়া দিতাম!

তার পর যুদ্ধের কোলাহল তীব্রতর হইয়া উঠিল। প্রায় একমাস আর আমাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সন্ধ্যার সময়, আমার প্রাণ,—কি সে চঞ্চল হইয়া উঠিত, কিন্তু উপায়ও ছিল না।

সেদিন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। চারিজন সৈনিক এক তরুণ আফগান বালককে লইয়া আসিল! দিব্য কোমল সুন্দর মুখশ্রী! বালকটি চর,—গুপ্তভাবে সন্ধান লইতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে।

চাহিয়া দেখিতেই মরিয়মের মুখ মনে পড়িল! যেন, মরিয়মের ছায়া। ভাবিলাম, এ তার ভাই! নিশ্চয়! এ মুখ আর কাহারো নয়! কিন্তু কর্ত্তব্যের সম্মুখে সম্পর্ক কত তুচ্ছ! ইহা ভাবিয়াই অবিচলিত কণ্ঠে তখনি তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম! সৈন্যেরা তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল!

আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই নিভৃত ঝরণার ধারে যাইবার জন্ত আকুল হইয়া উঠিলাম। কতদিন আমার মরিয়মকে দেখি নাই! কিন্তু তখন চারিধারে ফৌজের ছাউনী পড়িয়াছে—যাওয়া সহজ ছিল না। একজন সৈন্য আসিয়া বলিল, বন্দী আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহে।

আমি আসিতে বলিলাম। নির্জ্জন কক্ষে বন্দী ও আমি—আর কেহ ছিল না। আমি কহিলাম, "কি চাও, তুমি?"

সেলাম করিয়া সে বলিল, "মরিয়মকে জানেন! আমি তার ভাই!"

অবিচলিতকণ্ঠে আমি কহিলাম, "তার খবর, তুমি জানো?

সে কহিল, "একখানা চিঠি আছে, আপনার জন্ত! মরিয়ম দিয়াছে। কিন্তু এখন মিলিবে না! কোমরবন্ধে আছে; আমার মৃত্যুর পর লইয়া পড়িবেন।"

তারপর প্রহরী আসিয়া আমার ইঙ্গিতে তাহাকে লইয়া গেল। আমিও তাঁবুর বাহিরে আসিয়া বসিলাম। আকাশে তখন মেঘ জমিতেছিল।

একটু পরে বন্দুকের শব্দ পাইলাম! আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চোখ বুজিলাম। চকিতে, আবার মরিয়মের মুখ মনে পড়িল। কি করিব? কর্ত্তব্যের কাছে যে আমি বন্দী! ধিক্ এমন কর্ত্তব্য!

মৃতদেহের নিকট গেলাম। কোমরবন্ধ হইতে পত্র বাহির করিয়া, বালকের কবরের আদেশ দিয়া তাঁবুতে ফিরিলাম।

তখন কড়কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। তাঁবুর ভিতর আলো জ্বালাইয়া পত্র খুলিলাম। মরিয়ম নিজের হাতে অক্ষরগুলি সাজাইয়া পত্র লিখিয়াছে—ধরণটা এইরূপ—

"প্রাণের আলি,

প্রিয়তম, খোদার কাছে তুমিই আমার স্বামী। তুমি জানো, আমার ভাই মহম্মদ ফৌজে চরের কাজ করিত। যুদ্ধের সময়, কাজের সময়, সে শিবির ছাড়িয়া আমাদের কাছে আসে। মরণকে তার বড় ভয়—

পৃথিবী ছাড়িতে তার ইচ্ছা নাই—তাই সে পলাইয়া আসিয়াছিল।

তুমি জানো, এ দোষের ক্ষমা নাই। আমরা গরিব, কিন্তু আমার পিতা-পিতামহ রাজার কাছে, হাসিমুখে, যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে—কুলাঙ্গার মহম্মদের জন্য সে গৌরব ধূলায় মিশিবে—আমার সহ্য হইল না! তাই তার বেশ ধরিয়া আমি তার কাজে আসিয়া যোগ দিলাম। কেহ চিনিতেও পারিল না।

পিতামহীকে লইয়া মহম্মদ দেশ ছাড়িল। কোনদিন যদি সে হতভাগার দেখা পাও ত, ছাড়িয়া দিও—এমন হীন প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে যদি তার সাধ হয়, তবে বাঁচিতে দিও, মারিও না—তোমার কাছে এইটুকু শুধু আমার মিনতি।

চর বেশে তোমাদের দলের সন্ধানে আসিয়া ধরা পড়ি—তারপর কি হইল, সব জানো—সে কথা আর বলিয়া লাভ কি?

এখন বিদায়, আলি—তোমাকে কত ভালবাসিতাম, তাহা বুঝাইতে পারিলাম না, এই দুঃখ রহিয়া গেল! তবু তোমারি দেওয়া মৃত্যুদণ্ড লইয়া হাসিতে হাসিতে মরিলাম, এ কি কম সুখ!

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি বেহেস্ত্ থাকে, তবে সেখানে আবার দুইজনের দেখা হইবে। আজ আসি, আলি, বিদায় দাও।

তোমার মরিয়ম!”

রজব, নিজের হাতে আমি নিজের বুকের পাঁজর ভাঙিয়াছি! স্বহস্তে আমার মরিয়মকে হত্যা করিয়াছি।”

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আপ্তকাম।

ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নেওয়া
বাড়িয়ে দেওয়া কাজ,
এম্‌নি করে কাটাও তুমি
সারা সকাল সাঁঝ।
দেখাও কত কর্ম্মে রত
ব্যাপ্ত কত দিক্,
যায় না জানা কোথায় থানা
পায় না কেহ ঠিক্।
দেখাও হেন বইছ যেন
কত শত ভার,
রাতে দিনে নিজগুণে
করছ কত পার।
জেগে দেখি সকল ফাঁকি
আরত কিছু নাই,
একা তুমি আপন মনে
চলেছ গান গাই।
এই কথাটি সবার মাঝে
বল্‌তে নাহি দাও,
পূর্ণ হ'য়ে আছ যে হে
কারেও নাহি চাও।

শ্রীহেমলতা দেবী

শুভদৃষ্টি।

আমার স্বহস্ত-রোপিত মাধবীলতিকায় আজ প্রথম পুষ্পকলিকা দেখা দিয়াছে। আনন্দের আতিশয্যে দাদা মহাশয়কে খবরটা দিবার জন্য তাঁহার কক্ষদ্বারে আসিয়া ডাকিলাম, "দাদা মহাশয়"—জবাব পাইলাম না!

পরদা ঈষৎ সরাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দাদা মহাশয় পিতৃদেবের সহিত ধীরে ধীরে কি কথা বলিতেছেন! আমি আবার ডাকিলাম "দাদা মহাশয়,"—এবারও কোন উত্তর পাইলাম না!

বুড়ার উপর ভারি চটিয়া গেলাম। শুনিয়াছিলাম, আসলের চেয়ে সুদের উপর লোকের মায়া বেশী! এ বুড়ার দেখিলাম, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব! পিতামহ আপদে বিপদে লোককে টাকা ধার দিতেন বটে, কিন্তু কোন দিন তাঁহাকে সুদ নিতে দেখি নাই;—তাই বোধ হয়, সুদ কি 'চিজ্', তাহা তিনি চিনিতে পারেন নাই!

এমন সময় সেই কক্ষ মধ্যে এক অপরিচিত পুরুষ প্রবেশ করিলেন। ত্রস্তভাবে পিতা ও পিতামহ উভয়েই দণ্ডায়মান হইলেন। পিতামহ বলিলেন "আসতে আজ্ঞে হোক, আমরা মহাশয়ের কথাই বলিতেছিলাম।"

যিনি প্রবেশ করিলেন, তাঁহার চেহারাটী দেখিবার মত বটে! সেই দীর্ঘ আর্য্যচ্ছন্দের মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাটদেশ; উন্নত নাসিকা, বিশাল চক্ষুদ্বয়, সর্ব্বোপরি সেই সুগৌর সুদীর্ঘ বপু, প্রথম দৃষ্টিতেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে!

পিতা ও পিতামহ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আমাকে বলিলেন, "শিশির, প্রণাম কর, ইনি বিখ্যাত জ্যোতিষী রঘুদেব শাস্ত্রী!"

আমি মুগ্ধ নয়নে সেই বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলাম, পিতামহের সম্বোধনে চমক ভাঙিল; অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিলাম।

যখন উঠিয়া সোজা হইয়া জ্যোতিষীর সম্মুখে দাড়াইলাম, তখন দেখিলাম, তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। মিনিট-কাল পরে তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন! পিতামহ উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছেন?"

"পরে বলিতেছি, কিছু রক্তচন্দন অথবা অলক্তক আনিতে বলুন দেখি।"

চন্দন আনীত হইল। শাস্ত্রী আমাকে বলিলেন,

"হস্তে লেপন কর"—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন?"

"রেখাগুলি সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে; উহাতে গণনার পক্ষে সুবিধা হইবে।"

আমি আমার চন্দনসিক্ত হস্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অগ্রসর করিয়া দিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া তিনি বিশেষ রূপে প্রত্যেক রেখা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ললাটদেশ, মস্তকের স্থান বিশেষ ও চক্ষুর্দ্বয় পরীক্ষা করিলেন! গণনায় অন্যান্য ফলের মধ্যে বলিলেন,

"যতদূর বুঝিতেছি, এই বালকের পরিণয় অসম্ভব; যাহার সহিত এই বালকের যথার্থ শুভদৃষ্টি হইবে—অর্থাৎ যে কন্যার চক্ষু দেখিয়া মোহিত হইবে, যদি সেই কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হয়, তবেই বিবাহ সম্ভব ও মঙ্গলজনক, নতুবা নহে।"

পিতামহ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন,—

পিতৃদেবের বিশাল ললাট দেশও একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; আমিই যে বংশের একমাত্র দুলাল! দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে আমি একটু হাসিলাম; ভাবিলাম, যদি জ্যোতিষী অভ্রান্ত হন, তবে জীবনটা উপন্যাসের নায়কের মতই কাটিবে।

(২)

দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। চৈত্রের বায়ুতে বিতাড়িত হইয়া বসন্ত পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু তখনও ভোরের দিকে ও সন্ধ্যার পর এমন একটা প্রীতিপ্রদ দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়, যাহাতে শরীরকে স্নিগ্ধ করে ও মনকে প্রফুল্ল করিয়া তুলে! অপরিণত আম্রগুটিকার কাছে তখনও ভ্রমরের গুঞ্জনগীতি মিলাইয়া যায় নাই! বসন্ত চলিয়া গেলেও তাহার রেশটুকু যেন রাখিয়া গিয়াছে!

চৈত্রের শেষ। এফ্, এ, পরীক্ষা দিয়া আসিয়া দেখিলাম,—বাড়ীতে আনন্দরোল জাগিয়া উঠিয়াছে! ব্যাপারটা সহজেই বুঝিতে পারিলাম! জানিলাম, আমার বিবাহ! ফুলহাটীর জমীদার প্যারীশঙ্কর বাবুর কন্যা গৌরীর সহিত।

আমার বিবাহ! সেই জ্যোতিষীর গণনা এখনও ভুলিতে পারি নাই! পিতা কি ভুলিয়াছেন? পিতামহের কি সেই অভ্রান্ত জ্যোতিষীর কথা একেবারেই মনে নাই? কি জানি!

* * *

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ও আমার বাল্য-বন্ধু সুরেশ ফুলহাটী হইতে 'সাইকেলে' ফিরিয়া আসিতেছি! আমরা কনে দেখিতে গিয়াছিলাম; অবশ্য গোপনে, তাহা বলা বাহুল্য।

মাঠের মাঝখান দিয়া প্রশস্ত বর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে; আমরা পাশাপাশি তীরবেগে 'সাইকেল' ছুটাইয়া অগ্রসর হইতেছি! সম্মুখে বিরাট সূর্য্য, সেই বিশাল নীলাকাশের পশ্চিম প্রান্তে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছেন! সে কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে! এক ঝাঁক টীয়াপাখী উড়িয়া গেল; কবি সার্থক লিখিয়াছিলেন "অন্তস্থং তোরণ স্রজ,"। সেই অভিনব মালিকা নীলাকাশের গায়ে ভাসিয়া ভাসিয়া দূর চক্রবাল রেখার সহিত মিশিয়া গেল!

সুরেশ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কেমন দেখিলে? শুভদর্শন ত!"

"হ্যা সুন্দর—বই কি! কিন্তু"—

"কিন্তু কি আবার।"

"এটুকু বালিকা উহার চোখে এমন কি সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইব?"

সুরেশ- "সে কি! এমন সুন্দর চোখ ত প্রায় দেখা যায়না"—

"আমার ভাই কোনো ভাবই হয়নি, মুগ্ধ হওয়াতো দূরের কথা!"

"যা'ই কেন বলনা ভাই, তা'র চূর্ণকুন্তল বেষ্টিত কমনীয় মুখখানি দেখিয়া"—

"তুই যে একেবারে কবি হ'য়ে উঠ্লি সুরো! তবু যদি—'গৌরী' না হ'ত"—বলিয়া একটু হাসিলাম।

আমাদের আর কোনও কথা হইল না!

মেয়েটীর বয়স আট কি নয় বৎসর!

প্যারীশঙ্করবাবু অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাসম্প্রদান করিয়া "গৌরীদানের" ফললাভ করিবেন।

(৩)

ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে?

আমাদের বিবাহ বাসর উপস্থিত হইল। শুভলগ্নের প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা ফুলহাটী উপস্থিত হইলাম।

সত্যকথা বলিতে কি আমার মনের 'খট্‌কা' তখনও দূর হয় নাই; বোধ হয় পিতামহেরও নহে। সেই জন্যই কি তিনি বারংবার বিবাহের উজ্জ্বল বেশপরিহিত পৌত্রের দিকে স্নেহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিতেছিলেন! আর আমি? বালিকার আকর্ণচুম্বিত নয়ন দুটী কেন আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই—তাহাই ভাবিতেছিলাম;—মুগ্ধ হই নাই, তবু আমাদের বিবাহ হইবে; মিথ্যা সেই জ্যোতিষীর কথা; মিথ্যা গণনা—!

প্রায় বারটার সময় অন্তঃপুর হইতে একটী যুবক বাহির হইয়া আসিয়া প্যারীশঙ্কর বাবুর কাণে কাণে কি কথা বলিল; তিনি শুনিয়া, "কি সর্ব্বনাশ!" বলিয়া ব্যস্তভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন!

ভবিতব্য তাহার কঠোর হস্ত বিস্তার করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে কি?

একটা অস্ফুট ক্রন্দনের রোল উঠিল; কোন্ অলক্ষ্য শক্তি যেন আমাকে ভিতর বাড়ীতে টানিয়া লইয়া গেল! সঙ্গে সুরেশ ও পিতামহও ছিলেন!

কি দেখিলাম? শুভ্রশয্যার উপর বালক-নখরছিন্ন পদ্ম কোরকের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র বালিকা পড়িয়া রহিয়াছে! সন্ধ্যার অন্ধকারে পল্লীপথপ্রান্তে পতিত যূথিকাগুচ্ছের ন্যায় সেই অতুল সৌন্দর্য্য পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছে! সেই আকর্ণচুম্বিত নয়ন যুগল অর্দ্ধনিমীলিত; সুবর্ণ বলয়ালঙ্কৃত হস্ত দুই খানি দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর শিথিলভাবে বিন্যস্ত! বালিকা দুরন্ত কলেরা-রোগ আক্রান্ত!

সেই উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত গৃহের মধ্যে যখন আমি আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন বালিকার মাতা অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া আমার দিকে একবার চাহিলেন; তার পর তিনি অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন!

পিতামহ নিমেষশূন্য লোচনে বালিকাকে দেখিতেছিলেন, স্নেহকোমল বৃদ্ধের অশ্রু যেন বাধা মানিতেছিল না।

তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"প্যারী বাবু আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি; জ্যোতিষীর গণনা মিথ্যা হইবার নহে; শিশিরের সহিত ইহার বিবাহ আশা ত্যাগ করিলাম। আমি বলিতেছি, নারায়ণের কৃপায় আপনার কন্যা নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে।"

সেই অত্যুজ্জ্বল আলোকে, রোগ শয্যাশায়িতা বালিকার পরিম্লান মুখচ্ছবি আমাকে নিতান্তই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল! আমার পরিহিত উজ্জ্বল বিবাহ-বেশ যেন আমাকে তীব্র কষাঘাত করিয়া উপহাস করিতে লাগিল! আমি একবার সুরেশের মুখের দিকে চাহিলাম, সেই অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা দেবীকে দেখিলাম; সর্ব্বশেষে সেই রোগ শয্যাশায়িতা অনাঘ্রাত কুসুম-কোরক-তুল্য ক্ষুদ্র বালিকার দিকে চাহিয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাহিরে আসিলাম!

প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে বালিকার কল্যাণ-কামনায় আকুল প্রার্থনা বাহির হইয়া বিশ্বরাজের চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছিল!

মাথার উপর চন্দ্র হাসিতেছে। নক্ষত্র জ্বলিতেছে। খণ্ড খণ্ড লঘু মেঘ চন্দ্রকর স্নাত হইয়া আকাশের গায় ভাসিয়া যাইতেছে;—যাহা কিছু চক্ষে পড়িল, সবই তো সুন্দর—অসুন্দর কিছু দেখিলাম না! বুঝিলাম, পিতামহের বাক্যই সত্য—বালিকা রক্ষা পাইবে!

(৪)

তার পর প্রায় আট বৎসর চলিয়া গিয়াছে। অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; প্যারীশঙ্কর বাবুর কন্যা নিরাময় হইয়া উঠিলে সুরেশের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু বলা বাহুল্য, আমার এখনও বিবাহ হয় নাই। সুদীর্ঘকালের মধ্যে কত বালিকা, কত কিশোরী, কত যুবতী দেখিলাম, কই, কাহারও নয়নসৌন্দর্য্য তো আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। বিধাতা কি সে চক্ষু নির্ম্মাণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এ কি নিষ্ঠুর জ্যোতিষিক গণনা আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে! ব্যর্থ, উন্মুখ আশা, আকণ্ঠ পরিপূর্ণ তৃষা লইয়া আমার মানসীর সন্ধানে আমি কোথায় যাইব? হা ভগবান্, শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে আমার সেই মানসী প্রতিমা দেখাইয়া দাও! মৃদুগুঞ্জনে আশাবেড়া আমার প্রাণের মাঝে ঝঙ্কার দিয়া বলিত "ওগো সে আছে, সে আছে, সে আছে!"

এ আশা মিথ্যা হইল না, এ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিল না, সত্যই একদিন তাহাকে দেখিলাম; আমার ভাগিনেয়ীর বিবাহ রজনীতে বাসর গৃহের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা সেই চির-আকাঙ্ক্ষিতা ষোড়শী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, একবার চোখে চোখে মিলন হইল—এক মুহূর্ত্ত মাত্র;—সেই মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে এক অভূতপূর্ব্ব অমৃতময় বিদ্যুৎ তরঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন আলোড়িত, লুপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কে এ রমণী? এ শুভ দৃষ্টি কাহার সহিত? পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রীমণ্ডিতা, দেবতার পুণ্য আশীর্ব্বাদ রূপিণী এ রমণী কে? সে গৌরী! সে আজ বিধবা!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

ইংরাজদিগের ক্রীড়াকৌতুক।

ছোট খাট কাজকর্ম্মে, আচারব্যবহারে কোন মানুষ বা জাতির স্বভাবলক্ষণ যেমন ধরা পড়ে, এমন তাহার কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানে নহে। পাশ্চাত্য জাতির যে আজ পৃথিবী জুড়িয়া এত প্রতাপ—তাহার প্রধান কারণ তাঁহাদের সামান্য কাজটিও উদ্দেশ্যবিহীন নহে; পান হইতে চুণটুকুও যাহাতে নিরর্থক না খসে, সে দিকেও সর্ব্বদা তাঁহাদের দৃষ্টি;—এমন কি তাঁহাদের প্রত্যেক পদক্ষেপে—প্রত্যেক অঙ্গচালনায় পর্য্যন্ত একটি আদায়ের অভিপ্রায় নিহিত। আমরা যদি তাঁহাদের সামান্য ক্রীড়াকৌতুকগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখি—তাহা হইলে এ কথার সার্থকতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি।

আমাদের দেশে তাস দশ পঁচিশ বড় আমোদজনক খেলা। দুই চারিজনে মিলিলেন,

ও অমনি তাস বা কড়ি খেলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কত কলহ, কত প্রমোদ উত্তেজনা! —এমন কি বাজিতে জিতিলে—নৃত্যগীত পর্য্যন্ত চলিল! পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে তাস খেলার এরূপ বৃথা উন্মত্ততা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহারা যে একেবারে তাস খেলে না এমন নহে, কিন্তু সে খেলার উদ্দেশ্যও আদায়—বিনা বাজিতে নিরর্থক তাস খেলা তাহাদের মধ্যে বোধ হয় নাই।

আমাদের দেশে নিমন্ত্রণ মজলিসে যেখানে গীতবাদ্য না থাকে, সেখানে কতকলোক খোস গল্প করিয়া, কতক লোক মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া সময়টা নিরর্থক কাটাইয়া দিয়া অবশেষে ভোজনান্তে গৃহে গমন করেন। পুরুষদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বস্থলে আজ কাল এ কথাটা নাও খাটিতে পারে—কিন্তু মেয়ে নিমন্ত্রণে ইহাই পদ্ধতি। ইংরাজদিগের ছোট বড় সকল নিমন্ত্রণেই অথিতিদিগের মনোরঞ্জনার্থে কোন না কোনরূপ আমোদ-প্রমোদের আয়োজন থাকা চাইই—চাই;—এবং সে সকল আমোদ একটিও নিরর্থক নহে, সকলের মধ্যেই হয় স্বাস্থ্যজনক না হয় বুদ্ধিস্ফূর্ত্তিজনক কোন একটা উদ্দেশ্য নিহিত।

বৈকালিক চায়ের নিমন্ত্রণে টেনিসাদি খেলা—অধিকন্তু প্রায়ই পরে গীতবাদ্যাদি হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন স্বরূপ —বর্ষার সময়ে—অন্য অনেক সময়েও শারীরিক ব্যায়ামের স্থলে মানসিক ব্যায়াম পরিচালনা দেখা যায়। বঙ্গদেশ সম্মিলনের কথা, গত জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে বলিয়াছি—তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু এরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান, কালে ভদ্রে ডিনার শেষেই প্রায় হইয়া থাকে। প্রবাদ সজ্জা, বহি সজ্জা, প্রশ্নোত্তর খেলা, ছন্দমিল, হেঁয়ালি নাট্য প্রভৃতি ছোট খাট অভিনয় ও সাজ সজ্জা-খেলাগুলিই প্রায় বৈকালিক বা সান্ধ্য সম্মিলনীতে সদা সর্ব্বদা দেখা যায়।

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের কোন জজপত্নীর বাড়ী মহিলা-গণের প্রবাদ সাজিয়া যাইবার নিমন্ত্রণ ছিল। সকলেই কোন একটি প্রবাদ বাছিয়া তাহার চিহ্ন ধারণ করিয়া গিয়াছিলেন। এ খেলায়,—সাঙ্কেতিক চিহ্ন ধারণে--যিনি সর্ব্বাপেক্ষা চাতুর্য্য দেখাইতে পাবেন, এবং যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্কেত বুঝিতে পাবেন, উভয়কেই গৃহকর্ত্রী পুরস্কার প্রদান করেন। নিম্নে দুই চারিটি প্রবাদ সজ্জার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা গেল।

১। একজন মহিলা—একখানি পাতলা কাগজে আঁকা একটি সুন্দরী রমণীর ছবি লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই কাগজখানি তুলিয়া ধরিলে নীচের আর একখানি কাগজে সেই সুন্দর মূর্ত্তির কঙ্কাল দেখা যাইতে ছিল। ইহা হইতে বুঝা গেল, তাঁহার প্রবাদ—Beauty is but skin-deep.

২। আর একজনের প্রবাদ—Time and tide wait for no man. তিনি একটা ঘড়ি (time) ও একটা ফিতায় বাঁধা ছোট বাটখারা (tied weight) বক্ষে ঝুলাইয়া আসিয়াছিলেন। ঘড়ির কাঁটা চারিটা। (four, ঘরে ছিল এবং যিনি পরিয়াছিলেন তিনি পুরুষ নহেন,—স্ত্রীলোক।

৩। একটি মহিলা একটা কাগজে অনেকগুলি অঙ্কসংখ্যা লিখিয়া তাহাই সেফটি পিনে বিঁধিয়া বক্ষবস্ত্রে পরিয়া-

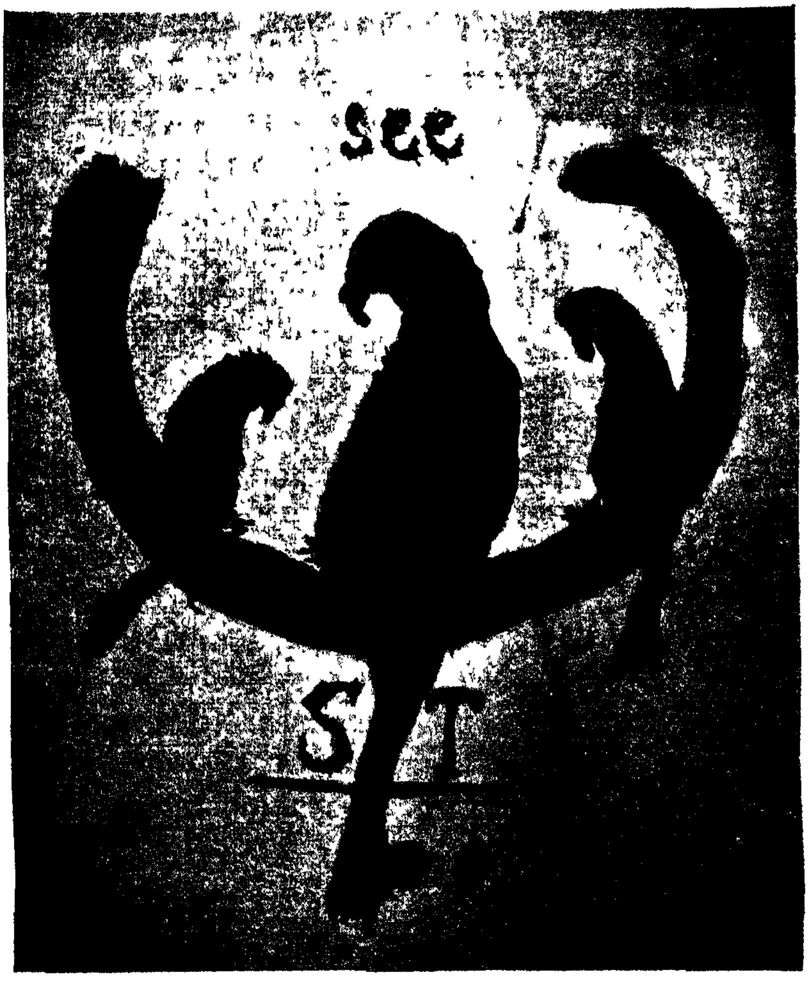
ছিলেন। ইঁহার প্রবাদ—There is safety in numbers

৪। একজনের প্রবাদ—you cant eat your cake and have it too. তিনি লইয়া আসিয়াছিলেন একখানি কাগজে আঁকা দুইটি ছেলে মেয়ের ছবি। মেয়েটি কেক খাইতেছে—ছেলেটি আপনার ভাগ নিঃশেষ করিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চাহিয়া আছে।

৫। একজন কতকগুলি ঘাস সেফ্‌টিপিনের মধ্যে পরিয়া—ঘাসের মধ্যে একটা পিন গুঁজিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবাদ—A pin in a bundle of hay.

৬। একজন সকণ্টক গোলাপ ফুল পরিয়া আসিয়াছিলেন,—No rose without its thorn

আর একটি প্রবাদ অনেকেরই সজ্জায় দেখা গেল,—All that glitters is not gold: ঝকমকে ঝুটার জরির কাপড়, বা



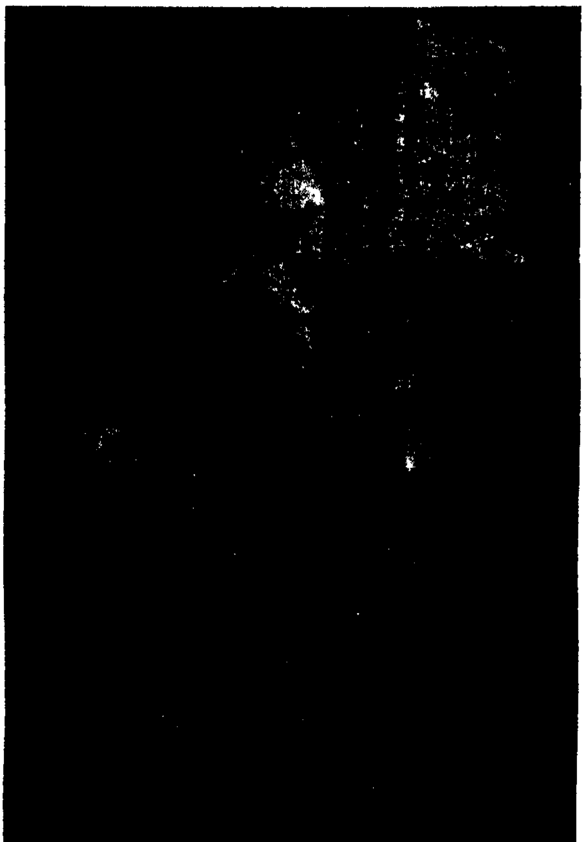
চকচকে পুঁথির জামা প্রভৃতি পরিয়া এই প্রবাদটি ইঙ্গিত করা হইয়াছিল।

স্বয়ং গৃহকর্ত্রী অর্দ্ধ খণ্ড রুটি স্কন্ধের কাপড়ে আঁটিয়া একটি নিতান্ত সহজ প্রবাদের সঙ্কেত ধারণ করিয়াছিলেন,--Half a bread is better than nothing

অধিকাংশ বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্কেত কৌশল সুন্দর হইয়াছিল। প্রথম পুরস্কার একজন বঙ্গ রমণীই দখল করিয়া লইলেন। সেই ছবিখানি আমরা পূর্ব্বপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি; পাঠক পাঠিকা ইহা দেখিয়া প্রবাদটি কি অনুমান করুন—পরে চিত্রব্যাখ্যা দেখিবেন।

বহিসজ্জা খেলায়—প্রবাদের পরিবর্ত্তে কোন একখানি বহির চিহ্ন ধারণ করিতে হয়।

আমরা একদিন বই সাজিয়া আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। বাঙ্গালী মহিলারা



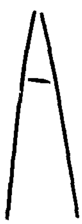
বাঙ্গলা বা সংস্কৃত পুস্তকের চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন, ইংরাজমহিলাগণ অবশ্য ইংরাজি বহি সাজিয়াছিলেন। দুই চারিটি সজ্জার বিবরণ নিম্নে দিলাম।

একজন মহিলার নাম কমলা, তিনি তাঁহার কান্তের একখানি ক্ষুদ্র ছবির পার্শ্বে একটি দপ্তর আঁকিয়া সেই ছবি ব্রোচের মধ্যে পরিয়া আসিয়াছিলেন,—অর্থাৎ কমলাকান্তের দপ্তর।

একজন ভারতের ম্যাপ আঁকিয়া তাহার পার্শ্বে দীর্ঘ ঈ বসাইয়াছিলেন—অর্থাৎ ভারতী।

মাধবের একখানি চিত্রের পার্শ্বে একটি মালতী ফুল পরিয়া একজন সাজিয়াছিলেন মালতী মাধব।

একজন মাত্র একটি সরু A অক্ষর আঁকিয়া



সেই কাগজ বস্ত্রে পিনবিদ্ধ করিয়া পরিয়াছিলেন,—In no sense A broad—অর্থাৎ Inocence abroad—

আমরা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় একখানি বহির সাঙ্কেতিক চিত্র দিলাম। পাঠক বলুন—এখানি কি বই?

প্রশ্নোত্তর খেলা অন্যরূপ। কোন জীব জন্তু মনুষ্য বা অন্য কোন পদার্থের নাম লেখা একখানি কাগজ প্রত্যেকের পিঠে—পিন করিয়া দেওয়া হয়। কাগজে কি লেখা আছে অন্যেরা দেখিতে পায়;—কাগজধারী ত নিজে তাহা দেখিতে পান না; তিনি অন্যকে প্রশ্ন করিয়া তবে সেই লেখাটি কি তাহা বাহির করিয়া লন। যেমন একজনের পিঠে লেখা হইল—মিসেস বেসেণ্ট। কাগজধারী জিজ্ঞাসা করিলেন "কোনও জীব?" উত্তর হইল। "হ্যাঁ"।

"স্ত্রীলোক?"—"হাঁ।"—"মৃত?" "না।" "জীবিত?" "হাঁ।" "এ দেশের লোক?" "না।"—"ইংরাজরমণী?" "হাঁ"—"এদেশে থাকেন?" "হাঁ"।—"দেখিয়াছি?" "জানি না।" "খ্যাতনাম?" "হাঁ।"—"কলিকাতায় থাকেন?" "না।" "পশ্চিমে"? "হাঁ।" "কাশীতে?" "হাঁ।" "কাশীতে কলেজ করেছেন?" "হাঁ।"

এইরূপ নানা প্রশ্নের পর মিসেস বেসেণ্টের নাম আসিয়া পড়িল।

ছন্দমিলের খেলায় এরূপ অনুমান নাই। একজন একছত্র ছন্দ মিলাইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শেষকথাটি মাত্র দেখান; দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই ছন্দে আর একটী ছত্র মিলাইয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে তাহার মিল করিতে বলেন। এইরূপে—অনেকগুলি ছত্র হইলে পড়িতে বেশ মজার লাগে। যথা—

১। আকাশ মেঘেতে ভরা অন্ধকার দিক্।
২। না জানে কাহিতে কথা নামটি রসিক।
৩। কে তুমি দাঁড়ায়ে পথে কি নাম পথিক।
৪। নয়নে ঝরছে জল হাসে ফিক ফিক।

মুখে মুখে উপন্যাস রচনা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিস্ফূর্ত্তিজনক খেলা। একটি গল্পের এক পরিচ্ছেদ একজন রচনা করিয়া বলিয়া গেলেন,—আর একজন অমনি পরের পরিচ্ছেদ বলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দুইচারিজনে মিলিয়া গল্পটি শেষ করিয়া ফেলিলেন।

হেঁয়ালি নাট্যাভিনয়ে—কোন একটি বা দুইটি কথা অভিনয়ের মধ্যে বার বার কৌশলে উল্লেখ করিতে হয়। তাহা হইতে দর্শকগণ কথাটি বাহির করেন। এ খেলাটী বড় কৌতুকজনক। পুরাতন ভারতীতে বহু হেঁয়ালি নাট্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আর একটি হেঁয়ালি নাট্য রচনা করিয়া দিলাম।

হেঁয়ালি নাট্য।

হরি গৃহে বসিয়া কবিতা পাঠ করিতেছেন, হরের প্রবেশ।

হর। কি পড়ছ ভায়া?

হরি। এই যে হর, এস এস, তোমাকে না শুনিয়ে কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না।

হর। পড় পড়—আমিও চাতকের মত তৃষিত হয়ে আছি। সেই কাব্যখানা বুঝি শেষ হোল? কি নামটা? এই যা: ভুলে যাচ্ছি যে।"—

হরি। সিন্ধু প্রভঞ্জন।

হর। ঠিক ঠিক! সিন্ধু প্রভঞ্জন,—লিখে লিখে মেমরিটা কেমন খারাপ হয়ে গেছে—অনবরত ব্রেনের একসাইস কিনা! পড় পড়,—তারপর—আমার নাটকের শেষটাও শোনাব এখন, সঙ্গে এনেছি।

হরি। বেশ!

আলোড়ি বিমথি সিন্ধু ভীষণ গর্জ্জনে—
নিক্ষেপি প্রবল বেগে—উত্তাল নিবিড়—
তরঙ্গ মহান উচ্চ পর্ব্বত সমান,
ঘেরিয়া অম্বরতল, ঢাকি বিবস্বান্—
প্রলয়ের প্রভঞ্জন ঘোষিলা সবোধে—
করাল আঁধারে পৃথ্বী করিয়া মগন!!!

হর। থাম ভাই, একটু থাম, আমার মাথা ঘুরে গেল, আমার চোখে আর এককণা সূর্য্যকরও বিভাসিত হচ্ছে না,—বিশ্ব মহা-অন্ধকারে—আত্মা প্রলয়ান্ধকারে মগ্ন হয়ে পড়েছে! চমৎকার চমৎকার।

হরি। কি বল ভাই হর,—সত্যি? তোমার নাটকের নায়িকার রূপ বর্ণনা শুনতে শুনতে আত্মা যেমন সপ্তম স্বর্গের চূড়ায় দুলতে থাকে তেমনি এ কবিতাটা কি সত্যিই—

হর। সত্যি বলছি হরি সত্যি! এবার আমাদের হতে বঙ্গসাহিত্য নিশ্চয়ই ফেল হবে, নিশ্চয় নিশ্চয়! কোন সন্দেহ নাই। সরস্বতী সেই আদি যুগে বাল্মীকিতে আবির্ভাব হয়েছিলেন—আর এ যুগে এতদিনে—

বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু।—হরি হরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আমার আজ পরম সৌভাগ্য যে হরি হরের একত্র সাক্ষাৎ লাভ করেছি!

হরি। এস এস বিষ্ণু এস—বন্ধুবর,—এতক্ষণ তোমারি অভাব অনুভব করছিলেম।

হর। এখন মন সন্তুষ্ট হোল, প্রাণ তৃপ্ত হোল, হরিহর আত্মার মিলন হোল,—এস ভাই এস। হরি ভাই! তোমার কবিতাটা আর একবার পড়ে—বিষ্ণুকে শোনাও না।

হরি। না না তোমার নায়িকার রূপ বর্ণনাটী আগে শোনাও। বলব কি বিষ্ণু—প্রতি অক্ষরে সাক্ষাৎ রতিদেবী যেন মূর্ত্তিমতী অথচ তাতে একটি অশ্লীলতা নেই—সমস্তই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ।

বিষ্ণু। দুঃখ কেবল এই,—লোক গুলাকে এ কথা কিছুতেই বোঝাতে পারছিনে; তাদের রুচি এমন বিকৃত হয়ে গেছে যে তারা অশ্লীলতাকে শ্লীলতা, কুভাবকে সুভাব, ঐন্দ্রিয়িককে আধ্যাত্মিক ভেবে নিয়ে প্রমাদ ঘটাচ্ছে!

হরি। কি দুঃখ কি দুঃখ, বেচারাদের জন্য বড় দুঃখ।

হর। উঃ বল কি! এই সকল দীনহীন হতভাগাদের পরিত্রাণের—পাপীতাপী উদ্ধারের উপায় হবে কি করে!

উভয়ের রোদন।

বিষ্ণু। ভেবোনা, দাদাবা কেঁদনা। সে উপায় আমি ঠিক করেছি। হরিহর আত্মায় মিলিত হলে বিশ্ব রসাতলে যায়—আর আমরা সাহিত্যে এতটুকু বিপ্লব ঘটাতে পারব না! এই দেখ ব্রহ্মাস্ত্র, হিমালয় হতে কুমারিক এতে কম্পিত হয়ে উঠবে, সূর্য্য চন্দ্র তারকা জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, বঙ্গসাহিত্য ভেঙ্গে চুরে একেবারে রসাতলে নিমগ্ন হবে,—আর সেই প্রলয় পয়োধিজলে কেবল আমাদের নূতন সাহিত্য গুলি নারায়ণের মত ভেসে ভেসে বেড়াবে।

হর। ও হরি! আমার মাথা যে ভোঁভোঁ করছে, মনে হচ্ছে আমি সেই প্রলয়ান্ধকারে নিমগ্ন হয়ে পড়ছি!—

হর। আর আমার মনে হচ্ছে,—আমি যেন নারায়ণ হয়ে সেই প্রলয়জলে পদ্মপত্রের উপর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি!

বিষ্ণু। আর আমার মনে হচ্ছে—আমি তোমাদের দুজনকে ধরে টেনে টেনে ডাঙ্গায় তুলছি—

হরি হর। (দুজনে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) বন্ধু হে তুমিই ভরসা!

শারদগীতি।

'হল দেখা তখনি বিদায়'—
চরাচর অন্তহীন এই গান গায়।
এই যে মিলন আজি বরষের পরে!
ইহাও কি শুধু তবে দুদিনের তরে!
মিলন কাতর তাই বিরহ ছায়ায়,
আনন্দ আপনহারা বিষাদে লুটায়!

শুধু দুদিনের দেখা আর কিছু নয়?
এ কথা তবু ত মাগো মনে নাহি লয়!
ফুলের সুবাস মত জন্মান্তর স্মৃতি,
ঢালিছে হৃদয়ে একি স্বপ্নময় প্রীতি!
জনমে জনমে যেন শত শত বার।
ফুটেছে তোমারি কোলে চেতনা আমার!
সেই পরিচিত ঘর সেই স্নেহ মুখ,
সেই পুণ্য স্মৃতিময় কত সুখ দুখ,
শোনায় আশ্বাস বাণী জাগায় বিশ্বাস—
ফুরাবে এ দিন তবু নাহি এর নাশ।

ঢাল তবে ঢাল চাঁদ জোছনার হাসি,
বাজুক মধুর সুরে উৎসবের বাঁশি,
ভোল ক্ষুধা তৃষ্ণা দীনো, ওহে ক্ষুধাশীর্ণ,
ফেলে দাও নবানন্দে ছিন্ন চির জীর্ণ।
ওই শোন ওই শোন মায়ের আহ্বান—
সুখে দুঃখে তাঁরি কোলে চিরজন্ম স্থান।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

ভারত ও বিলাত।

বিলাত-প্রবাসীর পত্র।

৯। সভ্যতার মাপকাটি।

সভ্যতা কা'কে বলে? এই কথা লইয়া য়ুরোপের সঙ্গে বাকি দুনিয়ার একটা গুরুতর বিরোধ ক্রমে পাকিয়া উঠিতেছে। এত কাল ধরিয়া সাদা জাতের সভ্যতার দাবিটাকে দুনিয়ার লোকে নীরবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। য়ুরোপ যদি সংযত হইয়া চলিতে পারিত, আত্মবিলোপের ভিতর দিয়া যে মহত্তর আত্মপ্রতিষ্ঠার পন্থা যিশুখৃষ্ট দেখাইয়া গিয়াছিলেন, খৃষ্টোপাসকেরা যদি সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া না পড়িত, তবে আজো এ দাবির প্রতিবাদ করিতে কেহ দাঁড়াইত কি না, সন্দেহের কথা। সর্ব্বত্রই লোকে সংযমের সম্মান করিয়া থাকে, বিশেষতঃ শক্তিশালীর সংযমের সমক্ষে মানুষের মাথা আপনা হইতেই ভক্তিভরে অবনত হইয়া পড়ে। শ্রেষ্ঠজনে যদি সংযম ছাড়িয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া আস্ফালন করিতে আরম্ভ করেন, প্রাকৃত জনে আর সে শ্রেষ্ঠতা সহজে মানিয়া লইতে চাহে না। ধরে বেঁধে যে কেবল প্রেম হয় না, তা' নয়; ধরে বেঁধে ভক্তি এবং শ্রদ্ধাও হয় না। য়ুরোপ যে দিন ধরে বেঁধে আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে দিন হইতেই এ শ্রেষ্ঠত্ব সাঁচ্চা না ভেজাল জিনিষ, এ সন্দেহও লোকের মনে উঠিয়াছে। এ সন্দেহ আজ দৃঢ় হইয়াছে। তার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনাকে লোকে সূক্ষ্মভাবে পরখ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ভারতের ইংরেজিনবিশেরা য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সার্ব্বজনীন সভ্যতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে মোহ ক্রমে কাটিতেছে, কিন্তু এখনো একেবারে কাটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। য়ুরোপের ধর্ম্ম যে ভারতের সনাতন ধর্ম্ম অপেক্ষা কোনো রূপে শ্রেষ্ঠ নহে, দেশের ইংরেজি নবিশেরাও বহুদিন হইতে এ কথা একরূপ মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু স্বদেশী ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়াও, স্বদেশের সমাজগঠনের হীনতা অনেকেই স্বীকার করিতেন। এজন্য ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা উপাসনাকাণ্ডে খৃষ্ট-তত্ত্ব ও খৃষ্টীয় পদ্ধতি বর্জ্জন করিয়াও, সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে খৃষ্টীয় সমাজের অল্প-বিস্তর অনুকরণ হইতে বিরত হন নাই। ইঁহারা হিন্দুর বর্ণভেদের উপরে খড়্গহস্ত। এ বর্ণভেদের দোষ অনেক, ইহা অস্বীকার না করিয়াও, ইহা যে খৃষ্টীয়দেশের শ্রেণীভেদ অপেক্ষা ভাল বই মন্দ নহে,—হিন্দুর বর্ণভেদে মনুষ্যত্বের যে অবমাননা করা হইয়াছে, খৃষ্টীয় দেশের শ্রেণীভেদে যে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক অবমাননা করা হয়, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজ সংস্কারকেরা কখনো গভীরভাবে এই বর্ণভেদ ও শ্রেণীভেদের মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। তাই অনেক সময় আমাদের প্রাচীন জাতি বা বর্ণভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-গৃহকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিদেশী শ্রেণীভেদের উপর নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবার

চেষ্টা করিয়াছেন। এখনো এ চেষ্টার একান্ত বিরাম হয় নাই। এইরূপে, ভারতের সমাজে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মেলা মেশার যে কতকটা অন্তরায় আছে, তাহাকে স্ত্রীচরিত্র-গঠনের অন্তরায় ভাবিয়া, নিজেদের সামাজিক রীতি-নীতিকে কতকটা বিলাতি ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছেন। এখনো আমরা সমাজ সংস্কারের নামে বিলাতের আদর্শে ভারতবর্ষকে নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা হইতে বিরত হই নাই। কিন্তু এ মোহও ক্রমে কাটিতেছে। আমরা যেমন আছি, তেমনটিই যে থাকিব, এমন কথা কোনো বুদ্ধিমান লোকে এখন আর বলিবেন না। দুই বা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিলাম, আবার তেমনটিই হইব, এ কল্পনাও কোনো বিচক্ষণ লোকের মনে স্থান পায় না। জগৎ-বিবর্ত্তনে চিরদিন সমভাবে থাকা যেমন একেবারে অসম্ভব, যে অবস্থা অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করাও তেমনি অসাধ্য। বেদ পড়িলেই বৈদিকযুগে ফিরিয়া যাওয়া যায় না। উপনিষদের সময়ে হিন্দুর সমাজবিবর্ত্তনের যে ধাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানে ফিরিয়া যাওয়া যায় না। কল্যকার উপনিষদের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হইতেই কৃত কর্ম্মকে আজ যেমন ফিরাইয়া আনিতে পারি না,—তাহার ফলমাত্র ভোগ করিতে পারি, সেইরূপ জাতীয় জীবনের অতীত-কালকেও টেঁচামেচি করিয়া, বা টিকি ধরিয়া টানিয়া আনা যায় না, তার কর্ম্মফলমাত্র ভোগ করা যায়। উপযোগী চেষ্টা দ্বারা সে কর্ম্মফলকে সংশোধন করা যাইতে পারে, অন্য কর্ম্ম দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করাও সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে, কিন্তু গত কর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নহে। সেকালের মানুষ লইয়াই সেকাল বাজ করিয়াছে, আর একাল ও সেকালের মানুষের মধ্যে যখন এতটাই প্রত্যক্ষ প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তখন এই নূতন মানুষ লইয়া সে প্রাচীন সাধনাকে ফিরাইয়া আনা কি সম্ভব? কিন্তু এ সকল সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াও, বিদেশী ছাঁচে স্বদেশকে ঢালিবার উৎকট উদ্যোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা যাইতে পারে। নূতন যুগে ভারতবর্ষ নূতন আকার ধারণ করিবে, এ কথা মানি। কিন্তু এ আকার যে বিলাতী আকার হইবে, বা হওয়া কোনো রূপে বাঞ্ছনীয়, এ কথা মানিতে রাজি নহি। ভারতে যা আছে, তাই থাকুক, এ কথা বলি না। বলিলেও দুরন্ত কাল সে কথা শুনিবে না। যা আছে, তাহা থাকিবে না। যা যেমন আছে, তাহা সেরূপ থাকিতে পারে না। তাহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। পরিবর্ত্তন অবশম্ভাবী। কিন্তু একরূপ পরিবর্ত্তন মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে, অপরবিধ পরিবর্ত্তন জীবনকে ফুটাইয়া তোলে। যে পরিবর্ত্তনে নিজত্ব লোপ পায়, তাহা মৃত্যুর পথ, যে পরিবর্ত্তনে নিজত্বকে ব্যক্ত করে, দৃঢ় করে, বিস্তৃত করে, পরিণত করে,—সেই পরিবর্ত্তনই জীবনের পথ।

ধর্ম্মে যেমন ভারতবর্ষ ক্রমশঃ আপনার নিজত্বটুকু আঁকড়াইয়া ধরিতেছে, সমাজ-গঠনে, রাষ্ট্রনীতিতে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিল্প-সাহিত্যে,—সমাজ-জীবনের প্রত্যেক অঙ্গে ও সকল বিভাগে সেইরূপে নিজত্বটুকুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে। এ বিষয়ে

আমাদিগকে ভাল করিয়া এইটুকু বুঝিতে হইবে যে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্মও শ্রেষ্ঠ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

স্বধর্ম্ম পালনের চেষ্টায় সফলতা লাভ না করিয়া যদি বিনাশ প্রাপ্ত হই, তাহাও শ্রেয়স্কর, কিন্তু পরধর্ম্ম সর্ব্বদাই ভয়াবহ।

আমরা একদিন এই "স্ব"কে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। কেবল আমরা কেন, দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন জাতিই, আপনাদের এই সনাতন "স্ব"কে হারাইয়াছিল। এ জগতে জীব ব্যষ্টিভাবেই হউক আর সমষ্টিভাবেই হউক, নিয়ত এই সনাতন "স্ব"কে হারাইতেছে, খুঁজিতেছে, পাইতেছে, পাইয়া আবার হারাইতেছে, আবার খুঁজিতেছে, আবার পাইতেছে; এইরূপে জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাই জীবের উন্নতির ও বিকাশের সার্ব্বজনীন নিয়ম ও পন্থা। প্রত্যেক সমাজই যুগে যুগে আপনার এই "স্ব"কে হারায়, "স্ব"কে খোঁজে, "স্ব"কে ফিরিয়া পায়। কিন্তু প্রতিবারেই পূর্ব্বেকার অপেক্ষা বৃহত্তর, স্ফুটতর, উন্নততর, বলবত্তর "স্ব"কে প্রাপ্ত হয়। হারাইয়াছিলাম বলিয়া দুঃখ নাই, খুঁজিতেছি বলিয়া শ্রান্তির বেদনা নাই। কতবার হারাইয়াছি, কতবার খুঁজিয়াছি, আবার কতবার পাইয়াছি। আবার পাইব, আবার হারাইব, আবার খুঁজিতে হইবে। এই পথেই এই সনাতন বস্তু আপনাকে ফুটাইয়া তোলে। যখন কিছুদিন পূর্ব্বে এই "স্ব"-বস্তুকে হারাইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন বিদেশের মোহ আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আজ সেই সনাতন "স্ব"কে অল্পে-অল্পে ফিরিয়া পাইতেছি বলিয়া, এ দাবির বিরুদ্ধে আপত্তি দায়ের করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

১০। য়ুরোপের কাছে দুনিয়ার ঋণ।

এই যে আজ আসিয়ার প্রাচীন জাতিগুলি অল্পে অল্পে আপনাদিগের সনাতন "স্ব"-বস্তুকে ফিরিয়া পাইতেছে, ইহার জন্য আমরা সকলেই য়ুরোপের নিকট অতিশয় ঋণী। এ ঋণ অস্বীকার করিলে কৃতঘ্ন হইতে হয়। য়ুরোপ যে ইচ্ছা করিয়া, দুনিয়ার হিতকল্পে এ কাজ করিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। য়ুরোপ নিজের দায়ে আসিয়ায় আসিয়া পড়িয়াছে। নিজের সার্থকতার জন্য আসিয়ায় আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এ সকলই সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে য়ুরোপ যদি এমনভাবে আসিয়া আসিয়ার উপর না পড়িত, আপনার সভ্যতা, সাধনা, শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্র ও কর্ম্মকে আপনার সাধনা, আপনার শক্তি ও আপনার বেশ্যাতর দ্বারা যদি আসিয়ার প্রাচীন সমাজ-সমূহের সভ্যতা একান্ত অভিভূত করিবার প্রয়াস না পাইত, তবে আজ আসিয়াও আপনাকে আবার ফিরিয়া পাইত না। পরের সম্মুখীন না হইলে, পরের দ্বারা অভিভূত না হইলে, পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ব্যতিরেকে, কেহ কখনো আপনার "স্ব"কে ফিরিয়া পাইতে পারে না। আপনাকে জানাই আপনাকে পাওয়া। "স্ব"বস্তু মাত্রেই ব্রহ্মপর্য্যায়ভুক্ত। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যেমন—জ্ঞানেনৈব আপ্তব্যং—কেবল জ্ঞানের দ্বারাই তাহাকে পাওয়া যায়,—ব্যক্তির "স্ব"ই হউক, আর জাতির "স্ব"ই

হউক, তাহার সম্বন্ধেও সেইরূপ—জ্ঞানৈব আপ্নুয়াৎ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনাকে পাইতে হইলে, আপনাকে জানিতে হইবে। ইহার অন্য উপায় আর নাই।

আর ভেদ ব্যতিরেকে জ্ঞানের সূচনাই হয় না। একাকার নিরাকারে জ্ঞান দাঁড়াইবার স্থান পায় না। অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকের জ্ঞান সম্ভব হয়। দূরত্ব আছে বলিয়াই নৈকট্য যে কি, তাহা জানিতে পারি। দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ, ও সুখ আছে বলিয়াই দুঃখ যে কি বস্তু এবং সুখই বা কি, ইহা বুঝিতে পারি। সেইরূপ পর আছে বলিয়াই আপনাকে চিনিতে পারি ও জানিতে পারি। ইদংএর সাক্ষাৎকার না হইলে অহংএর জ্ঞান জন্মে না, জন্মিতে পারে না। আর যে পরিমাণে ইদংএর সঙ্গে বিরোধ ও সংঘর্ষ তীব্র হইয়া উঠে সেই পরিমাণে অহংএর জ্ঞানও পরিস্ফুট এবং ইদংএর জ্ঞানও উজ্জ্বল হইতে থাকে। ব্যক্তি সম্বন্ধে এ কথা যেমন সত্য, জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। কোনো জাতি যতদিন কেবল আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, পরজাতির সঙ্গে যতদিন না তার সাক্ষাৎকার ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ততদিন তার নিজের "স্ব"এর জ্ঞান ভাল করিয়া ফুটিতে পারে না। বিদেশে আপনাদিগের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, ও পরজাতির মধ্যে আপনার ধর্ম্ম প্রচার, এই দ্বিবিধ উপায়ে য়ুরোপীয় লোকেরা ভিন্ন লোকের সঙ্গে সংঘর্ষ লাভ করিয়া, আপনাদিগের স্বাভিমানকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। আর এই সংঘর্ষ হইতেই আসিয়া এবং আফ্রিকারও আত্মজ্ঞান ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। য়ুরোপ যদি এতটা প্রবলবেগে আমাদের উপরে আসিয়া না পড়িত, তবে কি চীন কি জাপান, কি ভারত কি মিশর, কোনো প্রাচীন দেশই আজ এমনভাবে আপনাকে ফিরিয়া পাইত না। দুনিয়ার এই নব-জাগরণের রাজ্যে সকলকেই আজ য়ুরোপের নিকট এই বিপুল ঋণ স্বীকার করিতে হইবে। য়ুরোপের যাহা যথার্থ প্রাপ্য, তাহা দিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে কেন ?

১১। অহং ও ইদং।

ইদংএর সম্মুখীন না হইলে, ইদংএর সঙ্গে সংঘর্ষ ও বিরোধ উপস্থিত না হইলে, অহংএর জ্ঞান জন্মে না সত্য, কিন্তু প্রথম যখন ইদং অহংএর সম্মুখীন হয়, তখনই যে এ জ্ঞান হঠাৎ ফুটিয়া ওঠে তাহা নহে। প্রথমে বরং অহং ইদংএর দ্বারা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় অহং ইদং ও ইদং অহং হইয়া যায়—একটা গোলমেলে রকমের একাকারের সৃষ্টি হয়। শিশুদিগের প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সময় এটি অতি পরিষ্কাররূপে লক্ষ্য করা যায়। তারা ইদংকে নিজেদেরই মত ভাবে ও দেখে, আর নিজেদেরও ইদংএর মতই দেখে ও ভাবে। অহং এবং ইদংএর মধ্যে যে বিশাল বিভেদ রহিয়াছে, এ জ্ঞান প্রথমেই তাহাদের ফুটিয়া ওঠে না। এইরূপে একটা গোলমেলে রকমের একাকারের মধ্যে শিশুর চৈতন্য ক্রীড়া করিতে থাকে। কোনো জাতি যখন বহুকাল আপনার মধ্যে বাস করিয়া, সহসা একটা অপর জাতির সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে আসিয়া পড়ে, বিশেষতঃ যখন এই অপর জাতি একটা অভিনব

সভ্যতার উজ্জ্বল চাকচিক্য দ্বারা তাহার চক্ষুকে ঝলসাইয়া দেয়,—তখন তাহার জ্ঞানে এইরূপ একটা গোলমেলে রকমের একাকারের প্রতিষ্ঠা হয়। এবং এই একাকারের মধ্যে সে আপনাকে একান্তই হারাইয়া ফেলে। তখন সে স্বকেই পর ও পরকেই স্ব বলিয়া ধরিতে আরম্ভ করে।

আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, আসিয়ার প্রাচীন জাতি সকলেরো এই দশাই উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে তাহাদের জ্ঞানে একটা গোলমেলে রকমের একাকারের সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পর্য্যন্ত স্ব-পর ভেদ একরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমরা সকলেই ইদংএর দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া, অহংকে ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই! আর অহংকে ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই বলিয়া, ইদংকেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। ক্রমে এই গোলমেলে একাকারের অবস্থা অতিক্রম করিয়া উঠিতেছি। এবং য়ুরোপ যতই তাহার দুর্দ্দিনের সভ্যতা দ্বারা, আমাদের যুগযুগান্তের সাধনাকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই তার এই সভ্যতার দাবিটা যে কি, এ দাবির ভিত্তি ও যুক্তি কত শক্ত, এ সকল বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

১২। সভ্যতা ও অসভ্যতা।

প্রথমে যখন য়ুরোপ আমাদিগকে অসভ্য বলিয়াছিল, তখন আমরা মাথা হেঁট করিয়া, তার এই রায়কে মানিয়া লইয়াছিলাম। আমরা খালি গায়ে থাকি, খালি পায়ে হাঁটি, মাটিতে আঁচল পাতিয়া বসি, হাত দিয়া খাই, ঠাকুর দেবতা মানি, শ্রাদ্ধশান্তি করি, বীণাবেণু বাজাই,—আমাদের গায়ে কোট পেণ্টলুন নাই, পায়ে জুতাজামা নাই, ঘরে সোফা চৌকী নাই; আমরা টেবিলে খাই না, কাঁটা চামচ ধরি না; পুতুলের পূজা করি, মরা মানুষের পিণ্ডদান করি, হারমোনিয়ম পিয়ানো বাজাই না;—এসকলই আমাদের বর্ব্বরতার লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। সেই সময়ে মাইকেলকে মিল্টন বলিয়া, বঙ্কিমকে স্কট বলিয়া, রবীন্দ্রকে শেলী বলিয়া, কালিদাসকে শেক্সপীয়র বলিয়া, আমাদের মন সান্ত্বনা লাভ করিত। আমরাও যে সভ্য, আমাদেরো যে একটা সনাতন, একটা নিজস্ব সভ্যতা ও সাধনা আছে, এ জ্ঞান তখনো জন্মে নাই। ক্রমে এখন সে জ্ঞান জন্মিয়াছে। প্রথম সময়ের গোলমেলে একাকারের পরিবর্ত্তে, এখন স্ব-পরভেদটা ক্রমশঃই জ্ঞানে স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। তাই এখন আমরা বুঝিতেছি যে খালি গায়ে থাকা, খালি পায়ে চলা, আসনে বসা, হাতে খাওয়া,—এ সকল অসভ্যতার চিহ্ন নয়। প্রত্যেক দেশের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সেই সেই দেশের ভিতরের ও বাহিরের অবস্থা হইতে, স্বাভাবিক নিয়মে গড়িয়া উঠে। ইংরেজ বা জর্ম্মাণ, চিরদিনই যে কাঁটাচামচে দিয়া খাইত, বা চেয়ার-সোফায় বসিত, এমন নহে। আর হঠাৎ একদিন যে সকলে মিলিয়া সভা করিয়া, হাত তুলিয়া ঠিক করিয়াছিল যে আর আমরা হাতে খাইব না, বা মাটিতে বসিব না, এমনো নহে। এ সকল রীতিনীতি কালক্রমে, প্রয়োজনানুরোধে সমাজে অল্পে অল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। লজ্জা নিবারণের জন্য মানুষ প্রথমে কাপড় পরিতে

আরম্ভ করে নাই, সে সময়ে নগ্নতায় লজ্জা ভাব আদৌ জন্মে নাই। শীত নিবারণের জন্য, অথবা কেবলমাত্র সৌখিনতার খাতিরে, আপনার দেহযষ্টিকে সাজাইয়া সুন্দর করিবার জন্যই মানুষ প্রথমে কাপড় পরিতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায়, শীতপ্রধান দেশে যেরূপ পোষাক প্রবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক, গ্রীষ্মপ্রধানদেশে সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। ইংরাজ, জর্ম্মান, রুশ, এসকল জাতির লোকেরা শীত নিবারণের জন্যই আপনার সর্ব্বাঙ্গ একেবারে আবৃত করিয়া থাকে। আর আমরা, গ্রীষ্মপ্রধানদেশে বাস করি,—এত কাপড়চোপড়ে আমাদের স্বাস্থ্য ও সোয়াস্তি দুই নষ্ট হয়। সুতরাং ইংরাজের কোট প্যান্টালুন যেমন সুখকর, স্বাস্থ্যকর, ও সভ্যতার পরিচায়ক; আমাদের ধুতি উত্তরীয়ও সেইরূপ সুখকর, স্বাস্থ্যকর, সুশোভন ও সুসভ্য। একসময়ে এ জ্ঞান আমাদের ভাল করিয়া জন্মায় নাই। ধুতি পরিয়া ইংরেজের সম্মুখীন হইতে, সেকালে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইত। আমরা আমাদের মাতা ও ভগ্নীর নিকটে খালি গায়ে বসিতে ও চলিতে কোনো কুণ্ঠা বোধ করিতাম না, কিন্তু সাহেব বিবি দেখিলেই গা ঢাকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এখন আর এরূপ ব্যস্ত হইব না। একদিন আমরা ইংরেজের পোষাকেই সুরুচি ও শ্লীলতা দেখিতাম, আমাদের ধুতী বা শাড়ীতে সে সুরুচি বা অশ্লীলতা দেখি নাই। আজ এভাবও বদলাইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। এখন ধুতির সুচারুতা প্যান্টালুনের অপেক্ষা বেশীই বলিয়া বোধ হয়, আর বিবিদের আঁটাশাঁটা পোষাকে দেহযষ্টিকে ঢাকিবার ভাণ করিয়াও যে ঢাকিতে চাহে না, ইহা যতই লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছি, ততই আমাদের সাদাসিধে শাড়ীর ভিতরে কি শ্রী, কি শোভা, কি কমনীয় শ্লীলতা আছে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি। মোট কথা এই—এসকল পোষাকপরিচ্ছদ, এসকল রীতিনীতি, এসকল আচারব্যবহার, ইহারা বাহিরের বস্তু ও বিষয় সত্য, কিন্তু একান্ত বাহিরেরো নয়। বাহিরের ব্যাপার হইলেও, এসকলে প্রত্যেক জাতির ভিতরকার স্বভাব, আন্তরিক প্রকৃতি, এবং যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনা ও সভ্যতার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির পোষাকপরিচ্ছদের ভিতরে তাহাদের চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ তাহাদের খাওয়াদাওয়ায়, আচার-পদ্ধতিতে তাহাদের ধর্ম্মের আদর্শ, তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্যে তাহাদের কর্ম্মের আদর্শ, এবং এই সকল বিবিধ আকারের চেষ্টাচরিত্রে, জাতীয় সভ্যতা ও সাধনার মৌলিক আদর্শ যে কি, ইহা ধরিতে পারা যায়। আর এই সকলের দ্বারাই বিভিন্ন সভ্যতার বিচার করিতে হয়। দুঃখের বিষয় এই, য়ুরোপের লোকেরা এখনো এভাবে, তুলনায় সমালোচনা করিয়া, সভ্যতার লক্ষণ নির্ণয়ে সমর্থ হয় নাই। তাই তাহাদের শ্রেষ্ঠজনেরাও, য়ুরোপের বাহিরেও যে অতি উচ্চ ও উদার সভ্যতা আছে বা থাকিতে পারে, একথা সহজে বিশ্বাস বা স্বীকার করিতে পারেন না। এজন্য তাঁরা এখনো সভ্যতার সত্যিকার মাপকাটিটা খুঁজিয়া পান নাই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বক্তব্য।

"ভারত ও বিলাত" সম্বন্ধে বিপিনবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমাদের যে দুর্ব্বলতাটির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের ভাবিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। কিন্তু স্থানে স্থানে আমরা তাঁহার যুক্তির ঠিক অনুসরণ করিতে পারিলাম না। ভারত ও বিলাতের সভ্যতা লইয়া তিনি যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার অনেকগুলি কথা পাড়লে মনে কেমন একটা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয় যেন যাহা কিছু স্বদেশী তাহার ষোল আনার সমর্থন করাই তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য। আমাদের এ ধারণা ভ্রমাত্মক বলিয়া জানিতে পারিলে সুখী হইব।

বিপিনবাবু তাঁহার প্রবন্ধে এমন কতকগুলি কথার অবতারণা করিয়াছেন, যাহা হয় ত' তাঁহার অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছাক্রমেই ঈষৎ পক্ষপাতিতার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল স্থানগুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতি প্রবন্ধলেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

তিনি বলিতেছেন আমরা "য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সার্ব্বজনীন সভ্যতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম।" যদি তাহা করিয়া থাকি তাহা হইলে ভুল করিয়াছি সন্দেহ নাই। যাহা নির্দ্দোষ, যাহা সম্পূর্ণ, যাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব দেশে সত্য, তাহাই সার্ব্বজনীন আদর্শ হইবার যোগ্য—সর্ব্বলোকের বরণীয় ও গ্রহণীয়। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে শুধু য়ুরোপের কেন, পৃথিবীর কোন দেশেরই সভ্যতা সার্ব্বজনীন আদর্শ হইবার যোগ্য নহে। ব্যক্তিগত চরিত্রের সার্ব্বজনীন আদর্শ যেমন কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সমগ্রভাবে পাওয়া অসম্ভব, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন গুণের আদর্শ অনুসন্ধান করা আবশ্যক; জাতিগত ভাবেও তেমনি কোনও জাতিবিশেষের মধ্যে সার্ব্বজনীন আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব,—তা' সে য়ুরোপেই হউক আর এসিয়াতেই হউক, ইংলণ্ডেই হউক আর ভারতেই হউক! মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে যে সমগ্র মনুষ্যসমাজের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইতে হইবে, শ্রেণীবিশেষের মধ্যে বদ্ধ থাকিলে চলিবে না, সে কথা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সংসারের সব ভাল কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। ভাল—কিছু বা আমার আছে, কিছু বা তোমার আছে, কিছু বা অপরের আছে। ইহাই জগতের চিরন্তন সত্য। বিপিনবাবু ইতিপূর্ব্বে নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সেইজন্য আমাদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে অনিবার্য্য সত্যরূপে আমাদের সমাজের সকল ব্যাপার শ্রেষ্ঠ হইতেই হইবে, সৃষ্টিনিয়মে এরূপ কথা কোথাও লেখা নাই। সমাজ ইত্যাদি সকল বিষয়েই আমাদের উন্নতির মূলে শিক্ষা অর্থাৎ জ্ঞান। সেই শিক্ষার আবার দুই পথ,—দেখা আর ঠেকা। এই দেখা ও ঠেকার ফলেই দিনে দিনে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া সভ্যতা ও সমাজ পরিবর্ত্তিত ও পরিপুষ্ট আকারে উন্নত হইয়া উঠে! কিন্তু এই উন্নতির ফলে আজ কি সমাজ

তাহার সেই অন্তর্নিহিত চিরন্তন শক্তির প্রয়োজনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? তাহা যে দিন দাঁড়াইবে সে দিন ত' সে মৃত—তাহার জীবনীশক্তিই সে হারাইবে! বাহিরের পৃথিবীকে দেখিয়া আমরা যদি কাহারও ভালটি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে সেটা কি নির্ব্বোধ অনুকরণ? নির্ব্বুদ্ধিতা কোন্‌টা—বাহিরের ভাল দেখিয়াও আপনার ক্রটি স্বীকার করিয়া অবিলম্বে অপরের সেই ভালটিকে সাদরে গ্রহণ করা, না, চোখ বুজিয়া থাকিয়া তাহাকে অস্বীকার করা? ভিতরে ভিতরে ঠেকিয়াও নিজের বস্তুটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করাই কি যথার্থ মনুষ্যত্বের লক্ষণ? বিপিনবাবু এরূপ যুক্তির সমর্থন করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নহে।

লেখক বলিয়াছেন, "বিদেশী ছাঁচে স্বদেশকে ঢালিবার উৎকট উদ্যোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা যাইতে পারে।" ইহার অর্থ কি—বিদেশী আদর্শ মাত্রেই আমাদের পরিবর্জ্জনীয়? তাহা কি আমাদের পক্ষে অমঙ্গলকর? কিন্তু আমাদের ত মনে হয় আদর্শ গ্রহণ করায় দোষ বা লজ্জা নাই। বরং তাহাতে উপকার আছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

আমরা যদি কেবলমাত্র অপরের বাহ্য চাকচিক্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া অকারণে, অপ্রয়োজনে, অবোধের ন্যায় অপরের অনুকরণ করিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা অপরাধী সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রহণ মাত্রেই যে অনুকরণ নহে এ কথাটি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

বস্তুত একটী জাতিতে কোন গুণের উৎকর্ষ দেখিয়া অপর জাতি যদি তাহার ছাঁচে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে তবে তাহাকে অনুকরণ বলাই সঙ্গত হয় না; তাহা সুপ্তভাবের উদ্বোধন মাত্র।

১২৯৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার আর্য্যামি ও সাহেবিআনা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন,—"নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে শত সহস্র সেনা তোপের মুখে জরাজীর্ণ সেতু অতিক্রম করিয়া শত্রু সৈন্য পরাভূত করিল, তাহা হইতে এমন বুঝায় না যে নেপোলিয়নের অনুকরণে সৈন্যগণ সেই মুহূর্ত্তে 'ভুঁই ফোঁড়' বীর হইয়া উঠিল—তাহাদের অন্তরে যে বীর ভাব সুপ্ত ছিল নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে তাহাই উদ্বোধিত হইয়া উঠিল মাত্র। সৈন্যগণ যদি তাঁহার ধরণে ওয়েষ্ট কোটের পকেটে হাত দিয়া দাঁড়াইত কিম্বা তাঁহার ঢঙের কোর্ত্তা পরিত তবেই অনুকরণ হইত।"

পরিবর্ত্তন যে অনিবার্য্য, অবশ্যম্ভাবী তাহা বিপিনবাবু নিজেও স্বীকার করিয়াছেন। তবে সেই পরিবর্ত্তনের আকার লইয়াই সমস্যা! আমরা যদি আমাদের নারীদের মেম সাজাইয়া পুতুলের মত নাচাই, তাহা হইলে ব্যাপারটা যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি ক্ষতিকর সন্দেহ নাই।

আর্য্যামি ও সাহেবিআনার ভাষায়—"যাহা সাজে না তাহা আপনার গায়ে বলপূর্ব্বক সাজাইতে যাওয়ার নামই অনুকরণ! Museকে সাড়ী পরা সাজে না—সরস্বতীকে গৌন পরাও সাজে না * *।" প্রকৃত অনুকরণ ইহাই। কিন্তু যদি

আমাদের নারী-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাটি চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা বা কল্পনা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক না হয় তবে কতক পরিমাণে বিলাতি আদর্শ গ্রহণ করাও আমাদের স্বাভাবিক,—এবং সুলক্ষণ। আর আদর্শ গ্রহণ করিলেই যে কোন জাতি ভিন্ন জাতি হয় না; তাহার দৃষ্টান্ত জাপান। জাপান অন্যের ছাঁচ গ্রহণ করিয়াও সে জাপানই আছে। কৌলিক নিয়ম Law of heridity এবং সঙ্গতি নিয়ম Law of adaptation এই দুই নিয়মেই সংসার ও সমাজ চলিতেছে। চতুর্দ্দিকের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত চলিতে না পারিলে কোনও জীব—কোন সমাজ পৃথিবীতে টিঁকিতে পারে না—এবং এই সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইলেই জীবের পৈতৃক গুণ সকলও ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। আসল কথাটাই হইল এই। এই ছাঁচ বা আকার আমাদের কাহারও অন্তরের আকাঙ্খার অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য নহে। যে নিয়মের বলে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, সেই নিয়মের ফলেই আকারও অবশ্যম্ভাবী! নূতন যুগের স্বধর্ম্ম যেরূপ, তাহার অভিব্যক্তির আকারও সেইরূপ হইবে। পরিবর্ত্তন ক্রিয়া আপনা হইতে স্বাভাবিক নিয়মে যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিন আমাদের কাহারও পক্ষেই "মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা" অসম্ভব, কারণ ডাকটা আমাদের নিজের নহে,—যুগধর্ম্মের! সেই ধর্ম্মানুসারে যদি আমাদের জাতিগতভাবে অপর কোন জাতির সহিত আকারের সাদৃশ্য আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমরা অতীতকে হারাইবার জন্য আক্ষেপ করিতে পারি সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানের জন্য অনুতাপ করিলে কার্য্যটা ঠিক যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

ঘরে মা বোনের কাছে আমরা যেভাবে থাকি সেইভাবে সাহেব মেম বা অপর কাহারও নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করি বলিয়া বিপিনবাবু বাঙ্গালীকে একটু লজ্জা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে লজ্জা পাইবার হেতু ত' আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। ভিতর ও বাহির বলিয়া একটা ব্যাপার চিরদিনই সকল দেশে ও সকল সমাজে আছে। ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে কি আমাদের মধ্যে তাহার কোনও বিপরীত রীতি প্রচলিত ছিল? তা ছাড়া পুরুষদের কাছে পুরুষের যেভাবে মেশায় কোনও বাধা থাকেনা, স্ত্রীলোকের সহিত মিশিতে গেলে সেভাবে চলা কোনমতেই সঙ্গত বা শোভন হয় না—একটু সংযত হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের মেলা মেশা সম্বন্ধেও একথা খাটে।

আর একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দুর বর্ণভেদে মনুষ্যত্বের যে অবমাননা করা হইয়াছে, খৃষ্টীয় দেশের শ্রেণীভেদে যে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক অবমাননা করা হয়, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।" এ স্বীকারের মূলের যুক্তিটি শুনিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম। য়ুরোপে শ্রেণীভেদ আছে সত্য,—সেখানে মানুষ উচ্চ নীচ কেবল অর্থের তারতম্যে। বেশ! মানুষকে না দেখিয়া তাহার অর্থসম্পদকে দেখিলে যে তাহার মনুষ্যত্বকে অবমাননা করা হয় তাহা বুঝিলাম। কিন্তু অর্থহীনের অর্থবান হওয়া

একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। সেইজন্য য়ুরোপে আজ যে হীন একদিন সে বা তাহার বংশধর আবার উচ্চ বা মহৎ হইবার আশা করিতে পারে, হইয়াও থাকে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান বর্ণভেদও কি তাই? আমাদের মধ্যে যে নীচ তাহার পক্ষে কি কোন দিন উচ্চ হওয়া সম্ভব? সে কি অনন্তকাল নীচ থাকিতেই বাধ্য নহে? মানুষ মানুষকে—এমন কি তাহার ছায়াটিকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করে, ঘরে ঢুকিলে তাহার সংস্পর্শে জড়বস্তুটি পর্য্যন্ত অপবিত্র হইল বলিয়া মনে করে, ইহা অপেক্ষা মনুষ্যত্বের অবমাননা যে অধিক কি হইতে পারে তাহা আমরা কল্পনা করিতেও অক্ষম। কোটি কোটি মনুষ্যকে—তাহাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার উপযুক্ত শিক্ষা, সুযোগ ও সঙ্গ হইতে বঞ্চিত রাখাই ত' মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা! এ নিষ্ঠুর নীতিকে সমর্থন করা যে কি প্রকারে সম্ভব, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

আর একটা কথার উল্লেখ করিয়াই আমরা শেষ করিব। বিপিনবাবুর মতে "সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ।" কিন্তু স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেই ত' সে অধর্ম্মের তুল্য হইল। যাহা আমার গুণকে প্রকাশ করে, বিকাশ করে, সুন্দর ও সার্থক করে, তাহাই আমার স্বধর্ম্ম। এসকলের অন্তরায় ঘটিলে বুঝিতে হইবে আমি আমার স্বধর্ম্ম হারাইয়াছি,—অধর্ম্মের অধীন হইয়াছি! তখনও "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়" বলিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকাই কি বাঞ্ছনীয়? পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া পরকে বাদ দিলে চলিবে না। পরেরও স্বয়ের মধ্যে অনন্তকাল ধরিয়া অবিরাম আদান প্রধান চলিতেছে—এই নিয়মের ফলেই তুমি আমি! এখানে তোমাকে বাদ দিলে আমি কোথায়, আমাকে বাদ দিলে তুমি কোথায়? বিপিনবাবুর কথাটার অর্থ আমরা বুঝিলাম না।

আমাদের উপরের কথায় যেন কেহ মনে না করেন যে আমরা সাহেবিয়ানারই সমর্থন করিতেছি। সাহেবিয়ানা জিনিষটা একটা মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলি যে আর্য্যামি জিনিষটাও আমাদের পক্ষে অল্প ভয়ঙ্কর ব্যাধি নহে। সকল দিক হইতেই গোঁড়ামি আমাদের উন্নতির পথের বিষম অন্তরায়। কালের উপযোগী করিয়া আপনাকে গড়িবার সমাজের যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাহাতে বাধা দিলে সমাজশক্তি স্বাস্থ্য ও কার্য্যকারিতা হারাইয়া নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়ে,—বদ্ধজলের মতই তখন তাহা নানা রোগের আকরস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সাহেব হওয়া আর সাহেবি-আনা যেমন এক নহে আর্য্য হওয়া আর আর্য্যামি করাও তেমনি কোনমতেই এক নহে। সাহেবিয়ানাও যেরূপ প্রাণহীন, কপট, আত্মপ্রবঞ্চনা, আর্য্যামিও সেইরূপ অন্ধ, আত্মক্ষয়কর আত্মপ্রবঞ্চনা। এ বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে "আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, পাঠকগণকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার বক্তব্যের উপর নূতন করিয়া বলিবার আর কিছুই নাই।

দ্বিধা।

দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। একদিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর একদিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে তারই সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্চে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস। যতকিছু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান শিক্ষা দীক্ষা সাহিত্য শিল্প সমস্তই হচ্চে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয়চেষ্টার বিচিত্র ফল।

দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই হচ্চে উন্নতির মূলে। জন্তুদের ভাগ্যে পাকস্থলীর সঙ্গে তার খাবার জিনিষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে—এই দুটোকে এক করবার জন্যে বহু দুঃখে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে সর্ব্বদাই জাগিয়ে রেখেছে, গাছ নিজের খাবারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে—ক্ষুধার সঙ্গে আহারের সামঞ্জস্যসাধনের জন্যে তাকে নিরন্তর দুঃখ পেতে হয় না। জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে—এই বিচ্ছেদের সামঞ্জস্যসাধনের দুঃখ থেকে কত বীরত্ব ও কত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হচ্চে তার আর সীমা নেই, উদ্ভিদরাজ্যে যেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নেই, অথবা যেখানে তার মিলনসাধনের জন্যে বাইরের উপায় কাজ করে সেখানে কোনো দুঃখ নেই, সমস্ত সহজ।

মনুষ্যত্বের মূলে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক্ এবং পরমার্থের দিক্, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক—এই দুইকে মিলিয়ে চল্‌তে হবে মানুষকে।

যতদিন ভাল করে মেলাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, উত্থান পতনের দুঃখ সে বড় বিষম দুঃখ। যে ধর্ম্মের মধ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘট্‌তে পারে সেই ধর্ম্মের পথ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পথ। এই ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথেই মানুষের যাত্রা;—একথা তার বলবার জো নেই যে এই দুঃখ আমি এড়িয়ে চল্‌ব। এই দুঃখকে যে স্বীকার না করে তাকে দুর্গতির মধ্যে নেমে যেতে হয়;—সেই দুর্গতি যে কি নিদারুণ পশুরা তা কল্পনাও করতে পারে না। কেননা, পশুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের দুঃখ নেই—তারা কেবলমাত্র পশু। তারা কেবলমাত্র শরীর ধারণ এবং বংশবৃদ্ধি করে চল্‌বে এতে তাদের কোনো ধিক্কার নেই। তাই তাদের পশুজন্ম একেবারে নিঃসঙ্কোচ।

মানবজন্মের মধ্যে পদে পদে সঙ্কোচ। শিশুকাল থেকেই মানুষকে কত লজ্জা, কত পরিতাপ, কত আবরণ আড়ালের মধ্যে দিয়েই চল্‌তে হয়—তার আহার বিহার তার নিজের মধ্যেই কত বাধাগ্রস্ত—নিতান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করা তার পক্ষে কত কঠিন, এমন কি, নিজের নিত্য-

সহচর শরীরকেও মানুষ লজ্জায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কারণ মানুষ যে পশু এবং মানুষ দুইই। একদিকে সে আপনার আর একদিকে সে বিশ্বের। একদিকে তার সুখ, আর একদিকে তার মঙ্গল। সুখভোগের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ আরামে থাকে এবং সেখানে তার কোনো অভাব থাকে না কিন্তু সেখানে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। সেখানে তার হাত পা চোখ কান মুখ সমস্তই নিরর্থক। যদি জান্‌তে পারি যে এই ভ্রূণ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে তাহলেই বুঝতে পারি এ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার কেন আছে। এই সকল আপাত অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকার বাসই এর চরম নয়, আলোকেই এর সমাপ্তি, বন্ধন এর পক্ষে ক্ষণকালীন এবং মুক্তিই এর পরিণাম। তেমনি মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে কেবলমাত্র স্বার্থের মধ্যে সুখভোগের মধ্যে যার পরিপূর্ণ অর্থই পাওয়া যায় না—উন্মুক্ত মঙ্গললোকেই যদি তার পরিণাম না হয় তবে সেই সমস্ত স্বার্থবিরোধী প্রবৃত্তির কোনো অর্থই থাকে না। যে সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে নিজের দিক থেকে দুর্নিবারবেগে অন্যের দিকে নিয়ে যায়, সংগ্রহের দিক থেকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, এমন কি, জীবনে আসক্তির দিক থেকে মৃত্যুকে বরণের দিকে নিয়ে যায়—যা মানুষকে বিনা প্রয়োজনে বৃহত্তর জ্ঞান ও মহত্তর চেষ্টার দিকে অর্থাৎ ভূমার দিকে আকর্ষণ করে, যা মানুষকে বিনা কারণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুঃখকে স্বীকার করতে, সুখকে বিসর্জ্জন করতে প্রবৃত্ত করে—তাতেই কেবল জানিয়ে দিতে থাকে, সুখে স্বার্থে মানুষের স্থিতি নেই—তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে মানুষকে বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে—মঙ্গলের সম্বন্ধে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে মানুষকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

এই স্বার্থের আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই হচ্চে স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্যসাধন। কারণ স্বার্থের মধ্যে আবৃত থাক্‌লেই তাকে সত্যরূপে পাওয়া যায় না। স্বার্থ থেকে যখন আমরা বহির্গত হই তখনই আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি। তখনি আমরা আপনাকে পাই বলেই অন্য সমস্তকেই পাই। গর্ভের শিশু নিজেকে জানেনা বলেই তার মাকে জানেনা—যখনি মাতার মধ্য হতে মুক্ত হয়ে সে নিজেকে জানে তখনি সে মাকে জানে।

সেই জন্যে যতক্ষণ স্বার্থের নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ এই মঙ্গললোকের মধ্যে জন্মলাভ না করে ততক্ষণ তার বেদনার অন্ত নেই। কারণ, যেখানে তার চরম স্থিতি নয়, যেখানে সে অসম্পূর্ণ, সেখানেই চিরদিন স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলি টানাটানির মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে সে যা গড়ে তুল্‌বে তা ভেঙে পড়বে, যা সংগ্রহ করবে তা হারাবে এবং যাকে সে সকলের চেয়ে লোভনীয় বলে কামনা করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেল্‌বে।

তখন কেবল আঘাত, কেবল আঘাত। তখন পিতার কাছে আমাদের কামনা এই—মা মা হিংসীঃ—আমাকে আঘাত কোরোনা, আমাকে আর আঘাত কোরোনা। আমি

এমন করে কেবলি দ্বিধার মধ্যে আর বাঁচিনে।

কিন্তু এ পিতারই হাতের আঘাত—এ মঙ্গললোকের আকর্ষণেরই বেদনা। নইলে পাপে দুঃখ থাকত না—পাপ বলেই কোনো পদার্থ থাকত না,—মানুষ পশুদের মত অপাপ হয়ে থাকত। কিন্তু, মানুষকে মানুষ হতে হবে বলেই এই দ্বন্দ্ব, এই বিদ্রোহ, বিরোধ, এই পাপ, এই পাপের বেদনা।

তাই জন্যে মানুষ ছাড়া এ প্রার্থনা কেউ কোনোদিন করতে পারে না—'বিশ্বানি দেব সবিত দুরিতানি পরাসুব'—হে দেব, হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও! এ ক্ষুধামোচনের প্রার্থনা নয়, এ প্রয়োজন সাধনের প্রার্থনা নয়—মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে আমাকে পাপ হতে মুক্ত কর। তা না করলে আমার দ্বিধা ঘুচবে না—পূর্ণতার মধ্যে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারচিনে—হে অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল পুরুষ, তুমিই যে আমার পিতা এই বোধ আমার সম্পূর্ণ হতে পারচে না—তোমাকে সত্যভাবে নমস্কার করতে পারচিনে।

'যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব'—যা ভাল তাই আমাদের দাও। মানুষের পক্ষে এ প্রার্থনা অত্যন্ত কঠিন প্রার্থনা। কেননা মানুষ যে দ্বন্দ্বের জীব—ভাল যে মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাই, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব, এ আমাদের ত্যাগের প্রার্থনা দুঃখের প্রার্থনা—নাড়ি ছেদনের প্রার্থনা। পিতার কাছে এই কঠোর প্রার্থনা মানুষ ছাড়া আর কেউ করতে পারেনা।

পিতানোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু—যজুর্ব্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্কারের প্রার্থনা। তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের পিতা বলে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।

অর্থাৎ আমার দিকেই সমস্ত টানবার যে একটা প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে নিরস্ত করে দিয়ে তোমার দিকেই সমস্ত যেন নত করে সমর্পণ করে দিতে পারি। তাহলেই যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়—আমার যেখানে সার্থকতা সেইখানেই পৌঁছতে পারি। সেখানে যে পৌঁচেছি সে কেবল তোমাকে নমস্কারের দ্বারাই চেনা যায়;—সেখানে কোনো অহঙ্কার টিঁকতেই পারে না—ধনী সেখানে দরিদ্রের সঙ্গে তোমার পায়ের কাছে এসে মেলে, তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে মূঢ়ের সঙ্গেই তোমার পায়ের কাছে এসে নত হয়;—মানুষের দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান সেখানে তোমাকে পরিপূর্ণ নমস্কার, অহঙ্কারের একান্ত বিসর্জ্জন।

এই নমস্কারটি কেমন নমস্কার?

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

যিনি সুখকর তাঁকেও নমস্কার যিনি মঙ্গলকর তাঁকেও নমস্কার—যিনি সুখের আকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলের আকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গল তাঁকে নমস্কার যিনি চরম মঙ্গল তাঁকে নমস্কার।

সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাঁকে পিতা বলে নমস্কার করচে তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা গেছে পিতরৌ

বল্‌তে পিতা ও মাতা উভয়কেই একত্রে বুঝিয়েছে।

মাতা পুত্রকে একান্ত করে দেখেন—তাঁর পুত্র তাঁর কাছে আর সমস্তকে অতিক্রম করে থাকে। এই জন্যে তাকে দেখা শোনা তাকে খাওয়ানো পরানো সাজানো নাচানো তাকে সুখী করানোতেই মা মুখ্যভাবে নিযুক্ত থাকেন। গর্ভে সে যেমন তাঁর নিজের মধ্যে একমাত্ররূপে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল, বাইরেও তিনি যেন তার জন্যে একটি বৃহত্তর গর্ভবাস তৈরি করে তুলে পুত্রের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্যে সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করে থাকেন। মাতার এই একান্ত স্নেহে পুত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজের একটি বিশেষ মূল্য যেন অনুভব করে।

কিন্তু পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র তাঁর ঘরের ছেলে করে তাকে একটি সঙ্কীর্ণ পরিধির কেন্দ্রস্থলে একমাত্র করে গড়ে তোলেন না। তাকে তিনি সকলের সামগ্রী, তাকে সমাজের মানুষ করে তোলবার জন্যেই চেষ্টা করেন। এই জন্যে তাকে সুখী করে তিনি স্থির থাকেন না, তাকে দুঃখ দিতে হয়। সে যদি এক মাত্র হত নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হত তাহলে সে যা চায় তাই তাকে দিলে ক্ষতি হত না; কিন্তু তাকে সকলের সঙ্গে মিলনের যোগ্য করতে হলে তাকে তার অনেক কামনার সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করতে হয়—তাকে অনেক কাঁদাতে হয়। ছোট হয়ে না থেকে বড় হয়ে ওঠবার যে দুঃখ তা তাকে না দিলে চলে না। বড় হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে যে সত্য হবে, তার সমস্ত শরীর ও মন, জ্ঞান, ভাব ও শক্তি সমগ্রভাবে সার্থক হবে এবং সেই সার্থকতাতেই সে যথার্থ মুক্তি-লাভ করবে—এই কথা বুঝে কঠোর শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুত্রকে মানুষ করে তোলাই পিতার কর্ত্তব্য হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের মধ্যে এই মাতা পিতা এক হয়ে আছে। তাই দেখতে পাই আমি সুখী হব বলে জগতে আয়োজনের অন্ত নেই। আকাশের নীলিমা এবং পৃথিবীর শ্যামলতায় আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়—যদি নাও যেত তবু এই জগতে আমাদের বাস অসম্ভব হত না। ফলে শস্যে আমাদের রসনার তৃপ্তি হয়—যদি নাও হত তবু প্রাণের দায়ে আমাদের পেট ভরাতেই হত। জীবনধারণে কেবল যে আমাদের বা প্রকৃতির প্রয়োজন তা নয়, তাতে আমাদের আনন্দ; শরীর চালনা করতে আমাদের আনন্দ, চিন্তা করতে আমাদের আমাদের আনন্দ, কাজ করতে আমাদের আনন্দ, প্রকাশ করতে আমাদের আনন্দ। আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য এবং রসের যোগ আছে।

তাই দেখতে পাই বিশ্বচেষ্টার বিচিত্র-ব্যাপারের মধ্যে এ চেষ্টাও নিয়ত রয়েছে, যে, জগৎ চল্‌বে, জীবন চল্‌বে এবং সেই সঙ্গে আমি পদে পদে খুসি হতে থাকব। নক্ষত্র-লোকের যে সমস্ত প্রয়োজন তা যতই প্রকাণ্ড প্রভূত ও আমার জীবনের পক্ষে যতই সুদূরবর্ত্তী হোক্ না কেন, তবুও নিশীথের আকাশে আমার কাছে মনোহর হয়ে ওঠাও তার একটা কাজ। সেই জন্য অতবড় অচিন্তনীয় বিরাট্ কাণ্ডও প্রয়োজনবিহীন গৃহসজ্জায় মত্ত হয়ে উঠে—আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আকাশমণ্ডপটিকে চুম্‌কির কাজে খচিত করে তুলেছে।

"এমনি পদে পদে দেখতে পাচ্চি জগতের রাজা আমাকে খুসি করবার জন্য তাঁর বহুলক্ষ যোজনান্তরেরও অনুচর পরিচরদের হুকুম দিয়ে রেখেছেন ; তাদের সকল কাজের মধ্যে এটাও তারা ভুলতে পারে না। এ জগতে আমার মূল্য সামান্য নয়।

কিন্তু সুখের আয়োজনের মধ্যেই যখন নিঃশেষে প্রবেশ করতে চাই—তখন আবার কে আমাদের হাত চেপে ধরে—বলে, যে, তোমাকে বদ্ধ হতে দেব না। এই সমস্ত সুখের সামগ্রীর মধ্যে ত্যাগী হয়ে মুক্ত হয়ে তোমাকে থাকতে হবে তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। শিশু যেমন গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই যথার্থভাবে সম্পূর্ণভাবে সচেতনভাবে তার মাকে পায় তেমনি এই সমস্ত সুখের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন মঙ্গললোকে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হবে তখনই সমস্তকে পরিপূর্ণরূপে পাবে। যখনি আসক্তির পথে যাবে তখনই সমগ্রকে হারাবার পথেই যাবে—বস্তুকে যখনি চোখের উপরে টেনে আনবে তখনি তাকে আর দেখতে পাবে না, তখনি চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের পিতা সুখের মধ্যে আমাদের বদ্ধ হতে দেন না, কেননা সমগ্রের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে হবে—এবং সেই যোগের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার সত্য যোগ।

এই, সমগ্রের সঙ্গে যাতে আমাদের যোগ সাধন করে তাকেই বলে মঙ্গল। এই মঙ্গল বোধই মানুষকে কিছুতেই সুখের মধ্যে স্থির থাকতে দিচ্ছেনা—এই মঙ্গল বোধই পাপের বেদনায় মানুষকে এই কান্না কাঁদাচ্চে—মা মা হিংসীঃ, বিশ্বানি দেব সবিত দুরিতানি পরাসুব, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। সমস্ত খাওয়া পরার কান্না ছাড়িয়ে এই কান্না উঠেছে—আমাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে আর আঘাত কোরো না, আমাকে পাপ থেকে মুক্ত কর, আমাকে সম্পূর্ণ তোমার মধ্যে আনন্দে নত করে দাও।

তাই মানুষ এই বলে নমস্কারের সাধনা করচে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ—সেই সুখকর যে তাঁকেও নমস্কার,আর সেই কল্যাণকর যে তাঁকেও নমস্কার—একবার মাতারূপে তাঁকে নমস্কার, একবার পিতারূপে তাঁকে নমস্কার। মানবজীবনের দ্বন্দ্বের দোলায় মধ্যে চড়ে যেদিকেই হেলি সেইদিকে তাঁকেই নমস্কার করতে শিখতে হবে তাই বলি, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ—সুখের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার, মঙ্গলের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার—মাতা যিনি সীমার মধ্যে বেঁধে ধারণ করচেন পালন করচেন তাঁকেও নমস্কার, আর পিতা যিনি বন্ধন ছেদন করে অসীমের মধ্যে আমাদের পদে পদে অগ্রসর করচেন তাঁকেও নমস্কার। অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যখন সব নমস্কার একে এসে মেলে—তখন নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—তখন সুখে মঙ্গলে আর ভেদ নেই বিরোধ নেই—তখন শিব, শিব, শিব, তখন শিব এবং শিবতর—তখন পিতা এবং মাতা একই—তখন একমাত্র পিতা ;—এবং দ্বিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানবজীবনের একটিমাত্র চরম নমস্কার,

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত ঊর্দ্ধগামী একাগ্র এই নমস্কার—অনুত্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মত দশদিগন্তব্যাপী বিপুল এই নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চয়ন।

যবদ্বীপে।

তসারী ও ব্রোমো।

মঙ্গলবার ১৬ ডিসেম্বর

আমাকে কেহ কেহ আগ্রহাতিশয় সহকারে পরামর্শ দিয়াছিলেন, যেন আমি পূর্ব্বপ্রান্তস্থ আগ্নেয় গিরি-প্রদেশ না দেখিয়া, ব্রোমোয় আরোহণ না করিয়া, যবদ্বীপ হইতে প্রস্থান না করি। তাহা করিতে হইলে, যবদ্বীপের প্রধান প্রাচ্য বন্দর সোরাবয়া হইতে যাত্রা করিতে হয়, এবং প্রথমেই প্যাসো রোয়ানের রেল-গাড়ী ধরিতে হয়।

প্যাসোরোয়ানের ষ্টেশনে, নানা দেশের পর্য্যটকেরা একত্র মিলিত হইয়াছে:—কতকগুলি ওলন্দাজ রাজপুরুষ; কতকগুলি স্থূলকায় ওলন্দাজ রমণী; কতকগুলি যাবা দেশীয় পুরুষ ও যাবা-দেশীয় রমণী; একজন মেটে ফিরিঙ্গি ষ্টেশান মাষ্টার; কতকগুলি সুশ্রী ফিরিঙ্গী-রমণী,—শ্যামবর্ণ, সুন্দর কালো চুল, হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগসূচক বড় বড় চোখ্; কতকগুলি চীনে, কতকগুলি আরব; একটি ক্ষুদ্রকায় বিবাহিতা চীন-রমণী;—তাহার ফিঁকা নীল ও গোলাপী রঙের পরিচ্ছদ—উদ্ভট্ ধরণের নক্সা-কাজে আচ্ছন্ন।

প্যাসোরোয়ানে,—পোয়েস্‌পোয়ে যাইবার জন্য একটা গাড়ী লইলাম। এই ক্ষুদ্র গাড়ীটি একটা সমভূমি বড় রাস্তার উপর দিয়া খুব দ্রুত চলিতে লাগিল। রাস্তার দুই ধারে সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী;—আমার পাণ্ডা বলিলেন, এই গাছগুলি তেঁতুল গাছ: —এই চমৎকার সুশ্যামল তরুমণ্ডপের ছায়ায়,—প্রখর সূর্য্যকিরণ সত্ত্বেও—পথটি অন্ধকারাচ্ছন্ন; গথিক ক্যাথিড্রালে প্রবেশ করিলে যেরূপ মনের ভাব হয়, এইখানে আসিয়াও যেন আমার সেইরূপ হইল। এখানকার চুন-কাম করা কাঠের বাড়ীগুলি, যাবাদ্বীপের পশ্চিম-অঞ্চল অপেক্ষা, বেশী আদিম ধরণের—অনেকটা কুটীরের কাছা-কাছি; বিচিত্র ধরণে আড়াআড়ি বাঁশ দিয়া, উচ্চ দ্বার গঠিত হইয়াছে, মনে হয় যেন ক্ষুদ্র বিজয় তোরণ; কোথাও-কোথাও, ইহার গঠনে বেশ একটু শিল্প-সৌন্দর্য্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহের অঙ্গনে, পায়রার খোপ্-যুক্ত উচ্চ বংশদণ্ড খাড়া হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে তালীবন। এখানে বড়ই গরম। এ এক রকম গুরুভার উত্তাপ, যাহার প্রভাবে মানুষ, পশুপক্ষী, গাছপালা, সমস্ত পদার্থই যেন ঘুমাইয়া পড়ে। বেশ অনুভব করা যায়—আমরা আমাদের য়ুরোপ হইতে বহু দূরে আসিয়াছি—প্রকৃতির উষ্ণপ্রধান রাজ্যে আসিয়াছি, কোন একটা সাগর দ্বীপের গভীর প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি।

পাস্রেপান নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে, আমাদের গাড়ী উচ্চে উঠিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে, যাইতে যাইতে অনেক দেশীয় লোক দেখিতে পাইলাম;—তাহারা ছোট ছোট টাট্টু লইয়া যাইতেছে, কিংবা ভারী-

ভারী কাঠের গরুর গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে। এই সকল টাট্টু ঘোড়া, ও শকটের উপর শাকসব্জি বোঝাই করা,—এইগুলা আমাদের পরিচিত শাকসব্জি। এই অঞ্চলের পাহাড় পর্ব্বতের উপর, কোন বিশেষ-জাতীয় লোক, এই সব শাক্-সব্জি চাষ করিয়া সমস্ত দেশে সরবরাহ করে; ইহাদের নাম তেঙ্গেরেস্; ইহারা যবদ্বীপের শেষ হিন্দু-উপনিবেশী; কোন এক সময়ে ইহারা মুসলমান হইয়া যায়। উহাদের ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া, উহারা স্বকীয় পুরো-হিতদিগের নিকট হইতে এই আদেশ পায় যে তাহারা যেন কখন ধানের চাষ না করে। পুরোহিতদিগের এই আশঙ্কা হইয়াছিল পাছে ধান চাষ করিতে গিয়া উহারা ভূমিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং এইরূপে বিজেতাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এক্ষণে তেঙ্গে-রেস্‌রা পাহাড় পর্ব্বতের উপর বেশ শান্তিতে আছে; সেই পুরাতন আদেশটির প্রকৃত তাৎপর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে, তবু এখনও তাহারা সেই আদেশ পালন করিয়া থাকে, ধান চাষ না করিয়া, শাকসব্জীর চাষ করে;—যাহা যবাতে সচরাচর দেখা যায় না।

একটি ছোট মেয়ে, রাস্তায় কলা বিক্রী করিতেছে; আমি তাহার কাছে গেলাম, প্রথমে সে ভয় পাইয়া পলাইল। পরে, একটু সাহস পাইয়া সে আমার নিকটে আসিল। কয়েক পয়সায় আমাকে সে ত্রিশটা কলা দিল। আমি তাহা আমার শকট-বাহকের সহিত ভাগ করিয়া খাইলাম। এখানকার জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, য়ুরোপ অপেক্ষা অনেক সস্তা।

পোস্‌পোয় আসিয়া আমার গাড়ী থামিল। এখন প্রাতরাশের সময়। একজন স্থূলকায় য়ুরোপীয় হোটেল-কর্ত্তা আমার দিকে অগ্রসর হইল। আমি ইংরাজীতে তাহাকে আমার জন্য আহার প্রস্তুত করিতে বলিলাম। সে আমাকে ফরাসীতে উত্তর দিল,—বলিল, সে ইংরাজ জানে না। সে একজন সুইস্ জর্ম্মাণ, ভারত-সৈন্যদলের অন্তর্গত একজন সৈনিক; সৈনিক কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া যবদ্বীপে অবস্থিতি করিতেছে। তাহার টেবিলের উপর দুইখানা ফরাসী ও জর্ম্মাণ সাময়িক পত্র রহিয়াছে। প্যাসেবোয়ানের ওলন্দাজী অধ্যয়ন সমাজ, এই পত্রদ্বয় তাহাকে ধার দিয়াছে:—"লা নুভেল রেভিউ" ও "ডুশে রুন্দশাউ"। একটু সঙ্কোচের ভাবে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, দেশীয়দিগের সহিত একত্র আহার করিতে আমার আপত্তি আছে কি না। "কোন আপত্তি নাই!" দেশীয় ও য়ুরোপীয় একত্র আহার করিতেছে—এ দৃশ্য এখানে এত বিরল যে, আমি বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—টেবিলে আমার পাশে ভোজনে কে কে বসিবে। —"বোনিয়োর দুইজন রাজকুমার ও দুইজন কুমার রাণী! এই মহাদ্বীপের প্রধান সুলতানের ঔরসজাত পুত্রদ্বয় এবং উহাদের পত্নী! উঁহারা য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি প্রত্যাগত হইয়াছেন, হল্যাণ্ডের রাণীর নিকট হইতে আদর-অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন..."—রাজকুমারদ্বয়, রাণীদ্বয় ও আমি—আমরা টেবিলে আসিয়াই

পরস্পরকে দস্তুরমত নতশিরে নমস্কার করিলাম। উহাদের শ্যামলবর্ণ; মুখে বেশ একটা বুদ্ধির ভাব; সাদা কাপড়ের পরিচ্ছদ,—একরকম নূতন ধরণে পরিধান করিয়াছেন, সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়ও নহে, সম্পূর্ণ দেশীয়ও নহে। উহার মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা রাণীর মুখের অবয়বগুলি খুব পরিস্ফুট, একটু কপি-ধরণের; যে সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠা,—ইহার মধ্যেই স্থূল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দেখিতে সুশ্রী। এই রাজদম্পতিদ্বয় য়ুরোপীয় ধরণে আহার করেন, টেবিলে বসিয়া বেশ শিষ্টজনোচিত ব্যবহার করেন। একমাত্র আমিই কেবল টেবিলের চাদরে দাগ লাগাইয়াছিলাম। রাজকুমারদ্বয়, য়ুরোপীয় ভাষার মধ্যে কেবল ওলন্দাজী ভাষাতেই কথা কহেন: এখন আমার দুঃখ হইতেছে, কেন আমি ওলন্দাজী ভাষা শিখি নাই!

পোস্‌পো হইতে ডোসারীতে ঘোড়ায় চড়িয়া গেলাম। এখানকার দৃশ্য কতকটা আমাদের পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায়। কদলী বৃক্ষ, 'পর্ণ'-তরু—ইহাদের সহিত আমাদের দেশের গাছপালাও মিশিয়াছে। একপ্রকার নির্য্যাসস্রাবী চিরহরিৎ বৃক্ষ এখানে প্রায়ই দেখা যায়,—তাহার ফিঁকা সবুজ রঙ্গের দীর্ঘ পত্রগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কতকগুলা ছাগল, কতকগুলা গরু—উহাদের গলায় ছোট ছোট কাঠের ঘণ্টা। অনেকগুলা হলদে-ঠোঁট বড় বড় কালো পাখী গরুদের কাঁধের উপর বসিয়া আছে, আমার ঘোড়া দেখিয়াই উহারা উড়িয়া গেল···আকাশে মেঘ জমিয়াছে, বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। পর্ব্বতের মধ্যে, বজ্রের ভীষণ নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে সচল মেঘগুলা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আমি প্রায় চারিটার সময় ডোসারীতে পৌঁছিলাম।

ডোসারী একটা পার্ব্বত্য আড্ডা। পর্ব্বতটা ১৭১৭ metre উচ্চ: যবদ্বীপের উত্তাপে অবসন্ন হইয়া ওলন্দাজেরা আরাম বিরামের জন্য এইখানে আসে। একটি গ্রামে দেশীয়দিগের ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহসমূহ, সেই গ্রামের পার্শ্বদেশে স্বাস্থ্যনিবাসের হোটেল। উৎকৃষ্ট হোটেল; ভারতীয় ওলন্দাজরাজ্যের মধ্যে এরূপ হোটেল আর নাই এখানকার হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। সাদা কাপড়ের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া এখানে গরম কাপড় পরিতে হয়। এখানকার ঘরের জানলায় সাশি আছে; বিছানায় দুইটা করিয়া চাদর, কতকগুলা কম্বল, একটা পাশের বালিশ—ঠিক্ বিলাতের মত।

রাত্রিতে, ভোজনের পূর্ব্বে, হোটেল-বাসীরা, তাহাদের নিত্যনিয়মিত জোলাপ সেবন করিল—আদা ও কোন তিক্ত দ্রব্যের মিশ্রণে এই জোলাপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জোলাপ লইয়া তাহার পর উহারা তাস ও বিলিয়ার্ড খেলিতে আরম্ভ করিল। এই দেশের ওলন্দাজী সংবাদপত্র সকল আমি পড়িতে লাগিলাম। বিলাতের সমস্ত খবর ইহাতে আছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কেননা, ভারতীয় ইংরাজি সংবাদপত্রগুলা বিলাতের সংবাদ ভাল করিয়া কিছুই দেয় না। ইঙ্গ ভারতীয় রাজ্য, ফরাসী দেশ সম্বন্ধে বড় একটা খোঁজখবর রাখে না, কিন্তু মনে হয় ফরাসী দেশ, এখানকার সংবাদপত্রের একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

এখানকার সংবাদপত্রসমূহ, ফরাসী রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া থাকে। সামারঙ্গে প্রকাশিত Lokomo tief পত্রের এক সংখ্যা আমার হাতে পড়িল; তাহাতে Millerand কৃত "প্রকৃত ব্যবহারোপযোগী সাম্যমূলক সমাজতন্ত্র"—গ্রন্থের খুব প্রশংসা করিয়াছে। ফরাসীদিগের প্রতি যাবার ওলন্দাজদিগের যে সহানুভূতি আছে উহার বিজ্ঞাপন দেখিলেও বুঝা যায়:—"প্রকৃত ফরাসী উৎপন্ন দ্রব্য, ফরাসী জাহাজে আসিয়াছে"—একজন পরিচ্ছদের দোকানদার এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছে...এবং হোটেলের যে বৈঠকখানায় বসিয়া আমি এই স্থানীয় সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া থাকি, সেই ঘরটি ফরাসী মুদ্রণ-চিত্রের দ্বারা বিভূষিত। আমাদের সাংগ্রামিক চিত্রকরগণ ফরাসী-জর্ম্মাণ যুদ্ধের যে সকল বিষাদময় দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন—ইহা সেই সব চিত্র।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

(Buddhist Records of the Western World)

"His book is a treasure-house of accurate information, indispensable to every student of Indian antiquity and has done more than any archaeological discovery to render possible the remarkable resuscitation of lost Indian history which has recently been effected."—Mr. Vincent Smith in "Early History of India".

সিই-ইউ-কি প্রণেতার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

৬০৩ খৃষ্টাব্দে চীনের অন্তর্গত হোনান প্রদেশে চিন লিউ নগরে এই যশস্বী পরিব্রাজক জন্মগ্রহণ করেন। হিউয়েনসাংয়ের জ্যেষ্ঠ আরও তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা চাংসি তাঁহাকে অল্প বয়সেই শিক্ষার্থে লোইয়াং সহরে লইয়া যান এবং ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, হিউয়েনসাং শ্রমণ ব্রত গ্রহণ করেন। বিংশ বৎসরে তিনি ভিক্ষু হয়েন ও কিছু দিন পরেই তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া চাঙ্গাগানে উপনীত হন। এই স্থলেই, তিনি ভারতবর্ষে যাইয়া অধ্যয়ন করিবেন এইরূপ স্থিরসংকল্প হইয়া অন্য একটী ভিক্ষুর সহিত ছাব্বিশ বৎসর বয়সে চাঙগান পরিত্যাগ করেন ও ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পৌঁছেন। ৬২৯ হইতে ৬৪৫ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষেই অতিবাহিত করেন। পরে স্বদেশে পৌঁছিয়া ৬৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারত হইতে নীত পুস্তকাদি অনুবাদে ব্যাপৃত থাকেন। ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। ভারতবর্ষ

হইতে প্রত্যাগমনকালীন হিউয়েনসাং নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যান :—

(১) তথাগতের শরীরের পাঁচ শত প্রকারের স্মরণ চিহ্ন (relics)

(২) স্বচ্ছ পাদদানের উপর স্থাপিত বুদ্ধদেবের ২টী সুবর্ণ প্রতিমূর্ত্তি

(৩) স্বচ্ছ পাদদানের উপর স্থাপিত চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত ৩টী বুদ্ধ মূর্ত্তি

(৪) স্বচ্ছ পাদ দানের উপর স্থাপিত বুদ্ধদেবের রৌপ্য মূর্ত্তি

(৫) মহাযান সংক্রান্ত ১২৪ খানি সূত্র গ্রন্থ।

(৬) অন্যান্য ৬২০ খানি পুস্তকের দপ্তর। ইহা বহন করিতে দ্বাবিংশটী অশ্বের প্রয়োজন হইয়াছিল।

"সি-ইউ-কি"র মুখবন্ধ।

(টাংবংশীয় নরপতির মন্ত্রী, চ্যাং ইউয়ে কর্ত্তৃক লিখিত)

যখন ঊর্ণা তাহার জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল, সহস্র পৃথিবীর উপর শিশির পতিত হইতেছিল, চন্দ্র তাহার কিরণ মালা বিস্তার করিতেছিল এবং সুগন্ধি বায়ু দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিতেছিল, তখনই জানা গেল যে যিনি পৃথিবী-পতি বলিয়া খ্যাত তিনিই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার জ্যোতি বিশ্বের চতুঃপার্শ্বে ব্যাপৃত কিন্তু তাঁহার মহান্ আদর্শ পৃথিবীর মধ্যস্থলেই স্থিত। যখন জ্ঞানসূর্য্য অস্তমিত হইতেছিল তখন তাঁহার উপদেশের ছায়া পূর্ব্বদিকে ফলিত হইয়াছিল, সম্রাটের আদেশাবলী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার সম্ভ্রমাকর্ষক বিধানগুলি পশ্চিমদিকে সীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

ত্রিপিটক-পারদর্শী হিউয়েনসাং নামক এক পণ্ডিত মন্দিরে বাস করিতেন। তিনি সাধারণতঃ চিনসি নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন পুরুষগণ ইংচুয়েন প্রদেশে বাস করিতেন। স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও পুণ্য তাঁহাতে সমাবিষ্ট ছিল। এই বীজগুলি উত্তমরূপে প্রোথিত হইয়া শীঘ্রই ফল উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞানের উৎস গভীর ছিল এবং উহা আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইতেছিল। জীবনের প্রথম উন্মেষে তিনি সান্ধ্য বাতাসের ন্যায় গোলাপী আভাযুক্ত এবং উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় পূর্ণ ছিলেন। বাল্যে দারুচিনির ন্যায় তাঁহার সুগন্ধ ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি ফান ওস্থ (১) সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিলেন। তাহার সুযশ দিগদিগন্ত ব্যাপৃত হইতে লাগিল এবং পঞ্চপরিষদে তাঁহার খ্যাতি ধ্বনিত হইতে লাগিল।

প্রভাতে তিনি সত্য ও মিথ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং রাত্রিতেও তাঁহার সাধুতা দীপ্তিমান থাকিত। সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি ইন্দ্রিয়সুখে বিরত থাকিতেন এবং পরিত্রাণের জন্য কোন সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সদাশয় ভ্রাতা চাংসীও বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হস্তী বা অসুর যে প্রকার সমকালিক জীবাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিও সেই প্রকার তৎকালীন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যেরূপ সারস বা শ্যেন পক্ষী অপর সকল পক্ষী অপেক্ষা ঊর্দ্ধে বিচরণ করে সেইরূপ বিদ্যাকাশে তিনিও সর্ব্বোচ্চে বিচরণ করিতেন। কি রাজদরবারে কি গহন বনে সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যার গৌরবে পরিচিত ছিলেন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিশেষ প্রীতি ছিল। হিউয়েনসাং ছাত্রজীবনে পাঠে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এক মুহূর্ত্তও তিনি অপব্যয় করিতেন না এবং অধ্যয়ন দ্বারা তাঁহার শিক্ষকদিগকে মহিমান্বিত করিয়াছিলেন ও স্বগ্রামের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণের সমতা ছিল এবং তাঁহার খ্যাতি তাঁহার বাসস্থলের চতুর্দ্দিকেই ব্যাপৃত হইয়াছিল। সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া পরে তিনি বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময় হইতে তিনি নানা স্থল ভ্রমণ এবং সকল বিচার স্থলে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এইপ্রকারে তিনি অনেক বৎসর অতিবাহিত করিয়া তাঁহার বিদ্যা

(১) ২৮৫২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে ২৬৯৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনের প্রাচীন ইতিহাস।

শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। হোয়ান ইয়ান দেশে তিনি লৌহবর্ম্ম পরিহিত (১) পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করিলেন। পিংলো গ্রামে তিনি এক দুরূহ সমস্যা পূরণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার খ্যাতি ও যশ বিস্তৃত হইতে লাগিল।

এই সময় সম্প্রদায় সকল বিবাদপ্রিয় ছিল। তাহারা সত্য ত্যাগ করিয়া অসত্যের আকাঙ্ক্ষা করিত। দেশ মধ্যে বিরুদ্ধবাদীদের কেবলমাত্র "হাঁ" বা "না" এই কথাই শোনা যাইত। হিউয়েনসাং ইহাতে মর্ম্মাহত হইতেন। যদি অনুবাদের ভ্রম বাহির করিতে সক্ষম না হয়েন এই ভয়ে তিনি গন্ধহস্তী (২) সংক্রান্ত সম্পূর্ণ সাহিত্য পরীক্ষায় সক্ষম করিলেন এবং সর্পপ্রাসাদের (৩) সকল পুস্তকগুলি নকল করিতে মনস্থ করিলেন।

শুভমুহূর্ত্ত দেখিয়া তিনি ভ্রমণ-যষ্টি হস্তে করিয়া ও যন্ত্রাদির ধূলি ঝাড়িয়া দূরদেশ যাত্রা করিলেন। পা নদী পার হইয়া সাংলিং পর্ব্বতাভিমুখী হইলেন। নদ নদী উত্তীর্ণ ও পর্ব্বতাদি আরোহণকালীন তাঁহাকে যথেষ্ট বিপদ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার তুলনায় পোওয়া, (৩) বা ফাহিয়ান (৫) অত্যল্প দেশেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন,সেই সকল দেশের ভাষাই তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তিনি ধর্ম্মের সকল তত্ত্বের এবং জ্ঞানের উৎসের সূক্ষ্মানুসন্ধান করিতেন। এইপ্রকারেই তিনি ভারতীয় পুস্তক শুদ্ধ করিতে ও ভারতীয় লেখকগণকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সকল পুস্তকগুলি তালপত্রে নকল করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাগমন করেন।

সম্রাট তৈসঙ্গ এই স্বনাম-প্রসিদ্ধ মনস্বীর প্রত্যাগমনের জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে নিজ সিংহাসনের পার্শ্বে আসন প্রদান করিয়া তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করিলেন। হিউয়েনসাং ৭৮০ কথা দ্বারা ত্রিপিটকের একটী ভূমিকা লিখিলেন। বর্ত্তমান সম্রাটও ৫৭৯ কথায় লিখিয়াছেন কিন্তু হিউয়েনসাং যদি কুক্কুটসংগ্রহে (৬) কিম্বা গৃধ্রকূট পর্ব্বতে (৭) তাঁহার বিদ্যার পরিচয় না দিতেন, তাহা হইলে আর বর্ত্তমান সম্রাটের পক্ষে ইহা সম্ভবপর ছিলনা।

সম্রাটের আদেশে হিউয়েনসাং সংস্কৃত ৬৫৭ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, দেশের উৎপন্ন দ্রব্য, জাতিবিভাগ, রাজকীয় পঞ্জিবিতরণের স্থল প্রভৃতি সকল বিষয়ই তিনি টাটাংসিইউকি নামক আরখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত সকল গূঢ় বিষয়ই সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রকৃতই বলা যায় যে তাঁহার গ্রন্থ অবিনশ্বর।

সিউ ইউ-কি। প্রথম ভাগ।

ভূমিকা।*

হিউয়েনসাং যে যে দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন সেই সকল দেশেরই বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও তিনি প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করেন নাই। তাহা হইলেও তিনি যে সকল বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। তিনি যে সম্রাটের (৮) বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা

---

(১) এই পণ্ডিতপ্রবর পাছে তাঁহার বিদ্যা পেট হইতে ফাটিয়া বাহির হয় সেই জন্য উদরের উপর লৌহাবরণ ব্যবহার করিতেন। (২) "গন্ধহস্তীর উল্লেখ" বৌদ্ধ পুস্তিকাসমূহে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহার যথার্থ অর্থ পাওয়া যায় না। Beal সাহেব বলেন যে "It may refer to the Solitary elephant (bull elephant) when in ruto. A perfume then flows from his ears." (৩) নিরাপদে রাখিবার জন্য সর্পরাজের প্রাসাদে অনেকগুলি পুস্তক রক্ষিত হইয়াছিল এইরূপ প্রবাদ আছে। (৪) ইহার প্রকৃত নাম চাংকিয়েন—ইনিই প্রথম চীন পর্য্যটক (৫) সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় পর্য্যটক (৩৯৯—৪১৪) (৬) পাটনার নিকটবর্ত্তী (৭) রাজগৃহের সন্নিকট।

* এই ভূমিকা পূর্ব্বোক্ত চাংইয়ে কর্তৃক লিখিত। (৮) সম্রাট হর্ষ।

জানিতে পারি যে সকল জীবই তাঁহার অনুগ্রহভাজন ছিল এবং সকলেই তাঁহার যশোগান করিত। রাজধানী হইতে দেশ-দেশান্তরের সকল লোকই রাজকীয় পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া রাজাদেশ পালন করিত। তাঁহার শস্ত্রচালনা ও বিদ্যা উভয় বিষয়ই সকলে সমভাবে প্রশংসা করিত। তাঁহার চরিত্র ও বাকপটুতা প্রশংসনীয় ছিল। ইতিপূর্ব্বে এরূপ আর কোনদিন দেখা বা শোনা যায় নাই। রাজশাসনে প্রজাবৃন্দের সুখের বর্ণনা করিয়া এইক্ষণ আমরা অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করিব।

সহস্র সহস্র পৃথিবীর সমষ্টি এই "মহালোকের" উপর এক বুদ্ধদেবেরই আধ্যাত্মিক প্রভাব। ইহারই মধ্যস্থলে চন্দ্রসূর্য্যসেবিত চারিটী মহাদেশে বুদ্ধগণ, লোকনাথগণ, পবিত্রচেতা এবং বিষয়াসক্ত লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ (২) করেন ও এইখানেই তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

সুমেরুপর্ব্বত সুবর্ণ চক্রস্থিত সমুদ্রের মধ্যস্থলে স্থাপিত। চন্দ্র ও সূর্য্য এই পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করে। চারিটি মূল্যবান ধাতুদ্বারা এই পর্ব্বত নির্ম্মিত এবং দেবতাগণ এই পর্ব্বতে বাস করেন। ইহার চতুঃপার্শ্বে সাতটী পর্ব্বত শ্রেণী এবং সাতটী সমুদ্র। প্রত্যেক পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া অষ্টগুণান্বিত সমুদ্র। সাতটী সুবর্ণ পর্ব্বতের বহির্দ্দেশে লবণ সমুদ্র। এই লবণ সমুদ্রে চারিটি জনাকীর্ণ দ্বীপ আছে। পূর্ব্বে বিদেহ, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ, পশ্চিমে গোধান্য এবং উত্তরে কুরুদ্বীপ।

সুবর্ণ চক্রধারী (২) এক রাজা এই দ্বীপপুঞ্জ ধর্ম্মানুসারে শাসন করেন। রৌপ্যচক্রধারী রাজা কুরুদ্বীপ ব্যতীত অপর তিনটী, তাম্রচক্রধারী কুরু ও গোধান্য ব্যতীত অপর দুইটী এবং লৌহচক্রধারী রাজা একমাত্র জম্বুদ্বীপই শাসন করেন। যখন কোন চক্রবর্ত্তী রাজা সিংহাসন অধিরোহণ করেন। তখন একটী বৃহৎ রত্নচক্র শূন্যে ভাসিয়া রাজার নিকট আসিতে থাকে। এই চক্রদ্বারাই (অর্থাৎ সুবর্ণ কি রৌপ্য কি তাম্র কি লৌহ) রাজার অদৃষ্ট ও নাম (৩) নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে অনবতপ্ত নামে একটী হ্রদ আছে। ইহা গন্ধবাহী পর্ব্বতের দক্ষিণে এবং তুষার পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত। ইহার পরিধি আটশত লি অপেক্ষাও বেশী। ইহার চতুঃপার্শ্ব স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা (৪) ও স্ফটিক নির্ম্মিত। ইহার তলদেশে স্বর্ণরেণু এবং ইহার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। বোধিসত্ত্ব তাঁহার তপস্যাবলে নাগরাজে পরিণত হইয়া এইস্থানে বাস করেন। তাঁহারই আবাস হইতে শীতল জল নির্গত হইয়া জম্বুদ্বীপকে উর্ব্বর করে।

এই হ্রদের পূর্ব্বপার্শ্ব হইতে একটী রৌপ্যনির্ম্মিত বৃষ মুখ হইতে গঙ্গা নির্গত হইয়াছে। হ্রদকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গা দক্ষিণপূর্ব্ব সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। হ্রদের দক্ষিণে স্বর্ণহস্তীর মুখ হইতে সিন্ধুনদ নির্গত হইয়া এবং হ্রদকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণপশ্চিম সমুদ্রের সহিত ইহা মিশ্রিত হইয়াছে। হ্রদের পশ্চিম দিক হইতে রত্ননির্ম্মিত অশ্ব মুখ দিয়া বক্ষু নদী (৫) বহির্গত হইয়া হ্রদকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আবার উত্তরপশ্চিম সমুদ্রে মিশিয়াছে। হ্রদের উত্তর হইতে স্ফটিক সিংহের মুখগহ্বর হইতে সিটা। (৬) নদী বহির্গত হইয়া এবং হ্রদকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া ইহা উত্তরপূর্ব্ব সমুদ্রে মিশিয়াছে। পরম্পরায় প্রকাশ যে এই সিটা নদী পৃথিবী প্রবেশ করিয়া পরে সি পর্ব্বতের নিম্ন দিয়া চীনে পীত নদীতে পরিণত হইয়াছে।

যখন কোন রাজচক্রবর্ত্তী থাকেন না তখন জম্বুদ্বীপে ৪ জন রাজা থাকেন। দক্ষিণে গজপতি—

(১) বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে "অনুপপাদক" বলে। (২) রাজচক্রবর্ত্তী (৩) এই চিহ্ন হইতে তাঁহার নাম (অর্থাৎ সুবর্ণ চক্রবর্ত্তী কি রৌপ্য কি তাম্র কি লৌহ ইহা) নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

(৪) lapiolzuli a mineral of beautiful ultramerine colour used largely in ornamental and mosaic work and for sumptuous altars and shrines.

(৫) অক্সাস (৬) ইয়ারকন্দ নদী।

এই দেশ উষ্ণ ও আর্দ্র—হস্তিদের পক্ষে উপযোগী। পশ্চিমে ছত্রপতি—এখানে যথেষ্ট রত্ন পাওয়া যায়। উত্তরে অশ্বপতি—অশ্বগণের উপযোগী এই দেশ শৈত্য প্রধান। পূর্ব্বে নরপতি—এই দেশের স্বাস্থ্য সুন্দর এবং দেশটী বহু জনাকীর্ণ।

গজপতিদেশীয় লোক উৎসাহী। ইহারা যাদু-বিদ্যায় পারদর্শী। ইহারা দক্ষিণ স্কন্ধ অনাবৃত রাখিয়া বস্ত্র পরিধান করে। ইহারা চুল বন্ধন করিয়া শীর্ষ দেশে চুল বর্ত্তুলাকার করিয়া রাখে। মস্তিষ্কের চতুঃপার্শ্বের চুল আঁচড়ায় না। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নগরে বাস করে। ইহাদের বাটীগুলি একের উপরে অন্যটী স্থাপিত। ছত্রপতির দেশের লোক ভদ্রতা বা সাধুতা জানে না। ইহারা কেবল অর্থ সঞ্চয়ই করে। ইহারা চুল কাটে এবং গোঁফে "তা" দেয়। ইহারা প্রাচীর বেষ্টিত নগরে বাস করে এবং ব্যবসায়ে লাভ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। অশ্বপতির দেশের লোক স্বভাবতঃই ভ্রমণশীল এবং দুরন্ত। ইহারা হিংস্রপ্রকৃতি, জীবহত্যা করে এবং বৃহৎ পশমের তাম্বু ব্যবহার করে। নরপতির দেশের লোক বুদ্ধিমান। ইহারা ধার্ম্মিক ও সাধু। ইহারা মস্তকাবরণ ও কোমরবন্ধ ব্যবহার করে। পোষাকের শেষাংশ দক্ষিণ দিকে ঝুলিতে থাকে। ইহার পদমর্য্যাদানুযায়ী যান ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। ইহারা এক স্থানেই বাস করে। ইহারা কর্ম্ম-পটু এবং নানা শ্রেণীতে বিভক্ত।

এই কয় দেশের মধ্যে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকদিগকেই সকলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করে। ইহারা পূর্ব্বদ্বারী ঘরে বাস করে এবং প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য ওঠে তখন ইহারা সূর্য্যকে প্রণাম করে। এই দেশে দক্ষিণ দিকই বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়।

রাজার প্রতি প্রজার, শ্রেষ্ঠের প্রতি নিকৃষ্টের শিষ্টতা এবং আইন ও সাহিত্য বিষয়ে নরপতির রাজ্যের লোকই অন্যান্য দেশের লোকের অগ্রণী। হস্তীরাজ্যের লোক যাহাতে আত্মা পবিত্র হয় বা যাহাতে জীবাত্মা জীবন্মৃত্যুর বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায় এই সকল বিষয়ক বিধির জন্যই প্রসিদ্ধ। ইহাদের দেশের পুস্তকাদি ও রাজাদেশ এই বিষয়ক ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। হিউয়েনসাং ভারতবর্ষীয় বৃত্তান্তাদি তদ্দেশীয় লোকপ্রমুখাৎ অবগত হইয়া ও বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

হস্তিরাজের দেশের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। পরম্পরায় শোনা যায় যে সে দেশীয় লোক ধার্ম্মিক ও দয়ার্দ্রচিত্ত। অসভ্য জাতিগণ প্রাচীর বেষ্টিত নগর নির্ম্মাণ করে এবং কৃষিকার্য্য ও পশুচারণে ব্যাপৃত থাকে। ইহারা অর্থ সঞ্চয় করে এবং ধর্ম্ম ও সাধুতার আশ্রয় লয় না। বিবাহাদি বিষয়ে ইহাদের শীলতা দেখা যায় না এবং উচ্চ ও নীচে কোন প্রভেদ নাই। স্ত্রীলোক পুরুষকে বলে যে আমি তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত এবং তোমার স্বাধীনতা স্বীকার করিলাম। ইহাই বিবাহপ্রথা। ইহারা মৃতদেহ দাহন করে এবং অশৌচের কোন কালাকাল প্রতি-পালন করে না। ইহারা মুখমণ্ডল অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করে এবং কর্ণ বিদ্ধ করে। ইহারা চুল কাটে ও বস্ত্রাদি ছিন্ন করে। উৎসবাদিতে শুভ্র বস্ত্র এবং শোকের সময় কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র ব্যবহার করে। পশু হত্যাদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করে।

হিউয়েনসাং পূর্ব্বে অগ্নি, কুচে, বালুক, মাজকেন্দ, চাজ, ফর্গণা, সরমকন্দ, মাখিয়ান, কেবুদ, কাশানিয়া, কুয়ান,বোখারা, বেতিক, খর্জ্জাম, কেশ, তার্ম্মিদ, চাঞ্চানিয়ান, গার্ম্মা, সুমান, কুলাব, কুবাদিয়ান, ওয়াক্ষ, খোটল, দারোয়াজ, রোসান, বাঘলাম, রুই সমানগন, খুলম, বক্ষ, জাঘগানা, টালিকান, গাঝ, বামিয়ান, কপিশা ভ্রমণ করিয়া পরে ভারতবর্ষে পৌঁছেন।

দ্বিতীয় ভাগে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত আরম্ভ করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

বন্দী।

২১

সেই সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিবার সময় আমার মনে কেমন একটা লঘুতা আসিল—মনে হইল, আমি যেন স্বাধীন—বন্দী নহি! কিন্তু তারপর যখন সোপান অতিক্রম করিয়া ছোট দ্বার দিয়া অন্ধকার ঘরগুলার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম—তখনি একটা নিরানন্দ অবসাদের ভাব আমাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া তুলিল।

প্রহরী আগাগোড়া সঙ্গে আসিল। আচার্য্য মহাশয় দুই ঘণ্টা পরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। তাঁর আরো সব কি কাজ আছে! সেইজন্য!

অবশেষে অধ্যক্ষের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহারি হাতে প্রহরী আমাকে সঁপিয়া দিল! আমার মনে একটা কৌতুকের হাসি দেখা দিল! সঁপিয়া দিল—আমার প্রিয়জনের হাতে এত যত্নে আমি সমর্পিত হইলাম!

অধ্যক্ষ মহাশয় তখন বড় ব্যস্ত ছিলেন। প্রহরীকে বলিলেন, "একটু সবুর কর—আমি বুঝিয়া নিতেছি!"

সত্যাই ত—একটা মানুষকে জমাখরচের খাতায়, তহবিল না মিলাইয়া, কি করিয়া জমা করেন। আর একজন হতভাগ্য বন্দীর অদৃষ্ট লইয়া তিনি তখন অতিরিক্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। প্রহরী বলিল, "বেশ আমিও আমার কাগজপত্রগুলা একবার ভালো করিয়া গুছাইয়া লই!"

একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া প্রহরীও তখন ব্যস্ত হইয়া পড়িল! আমি ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া ছিলাম! লোহার মোটা গরাদের মধ্য দিয়া বাহিরে আকাশ দেখা যাইতেছিল—রৌদ্র দেখিয়া মনে হইতেছিল, আকাশের গায় যেন কে রঙ্ মাখাইয়া দিয়াছে! উজ্জ্বল নীল বর্ণের আকাশ!

আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম—এক-আধবার মনে হইতেছিল—এই একই আকাশের নীচে এখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি—আমার স্ত্রী, আমার কন্যা তারাও আছে! কিন্তু আর কি তাদের দেখিতে পাইব?

প্রহরী আমাকে পাশে একটা ছোট কুঠ্‌রিতে লইয়া চলিল—অন্ধকূপের মত ছোট কুঠ্‌রি! মোটা লোহার জালে জানালা দুটি ঘেরা! আমি জানালার ধারে আসিয়া বসিলাম!

কতক্ষণ বসিয়াছিলাম, মনে পড়েনা! সহসা একটা অট্টহাসিতে ফিরিয়া চাহিলাম! ঘরে আর একজন লোক! বয়স পঞ্চাশের। উর্দ্ধে—পিঠ ঝুঁকিয়া গিয়াছে মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে, অথচ বেশ মজবুত দোহারা দেহ—চোখে মুখে কেমন একটা বিকট ভাব—লোকটাকে সহসা দেখিলে প্রাণ যেন শিহরিয়া উঠে—তার সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মে!

লোকটাকে পূর্ব্বে আমি লক্ষ্যই করি নাই! অথচ, সে এই ঘরে বসিয়াছিল! আশ্চর্য্য! এ কি তবে মৃত্যু—আজ এমন বেশে আসিয়া আমাকে দেখা দিয়াছে!

লোকটা কহিল, "দেখছি, তোমার ভাবখানা! কি এমন ভাবে মশগুল হে যে, একটা লোককে চোখে দেখারও অবসর পাও না! তোমার নাম কি?"

আমি কথা কহিলাম না। শুধু তার দিকে চাহিয়া রহিলাম!

সে কহিল, "কি হে, আমাকে দেখে বুঝি অবাক হয়ে গেছ! আমি একটা লগেজ,—ষ্টেশনের ছাপ-মারা হয়ে পড়ে আছি! গাড়ীতে তুলে নিলেই হয়!"

লোকটা বেশ রসিক ত! আমি কহিলাম, "তার অর্থ?"

হো হো করিয়া সে হাসিয়া উঠিল—কহিল, "এর সরল অর্থটুকু এমন কি কঠিন যে, বুঝলে না? আর ছয় সপ্তাহ পরে আমাকে ভবপারে পাঠাবে—তারি জন্য আজ 'লগেজ বুক' হয়ে রইলাম! অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা পরে তোমার যে দশা, ছয় সপ্তাহ পরে আমারো তাই! এমন দিনে, এমন বন্ধুর দিকেও তুমি ফিরে চাচ্ছ না?"

ঠিক কথা! আমার দেহের শিরাগুলায় যেন টান পড়িল!

লোকটা কহিল, "চুপ করে ভেবে আর কি হবে, বল, বন্ধু!—তার চেয়ে আমার কাহিনীটা বলি, শোন—মন্দ লাগবে না! সময়টুকুও বেশ কেটে যাবে!"

সে বলিতে আরম্ভ করিল—"আমরা কয়পুরুষ ধরিয়া চুরি বিদ্যায় বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছি। এমন শাণিত বুদ্ধি ফাঁসি-কাঠের চাপে ঝরিয়া মরিবে। অদৃষ্ট, বন্ধু!

ছয় বৎসর বয়সের সময় মা-বাপ হারাইয়া বসিলাম। লোকের পকেট কাটিয়া, নির্ব্বোধ ভুলাইয়া বেশ দুইপয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম! হাজার হউক, বংশগত বিদ্যা ত!

শীতের দুরন্ত রাত্রে, বরফে যখন পথ-মাঠ ভরিয়া যাইত, তখন শুধু পায় পথ চলাও রীতিমত অভ্যাস হইয়া গেল। তার পর ষ্টেশনে, হোটেলে, ট্রেণে, লোকের পকেট কাটিতে দড় হইয়া উঠিলাম!

পনেরো বৎসর বয়সে প্রথম ধরা পড়ি! কয়েক ঘা বেত ও দুই চারি দিনের জন্য জেল হইল! জেলের ফেরত হইলে, আমার প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল! দলের সর্দ্দার হইয়া উঠিলাম!

তারপর বড় বড় কাজে হাত দিলাম। সহরের বিখ্যাত জহরতওয়ালার দোকানে দল লইয়া উপস্থিত হইলাম! দোকান-ঘর উজাড় করিয়া ফেলিলাম—দুইটা দ্বারবানও প্রাণ দিল! তখন আমার দম্ভও বাড়িয়া গেল। দলের একটা হতভাগা স্বার্থপর বিশ্বাস-ভঙ্গ করিয়া ধরাইয়া দিল! সাত বৎসর জেল ঘুরিয়া আসিলাম। স্পষ্ট প্রমাণ তেমন কিছু ছিল না—নহিলে জেল হইতে হয়ত আর বাহির হইতে পাইতাম না! রাগ পড়িয়া গেল—সেই স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতকটার উপর!

যখন বিচার শেষ হয়—সে তখন আদালতের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। তার প্রতি শুধু একটা রক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলাম। সে দৃষ্টিতে আগুনের হল্কা ছিল—লোকটার হাড়ে হাড়ে সে জ্বালা বিঁধিয়াছিল! ভয়ে তার মুখ শুখাইয়া গেল! সাত বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল! তার পর আবার একদিন জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম!

দুই দিন ঘুরিয়াই কাটিল! মুখে অন্ন দিই নাই! প্রতিহিংসার জন্য দারুণ আক্রোশ জাগিয়াছিল!

রাত্রে জানালা ভাঙ্গিয়া হোটেলে ঢুকিয়া আহার করিলাম—পূর্ণ পরিতৃপ্তি! চুপি চুপি! কেহ জানিতেও পারিল না!

সাত আট দিন পরে দলের দুইচারিজন লোকের সহিত দেখা হইল! তারা চুরি ছাড়িয়া চাষের ক্ষেতে কেহ বা অন্য কোন কাজে দিব্য যোগ দিয়াছে! ভীরু, কাপুরুষের দল, সব!

নূতন করিয়া দল গড়িলাম! বাছাই-করা জোয়ান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক!

তার পর কিছুকাল খুব সরগরমে কাজ চলিল। নিত্য লুঠ, নিত্য জয়—নিত্য আমোদ! আনন্দে জ্ঞান হারাইবার উপক্রম করিলাম!—কিন্তু আবার পুনর্মূষিক হইলাম। সঙ্গীর দল গা-ঢাকা দিল। আমার কাজও বন্ধ হইল। রাগে দেহ কাঁপিয়া উঠিল!

তার পর একদিন পথে সেই বিশ্বাসঘাতকটাকে দেখিলাম! আমাকে দেখিয়া সে যেন কাঁপিয়া উঠিল! আমি তার চুলের মুঠি সবলে চাপিয়া ধরিলাম! কহিলাম, "কেমন? আজ!"

সে কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "মাপ,—মাপ কর সর্দ্দার!"

আমি কহিলাম, "বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নাই—তা যে কাজেই হোক!"

সে কহিল "আমি তোমার গোলাম!"

"বিশ্বাসঘাতক গোলামকে এমন করিয়া আমি শিক্ষা দিই" বলিয়া তার পৃষ্ঠে প্রচণ্ড পদাঘাত করিলাম! ছিট্‌কাইয়া সে পাঁচ হাত দূরে গিয়া পড়িল! মুখ দিয়া গল্‌গল্‌ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল। আমি কহিলাম, "উঠে আয়!"

সে আসিল—আমি তখন,—আঃ পিশাচের মত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলাম—আমার এমন দল, পুরানো সঙ্গীর দল—এই বিশ্বাসঘাতকটার জন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল! শয়তান!

পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া তার কাণ দুইটা কাটিয়া দিলাম। সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল! আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল! সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম!

তার পর সে পুলিশে যাইয়া সব কথা বলিয়া দিল। পরে, একদিন হাঁসপাতালেই মরিল—আমি ধরা পড়িলাম—আমার ফাঁসির হুকুম হইয়া গিয়াছে—ন্যায্যই হইয়াছে, কি বল? অমন করিয়া লোকটাকে মারিলাম! যাক্, ফাঁসির জন্য আমি কাতর নহি! চুরির কাজে স্ফূর্ত্তি কমিয়া আসিয়াছিল—বোকার মত, হীন চোরের মত, আমার চুরি নয়। তাতে রীতিমত বুদ্ধি খেলানো দরকার। মনের মত সঙ্গীও মিলেনা! কাজেই জীবনে আর তেমন আকর্ষণ নাই! তবু মরিবার পূর্ব্বে বিশ্বাসঘাতককে যে নিজের হাতে দণ্ড দিয়াছি ইহাই সুখ! শুনিলে ত, বন্ধু, আমার কাহিনী। চুরির কথাও দুই একটা বলিতেছি! শুনিলে বুঝিবে, এদিকটায় আমার বুদ্ধি কেমন খেলে! এমন মাথাটা ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে চলিয়াছে, দেশেরো এটা অল্প দুর্ভাগ্য নয়, বন্ধু!"

লোকটার কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল। এখন এ রাক্ষস,

পিশাচটার হেয় সংসর্গ হইতে মুক্তি পাইলে যে বাঁচি!

সে কহিল, "তুমি বড় নিরীহ! ছ্যাঃ! ফাঁসিকাঠে চলেছ, এখনো মুখে অমন দুঃখের চিহ্ন! লোকে মজা পায় এতে, জানো! তার চেয়ে তোফা আমোদ-আহ্লাদ কর, লোকে দেখুক, ফাঁসিকাঠকে এরা ডরায় না! মরণ তার খেলার সাথী। দেখে অবাক হয়ে যাবে স্তম্ভিত হয়ে যাবে—বাহাদুর ঠাওরাবে! দেখছ ত, আমার স্ফূর্ত্তিটা! দুঃখ করে ফল কি!

আমি কহিলাম "আপনি মহাশয় ব্যক্তি!"

হো হো করিয়া সে আবার হাসিয়া উঠিল, ছোট ঘর সে হাসির শব্দে যেন কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল, "ওহো 'মহাশয়' ব্যক্তি! আপনারা ভদ্র, মহাশয়, সে কথাটা মনে ছিল না! বটে, বটে! মহাশয় ব্যক্তিরও ফাঁসিতে চড়িবার সখ হয়—ভালো, ভালো!" কথাটার সহিত বেশ একটু টিট্‌কারী মিশানো ছিল!

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সে কহিল, "কি? আচার্য্যের জন্যই বুঝি আপনার দেমাটুকু! তা আপনি ত একজন জমিদার মানুষ, শুনলাম—ফাঁসিতে চড়তে চলেছেন—অমন ভালো জামাটা নষ্ট হয় কেন? আমাকে দিন! এই শীতে তবু পরে বাঁচব, তার পর না হয়, বেচিয়া চুরুট তামাকের জোগাড় দেখিব!"

আমি কোট খুলিয়া দিলাম। কিন্তু শীতে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলাম। সে কহিল, "আপনারা বড় লোক। এ শীত সহিবে না। নিন, অপনার কোট গায়ে দিন!"

লোকটার কথার সুর যেন একটু ফিরিল! আমি কহিলাম, "এ শীত আমার সহ্য হবে! কোটের দরকার নাই!"

লোকটা জানালার নীচে আসিয়া কোটটাকে সূক্ষ্মভাবে দেখিতে লাগিল—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভালো করিয়া দেখিল। পরে বলিল, "এ যে একেবারে নূতন! তা বেশ, ছয় সপ্তাহের তামাকের জোগাড় হল, আপনারি জন্য, ধন্যবাদ মশায়! কিছু মনে করবেন না, আমরা গরিব চাষা লোক!"

এমন সময় দ্বার খুলিল। অধ্যক্ষ আসিয়া আমাকে একটা প্রহরীর জিম্মা করিয়া দিলেন এবং সেই লোকটার ভার আর দুইজন প্রহরীর হাতে দিয়া বাহিরে গেলেন! আমরাও বাহিরে আসিলাম! বাহিরে আসিয়া সে কহিল, "মনে রাখবেন, মশায়, এখানে এই শেষ দেখা! আবার দেখা হবে, ছয় সপ্তাহ পরে। এই পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে সেদিন অপেক্ষা করবেন আমার জন্য।"

কথাটা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইল। বলে কি, এ? পাগল, না বোকা? কে, এ?

২২

ভারী মজার লোক ত! আমার কোটটি দিব্য লইয়া গেল!

আমি কি দান করিলাম—? তাহা নহে! আমি ভাবিলাম, বুঝি তামাসা করিতেছে! তার পর চক্ষুলজ্জায় চাহিতেও পারিলাম না!

পাকা পুরানো চোর! পা দিয়া যাহাকে দলিতে পারি, এমন স্পর্দ্ধার সহিত, সে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিল? রোষে, ক্ষোভে, আক্রোশে আমার চিত্ত গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল! মরণ আসিয়া দেখা দিয়াছে, এখনি

নিষ্ঠুরভাবে আমাকে ধূলায় পিষিয়া মারিবে! তবু এ মুহূর্ত্তে আভিজাত্যের এ নিষ্ফল আস্ফালন, কেন?

২৩,

বায়ু ও আলোকহীন ছোট ঘরে আবার আমি বন্দী! বন্দী হইয়াছি বলিয়া কি আলো বায়ুতেও আমি অধিকার হারাইয়াছি! বিচারের নামে, মানুষের প্রতি মানুষ এমন অবিচার করে! যদি শাস্তি দেওয়াই প্রয়োজন হয়, তবে অল্প খরচে আরো সহজ উপায় ত ছিল! প্রাচীনযুগের মত, একটা থলির মধ্যে পুরিয়া নদীর জলে ডুবাইয়া দিলে ত চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইত! এত কড়া পাহারা, এমন জবরদস্ত তদারকের পরিশ্রম ও ব্যয়টাও বাঁচিয়া যাইত!

ঘরে বিছানা ছিল না! প্রহরীকে বিছানার জন্য বলিতে সে অবাক হইয়া গেল! যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে,এমন ভাবখানা! অর্থাৎ ছয় ঘণ্টার জন্য আর বিছানা লইয়া আমি কি করিব?

যাহা হউক, ঘরের কোণে অধ্যক্ষ মহাশয় তখনি একটা বিছানা করাইয়া দিলেন! তাঁর দয়া অসাধারণ! মরিবার সময়, তাঁর দয়ার কথা ভাবিয়া মরিতে পাইব! কিন্তু আমার ঘরের দ্বারে পাহারা মোতায়েন রহিল—পাছে বিছানার কম্বল গলায় জড়াইয়া ফাঁসিকাঠকে আমি ফাঁকি দিই!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

জলে বাসা।

অন্ধকার ও বিজনতার মধ্যে গৃহ-নির্ম্মাণের কল্পনা যে কেবল জুল ভার্ণের ন্যায় কবির উর্ব্বর মস্তিষ্কেই প্রথম স্থান পাইয়াছিল, তাহা নহে। লোকচক্ষুর অগোচরে সমুদ্রতলের অধিবাসী মৎস্য ও কীটাদির আবাস নির্ম্মাণের প্রণালীটুকু প্রকৃতপক্ষে অপূর্ব্ব কৌতূহল ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

সমুদ্র এবং হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতির নির্ম্মল জলতলে, প্রসবের সময় ডিম্ব এবং সন্তানাদি রক্ষার জন্য গৃহনির্ম্মাণে মৎস্যজাতির সবিশেষ ব্যগ্রতা দেখা যায়। এই সকল গৃহের নির্ম্মাণ প্রণালী বেশ কৌতূহলজনক। কোন কোন স্থানে এগুলি কেবল সমুদ্রের তলদেশে বালুকা ও পঙ্কের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র গহ্বর বিশেষ, আবার কোথাও বা জলজ শৈবাল ও উদ্ভিদ্‌রাজিতে আচ্ছন্ন, আবার কোথাও বা অধিকতর শ্রমকর নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। সে কথা পরে বলিতেছি।

সারগাসো সমুদ্রে (Sargaso Sea) মৎস্যগণের আবাস-নির্ম্মাণের প্রণালীটুকু অধিকতর বিস্ময়োদ্দীপক। সারগাসো সমুদ্র ২৬০০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী এবং তাহা প্রায়ই জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের তত্ত্বসংগ্রহের পক্ষে সারগাসো সমুদ্রই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই সকল জলজ উদ্ভিদের মধ্যে বহুবিধ অদ্ভুত জীব বাস করে। এই সকল জীবের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে সারগাসো সমুদ্রই উপযুক্ত স্থান। অন্যান্য হিংস্র জীব হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহারা এই সকল উদ্ভিদাবরণের মধ্যে আশ্রয়

গ্রহণ করে। আন্তেনারিয়া (Antennaria) নামক ক্ষুদ্রাকার বিশিষ্ট একরূপ মৎস্য এই সমুদ্রে বাস করে। ইহাদিগের মস্তকের উপর শৃঙ্গের ন্যায় একপ্রকার তীক্ষ্ণ শুঁড় আছে, সাধারণতঃ শীকারকার্য্যে ইহাই তাহাদিগের প্রধান অস্ত্রস্বরূপ। ইহাদের মুখের ভঙ্গিমাও অদ্ভুত ধরণের।

এই ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্য সমুদ্রে ডিম্বাকৃতি একপ্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করে। এই সকল আবাস-স্থান সাধারণতঃ ফুটবলের অপেক্ষা কিছু বৃহৎ আকারের। সারগাসম্ জাতীয় উদ্ভিদে সুতার মত সূক্ষ্ম অসংখ্য স্তবক থাকে; এই সকল স্তবকের গাত্রে বহু পরিমাণ বায়ু-পূর্ণ কোষ জন্মে। এই সকল কোষের সাহায্যে স্তবকগুলি ঠিক সমুদ্রের উপর অর্দ্ধ নিমজ্জিত ভাবে থাকে। অনেকগুলি স্তবক যেখানে একত্র জড়িত হইয়াছে, কেবল সেই সকল স্থানেই মৎস্যেরা আপনাদিগের বাসোপ-যোগী নীড় রচনা করিয়া লয়।

এক্ষণে ইহাদিগের আবাস-নির্ম্মাণের প্রণালী সম্বন্ধে আমরা দুই এক কথা বলিব। প্রথমতঃ একটী সুদীর্ঘ লতার এক প্রান্ত সেই স্তূপাকার স্তবকগুলির ভিতর দিয়া ইহারা টানিয়া লয়। ইহাদিগের এই কার্য্য-প্রণালী অনেকটা আমাদের দেশে প্রচলিত তাঁতের মাকুর মত। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ লতা-নিবার পর যখন জড়িত লতাগুল্মগুলি বেশ জট পাকাইয়া যায়, তখন শিরিষের মত এক প্রকার নির্য্যাসের দ্বারা তাহারা সেই সকল 'লতানে' উদ্ভিদগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া দেয়। এই নির্য্যাস সাধারণতঃ তাহাদিগেরই উদরের লালাগ্রন্থি হইতে নির্গত হইয়া থাকে।

ইহাদিগের বাসস্থানগুলির সহিত পক্ষী-দিগের বাসস্থানের কোনরূপ সৌসাদৃশ্য নাই। ইহাদিগের বাসস্থানের মধ্যভাগে বাসের জন্য গহ্বর থাকে না। ডিম্বগুলি উদ্ভিদ সমূহের গাত্রে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। প্রসবের পর সেই সকল উদ্ভিদের আর একটী স্তর ইহারা বাসস্থানের উপর গড়িয়া তুলে। এই কার্য্যের অব্যবহিত পরেই পুরুভুজ নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র এবং অপরূপ উদ্ভিজ্জ প্রাণি-বিশেষ গুচ্ছাকারে এই সকল উদ্ভিদের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় ঝুলিতে থাকে। তাহা-দিগের অঙ্গ দিয়া ফস্‌ফরাসের ন্যায় এক প্রকার নীল ও শুভ্র জ্যোতি বাহির হয়। এইরূপে একে একে বাসস্থানগুলির নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে সেই সকল উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা হইতে সবুজ ও পীত বর্ণের নানা সুকোমল পল্লব বাহির হইতে থাকে। প্রায় সমস্ত আবাসস্থানটুকুই সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার হয়। প্রসূতি মৎস্য স্বীয় আবাসগৃহের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনো বা আবাসগৃহের উপরেই সে পাখনা ভাসাইয়া বিশ্রাম করে।

ডিম্বগুলি একে একে ফুটিতে আরম্ভ করিলে, পূর্ব্বোল্লিখিত উদ্ভিদগুলির বন্ধন ক্রমশই শিথিল হইয়া পড়ে। তখন বাসগৃহটি ঠিক একটী লতাকুঞ্জের মত দেখায়। শিশু মৎস্যগুলি একটু সক্ষম হইলেই সেই লতা-কুঞ্জের আশে-পাশে ধীরে ধীরে সন্তরণ করিয়া বেড়ায় এবং কোন বিপদের আশঙ্কা দেখিলেই লতাকুঞ্জের মধ্যে লুকাইয়া পড়ে।

ভূমধ্যসাগরে ব্লেক গোবি (black goby) নামক অন্য এক জাতীয় মৎস্য বহুল

পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের গৃহনির্ম্মাণপ্রণালী অতি চমৎকার। (kelp) নামক এক প্রকার শৈবালের সাহায্যে ইহারা গৃহনির্ম্মাণ করে। এই সকল গৃহের মধ্যস্থল ফাঁপা। ইহার অভ্যন্তরেই প্রসূতি মৎস্য ডিম্ব প্রসব করে এবং যতদিন না শিশুগুলি একটু বড় হয়, ততদিন পুরুষ মৎস্য গৃহের সম্মুখে পাহারা দিয়া থাকে। অপরজাতীয় মৎস্য ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়।

গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে কটকটে (toad) নামক অপর এক জাতীয় মৎস্যকে গৃহ রচনা করিতে দেখা যায়। ইহাদিগের গৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালীও বেশ। এই সকল মৎস্য দেখিতে অতি কদাকার; বর্ণও কতকটা শৈবালাচ্ছাদিত প্রস্তরখণ্ডের অনুরূপ। যখন ইহারা বালুকারাশির উপর দিয়া গুড়ি মারিয়া বেড়ায়, সেই সময় কোন স্তূপাকার শৈবাল কিম্বা প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাইলে তাহাতেই গর্ত্ত করিয়া বাস নির্ম্মাণ করে। সেই গর্ত্তের মধ্যে ডিম্বগুলি রক্ষিত হয়। সন্তানগুলি ডিম্ব হইতে বাহির হইয়া যতদিন অবধি না সবল হইয়া উঠে, ততদিন, প্রসূতি স্বয়ং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করে।

আবার এমন কতকগুলি সামুদ্রিক মৎস্য আছে, যাহারা নদীতে আসিয়া প্রসব করে। স্যামন, ঈল প্রভৃতি মৎস্য এই শ্রেণীর। প্রসবের সময় এই সকল মৎস্য বহুল পরিমাণে ধরা পড়ে। প্রসবের পর ইহাদের স্বাদও তেমন মধুর থাকে না। স্যামন মৎস্য সাধারণতঃ ক্ষীণতোয়া পার্ব্বত্য নদীতেই ডিম্ব প্রসব করে। এই সকল নদীতে আসিবার সময় তাহাদিগকে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। নদীগর্ভের খানিকটা স্থান ক্রমাগত লেজের ঝটকায় পরিচ্ছন্ন করিয়া সেই স্থানে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। স্রোতের মুখ হইতে ডিম্বগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আইল বাঁধিয়া দেয়।

বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল মৎস্য সমুদ্র হইতে নদীতে চলিয়া আসে এবং তথায় প্রসবের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া লয়। ইহাদিগের প্রথম কার্য্য সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রস্তর বালুকা প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশি একপার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়া সেই স্থানটীকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করা। কখন বা দুইটী মৎস্য পরস্পরে ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকায়, আবার কখনো বা পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করে। তাহাদিগের এই কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয় যেন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়াছে।

এইরূপে স্থানটী পরিষ্কৃত হইলে আবাস নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রস্তর-খণ্ডগুলি উপর-উপর সাজাইয়া দুই তিন ফুট উচ্চ করে। ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডগুলি সাধারণতঃ ইহারা মুখে করিয়াই বহন করিয়া আনে, কিন্তু যেগুলি একটু বৃহৎ সেগুলি মুখে করিয়া বহন করিতে পারে না। এক্ষেত্রে তাহারা বেশ একটী সুন্দর উপায় অবলম্বন করে; তাহা হইতে ইহাদিগের বুদ্ধিরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ বেগবান স্রোতের মুখেই ইহারা বাসের উপযোগী স্থান সংগ্রহ করিয়া

লয়। নদীর উপরিভাগে কিছুক্ষণ সন্তরণ করিয়া একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ইহারা বাছিয়া লয়। তৎপরে ক্রমাগত ধাক্কা এবং নীচে হইতে মোচড় দিয়া সেটিকে কিয়দ্দূর সরাইয়া আনে। পরে মসৃণ দিকটী জমির উপরে আসিলে মুখ দিয়া সমগ্র প্রস্তরখণ্ডটী উত্তমরূপে কামড়াইয়া ধরিয়া লেজটী উপর দিকে তুলিয়া ধরে। প্রস্তর ও মৎস্য উভয়ই তখন স্রোতের টানে খানিকদূর ভাসিয়া আসে। দুই চারিবার এইরূপ করিলে প্রস্তরখণ্ড ঈপ্সিত স্থানে আসিয়া পড়ে এবং নিপুণ ইঞ্জিনিয়ারের মতই মৎস্য আপন বাসা নির্ম্মাণ করিয়া লয়।

বাইন (Lamprey) মৎস্যের আবাস আকারে অনেকটা ডিম্বের মত। প্রস্তরখণ্ড বেশ সুদৃশ্যভাবে পর-পর সাজান। এক পাশে কেবল একটী ছোট প্রবেশ দ্বার থাকে। ইহার অভ্যন্তরেই ডিম্বগুলি সযত্নে রক্ষিত হয়। শিশু মৎস্যগুলি কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে এই সকল প্রস্তরখণ্ডের যুক্ত-স্থানের মধ্যস্থিত ছিদ্র পথে লুকাইয়া পড়ে।

অনেক ছোট ছোট নদীতে (ষ্টিকিল ব্যাক (sticle back) নামক আর এক জাতীয় মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দর গৃহনির্ম্মাণে ইহারা বেশ নিপুণ শিল্পী। সন্তানদিগের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়েও ইহারা বিশেষ সতর্ক। এই জাতীয় মৎস্য সচরাচর আকারে অতি ক্ষুদ্র এবং সেই অনুযায়ী ইহাদিগের গৃহও ক্ষুদ্রাকার। ছোট ছোট আগাছা সংগ্রহ করিয়াই ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করে। এই সকল গৃহ সাধারণতঃ গোলাকার এবং ফাঁপা। ইহার মধ্যেই স্ত্রীমৎস্য ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ পুষ্করিণীতে যে সকল ষ্টিকিল ব্যাক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের গৃহ-নির্ম্মাণে বেশ শিল্পচাতুর্য্য আছে। যিনি একটু যত্ন করিয়া ইহাদিগের বাসস্থানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়া থাকিবেন, কতকটা বন্য ইন্দুরের বাসার ন্যায় ইহারাও পুষ্করিণীজাত লতাগুল্মাদি দ্বারা বেশ সুন্দর গৃহ প্রস্তুত করিতে পারে।

যাঁহাদিগের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর আচারব্যবহার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের জন্য অন্ততঃ একটুও আগ্রহ আছে, তাঁহারা গৃহ-প্রাঙ্গণে ছোট ছোট চৌবাচ্চা প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে নানাবিধ জলজ আগাছা এবং ষ্টিকিল-ব্যাক প্রভৃতি মৎস্য অতি যত্নসহকারে যদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তবে সময়ে সময়ে তাহাদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন।

আমেরিকাপ্রদেশে অনেক বন্য নদীতে সূর্য্যমৎস্য (sun fish) নামক একজাতীয় বিচিত্র মৎস্য বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ নানাবিধ আগাছাবেষ্টিত কঙ্করময় স্থানেই বাসস্থান রচনা করে। এই সকল উদ্ভিদ-জাতীয় লতাগুল্মাদি এমন সুশৃঙ্খলতার সহিত সজ্জিত করে যে দেখিলে মনে হয় যেন কে নদীর অভ্যন্তরে একটী সুন্দর ফুলের বাগান সাজাইয়া রাখিয়াছে! প্রথমতঃ ইহারা গৃহনির্ম্মাণোপযোগী স্থানটী মনোনীত করে; প্রায় ১২ ইঞ্চি বর্গ পরিমাণ স্থানের সমুদয় গাছগাছড়া প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া সেই স্থানটীকে বেশ পরিষ্কার করিয়া লয়; তৎপরে ক্রমাগত লেজের আঘাতে জল-ঘূর্ণনের

দ্বারা তথা হইতে নুড়ি, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশি অপসারিত করিয়া ডিম্বাকারে একটী গহ্বর রচনা করে এবং সেই গর্ত্তেই প্রসবকালে ডিম্বাদি রক্ষিত হইয়া থাকে। আশপাশের উদ্ভিদরাশির শাখাপ্রশাখা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের গৃহটীকে ছোটখাট একটী কুঞ্জের মত রমণীয় করিয়া তোলে।

আর একজাতীয় বর্ত্তিকা মৎস্য (বাটা মাছ) আমেরিকায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের বাস-নির্ম্মাণ-প্রণালী অভিনব ধরণের। দারুণ গ্রীষ্মের সময় ইহারা নদীগর্ভের কতকটা স্থান বেশ সুন্দররূপে পরিচ্ছন্ন করিয়া তাহাতেই এক স্তর ডিম্ব প্রসব করে। পরে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা সেই ডিম্বের স্তরটীকে বেশ করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে সেই সকল আচ্ছাদন প্রস্তরখণ্ডের উপর আর এক স্তর ডিম্ব প্রসব করে এবং তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আবৃত করিয়া দেয়। এইরূপে একে একে স্তরগুলি ভূমি হইতে প্রায় আট ইঞ্চি অবধি উচ্চ করে।



বাসরচনায় নিযুক্ত সূর্য্য মৎস্য।



বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান 'পিরাই' মৎস্যের বাসা।

অরিনকো (Orinoco) নদীতে পিরাই (Perai) নামক একশ্রেণীর মৎস্য বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ নদীতটস্থিত বড় বড় বৃক্ষ হইতে লম্বমান নদীজলস্পর্শী লতাতন্তু দ্বারা দিব্য বাসস্থান রচনা করে। চিত্র হইতেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় মিলিবে।

শ্রীগুরুদাস আদক।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁ মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বিশ্বাসঘাতক আতাউল্লার কয়েকখানি পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। এই সকল পত্রে আতাউল্লা বিদ্রোহীগণকে নির্ভয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পরামর্শ দিয়া পরিশিষ্টে আশ্বাস দিয়াছেন যে তাহাদের অভীষ্টসাধনে কোন প্রকার বাধা বা বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। মুঙ্গের হইতে নবাব একেবারে বাঢ় যাত্রা করিলেন। এই বাঢ়েই বিদ্রোহীরা তাহাদের প্রধান আড্ডা স্থাপিত করিয়াছিল। বিপৎকালে মহারাষ্ট্রেরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিল। সেই জন্য তাহারা তথায় প্রতিক্ষণেই মহারাষ্ট্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। শমশীর খাঁ ইতিপূর্ব্বে একদিন হবিবকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া, মহারাষ্ট্রদিগের প্রতিজ্ঞা রক্ষার প্রতিভূ স্বরূপ তাহাকে স্বকীয় শিবিরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। শত্রুপক্ষের মধ্যে এইরূপ বিরোধ ও মনোমালিন্যে নবাবের আরও সুবিধাই হইল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই সর্দ্দার খাঁ নিহত হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। দুর্দ্দান্ত শমশীরের সহিত মুর্শিদাবাদস্থ হবিব বেগ নামে এক ব্যক্তি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে মুর্শিদাবাদের লোকেরা অসিক্রীড়ায় নিপুণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। হবিব তাহার শ্রেষ্ঠ কৌশলের বলে অবিলম্বে শমশীরের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া নবাবের পদতলে রাখিয়া দিল। বিদ্রোহী আফগানদিগকে প্রথমে পরাজিত করিয়া পরে মহারাষ্ট্রদিগকে শাসিত করাই নবাবের উদ্দেশ্য ছিল। শামশীর ও সর্দ্দারের মৃত্যুতে তাহাদের সৈন্যগণ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অগত্যা মহারাষ্ট্রেরাও যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর অভিমুখে পলায়ন করিল। পরিত্যক্ত শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিয়াই আলিবর্দ্দী তাঁহার কন্যাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রিয়তমা কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দান করিলেন ও দরিদ্রদিগের মধ্যে প্রভূত অর্থ বিতরিত করিলেন। এইবার জয়গর্ব্বে পাটনা নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি তাঁহার বালক দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলাকে তদীয় পিতৃপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। সিরাজ বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। সিরাজের অনভিজ্ঞতাহেতু নবাব রাজা জানকী রামকে সহকারী শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। আতাউল্লার অতীত রাজসেবা স্মরণ করিয়া নবাব তাহাকে অপর কোন শাস্তি না দিয়া কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং তাহার সঞ্চিত অতুল সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। আলিবর্দ্দীর অন্তর এত উদার ও মহৎ ছিল যে তাঁহার কোন কর্ম্মচারী বিদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক হইয়াছে বলিয়া তিনি তাহার পরিবারবর্গের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা নিতান্ত হীনতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সেইজন্য তিনি বিদ্রোহী আফগান সেনাপতির পরিবারবর্গকে তাহাদের শোকে সহানুভূতি জানাইয়া এক পত্র লিখিলেন এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ অর্থ ও উপঢৌকনাদি পাঠাইয়া দিলেন। এমন কি তিনি বিশ্বাসঘাতক মির হবিবের পত্নীকে অর্থ ও অন্যান্য উপহার প্রদান করিয়া স্বকীয় ব্যয়ে তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নিকট উড়িষ্যাতে পাঠাইয়া দিলেন। এই বৎসরেই জানুজি ভোঁসলে মাতৃবিয়োগ হওয়াতে মেদিনীপুর ত্যাগ করিয়া বেরার যাত্রা করিলেন।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দেই অক্লান্ত বীর আলিবর্দ্দী পুনরায় রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। এবার তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে উড়িষ্যা হইতে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু কৌশলী মহারাষ্ট্রদিগের নিকট ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া তিনি এই লুণ্ঠনকারীদিগের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য

পুনরায় বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। এবার আলিবর্দ্দী মেদিনীপুরেই বর্ষাযাপন করিয়া শীতের প্রারম্ভেই মহারাষ্ট্রদিগের সহিত শেষ-যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মেদিনীপুরের চতুর্দ্দিকে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। কিন্তু এই নির্ম্মাণ ক্রিয়া শেষ হইতে না হইতেই সিরাজের বিদ্রোহ-সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং উপস্থিত আলিবর্দ্দীকে বিহারের প্রতিই মনোযোগী হইতে হইল। সিরাজ স্বাধীনভাবে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য জানকীরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া নবাব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ সৈন্য সঙ্গে লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। কিন্তু সিরাজ তৎপূর্ব্বেই বিহারে উপস্থিত হইয়া জানকীরামের নিকট হইতে পাটনা নগর হস্তগত করিয়াছিলেন। নবাব যে সিরাজকে কিরূপ ভাল বাসিতেন, তাহা জানকীরাম জানিতেন। সুতরাং এরূপ স্থলে তাঁহার যে কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে বিনারক্তপাতে যুদ্ধ শেষ করাই শ্রেয় স্থির করিয়া, তিনি সিরাজকে পরাজিত করিয়াও অক্ষত দেহে সসৈন্যে পলায়ন করিবার অবসর প্রদান করিলেন। অনেক কষ্টে সিরাজকে বুঝাইয়া তাঁহার চিরস্নেহপূর্ণ বৃদ্ধ মাতামহের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। বৃদ্ধ নবাব তাঁহাকে তিরস্কার করা দূরে থাক, তৎক্ষণাৎ বক্ষের মধ্যে লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন। সিরাজের অকৃতজ্ঞতা বা ঔদ্ধত্যের জন্য নবাব লেশমাত্র ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না।

১৭৫১ সালে আবার মহারাষ্ট্র ও নবাবসেনার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এতকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং একটা সন্ধি স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল। আলিবর্দ্দী যেদিন বাঙ্গলার মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন, আজ আর তিনি সে আলিবর্দ্দী নাই। একে বার্দ্ধক্য তাহার উপর আবার প্রাণপ্রিয় দৌহিত্রের এই বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল—সে সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যেন দিন দিন তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছিল। এক্ষণে তাঁহার মনের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার পদ বা খ্যাতির পক্ষে ক্ষতিকর সন্ধি করিয়াও মহারাষ্ট্রের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভে প্রস্তুত ছিলেন। নবাব ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে যে সন্ধি হয় ষ্টুয়ার্ট (Stewart) সাহেব তাহার এই সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন :—

(১) মির হবিব নবাবের সহকারীরূপে গণ্য হইবেন; রাজা রঘুজি ভোঁসলের সৈন্যগণের যে টাকা প্রাপ্য আছে, মির হবিব উড়িষ্যার রাজস্ব হইতে তাহা পরিশোধ করিবেন। এতদ্ভিন্ন নবাব উক্ত রাজার প্রতিনিধিকে বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা নজর দিবেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রেরা আর নবাবের রাজ্য মধ্যে পদার্পণ করিবে না।

(২) বালেশ্বরের নিকটস্থ সোণামুখী নদী উভয় রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং মহারাষ্ট্রেরা কোনও দিন তাহা উত্তীর্ণ হইবে না, এমন কি নদীবক্ষে অবতরণ পর্য্যন্ত করিবে না।

আলিবর্দ্দী তাঁহার জীবনের শেষভাগে রাজ্যরক্ষণেই নিযুক্ত ছিলেন। বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও তাঁহার বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের শক্তি কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। সিরাজের প্রতি স্নেহাধিক্যই তাঁহার চরিত্রের একমাত্র দুর্ব্বলতা ছিল। এই দুর্ব্বলতার ফলে সিরাজ এক্ষণে তাঁহার উপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু সিরাজকে নবাব এতই ভাল বাসিতেন যে তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য এ সময় তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক জেলার উপর "আবোয়াব" কর স্থাপন করিয়াছিলেন। সিরাজ এক্ষণে তাঁহার মাতামহের রাজ্যমধ্যে যথেচ্ছশক্তি লাভ করিয়া আপন উদ্দাম প্রবৃত্তিলালসার স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন। অনেক উচ্চ পদস্থ সভাসদ্‌কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৭৫৬ সালে চিরবিশ্বস্ত বীর শাহামৎ এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৌলৎ জঙ্গের মৃত্যু হয়। উড়িষ্যা হইতে

নির্ব্বাসিত হওয়া অবধি সৌলৎ তাঁহার চরিত্র-সংশোধন করিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুতে পূর্ণিয়ায় তাঁহার প্রজাবৃন্দ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। শাহামতের অতুল বীরত্ব, অটল সাহস, এবং বিপদে ধৈর্য্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যই যে লোকে তাঁহাকে ভালবাসিত তাহা নহে। তাঁহার চরিত্র এরূপ নিষ্কলঙ্ক উদার ও মহৎ ছিল যে সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। তাঁহার দানশীলতা এত অধিক ছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পরে দেখা গেল সহস্র সহস্র বিধবা ও অনাথার ভরণপোষণ তাঁহার দাতব্য অর্থের উপর নির্ভর করিত। মাসিক ৩৭ হাজার টাকা তিনি এইরূপে গোপনে দান করিতেন। কিন্তু ভবিষ্যতে মতিঝিলের বিরাট প্রাসাদশ্রেণীর নির্ম্মাতা ও অধিকারী রূপেই তাঁহার নাম চিরস্মরনীয় রহিবে। সে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অট্টালিকা শ্রেণী আজ কণ্টক-গুল্মে আচ্ছন্ন। এক হ্রদের মধ্যস্থলে এই প্রাসাদ-শ্রেণী গঠিত হয়। শুনা যায় ভাগিরথীর সহসা গতি পরিবর্ত্তনেই এই মনোহর সরোবরের সৃষ্টি। রাজধানীর কর্ম্মসঙ্কুল জীবন হইতে কিছুক্ষণ অবসর গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির ক্রোড়ের মধ্যে শান্তি সম্ভোগ করিবার জন্য শাহামৎ তাঁহার গুণান্বিতা পত্নী, আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, ঘসিটি বেগমের সহিত এই মতিঝিলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। মুক্তা-সরোবরের (Pearl Lake) নাম মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ রহিবে। এই স্থান হইতেই সিরাজ পলাসীর যুগান্তরকারী রণক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করেন; এই স্থানেই ইংরাজ মীরজাফরকে বাংলার নবাব নাজিম বলিয়া অভিবাদন করেন; এই স্থানেই ক্লাইব নিজ-মুদ্দৌলা মুরশিদাবাদের সহিত একত্রে উপবেশন করেন; এই স্থানেই বৎসরের পর বৎসর মুর্শিদাবাদের প্রকৃত শাসনকর্ত্তাগণ অর্থাৎ ইংরাজ গভর্ণরের রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণ বাস করিতেন। এখন সেই সৌধ-শ্রেণীর মধ্যে অবশিষ্ট আছে কেবল একটি ভগ্ন গৃহ। গৃহটি দৈর্ঘ্যে ৪২হাত এবং উর্দ্ধে ১২ হাত, কোথাও প্রবেশ পথ নাই। শুনা যায় ইহার অন্ধকার গর্ভের মধ্যে নাকি শাহামৎএর অনন্ত ধনরাজী প্রোথিত আছে। আজ পর্য্যন্ত কেহ সাহস করিয়া এ স্থানটি খনন করিয়া দেখেন নাই। যে দেখিতে চেষ্টা করিবে সে নাকি ভীষণ শাপগ্রস্ত হইবে।

১৭৫৬ সালে আলিবর্দ্দী উদরী রোগে আক্রান্ত হন, এবং বহুদিন যন্ত্রণাভোগ করিয়া এপ্রিল মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে তাঁহার স্বর্গীয় জননীর পদপ্রান্তে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। আলীবর্দ্দী খাঁর জীবন অতি পবিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠাপূর্ণ ছিল। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়াই তিনি কোরাণ পাঠ করিতেন ও ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। তাঁহার দানশীলতা একপ অধিক ছিল যে শুনা যায় তাঁহার হীনতম কর্ম্মচারীরও সঞ্চিত ধন সহস্র সহস্র মুদ্রা থাকিত। তাঁহার দারিদ্র্যের দিনে যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি এরূপ কৃতজ্ঞ-প্রকৃতি ছিলেন যে তাঁহার উপকারী ব্যক্তি অতি হীন অবস্থায় থাকিলেও তিনি তাহাকে একদিনের জন্যও বিস্মৃত হইতেন না। কন্যাগুলিকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহার স্বকীয় যত্নের ফলেই তাঁহার কন্যাগুলি এরূপ অশেষ-গুণসম্পন্না হইয়াছিল। একাধিক পত্নীগ্রহণ করা আমাদের দেশের নবাবদের রীতি ছিল। কিন্তু আলিবর্দ্দী তাহা করেন নাই। তাঁহার সদ্গুণের ফলে তদীয় রাজসভাতে চতুর্দ্দিক হইতে কবি, পণ্ডিত ও গুণীগণ আসিয়া সমবেত হইতেন। আলিবর্দ্দীর মুশেয়ার গৌরব মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে। এই সকল মুশেয়াতে শ্রেষ্ঠ কবিগণ আসিয়া তাঁহাদের রচনা পাঠ করিয়া শুনাইতেন। নবাব জীবনে কোন দিন একাকী ভোজন করেন নাই, সর্ব্বদাই দুই চারি জন সহচর সঙ্গে লইয়া একত্রে ভোজন করিতেন। তাঁহার চরিত্রনীতি অতি শুদ্ধ ও কঠোর ছিল এবং অন্তর যৎপরোনাস্তি উদার ও মহৎ ছিল। অশীতি বৎসর বয়সে আলিবর্দ্দী যখন দেহত্যাগ করিলেন, তাঁহার প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহার শবানুসরণ করিল। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুতে অশ্রুত্যাগ করেন নাই এরূপ লোক নিতান্তই বিরল ছিল বলিয়া বোধ হয়। তঁহার সেই মৃত্যুদিন

হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম করিবামাত্র এক মহিমান্বিত উদার পুরুষের পবিত্র স্মৃতি বাঙ্গালীর মনে ভাসিয়া উঠে।

এক সময়ে এক প্রাচ্য পর্য্যটক বলিয়া গিয়াছেন—"সাধারণ লোকের সম্বন্ধে আমরা যে ভাবে বিচার করি, রাজাদের দোষ ত্রুটির বিষয় সে ভাবে বিচার করিলে চলে না।" এ কথাটা খুবই সত্য। অন্যের সম্বন্ধে যে দোষ আমরা সহজেই ক্ষমা করিয়া থাকি, অনেকে আলিবর্দ্দীকে সেই প্রকার দোষের জন্য অপরাধী করিয়াছেন। শিবজী সায়েস্তা খাঁকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা ক্ষমা করিতে যাঁহারা প্রস্তুত, তাঁহারাই ভাস্করকে হত্যা করার জন্য আলিবর্দ্দীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু আলিবর্দ্দীর কাল হইতে আজিকার মধ্যে জগতের নীতি-আদর্শ যে বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সে কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সে যুগে এরূপ কর্ম্ম রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কীট্‌স্‌ হইতে

এস এস হে আনন্দ, এস হে বিষাদ,
নরকতিমির এস, স্বরগের আলো,
এস আজ এস কাল পূরাও গো সাধ—
দুজনারে একসাথে আমি বাসি ভালো।
সুন্দর বসন্তপ্রাতে মুখখানি কালো
ভালবাসি—উল্কাপাতে উল্লাসের হাসি—
ভাল মন্দ একসঙ্গে দোঁহে ভালবাসি।
দাবাগ্নির বক্ষোপরে উন্মুক্ত প্রান্তর,
বিস্ময়ের মুগ্ধ মুখে উচ্চ কলস্বর;
গম্ভীর মুখশ্রী আর রঙ্গ এক সাথে,
শ্মশানের হরিধ্বনি বিবাহের রাতে;
স্তন্যপায়ী শিশু—তার খুলি নিয়ে খেলা,
মগ্ন তরণীর দৃশ্য শান্ত ভোর বেলা;
শ্যামলতা অঙ্গে বিষবল্লীর গাঁথনি,
প্রস্ফুট গোলাপকুঞ্জে সর্প গরজনি;
'ক্লিওপেট্রা' সুসজ্জিত রাজ্ঞী আড়ম্বরে—
ভুজঙ্গ-দংশন চিহ্ন রক্ত পয়োধরে;
নর্ত্তনের বাদ্যসাথে আর্ত্ত কণ্ঠরোল
পাশাপাশি একসঙ্গে পণ্ডিত পাগোল;
রৌদ্র ও করুণরস একত্র মিলন,
রাহুর উন্মুক্ত গ্রাসে মধ্যাহ্ন তপন;
হাসি শেষে কান্না—ফিরে পুন হাসিমুখ—
হায়, সে কি সুমধুর বেদনার সুখ!
এস রুদ্র, তুমিও গো করুণা সুন্দরি,
মুখের অঞ্চল-বাস দূরে অপসরি'
দেখা দাও, দেখা দাও—দাও দেখিবারে
দিবারাত্রি যুগ্ম শোভা যুক্ত একাধারে;—
মিটায়ে গো তৃষ্ণা আজি উপকণ্ঠ ভরি'
বেদনার মহানন্দরসপান করি।
রচিব নিকুঞ্জ মোর বিল্ববিটপীতে—
তুলসী মঞ্জরী মালা গ্রথিত যাহায়;
নিম্ব আর দেবদারু যার চারিভিতে,
লভিব বিশ্রাম সেথা শ্মশান শয্যায়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

জীবন-দণ্ড।

(বেল্‌জাক হইতে)

ফ্রান্সের এক তরুণ কর্ম্মচারী মেণ্ডাসহরের শৈলস্থিত প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানের প্রাচীরের কাছে বসিয়াছিল। মাথার উপর স্পেন-দেশসুলভ মৃদু নীল আকাশের চাঁদোয়া, নিম্নে চন্দ্রতারা-কিরণে সমুজ্জ্বল শৈললগ্ন সুন্দর উপত্যকা। একটি মুঞ্জরিত কমলালেবু গাছে হেলান দিয়া একশত ফিট নীচে অবস্থিত মেণ্ডা সহরের পানে সে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন এই সহরটি উত্তর বায়ুতে উড়িয়া আসিয়া শৈলের সানুদেশে আশ্রয়স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে। অন্যদিকে বিপুল সমুদ্র, সুবিস্তৃত রজত উড়ানির মত তটের বন্ধনে সুপ্তিসুখে একরূপ শান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাসাদটি আলোকময়; নৃত্য-গীত-আমোদ ও হাসিগানের দূর মৃদুশব্দ বীচিমর্ম্মরের সহিত মিলিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

স্পেনের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই প্রাসাদের অধিকারী। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ তখন সেখানে বাস করিতে-ছিলেন। সারা বিকাল ধরিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটি যেরূপ করুণামাখা স্নেহ-ব্যাকুলতার সহিত এই যুবককে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে এই ফরাসী যুবকের হৃদয়ে যে একটা স্বপ্ন-ভাবনা জাগিয়া উঠিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি!

ক্লেরা সুন্দরী; সম্ভ্রান্তবংশীয় স্পেনবাসী যে এক ফরাসী যুবা-তনয়ের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবেন না, ইহা সে জানিত। বিশেষতঃ স্পেনীয়েরা তখন ফরাসীদিগকে ঘৃণা করিত। সেই রাজ্যের শাসনকর্ত্তা জেনারেল গতিয়ে এই মার্কুয়েসকে ফার্দ্দিনন্দের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়াই সন্দেহ করিতেন। মার্কুয়েস ও তাঁহার অনুগত লোকজনকে সংযত রাখিবার জন্য ভিক্টরের অধীনে একটি সেনাদল নিযুক্ত ছিল। বিশেষতঃ এদিকে মার্শে-লনের প্রেরিত সংবাদে শীঘ্রই ইংরাজ অভি-যানের সম্ভাবনা বুঝা যাইতেছে এবং তাহাতে মার্কুয়েসেরও সহযোগিতার কথা নিতান্ত গোপন ছিল না।

সেই কারণেই স্পেনীয়দের সাদর আহ্বান সত্ত্বেও ভিক্টর বরাবর সতর্ক ছিল। নীচের দিকে চাহিয়া মার্কুয়েসের অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি ও স্পেনবাসীদিগের শান্ত মৌন বাধ্যতার সঙ্গে জেনারেল গতিয়ের সন্দেহ কি করিয়া খাপ খায়, সে তাহাই ভাবিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক নিমেষে সমস্ত চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া একটা আত্মরক্ষার ভাব ও ন্যায়সঙ্গত কৌতূহল তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। আজিকার সেণ্ট্‌ জেমস্‌ উৎসবে প্রাসাদ ব্যতীত অন্য সকল স্থানে এ সময় আলো জ্বালাইয়া রাখা ত সে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, তবে এ আলোক-রশ্মি কোথা হইতে আসে? এ কি! চৌকিস্থান হইতে তাহারি নিযুক্ত সৈন্যবর্গের বেয়নেট না মাঝে-মাঝে ঝলসিয়া উঠিতেছে? কিন্তু তখনো চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতা; স্পেনবাসী উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে, বলিয়া ত, কোনো

লক্ষণ দেখা যাইতেছে না! স্থানে স্থানে পুলিশের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য, সে সৈন্যকর্ম্মচারী মোতায়েন রাখিয়া আসিয়াছে; তবে, ইতিমধ্যে স্পেনীয়দের মধ্যে এমন কি ঘটিতে পারে? সে নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে মৃদু চরণধ্বনি শুনিয়া আবার থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পশ্চাতে চাহিয়া কিছুই সে দেখিতে পাইল না, কেবল সমুদ্র তার অসামান্য ঔজ্জ্বল্য লইয়া দৃষ্টির সম্মুখে ঝলসিয়া উঠিল। তন্মুহূর্ত্তেই সে এমন-কিছু দেখিল যাহাতে তাহার দৃষ্টিকে সে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না। শরীরের মধ্য দিয়া যেন একটা কম্পন বহিয়া গেল; বহুদূরে কতকগুলি জাহাজ ভাসিতেছিল, চাঁদের কিরণে তাহার চোখে, সেটা মোহ বিভ্রম বলিয়া মনে হইল। সেই সময় কর্কশ কণ্ঠে তাহার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া সে ফিরিয়া দেখিল, তাহারই এক অনুচর উপরে উঠিয়া আসিতেছে। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সেনাপতি, আপনি কি—?" যুবক সতর্ক নিম্নস্বরে উত্তর করিল "হাঁ, কি চাও।"

"নীচে সব পাজি ব্যাটারা পিপীলিকার মত এদিক ওদিক ফিরিতেছে, আমি যা কিছু দেখিয়াছি, তাহাও শুনুন।"

"বল।"

"এইমাত্র এদিকে আমি প্রাসাদ হইতে আগত একটা লোকের অনুসরণ করিয়াছিলাম; এত রাতে লণ্ঠনটা ভয়ানক সন্দেহের জিনিষ। আমি মনে ভাবিলাম ব্যাটারা আমাদের হাড়গোড় চিবিয়ে খেতে চায়। তাই এই পথে পাছে পাছে তার অন্ধি সন্ধি লক্ষ্য করিতে গেলাম। দেখি একটা প্রকাণ্ড জ্বালানি কাঠের আঁটি অল্প দূরে একটা উঁচু জায়গায় একেবারে স্তূপাকার করিয়া রাখা হইয়াছে—"

কথাটা শেষ হইল না। সহসা একটা ভয়ানক চীৎকার-ধ্বনি সহরের বুক চিরিয়া ভাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে একটা উজ্জ্বল আলোও ভিক্টরের সম্মুখে ঝলসিয়া উঠিল। মাথায় গোলার আঘাত পাইয়া সৈন্যটি পড়িয়া গেল। যুবকের দশ-বারো পদ দূরে খড়কুটা ও শুকনো কাঠে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নাচঘরে মুহূর্ত্তের মাঝে হাস্যগীত থামিয়া গেল। সহসা উৎসবের গীতধ্বনি ও মধুর উন্মাদনার স্থানে মৃত্যুর বিরাট স্তব্ধতা আসিয়া চারিদিক ঘেরিয়া বসিল; শুধু মাঝে মাঝে অস্ফুট কাতরধ্বনিতে এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। কামানের বজ্রধ্বনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া সমুদ্রের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। ভিক্টরের ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। হায়! এই দুঃসময়ে একটা অসিও তাহার হাতে নাই। ইতিমধ্যে তাহার সব লোক যে নিহত হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল। ইংরাজেরাও শীঘ্র আসিয়া পৌঁছিবে। বাঁচিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে তাহার জন্য অপমান সঞ্চিত হইয়া আছে, সে তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিল। উপত্যকার গভীরতা চক্ষুদ্বারা পরিমাপ করিয়া সে নীচে লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল, অমনি নিঃশেষে ক্লেরা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ক্লেরা বলিল, "পালাও, আমার ভাইরা তোমাকে মারিবার জন্য অনুসরণ করিতেছে; এদিকে পাহাড়ের

নীচে জুয়ানিটোর ঘোড়া আছে,—ছুটিয়া যাও।"

বিস্মিত যুবক তাহার দিকে ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। ক্লেরা তাহাকে ঠেলিয়া দিল, তখন আত্মরক্ষার জন্য একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাবশে, সে ক্লেরার প্রদর্শিত পথে ছুটিয়া চলিল। যে পথে মেষ ছাড়া মানুষ কখনো চলে নাই, ভিক্টর সেই দুর্গম পাহাড়ের পথে লাফাইয়া পড়িল; সে শুনিল, ক্লেরা তাহার ভাইদিগের নিকট চীৎকার করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিবার জন্য বলিয়া দিতেছে, আততায়ীরা তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, কত গোলাগুলি কানের পাশ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সে নির্ব্বিঘ্নে নীচে পৌঁছিল, দেখিল, ঘোড়া বাঁধা আছে; নিমেষের মধ্যে তার পিঠে চড়িয়া বসিয়া সে বিদ্যুদ্বেগে সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই জেনারেল গতিয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। গতিয়ে তখন অনুচরবর্গসহ ডিনারে বসিয়াছেন।

তাহার মুখ ফ্যাকাশে এবং বিকৃত হইয়া গিয়াছে। দাঁড়াইয়াই সে সমস্ত বিপদের বার্ত্তা বিবৃত করিল। সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ের সহিত শুনিল।

কিছুক্ষণ পরে কঠোরহৃদয় গতিয়ে বলিলেন, "তোমাকে দোষীর চেয়ে বেশী দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে হয়; স্পেনবাসীদের এই বিপ্লবের জন্য অবশ্য তুমি দায়ী নও; আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, তবে মার্শেল অন্য বিচার না করিলে ভালো।"

বেচারা ভিক্টর ইহাতে অল্পই সান্ত্বনা পাইল, সে বলিল, "কিন্তু যখন সম্রাট শুনিবেন?"

"তোমাকে বধ করিতে চাহিবেন! যা হোক, সে বিষয়ে আর কথা নয়—তবে এমন একটা প্রতিশোধ লইতে হইবে যে সমস্ত দেশ জুড়িয়া একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠে, দেখিব হতভাগারা কেমন সব অসভ্যের মত যুদ্ধ করে।"

এক ঘণ্টার মধ্যে অশ্বারোহী ও পদাতিকে মিলিয়া বিপুল সৈন্যবাহিনী অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অভিযানে বাহির হইল। গতিয়ে ও ভিক্টর সকলের আগে চলিলেন। সৈন্যেরা সহযাত্রীগণের এই নিদারুণ নিধন বার্ত্তা শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। আশ্চর্য্য দ্রুততার সহিত সকলে আসিয়া মেণ্ডায় পৌঁছিল। জেনারেল দেখিলেন পথে সমস্ত গ্রাম বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে; একে একে সবগুলিকে ঘেরাও করিয়া তিনি অসংখ্য গ্রামবাসীর হত্যাসাধন করিলেন।

কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে ইংরাজ জাহাজগুলি আর অগ্রসর হয় নাই। শেষে জানা গেল যে এইগুলি তাহাদের সঙ্গীর দলকে পাছে ফেলিয়া কেবল অস্ত্র শস্ত্র নিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কাজেই ইংরাজাগমনোৎফুল্ল মেণ্ডাসহর হঠাৎ যখন সে সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গেল, তখন বিনা যুদ্ধে ফরাসীদের হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় রহিল না। প্রাসাদের সামান্য ভৃত্যটি হইতে মার্কুয়েস অবধি সকলে বন্দীভাবে তাঁহার হাতে বিচারের অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলে, জেনারেল অত্যাচার হইতে অবশিষ্ট সকলকে রক্ষা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

সৈন্যদলের নিরাপদের জন্য জেনারেল যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। সৈন্যাবাসের জন্য শিবির সংস্থাপন করিয়া পাহাড়ে উঠিয়া প্রাসাদ অধিকার করিলেন। লিয়াগেরিস্ পরিবারের সকলেই অনুচর বর্গের সহিত বলনাচের সুবৃহৎ কক্ষে বন্দী হইলেন। সেই কক্ষের জানালা দিয়া উন্নত ভূমির নিম্নদেশে প্রসারিত মেণ্ডা সহর অবস্থিত।

জেনারেল বিচারে বসিলেন। দুই শত বন্দী স্পেনবাসীকে প্রাসাদসংলগ্ন উন্নত স্থানটির উপর গুলি করিয়া মারা হইল। এবং প্রাসাদের বন্দীদিগের জন্য ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইল। তাড়াতাড়ি জেনারেলের নিকট আসিয়া ভিক্টর আবেগপূর্ণ ভগ্নকণ্ঠে বলিল "আমি আপনার নিকট একটা ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।"

জেনারেল তীব্র ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন "তুমি?"

ভিক্টর বলিল,"মার্কুয়েস্ ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইতে দেখিয়াছেন; তাঁহার পরিবারবর্গের নিধন-সাধনের জন্য অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করিবেন এইটুকু তিনি আশা করেন।"

জেনারেল বলিলেন,"আচ্ছা, তাই হউক।"

ভিক্টর বলিল, "তাঁরা আপনার কাছে আরো প্রার্থনা করেন যে, আপনি তাহাদিগকে ধর্ম্মের শেষ সান্ত্বনা গ্রহণ এবং বন্ধন মোচনের অনুমতি দিবেন; তাঁহারা পলাইবার কোনো চেষ্টা করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।"

জেনারেল বলিলেন, "আচ্ছা আমি স্বীকৃত কিন্তু তুমি তাদের জন্য দায়ী রহিলে।"

"বৃদ্ধ তাঁহার ছোট ছেলের জীবনের বিনিময়ে আপনাকে তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি দিতেও প্রস্তুত আছেন।"

জেনারেল বলিলেন, "বাঃ! তার সব ত এখন রাজা জোশেফের।" কিছু ক্ষণ থামিয়া অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গিসহকারে জেনারেল আবার বলিলেন "শেষ অনুরোধটির মর্ম্ম এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ভালো তাহার বংশ বরাবর টিঁকিয়া থাকুক, কিন্তু স্পেনবাসীরা তাহার বিশ্বাসঘাতকতা এবং শোচনীয় শাস্তির কথা চিরদিন স্মরণ রাখিবে। তার কোনো পুত্র যদি আজ জহ্লাদের কাজ করত তাকে তার জীবন এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। যাও, এ সম্বন্ধে আমাকে আর বেশী কথা বলিও না।"

গর্ব্বোদ্ধত লিয়াগেরিস্ পরিবার আজ মর্ম্মান্তিক শোকে দগ্ধ হইতেছে। ভিক্টর করুণার সহিত তাহাদিগের দিকে চাহিয়া দেখিল। গত রজনীতেই এই অনিন্দ্যরূপা বালিকাদুটিকে এবং তিন ভ্রাতাকে এই কক্ষের মাঝেই নৃত্যগীত রঙ্গের মধুরোন্মাদে সে মগ্ন দেখিয়াছিল। এত শীঘ্র তাহাদের সুন্দর শিরগুলি স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে! নিরুপায়! এই কথাটা স্মরণ করিয়া ভিক্টর কাঁপিয়া উঠিল। তাহাদের স্বর্ণাঙ্কিত চেয়ারে রজ্জুবদ্ধ পিতা এবং মাতা, তাঁহাদের দুইটি মেয়ে ও তিনটি ছেলে, গতি-হীন মৌন হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে আট জন অনুচর পশ্চাদ্বদ্ধ হাতে দাঁড়াইয়া আছে। এই দলের জনে পরস্পর মুখচাওয়া-চায়ি করিতেছে। অন্তরে যে প্রবল চিন্তা

উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, চোখে তার বিন্দুমাত্র আভাস নাই, শুধু আত্মসমর্পণ এবং সম্মিলিত চেষ্টার অসম্ভাবিত নিষ্ফলতার। নিবিড় ছায়া কাহারো বা মুখে অঙ্কিত! পাহারায় নিযুক্ত সৈন্যেরাও তাহাদের নির্ম্মম শত্রুদিগের এই নির্ব্বাক শোকাভিনয়ে মৌন-করুণ শ্রদ্ধা-মিশ্রিত সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। ভিক্টরের আগমনে একটা ব্যগ্র কৌতূহলে সকলের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সৈন্যদিগকে বন্দীদের বন্ধন মোচন করিতে সে আদেশ দিল এবং স্বয়ং গিয়া ক্লেরাকে বন্ধনমুক্ত করিল।

অধরপুটে একটি সুকরুণ মৃদু হাসি ফুটাইয়া ক্লেরা বলিল, "তুমি কৃতকার্য্য হয়েছিলে?" তাহার চোখে তখনো বাল্যের সরল মধুরিমা বিরাজ করিতেছিল।

অলক্ষিতে ভিক্টরের দীর্ঘনিশ্বাস বায়ুতে মিলাইয়া গেল। সকাতর দৃষ্টিতে সে একবার ক্লেরা এবং তাহার তিনটি ভাইয়ের দিকে চাহিল। বড় ভাইটির বয়স ত্রিশ,—খর্ব্বাকৃতি, তার দৃষ্টি গর্ব্ব এবং ঔদ্ধত্যে পূর্ণ, কিন্তু সমস্ত দেহভঙ্গিতে একটা উন্নত আভিজাত্যের গৌরব ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং যে সূক্ষ্ম কোমল পরদুঃখকাতর হৃদয়ভাব অজস্র স্পেনদেশের নাইট সম্প্রদায়ের বীরত্বগর্ব্বে দেশ বিদেশে যশোমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, জুয়ানিটোতে তাহারো অভাব বোধ হইল না। দ্বিতীয় ভাইটির নাম ফেলিপি; বয়স বিশ, দেখিতে ক্লেরার মত। সবার ছোট ম্যানুয়েলের বয়স আট, তাহার মুখভঙ্গিতে একটা সুগভীর দৃঢ়তার ভাব অঙ্কিত। বৃদ্ধ মার্কুয়েসের উন্নত দেহ পলিত কেশ। জেনারেলের প্রস্তাব যে তাহারা কখনো মানিয়া লইবে, এমন আশা ভিক্টর হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিল না। তথাপি ক্লেরার নিকট সে ধীরে ধীরে প্রস্তাবটি পাড়িয়া ফেলিল। প্রথমটা ক্লেরা বিস্ময়-চমকে কাঁপিয়া উঠিল; শেষে স্বাভাবিক শান্তভাবে পিতার কাছে গিয়া হাঁটু গাঁড়িয়া সে বলিল, "পিতা, জুয়ানিটোকে এই কাজ করতে বাধ্য করাও, তাতে আমাদের মঙ্গল হবে।" মার্কুয়েস-পত্নী ক্লেরার মর্ম্মান্তিক প্রস্তাব শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। জুয়ানিটো পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত সহসা লাফাইয়া উঠিল। ভিক্টর তখন সৈন্য গণকে সরিয়া যাইতে বলিল। যখন ভিক্টর ছাড়া সেখানে অন্য লোক আর কেহ রহিল না, তখন মার্কুয়েস্ ডাকিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে "জুয়ানিটো!"

মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করা ব্যতীত জুয়ানিটো কথায় কোনো উত্তর দিল না। ক্লেরা নিকট গিয়া তাহার হাঁটুর উপর বসিল, এবং বাহুদ্বারা জুয়ানিটোর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার আঁখির পাতায় চুম্বন করিল। মৃদু হাসিয়া ক্লেরা বলিল, "জুয়ানিটো, ভাই, তুমি যদি শুধু জানতে, তোমার হাতে মরণ আমাদের কত সুখের, তা হলে জহ্লাদের হাতের স্পর্শ হতে এখনি রক্ষা করবে। আমাদের জন্য যত দুঃখ সঞ্চিত আছে, সে সব হতে তুমিই আজ মুক্তি দিতে পার—অন্যের হাতের লাঞ্ছনা তুমি দেখতে পারবে না, জানি, তবে—" কথা শেষ না করিয়া জুয়ানিটোর হৃদয়ে ফরাসীবিদ্বেষ জাগাইয়া দিবার জন্যই ক্লেরা তীব্র দৃষ্টিতে একবার ভিক্টরের দিকে চাহিল।

ফেলিপি বলিল, "ভয় কিসের? ভেবে

দেখ, আমাদের বংশ বরাবর একরকমে স্পেনে রাজা গড়ে এসেছে, তুমি যদি না থাক, তবে সে বংশ একেবারে নির্ম্মূল হয়ে যাবে যে!"

সহসা ক্লেরা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জুয়ানিটোর চারিদিক হইতে সকলে সরিয়া আসিল, বৃদ্ধ পিতা তখন উচ্চস্বরে বলিলেন, "জুয়ানিটো, আমি তোমাকে আদেশ করছি।"

যুবক কাউন্ট নির্ব্বাকভাবে বসিয়া রহিল। তাহার পিতা সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন; ক্লেরা ম্যানুয়েল ফেলিপি মেরিকুইটা অলক্ষিতে তাঁহার অনুসরণ করিল। তাহারা সকলে জুয়ানিটোর দিকে হাত জোড় করিয়া রহিল। সে-ই শুধু তাহাদিগকে অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে! তাহার দৃঢ়তার উপরেই পুরাতন লিয়াগেরিস বংশের গৌরব ও স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে!

সকলে মার্কুয়েসের কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছিল। পিতা কহিলেন, "তুমি কি তোমার সমস্ত শক্তি এবং স্পেনের গৌরব-গর্ব্ব আজ বিসর্জ্জন দিবে? কতক্ষণ তুমি তোমার পিতাকে এমন অবস্থায় রাখিবে? তোমার জীবন ও দুঃখের কথা ভাবিবার এখন তোমার কি অধিকার আছে?" পরে বৃদ্ধ পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "লিনা, এই কি আমার পুত্র?"

মার্কুয়েস্-পত্নী হতাশার স্বরে বলিলেন, "ও স্বীকার করেছে গো!" জুয়ানিটোর চক্ষুর পাতা নামিয়া পড়িল জননী শুধু অর্থ বুঝিয়াছিলেন।

ছোট মেয়ে মেরিকুইটা তখনো তেমন হাঁটু গাঁড়িয়া রহিয়াছিল; সে তাহার মায়ের কণ্ঠ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ছোট ভাই ম্যানুয়েল তাহাকে খুব ভৎসনা করিল। সেই মুহূর্ত্তে বংশ-পুরোহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; সমস্ত পরিবারটি আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং জুয়ানিটোর কাছে লইয়া গেল। এ দৃশ্য ভিক্টরের আর সহ্য হইল না, সে ক্লেরাকে ইঙ্গিত করিয়া শেষ চেষ্টার একবার জন্য জেনারেলের নিকট ছুটিয়া চলিল। জেনারেল তখন সহচরদিগের সহিত আমোদ-উৎসবে রত!

ঘণ্টাখানেক পরে মেণ্ডার অধিবাসীদের মধ্যে এক শত জন মাতব্বর ব্যক্তি জেনারেলের আদেশে লিয়াগেরিস্ পরিবারের হত্যা দেখিবার জন্য প্রাসাদের সম্মুখস্থিত সমতলভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মার্কুয়েসের ভৃত্যেরা তখনো ফাঁসীকাঠে ঝুলিতেছিল। বধ্যকাষ্ঠ, খড়্গ, এবং জুয়ানিটোর অস্বীকৃতি আশঙ্কায় সহরের জহ্লাদ, তখনো মার্কুয়েস্ পরিবারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে স্পেনবাসীরা তখন কাহাদের চরণ ধ্বনি শুনিতে পাইল, সজ্জিত সৈন্যবর্গের পরিমিত পদক্ষেপ, অস্ত্রশস্ত্রের ঠুন-ঠুনি সৈন্য কর্ম্মচারীদের আমোদোৎসবের বিচিত্র কলধ্বনির সহিত মিলিয়া তাঁহাদের কাণে ভাসিয়া বাজিতেছিল। গত নিশীথোৎসবের আড়ালে যেমন এক বিশ্বাসঘাতক হত্যাকাণ্ড লুকাইয়াছিল, আজিকার হাসিগান ও পানোন্মত্ত সৈন্য কর্ম্মচারীদের উদ্ভ্রান্ত উন্মাদনার আড়ালেও তেমনি এক করুণ অভিনয় চলিতেছিল। সকলের দৃষ্টি প্রাসাদের দিকেই নিবদ্ধ ছিল; সম্ভ্রান্ত পরিবারটির সকলকেই আশ্চর্য্য পদগৌরবের সহিত অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখা গেল।

সকলের মুখই একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত; শুধু এক জনকে অত্যন্ত মলিন ও ফ্যাকাশে বলিয়া বোধ হইল; সে ধর্ম্ম-যাজকের বাহুর উপর হেলান দিয়া হাঁটিয়া আসিতেছিল। তাহাকেই কেবল ধর্ম্মযাজক সান্ত্বনা দিতেছিলেন—কেবল তাহাকেই, মরিবার যার ক্ষমতা নাই, যাহাকে কঠোর কর্ত্তব্যের জন্য সারাজীবনের জন্য আপনার সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া বাঁচিতে হইবে, যাহাকে আজিকার মৃত্যু হইতে বঞ্চিত হইয়া একই জীবনে শত সহস্র মৃত্যুক্লেশ বরণ করিয়া লইতে হইবে! তারো আজ দণ্ড! জীবন-দণ্ড! সকলে বুঝিল জুয়ানিটো আজিকার জহ্লাদের কাজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। বৃদ্ধ মার্কুয়েস্ ও তাঁহার পত্নী, ক্লেরা ও মেরিকুইটা এবং তাহাদের দুইটি ভাই বধ্যস্থান হইতে অল্পদূরে ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। জুয়ানিটো সেখানে আসিলে জহ্লাদ তাহাকে আড়ালে লইয়া দুই একটা উপদেশ দিল।

তাহারা অত্যন্ত সহজভাবে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। মুখভঙ্গিতে উত্তেজনা কিম্বা ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না।

ক্লেরা সকলের আগে আসিয়া জুয়ানিটোকে বলিল "জুয়ানিটো, আমার দুর্ব্বলতার জন্য আমাকে একটু দয়া করো, আমাকে দিয়াই তোমার কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে।"

তখন বেগে কে একজন অপর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্লেরা একরূপ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার শুভ্র মরাল-গ্রীবাটি খড়্গের ধার পরখ করিবার জন্য যেন উন্মুখ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। দেখিয়া ভিক্টরের চক্ষু স্থির এবং মুখ মলিন হইয়া গেল। হৃদয়ও কেমন এক আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। তবু সে কোনোমতে নিকটে আসিয়া ক্লেরার কানে কানে বলিল, "তুমি আমাকে বিবাহ কর্‌লে জেনারেল তোমার জীবন-ভিক্ষা দিতে রাজী আছেন।" স্পেন-মহিলা গর্ব্বিত ঘৃণার সহিত যুবকের দিকে চাহিল, তার পর মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আঘাত কর, জুয়ানিটো।" স্বর গম্ভীর, দৃঢ়।

ক্লেরার ছিন্ন শির ভিক্টরের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল; মার্কুয়েস্-পত্নীর সর্ব্বশরীর দিয়া একটা তড়িৎরেখা বহিয়া গেল; তার পর আসিল, ফেলিপি। ছোট ম্যানুয়েল ভাইকে জিজ্ঞাসা করিল, "জুয়ানিটো, আমি ঠিক আছি ত?"

জুয়ানিটো তার বোনকে বলিল "মেরি-কুইটা, তুই কাঁদছিস্!"

বালিকা উত্তর করিল, "হঁ৷ দাদা, আমি তোমার কথা ভাবছি; আমাদের ছেড়ে তুমি কি করে থাক্‌বে ভাই?"

* * * *

তার পর মার্কুয়েস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার সন্তানগণের রক্তধারা লক্ষ্য করিলেন, পরে নির্ব্বাক নিস্পন্দ দর্শকমণ্ডলীর দিকে মুখ ফিরাইলেন। তার পর জুয়ানিটোর দিকে চাহিয়া হাত বাড়াইয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "স্পেনবাসী ভাই সব, আমি আমার পুত্রকে পিতার আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাচ্ছি। জুয়ানিটো, আজ তুমি মার্কুয়েস; খড়্গ চালাও, কিছু ভয় করোনা, এতে তোমার কোনো পাপ নেই। তুমি পুণ্য কার্য্য করছ।"

সর্ব্বশেষে ধর্ম্মযাজকের গায় ভর দিয়া জুয়ানিটোর মাতা আসিলেন; জুয়ানিটো

আর পারিল না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "না, আমি পারব না।" তাহার চীৎকারে দর্শক বৃন্দের মুখ হইতে একটা সুস্পষ্ট যন্ত্রণাধ্বনি ফুটিয়া বাহির হইল। তাহাতে উৎসবের আনন্দ-রব ও হাস্যচ্ছটা ক্ষণকালের জন্য ডুবিয়া গেল। মার্কুয়েস পত্নী জুয়ানিটোর দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভশ্রেণীর উপর দিয়া লাফাইয়া পড়িলেন, নীচে পাহাড়ের গায় লাগিয়া তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। সকলে প্রশংসাধ্বনি করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে জুয়ানিটোর মূর্চ্ছিত দেহও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

গোধূলি।

ছায়াঝিকিমিকি স্বর্ণ আলোক আমি
সান্ধ্য রবির কিরণের অনুগামী,
প্রদোষ নীরবে ধীরে ধীরে আমি নামি—
গোধূলি আমার নাম।
পাখীদের আমি কুলায়ে ভুলায়ে আনি,
হাওয়ায় বহাই ফুলের সুরভিখানি,
ক্লান্ত গাভীরে গৃহপানে আমি টানি—
বিশ্রাম অভিরাম।
সন্ধ্যার তারা মোরে হেরে তবে ফুটে,
আরতিশঙ্খ মোরি সাথে বেজে উঠে,
দিনের ক্লান্তি আদেশে আমার টুটে
লভিতে শান্তি ক্রোড়;
গৃহদীপখানি আমারে হেরিয়া জ্বলে,
বিরাম-শয়ন রচি বাতায়নতলে,
বিছাই তন্দ্রা ধরণীর স্থলে জলে
স্বপ্ন পরশে মোর।
অথচ আমার ক্ষণিকের পরমায়ু—
প্রদোষ বাতাসে তাই কাঁদে মোর বায়ু;
দিয়ে যাই তবু যতটুকু আছে আয়ু
ধরার সুখের লাগি;
দিনে দিয়া ছুটি রাত্রিকে ডেকে আনি,
শ্রান্তির পরে শান্তির রেখা টানি,
সন্ধ্যার বায়ে রটায়ে বিরাম-বাণী
তার পর ছুটি মাগি।
অস্তরবির হিরণকিরণাসীনা,
পশ্চিম মেঘে চঞ্চলালোকলীনা,
দূর দিগন্তে বাজাই স্বর্ণবীণা—
তন্দ্রা বিছানো তান;
দিকে দিকে মেলি' চঞ্চল কম-কায়া,
তালের বাকলে রচিয়া সোনার মায়া,
জাহ্নবী-জলে বিছায়ে রক্ত ছায়া,
তবে মোর অবসান—
গাহি নির্ব্বাণ গান।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

'অশ্রুকণা'-রচয়িত্রী।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এক বঙ্গীয়া বালিকা কবির রচিত 'কবিতাহার' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮০ জ্যৈষ্ঠ) তাহার সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ইহার অনেক স্থান এমন যে তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।" সুদূর শৈশবে যে প্রতিভার স্ফুরণমাত্র দেখিয়া সাহিত্য-সম্রাট মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আজ তাহা বিকশিত হইয়া বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য অপূর্ব্ব কিরণে উদ্ভাসিত করিয়াছে। এই প্রতিভাশালিনী কবি, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী।

গিরীন্দ্রমোহিনী-রচিত 'অশ্রুকণা', 'আভাষ' 'অর্ঘ্য', 'শিখা' 'সিন্ধুগাথা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি ভাবসম্পদ ও সলীল সহজ অভিব্যক্তির গুণে মনোরম। এগুলি পাঠ না করিলে, কাব্য-পাঠ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

গীতিকবিতার আধুনিক যুগে অনুকরণের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। পুরুষ ও মহিলা কবির কাব্যে নূতন ভাবের পরিচয়-লাভ যে দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা সত্য এবং আজ এমন দিনও আসিয়াছে, যখন মহিলারচিত বলিয়াই নিরপেক্ষ সমালোচনার হাত হইতে সাহিত্য অব্যাহতি পাইবে না। সে আপনার পাওনা-গণ্ডা কড়াক্রান্তিতে বুঝিয়া তবে আজ লেখক-লেখিকাগণকে আপন প্রবেশদ্বারেছাড় পত্র দিবে! কঠোর এবং সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনায় গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যগুলি যে বঙ্গীয় সমালোচকের মতে বিশিষ্ট উচ্চাসন লাভ করিবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

অতি শৈশব হইতেই কাব্যের প্রতি গিরীন্দ্রমোহিনীর সবিশেষ অনুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল। যে বয়সে বালিকারা 'পুতুলখেলা' ও কলহাদি লইয়া মাতিয়া থাকে, সেই সময় বাণীদেবী তাঁহার গোপন ইন্দ্রজালে বালিকাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। 'গণেশবন্দনা' লিখিয়া গিরীন্দ্রমোহিনী প্রথম কাব্য-সাহিত্যে 'হাতে খড়ি' করেন! সে সকল শৈশব রচনা কালের প্রভাবে 'অজানা'লোকে প্রয়াণ করিয়াছে, কিন্তু সে যে সূচনার আভাষ দিয়া গিয়াছে, তাহার শুভ পরিণতি আজ স্পষ্টতা লাভ করিয়া বাঙ্গালীর অন্তরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে!

শৈশবেই গিরীন্দ্রমোহিনী-রচিত "ভারত-কুসুম" ও "কবিতাহার" প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে কবির নাম ছিল না। 'জনৈক হিন্দু মহিলা' লিখিত—বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতাহার পাঠে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় এতদূর প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি কবিকে স্বরচিত অমূল্য নাটকাবলী উপহার দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন নানা ইংরাজী পত্রিকাতেও গ্রন্থের সুখ্যাতি পাঠ করিয়া নারীজাতির পরম হিতৈষিণী মেরি কার্পেন্টার মহোদয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত সাক্ষাতের অভিলাষিণী হয়েন, কিন্তু নানাকারণে উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া উঠে নাই!

তারপর, গিরীন্দ্রমোহিনীর তৃতীয় গ্রন্থ

অশ্রুকণা' প্রকাশিত হয়। স্বামীর মৃত্যুতে গিরীন্দ্রমোহিনীর হৃদয়ে যে শোকের সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, 'অশ্রুকণা' তাহারি বিন্দু আভাষমাত্র! এই গ্রন্থের সহজ করুণ সুর পাঠকের চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলে। সাধারণ শোকোচ্ছ্বাস ত এমন অনেক প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়টি সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য! গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত! কারণ সে শোক উদার, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে। আজি অবধি 'অশ্রুকণার' চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা হইতেই কাব্যের মর্ম্মস্পর্শিতা সকলে অনুমান করিতে পারিবেন। বাঙ্গালা দেশে যে কাব্যগ্রন্থের চারিটি সংস্করণ অচিরকালের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তাহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন হয় না!

নিষ্ঠুর কাল হিন্দু নারীর ললাটের সিন্দুর ঘুচাইয়া দিল—এ শোক সান্ত্বনার অতীত—কিন্তু যখন ভাবি সেই সিন্দুরহীন ললাটই কবিযশের অম্লান মুকুটমণির ছটায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন আমরা সে শোকেও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করি। 'অশ্রুকণায়' কবির আন্তরিক শোক যেন মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইয়াছে, তাই ইহার উচ্ছ্বাসগুলি এমন মর্ম্মস্পর্শী। তাহার মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই, কৃত্রিমতা নাই! তাহা বিধবা নারীর হৃদয়ের গান! 'অশ্রুকণা'র মুখপত্রে কবির উক্তিটুকু,—দুই ছত্রমাত্র—কাব্যের মূলসূত্রটুকু ধরিয়া দিয়াছে,—

যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ, দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
—চিরদীপ্ত রবে হুতাশন!

'অশ্রুকণার' পরে প্রকাশিত অপর কাব্যগুলির মধ্য দিয়াও এই শোকের ধারা বহিয়া গিয়াছে! কোথাও কূলপ্লাবী সাগরের বিপুল ধারা, কোথাও বা অন্তরবাহিনী ফল্গুর শীর্ণ রেখা! তাঁহার কবি-জীবনের প্রধান ব্রত পতির ধ্যান—পতির পূজা! পতি-দেবতার প্রীতিকামনায় তিনি কাব্য রচনা করেন, তাই,'অশ্রুকণা'র শেষ কবিতায় কবি বলিয়াছেন,—

"তবে কি লিখিব 'শেষ'—গান সমাপন?
হায় রে হবে কি কভু থাকিবে জীবন?
লিখিব কি তবে শেষ হল অশ্রুকণা?
তা হলে মুহূর্ত্ত তরে আর বাঁচিব না।"

'অশ্রুকণা' পাঠ করিয়া সুকবি ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাহার সমালোচনা করেন ও কবির উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করেন। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার কাব্য পড়িতে পড়িতে এমন মনে হয় না যে, তিনি কাগজ কলম লইয়া কখনো কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন—যেমন শিশিরকণা দূর্ব্বাদলে পড়িয়া মুক্তারূপে ফুটিয়া উঠে, সেইরকম গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যে তাঁহার কল্পনার উচ্ছ্বাসগুলি যেন অক্ষররূপে পরিণত হইয়াছে। * * কল্পনা 'স্নিগ্ধ বিদ্যুতের' ন্যায় উজ্জ্বল, অথচ তীব্র নহে, লীলাময়ী অথচ দুরন্ত নহে, মুগ্ধকরী অথচ মর্ম্মভেদী নহে!" মনস্বী ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, This is poetry in life and as expression of that poetry *Asrukona* is the history of the soul of a noble Hindu woman.

'অশ্রুকণা'র পর "আভাষ"। কবি ভূমিকাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"হৃদয়ে উথলে মম যে সিন্ধু-উচ্ছ্বাস,
'আভাষ' তাহার মাত্র প্রকাশে আভাষ।"

আভাষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি ভাবরসে আগাগোড়া ভরিয়া রহিয়াছে। কবির একটি করুণ উক্তি,

"বসে ওই মেঘের'পরে সাধ করে সই
যাইলো ভেসে,
হৃদয়ের ধন, প্রাণের রতন আছে যেথায়
যাই সে দেশে॥"

ইহার মধ্যে সমগ্র 'মেঘদূত' খানি যেন এক অভিনবভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে! "শিখা" তাঁহার এই পতি-যজ্ঞের উজ্জ্বল হোমাগ্নি শিখা! তার পর কবি 'অর্ঘ্য' নিবেদন করিয়াছেন, পতিদেবতার পূজার জন্য! অর্ঘ্যের কবিতাগুলি এমন ওজোগুণসম্পন্ন যে,তাহা অর্ঘ্যপাত্রস্থিত রক্তজবার মতই সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে! 'হৃদিছেঁড়া রক্তফুলে' কবি পতির পূজা করিয়াছেন!

তাহার পর "সিন্ধুগাথা"। ইহা কবির পতিস্মৃতি-উদ্বেলিত হৃদয়সিন্ধুর গম্ভীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। তাহে ছন্দে যেন তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে—তাহার মধ্যেও সেই আর্ত্তচিত্তের করুণ সুর—

"দূরে নীল আকাশের কোলে ভেসে আসে
শুভ্র পোতখানি,—
ওপারের সংবাদ কাহার আনিছে এ প্রভাতে
না জানি!"

গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের সহিত পরিচয় সাধন করিতে হইলে দুই এক ছত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণই রহিয়া যায়। এতগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, এমন কবি বাঙ্গালাদেশে বিরল।

গিরীন্দ্রমোহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক রচনা, "স্বদেশিনী"। সরল ভক্তি ও স্বদেশ-প্রেমের এমন মিশ্র ডালি বাণীদেবীর চরণ শোভা যে সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই!

এক্ষণে সংক্ষেপে কবির জীবনীর পরিচয় দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সন ১২৬৫ সালে ৩রা ভাদ্র কলিকাতা ভবানীপুরে মাতুলালয়ে গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম হয়। গিরীন্দ্রমোহিনীর পিতা ৺ হারাণচন্দ্র মিত্রের আদিনিবাস কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তরে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাণিহাটি গ্রামে।

মজিলপুরগ্রামে গিরীন্দ্রমোহিনীর শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। বাটিস্থ বালিকা বিদ্যালয়ে ইনি প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই গ্রন্থপাঠে অতিবাহিত হইত। শিক্ষার প্রতি গিরীন্দ্রমোহিনীর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। খেলাধূলার সময় খেলা করিতে তিনি বড় একটা ভাল বাসিতেন না। বিদ্যালয়ে সর্ব্বদাই তিনি রৌপ্যপদকাদি সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। শৈশব হইতেই তাঁহার চিত্ত পরদুঃখকাতর, শান্তিপ্রিয়, তিনি যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার সহপাঠিনী এক দরিদ্র বালিকা একদিন কাণ বিঁধাইয়া, কাণে সূতা পরিয়া বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল। কাণে সূতা পরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বালিকা বলিল,"আমরা গরিব মানুষ, সোণার মাকড়ি পাব কোথা, ভাই, তোমাদের মত!" কথাটা বলিবার সময় বলিকার চোখ ছলছল করিয়াছিল, তাহাতে সহৃদয়া গিরীন্দ্রমোহিনী এমন বিচলিতা হইলেন যে তদ্দণ্ডেই আপনার কর্ণ হইতে মুক্তার মাকড়ি খুলিয়া তিনি বালিকার কর্ণে পরাইয়া দেন। এমন করিয়া বিত্তর দরিদ্রা বালিকাকে তিনি নূতন বস্ত্র জামা প্রভৃতি দান করিতেন। এ বিষয়ে মাতমা

অনুজ্ঞার অপেক্ষাও রাখিতেন না। মাতা কন্যার অতিরিক্ত দানশীলতায় বিরক্ত হইলে, বালিকা কন্যা করুণ কণ্ঠে কহিতেন, "আহা, ওদের যে নাই মা।"

শৈশবে শিক্ষকের নিকট গিরীন্দ্রমোহিনী ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। সেই সময় ইংরাজী শিখিবার উদ্যোগ হয়। স্বামীর নিকট তিনি ইংরাজী পড়িতেন; কিন্তু কিছুকাল পড়িয়াই পড়া ছাড়িয়া দিলেন। স্বামী অনুযোগ করিলে গিরীন্দ্রমোহিনী বলিলেন, "গুরুমহাশয়ের নিকট না পড়িলে বিদ্যা-শিক্ষা হয় না।" কবির দাম্পত্যজীবনের এ রহস্যটুকু কেমন মিষ্ট ও উপভোগ্য।



শৈশবেই তাঁহার কাব্যানুরাগ প্রস্ফুট হইয়াছিল। কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে, বালিকা গিরীন্দ্রমোহিনী আধ-আধ ভাবে বলিতেন,

"আমার নামটি বাবু চাঁদা।
পাখী মারি, ভাত খাই, চোখে লাগাই ধাঁধা।"

গিরীন্দ্রমোহিনীর পিতা হারাণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর বয়স যখন দ্বাদশ বর্ষ, সেই সময়, একদিন তিনি কন্যার নিকট একটি ইংরাজী কবিতা বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া বালিকা কন্যা ছন্দে সেই বিদেশী কবিতার মর্ম্ম গাঁথিয়া পিতাকে দেখাইলেন। এই কবিতাটি "তপোবন" নামে "ভারত-কুসুমে" প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর বালিকার কল্পনাবিকাশের সহায়তাকল্পে পিতা তাঁহাকে

Paul and Virginia, Theodosius, Constancia প্রভৃতি পুস্তক ও গল্প বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তাহা হইতে, এবং মাতামহী-সংগৃহীত 'মহানাটক', 'কোকিলদূত', 'যোজনগন্ধা', 'বাসবদত্তা', "ইসফ্ জেলেখা," "কবিকঙ্কণ" প্রভৃতি পাঠ করিয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য-প্রতিভা স্ফুরিত হইয়া উঠে।

দশ বৎসর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী ৺ নরেশচন্দ্র দত্ত বহুবাজারনিবাসী সম্ভ্রান্ত জমিদার ৺ অক্রূর দত্ত মহাশয়ের প্রপৌত্র ৺ দুর্গাচরণ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র।

বিবাহের পর, বিদ্যাশিক্ষায় ব্যাঘাত জন্মিলেও কাব্যানুরাগ বিন্দুপরিমাণে শিথিল হয় নাই। শিক্ষা নানাপথে তাঁহার প্রতিভাকে চালিত করিয়াছে। সূচীর সূক্ষ্ম শিল্প এবং রন্ধনাদিকার্য্যে গিরীন্দ্রমোহিনী সুনিপুণা। পরিণত বয়সে চিত্রকার্য্যেও তিনি সুপটু হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র বঙ্গদেশের নানা শিল্প প্রদর্শনীতে সমাদর ও পদকাদি লাভে সমর্থ হইয়াছে, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে!

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' প্রকাশ সম্বন্ধে বেশ একটু ইতিহাস আছে। ইংরাজী ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রচিত গদ্যে পদ্যে লিখিত কয়েকখানি পত্র তাঁহার স্বামীর জনৈক বন্ধু "জনৈক হিন্দু-মহিলার পত্র" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। পত্র প্রকাশিত হইলে, নববধূ গিরীন্দ্রমোহিনী অতিশয় লজ্জিত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া প্রবাসী স্বামীকে লিখিয়াছিলেন, "যদি আমার রচনা লোককে দেখাইতে এত ইচ্ছা হইয়াছিল, তবে বলিলে আমি অন্য কবিতা না হয় দিতাম। পত্র কেন প্রচার করিলে?"

ইহার ফলেই গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম কবিতাগ্রন্থ "কবিতাহার" প্রকাশিত হয়। 'কবিতাহারের' সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রকৃতিটি প্রকৃতই কবিজনোচিত। গর্ব্ব নাই, দ্বেষ নাই, আড়ম্বর নাই। শান্ত মৃদু কথাবার্ত্তায়, মিষ্ট মধুর বচনে অবরোধ-বাসিনী কবি মিতাক্ষই যেন 'প্রকৃতিপালিতা'। " আজো পর্য্যন্ত ইনি গম্ভীর-প্রকৃতি গৃহিণী (Serious house-wife) নহেন। কিন্তু ভবসমুদ্রের কূলে তিনি আবার সমুদ্রেরই মত গম্ভীর।

গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবনে আর একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা, 'ভারতী'-সম্পাদিকার সহিত তাঁহার অকৃত্রিম সখ্য। এমন সখ্যভাব সাহিত্য-জগতে —বিশেষতঃ প্রতিদ্বন্দিতার ক্ষেত্রে—বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সখ্যভাব আজীবন সমভাবে রহিয়াছে। ভারতী সম্পাদিকা তাঁহার রচিত 'স্নেহলতা" গিরীন্দ্রমোহিনীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন, গিরীন্দ্রমোহিনীও সখীকে তদ্‌রচিত "শিখা'" প্রত্যুপহার দিয়াছেন।

ইঁহাদিগের পরস্পরের প্রীতি-সম্পর্কের নাম, "মিলন"। একদিন গিরীন্দ্রমোহিনী ভারতী সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আপনার মাথার চুলের কাঁটা ফেলিয়া যান, সেই ছলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভারতী- সম্পাদিকা এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন,—

অধরে মোহন হাসি, নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ জাগতে শুধু মিলন পরাণে আসে।
কই রে মিলন কোথা, সে কি হেথা আছে আর।
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল পরশ তার।
ফুলটী সে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে,
হাসি যত নিয়ে গেছে, অশ্রুজল গেছে দিয়ে।
সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে সন্ধ্যা-তারা
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা
ফুলটী সে নিয়ে গেছে ফেলে গেছে কাঁটাছুটী,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি।

গিরিন্দ্রমোহিনী "আভাষে" স্বীয় সখীকে লিখিতেছেন:—

মিলন মিলন কত বারই বলি,
কই রে মিলন কই?
মিলন চাহিতে বিরহ-সাগরে,
ডোব-ডোব তরী সই।
ভাসা ভাসা নদী, আশাভরা তরী
বেয়ে চলি ধীরি ধীরি,

অনন্তের কূলে মধুর মিলনে,
যদি রে মিশিতে পারি।
লইয়া বিদায় সবে চলে যায়
দেখা না হইতে শেষ—
বুঝি, তাই ভয়ে ম'রি, যাই সরি সরি
করিতে প্রাণে প্রবেশ।
লাগে যদি বোঝা ফেলে যেও সোজা,
গিয়াছে ফেলিয়া সবে।
একা আসিয়াছি যাব চলে একা,
ভেসে ভেসে ভবার্ণবে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবন দুঃখের জীবন। বাণীর কমল-বন, বুঝি, চিরকণ্টকাকীর্ণ। তাঁহার স্বামী নরেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য কখনো ভাল ছিল না। প্রবাসে, স্বাস্থ্য-নিবাসেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। গিরীন্দ্রমোহিনী নরেশ-চন্দ্রের ছায়াস্বরূপিনী বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। পতিগতপ্রাণা হিন্দু সহধর্ম্মিণীর তিনি আদর্শস্থানীয়া। পতির জন্যই তাঁহার জীবন—নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, কিছু নাই, এমন ভাবেই তিনি অনুপ্রাণিতা।

বালিকাবধূ দশ বৎসর বয়সে আসিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন—কালের কঠিন বিধানে আজ সে স্বামী পাশে নাই—শরীরী হইয়া নাই, কিন্তু অশরীরী আত্মায় মিশাইয়া আছেন—এই ভাবই গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের মেরুদণ্ড। এইটুকু মনে রাখিয়া গিরীন্দ্র-মোহিনীর কাব্য পাঠ করিতে হইবে। নচেৎ কাব্য ও কবির প্রতি সুবিচার না হইতেও পারে।

ইংরাজী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (সন ১২৯০ সাল) নরেশ-চন্দ্রের মৃত্যু হয়। স্বামীকে হারাইয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর হৃদয় যে বিপুল শোকে ভরিয়া উঠিল, তাহারি 'অশ্রু-কণা' লাভ করিয়া বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য ধন্য হইল। মৃত্যুর ভীষণতাকে ভাসাইয়া দিয়া শোকের যে সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, অমরতার অমৃত-বারিতে তাহা চিরদিন ভরিয়া রহিবে এবং বাঙ্গালী সে সিন্ধুর 'আনন্দে করিবে পান, সুধা, নিরবধি !'

সমালোচনা।

গীতাঞ্জলি।—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা মাত্র। কবিবরের রচিত দেড়শতাধিক অধুনা-রচিত উৎকৃষ্ট ভগবদ্-সঙ্গীতে গীতাঞ্জলি রচিত হইয়াছে। কবিবরের গীতের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা! এই গীত-গ্রন্থখানি ভগবদ্ভক্তের আনন্দ, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, গৃহস্থের কল্যাণস্বরূপ! কবিবর আপনাকে নিখিলের মধ্যে একেবারে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। সংসারের সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে ভগবানের সহিত অন্তর্মিলনের যে পরিচয় আজকাল তাঁহার রচনায় আমরা বহুলভাবে পাই, ইহাও তাহার অন্যতম। এই অন্তর্মিলনে তিনি যে শুধু পরম আনন্দ ভোগ করেন তাহা নহে, ইহা ব্যথিতের বেদনা মোচন করে এবং পীড়িতকে শান্তি দান করে। একমাত্র হৃদয় দিয়াই ইহা অনুভব করা যায়—সমালোচনা ইহার নিকট নিতান্তই মূক হইয়া রহে।

কাশীরাম দাসের চরিত্র মহাভারত।—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা মাত্র। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুইখানির নানাবিধ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। দেশের পক্ষে ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ। চরিত্রগঠনের সহায়তা-কল্পে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুরূপ গ্রন্থ বিশ্বের সাহিত্যে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সংস্করণখানি নানা কারণে আমাদিগের নিকট ভালো লাগিয়াছে। সম্পাদক মহাশয় গুরুতর শ্রম স্বীকার করিয়া

আধুনিক রুচি-অনুযায়ী ইহার অশ্লীল শব্দ স্থানবিশেষে পরিবর্জন করিয়াছেন বা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকাটুকু উপাদেয়। সংক্ষেপে কাশীরামের কালনিরূপণাদির তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া পাঠকবর্গকে গুরুগবেষণার দায় হইতে তিনি মুক্তি দিয়াছেন। দুরূহ শব্দাদির টীকা, প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান বুঝিবার সুবিধা-বিধানের জন্য ভৌগোলিক টীকা ও মানচিত্রের সন্নিবেশে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

তবে গ্রন্থের একটি ত্রুটির উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—ইহাতে বত্রিশখানি নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কয়েকখানির পরিকল্পনা আমাদের ভাল লাগিল না। "ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা" "শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী" "শ্রীকৃষ্ণের কপট নিদ্রা" প্রভৃতি চিত্র নিতান্তই যাত্রার অনুকরণে অঙ্কিত। মুখ চোখ সব উদ্ভট ধরণের। শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'প্রহ্লাদ'-চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় ভূমিকা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "মহাভারতের ভাষানুবাদ পড়িয়াই শিবাজী মহারাজ দেখিতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবি হইয়াছিলেন, এই কাশীদাসী মহাভারত পড়িয়া। আমরা সেই কাশীদাসী মহাভারতের পূর্ণাবয়ব সুসংস্কৃত সুলভ সংস্করণ বঙ্গের তরুণ পাঠকপাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে কাব্যে কলায় অনুরাগ-বৃদ্ধির সহায় হইবে, আশা করি।" আমরাও কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, সম্পাদক মহাশয়ের এ শুভ আশা পূর্ণ হউক। আমাদিগের সদর ও অন্দরের নীতি-শিক্ষা-লোকাচারের জন্য রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থই পর্য্যাপ্ত। উৎকৃষ্ট ছাপা ও বাঁধা এই দ্বাদশশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের মূল্য নিতান্ত সুলভ হইয়াছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

মূর্ত্তিপূজা।—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৫৭ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই আনা। 'বেদালয়'-সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল। তাহাই এক্ষণে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। ইহাতে অসঙ্গত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য বা অন্ধ বিশ্বাসের দোহাই দেওয়া হয় নাই। মূর্ত্তিপূজার স্বপক্ষে যুক্তি-তর্কের সমাবেশে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে।

শিখগুরু ও শিখজাতি।—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। গ্রন্থের ভাষা সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে এমন উপযোগী ইতিহাস-গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অল্পই আছে। ইহা শুধু ইতিহাসের কঙ্কালমাত্র নহে—লেখকের সহৃদয়তার গুণে বর্ণিত বিষয়গুলি যেন চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস-গ্রন্থ রচনায় শরৎবাবু নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে বেশ একটি ধারাবাহিকতা আছে—ইহার অংশগুলি স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নহে, ইহাই তাঁহার ইতিহাস-গ্রন্থের বিশেষত্ব। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি আরো উপাদেয় হইয়াছে গ্রন্থের প্রারম্ভে রবীন্দ্র বাবুর ভূমিকা সমাবেশে। সুচিন্তিত ভূমিকাটি পাঠ করিলে ইতিহাস কাহাকে বলে, তাহার বিশদ আভাষ পাওয়া যায়। শিখ ও মারাঠা জাতির উত্থান-পতনের কারণ-নির্দ্দেশ, ভারতীয় আদর্শের স্বাতন্ত্র্য-নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়গুলি কবিবরের ভূমিকায় সংক্ষেপে বেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। এমন জ্ঞানগম্ভীর রচনা আমরা বহুদিন পাঠ করি নাই। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাইও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। গুরু নানক, গুরু গোবিন্দ, সের সিং, রণজিৎ সিং, খড়্গ সিং, অমৃতসর স্বর্ণমন্দির প্রভৃতি বহু চিত্রও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

আলপনা। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। এখানি গল্পের বহি। বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার রচিত আটটি গল্প—তন্মধ্যে চারিটি

বিদেশী, দুইটি মৌলিক,—এবং একটি মৌলিক রস-রচনা "হুকার জন্ম" প্রকাশিত হইয়াছে। বিদেশীয় সাহিত্য হইতে বিশুর গল্প সঙ্কলন করিয়া মণিলাল বাবু বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। 'বরলাভ' "জয়মাল্য" "কিসমৎ" প্রভৃতি বিদেশী গল্পগুলি এমনি হৃদয় দিয়া লিখিত হইয়াছে যে পাঠকালীন আমাদিগের সহানুভূতি সহজেই উদ্রিক্ত হয়—বিদেশীয়ত্ব টুকু সে বিষয়ে মোটেই বাধা দেয় না। ইহা অল্প শক্তির পরিচায়ক নহে।

"জয়মাল্য" ক্ষুদ্র একটি প্রসঙ্গ; তাহার মধ্যে নাট্যকারের তুলিকাপাত আছে, কবির সহানুভূতি আছে, একটি জীবনের সমগ্র ইতিহাস আছে।

"কিসমৎ,"—রাজাধিরাজের বিলাস ও উৎসব-প্রাচুর্য্যের পাশ দিয়া কঠিন মৃত্যুর ছদ্ম প্রবেশ, লিপিচাতুর্য্যের সুন্দর পরিচয়। গল্পগুলি আমাদিগকে একান্তই মুগ্ধ করিয়াছে। কোনখানে অস্বাভাবিকতা নাই, আড়ম্বর নাই। "ঘটনাচক্র" ও "দেবতার কোপ" 'গল্প দুইটি মণিবাবুর মৌলিক রচনা। গল্পদুটি ছোট গল্পের আর্ট হিসাবে সুন্দর হইয়াছে। ব্যঙ্গেও লেখকে চমৎকার অধিকার আছে—'ঘটনাচক্রের' মধ্য দিয়া একটি স্নিগ্ধ হাস্যরসধারা আগাগোড়া বহিয়া গিয়াছে। "হুকার জন্ম" রসরচনা,—সার্থক হইয়াছে। পাঠ করিলে কমলাকান্তকে মনে পড়ে। রচনার কোনখানে এতটুকু অক্ষমতা নাই—হাস্যরসের নামে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, এমন গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠকও ইহা পাঠে হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেন না। ভাষা কবিতার মত মর্ম্মস্পর্শী। গ্রন্থে তিন খানি চিত্র আছে। পরিষ্কার ছাপা, পরিপাটি বাঁধাই, ও কভারে 'আলপনা'র চিত্রটুকু সুন্দর, উপভোগ্য।

বিষ্ণুপুরাণ। (গার্হস্থ্য সংস্করণ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। আখ্যায়িকাগুলিকে অবিকল রাখিয়া বিষ্ণুপুরাণের প্রায় সকল উপাখ্যানই গ্রন্থকার সরল কথায় নিজের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আখ্যায়িকাগুলি কৌতুক ও শিক্ষাপ্রদ। সৃষ্টিতত্ত্বের মত গুরুতর বিষয়ও লেখকের বর্ণনাগুণে বেশ সরল ও সহজ হইয়াছে। গ্রন্থখানি একাসনে বসিয়াই আমরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিয়াছি। লেখকের রচনায় বেশ একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। পড়িতে বসিলে ক্লান্তি অনুভব হয় না। এমন সশ্রদ্ধভাবে সহজ ভাষায় আখ্যায়িকাগুলি বর্ণিত হইয়াছে—যে তাহা উপন্যাসের মত মধুর হইয়াছে। এইরূপ গ্রন্থই ছাত্রদিগের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত মনে করি। জ্ঞানীর আনন্দ, শিক্ষার্থীর শিক্ষা, কাব্যামোদীর কল্পনা-বিকাশ—সকল বিষয়েই অতুলনীয় সহচরস্বরূপ এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ যে সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থে চারিখানি নানাবর্ণে সুরঞ্জিত চিত্র, কভারের সুন্দর পরিকল্পনা, ছাপা কাগজ প্রভৃতি বহিরবয়বও বিশেষ পরিপাটি হইয়াছে।

পরদেশী। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। বাঙ্গালায় এগারোটি পরদেশীয় গল্পের সমষ্টি। ছাপা, কাগজ, কভার সুন্দর। গ্রন্থের আকার ও বিষয়ের হিসাবে মূল্যও যথেষ্ট সুলভ। গ্রন্থারম্ভে একখানি সুন্দর হাফটোন চিত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সফল সাহিত্য-রচনার দুইটি পথ আছে। এক মৌলিক রচনা, অপর অনুবাদ বা ছায়ানুবাদ। দুই প্রকার রচনারই প্রয়োজনীয়তা আছে। মৌলিক রচনাই উৎকৃষ্ট; কিন্তু সময়ে সময়ে যথার্থ সাহিত্য-পুষ্টির জন্য অনুবাদেরও একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। সাহিত্যে যখন অন্তর্নিহিত শক্তির অভাব হয়, তখন বহিঃ-শক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত না করিলে সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি। পরদেশীয় সাহিত্য সেই বহিঃশক্তি সঞ্চারিত করিয়া সাহিত্যকে দুর্দ্দিনে জীবিত রাখে; এইখানেই অনুবাদের সার্থকতা, এইখানেই বিদেশীয় সাহিত্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা।

ছোট গল্প হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে সে দুর্দ্দিন

যে আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজকাল বাঙ্গালা মাসিকে গল্প প্রকাশিত করিবার অন্ধ চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছে তা' সে যেমন গল্পই হউক না! তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ছোট গল্পের আদর্শ দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতেছে। ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতার নিকট সাহিত্য অনাদৃত হইতেছে।

ঠিক এমন দিনেই পরদেশী গল্প-অনুবাদের প্রয়োজন হইয়াছে। ছোট গল্প লেখার মধ্যেও যে একটা শিক্ষা ও আর্টের প্রয়োজন আছে, সে কথাটা আজিকার বাঙ্গালা গল্প যদি মনে করাইয়া না দিতে পারে ত' উৎকৃষ্ট বিদেশীয় গল্পের শরণ লওয়া ভিন্ন উপায় কি? সৌরীন্দ্রবাবু একজন প্রতিভাবান মৌলিক গল্প-লেখক হইলেও সাহিত্যের এই অভাবটা তাঁহার প্রতিভার নিকট ধরা পড়িয়াছে, তাই তিনি আজ আমাদিগের নিকট বিদেশীয় ছোট বড় কতকগুলি মণি-মাণিক্য-রত্ন-সংগ্রহ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী আজ তাঁহাকে এবং তাঁহারই মত দুই একজন প্রচেষ্টাশীল লেখককে সাদরে অভিনন্দন করিতেছে।

গল্পগুলি যেন এক একটি হীরার টুকরা। সৌরীন্দ্রবাবুর শক্তির বিশেষত্ব এই যে, পরদেশীয় গল্পগুলিকে তিনি নিজের দেশের করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার অর্থ ইহা নয় যে, তিনি নায়ক-নায়িকার নাম-গুলা পর্য্যন্ত বদ্‌লাইয়া একটা খিচুড়ি পাকাইয়াছেন! গল্পগুলি বাহির হইতে সম্পূর্ণ বিদেশীই আছে; কিন্তু তাহাদের ভিতর প্রত্যেক ভাব, স্নেহের প্রত্যেক দৃষ্টান্ত, ভালবাসার প্রত্যেক পরিচয় আমাদের নিজস্ব, বুকের মধ্যে সত্য বলিয়াই তাহা আমরা অনুভব করি "প্রায়শ্চিত্ত'র আশ্রয়হীনা ক্রন্দন-শীলা কারেণ আমাদিগের হৃদয়কে ঠিক ততখানি শোকভারাবনত করিয়া তোলে, যতখানি ক্রোধ পিশাচ রল্‌ফের উপর পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে! "বৃষ্টি" শুধু চীনের গল্প নহে, তাহা বিশ্বের! "সিন্ধুবক্ষে" বাতিঘরের চারিধারে যখন তুফান গর্জ্জন করিয়া উঠে, তখন আমাদেরও নিশ্বাস-রোধ হইয়া আসিতে থাকে, এবং "মুক্তিতে" "জো"র বেহালার প্রত্যেক করুণ রাগিণীর সহিত আমাদের চোখের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে! এমন কত পরিচয় দিব—সমস্ত গল্পগুলি পড়িয়াই আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

শিশির-সিক্ত প্রভাতের ফুলগুলির মত সব গল্প-গুলিই যেন টাট্‌কা, তাজা, প্রাণপূর্ণ! বিদেশের স্বাস্থ্য পূর্ণ বাতাসের একটা প্রবাহ শরতের এই আনন্দের দিনে আমাদের সোনার বাঙ্গালায় সঞ্চারিত হইয়া দিকে দিকে সৌন্দর্য্য ও সুষমা বিকশিত করিয়া তুলিবে, এ আশা আমাদের সম্পূর্ণভাবেই আছে।

পুষ্পপাত্র। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। এখানি গল্পের বহি। চারুবাবু বহুদিন যাবৎ মাসিক পত্রিকাদিতে গল্প লিখিতেছেন—সাহিত্যে তাঁহার পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার বিবিধ গল্প হইতে কয়েকটি মাত্র 'পুষ্পপাত্রে' সংগৃহীত হইয়াছে গল্পগুলি নানা রসাশ্রিত। চারুবাবুর গল্পগুলির একটি বিশেষত্ব—সেগুলির মধ্যে বেশ একটু মনোরম বৈচিত্র্য আছে। ভাষাও সুন্দর। সাধারণ গল্পের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তিনি নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছেন। দুই একটি গল্পে একটু অস্বাভাবিকতা দোষ লক্ষিত হইল। তবে বৈচিত্র্য হিসাবে তাহা ততটা ধর্ত্তব্য নহে। বাঙ্গালা গল্পে আমরা এরূপ বৈচিত্র্যেরই পক্ষপাতী। "সেবিকা" ও "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী" গল্প দুইটি আমাদিগের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট,—বাঙ্গালা গল্পের রাজ্যে নূতন, বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। লেখক "কৈফিয়তে" বলিয়াছেন, "কতকগুলির মধ্যে সংস্কৃতের গন্ধ বড় বেশি আছে। যে সময় যে ভাষার চর্চ্চা করিতেছিলাম, সেই সময়-কার রচনায় সেই নূতন শিক্ষিত ভাষার নেশার ঝোঁক আমার অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহারও একটা উপভোগের দিক আছে বলিয়া পুরাতন লেখা যেমন ছিল তেমনিই প্রকাশ করিলাম।" ঠিক কথা। আমরা সে ভাষা উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু আর্ট হিসাবে উক্ত ভাষা কতক পরিমাণে গল্পের সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা।

পুস্তকের বাঁধাই, ছাপা, কাগজ প্রভৃতি সমস্তই সুন্দর হইয়াছে। মূল্যও সুলভ।

১। তীর্থরেণু। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। সুকবি বলিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সত্যেন্দ্রবাবু প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। নানাদেশের কবি রচিত নানা ভাষার কবিতার বঙ্গানুবাদে তীর্থরেণু সংগৃহীত। কবিতাগুলি অনুবাদ বলিয়া মোটেই মনে হয় না। উৎকৃষ্ট মৌলিক কবিতার মতই কবিতাগুলি সুন্দর, উপভোগ্য। গ্রন্থের আরো একটি বিশেষ গুণ, কবিতাগুলির বৈচিত্র্য! একবার আরম্ভ করিলে সমস্ত কবিতাগুলি পড়িতেই হইবে। এমন কথা একমাত্র রবীন্দ্রবাবুর কাব্য সম্বন্ধেই খাটে! রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের পর কবিতা-পাঠে এমন আনন্দ আমরা আর কখনো উপভোগ করি নাই। যেমন মিষ্ট কোমল ভাষা, ছন্দেও তেমনি লীলাতরঙ্গ! গ্রন্থগুলি উৎকৃষ্ট কবিতায় পরিপূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থের মূল্য এক টাকা মাত্র। গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থোক্ত কবিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জ ক্রমেই অংশাহরে ভরিয়া উঠিতেছে—অক্ষম কবিযশঃপ্রার্থীর ভাবহীন কর্কশ সুরে মুখরিত হইতেছে, এমন দুর্দ্দিনে উদীয়মান প্রতিভাশালী কবির "তীর্থরেণু" বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়া দিল। বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্য তীর্থরেণুর পবিত্র স্পর্শে ধন্য হউক! কবিতাগুলির ভাবৈশ্বর্য্যের উজ্জ্বল ছটায় তার জীর্ণ মলিনতা ঘুচিয়া যাউক—বাঙ্গালীর প্রতিগৃহ তীর্থরেণুর লীলাছন্দের কোমল মধুর ঝঙ্কারে ভরিয়া উঠুক!

সমালোচক।

চিত্রব্যাখ্যা।

দময়ন্তী।—দময়ন্তী ও হংসের উপাখ্যান সুপরিচিত। রাজা নল হংসকে দূত করিয়া দময়ন্তীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। হংস দময়ন্তীকে নলের সংবাদ জানাইয়া দময়ন্তীর প্রতিসন্দেশ বহন করিয়া নলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। এবং দময়ন্তীর অন্তরে আনন্দরসের সঞ্চার হওয়াতে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। পুলকগদগদা দময়ন্তী উড্ডীয়মান হংসকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ইহাই চিত্রের বর্ণিত বিষয়। চিত্রখানি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পনা।

ইংরাজের ক্রীড়াকৌতুক।—৪১৪ পৃষ্ঠার ছবির অর্থ, Honesty is the best policy. On ST is the best Polly See. Polly অর্থে, টিয়াপাখী তিনটি টিয়াপাখীর মধ্যে মাঝেরটিই বড় সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট, best.

৪১৫ পৃষ্ঠার ছবির অর্থ,—দীপ-নির্ব্বাণ।

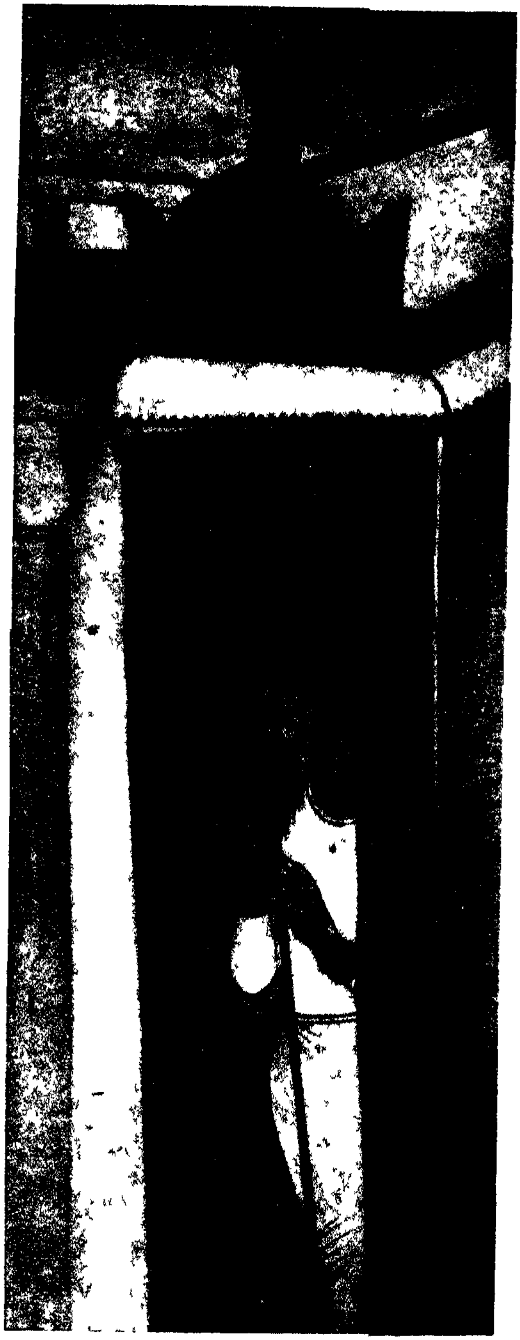
পূজায় ভিক্ষা-প্রার্থনা।

ভারতীর পাঠক-পাঠিকাগণ, বোধ হয়, মহিলা শিল্পাশ্রমের বিষয় সকলেই অবগত আছেন।

ভারতীতে ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা একটি হিন্দু বিধবাশ্রম। শিল্পাদি শিক্ষা দ্বারা যাহাতে হিন্দুবিধবাগণ স্ব স্ব জীবিকা-অর্জ্জনে সক্ষম হন, তদুদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত। এখানে তাঁত, কলের মোজা এবং অন্যান্য শিল্প-শিক্ষা দেওয়া হয়। আপাততঃ প্রায় ত্রিশজন অনাথা মহিলা এই আশ্রমে বাস করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই আশ্রম-রক্ষার ব্যয় বিস্তর—অথচ ইহার স্থায়ী কোন ফণ্ড নাই—প্রধানতঃ ভিক্ষার উপরই ইহার জীবন-নির্ভর। বাঙ্গালী-গৃহে পূজার সময় কেহ ভিক্ষাপাত্র লইয়া দ্বারস্থ হইলে গৃহস্বামী কখনই তাঁহাকে শূন্য হস্তে ফিরাইতে পারেন না। আমরাও তাই আশা পূর্ণ হৃদয়ে পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট এই অনাথা মহিলাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। প্রত্যেকে যদি অন্ততঃ একটি করিয়া টাকাও এজন্য ভিক্ষাদান করেন, তবে কৃতার্থ হইব। ভারতী কার্য্যালয়েই দান পাঠাইতে অনুরোধ করি।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



প্রহরী

অজন্তার প্রথম গুহার চিত্র হইতে

ইউ, রায় কর্তৃক ব্লক]　　　　[কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩১৭ [৭ম সংখ্যা

ভারত ও বিলাত।

(বিলাত-প্রবাসীর পত্র।)

১৩। ব্যক্তিত্ব ও জাতিত্ব।

এ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি একএকটা নিজস্ব আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এ আদর্শ তার ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; বাহির হইতে কোনো জাতিই আপনার এই নিজস্ব আদর্শটীকে ধার করিয়া লইতে পারে না। এই যে আদর্শের বিশেষত্ব, ইহাকেই জাতীয়তা বা জাতিত্ব বলা যায়। ব্যক্তির পক্ষে যেমন ব্যক্তিত্ব বলিয়া একটা জিনিষ আছে, জাতির পক্ষেও ঠিক সেইরূপ জাতিত্ব বলিয়া একটা বস্তু আছে। এই ব্যক্তিত্ব কাকে বলি? আমার ভিতরে, আমার দেহগঠনে, আমার চাল্‌চলনে, আমার ভাব ও চিন্তাতে, এমন কিছু আছে, যাহাতে দুনিয়ার অপর সকল লোক হইতে আমাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। আমিও তাদেরই মত মানুষ, তাদেরই মত আমার হাত পা, আমার নাক মুখ চোখ। আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলই অপর মানুষের মতন। কিন্তু এগুলির ব্যবহারে আমার এমন একটা বিশেষত্ব ফুটিয়া বাহির হয়, যাহা অপরের হয় না। আমার কণ্ঠনালীতে আর অপরের কণ্ঠনালীতে কোনো পার্থক্য নাই, যদি কিছু থাকে, তাহাও সহজে ধরা যায় না। অথচ কণ্ঠনালীর গঠন আমাদের একরূপ হইলেও, আমার স্বরে ও অপরের স্বরে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হয়। গঠন মোটামুটি এক, কিন্তু উচ্চারণ বিভিন্ন। এটি আমার ব্যক্তিত্ব বা বিশেষত্বের একটা বহিঃপ্রকাশ। সেইরূপ আমার পায়ে যে ক'খানা হাড় ও পেশী, অপর মানুষেরো তাই আছে; কিন্তু আমার পায়ের শব্দ ও তাদের পায়ের শব্দ এক নয়। আমাকে যাঁরা ভাল করিয়া চিনেন, আমার পায়ের শব্দে তাঁরা আমার পরিচয় পাইয়া থাকেন। শরীরের ও শারীর ক্রিয়ার ভিতরেও আমার নিজত্বটুকু এমনভাবে আপনাকে প্রতিনিয়তই ব্যক্ত করিয়া থাকে। আর যাহাতে আমার এই নিজত্বটুকুকে,—বিশাল বিশ্বে আমার এই বিশেষত্বটুকুকে ব্যক্ত করে, তাহাই আমার ব্যক্তিত্ব।

শরীর সম্বন্ধে যেমন আমার একটা বিশেষত্ব বা নিজত্ব আছে, শরীর সম্বন্ধে যেমন আমি দুনিয়ার সকল মানুষের সমান হইয়াও সমান নই, সাধারণ শারীর ধর্ম্ম আমার যেমন অপরেরো সেইরূপ, ইহা সত্য হইলেও,

এই সত্যে ইহারই ভিতর আমার যে একটা বিশেষত্ব আছে, এই সাম্যের ভিতরই যে একটা চিরন্তন বৈষম্য ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহাকে নষ্ট করে না। সেইরূপ আমার মনের গঠনে এবং চিন্তার প্রণালীতেও এমন কিছু আছে, যা'তে আমার চিন্তাকে, আমার বিচারকে, জীবনের জটিল সমস্যা আমি যেভাবে ভেদ করিতে যাই, তাহাকে, অপর লোকের চিন্তা, অপর লোকের বিচার, অপর লোকের বিশ্ব সমস্যার মীমাংসা হইতে পৃথক করিয়া রাখে। আমাদের চিন্তা যখন এক হয়, তখনো সে চিন্তার অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হইয়া থাকে। একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া, আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের নিজেদের মত করিয়া সে সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করি ও অপরের নিকট প্রয়োজন মত তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের কণ্ঠের যেমন একটা সুর আছে, এ সুর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র ; একই কথা বলিতেছি, একই বর্ণ উচ্চারণ করিতেছি, উচ্চারণও সমভাবে সাধু হইতেছে, অথচ আমার সুর আমার, তোমার সুর তোমার, ইহা যেমন সত্য ; সেইরূপ আমাদের মনেরো একটা সুর আছে। আমাদের অভিজ্ঞতা এক, আমাদের মত এক, আমাদের বিশ্বাস এক, আমাদের সিদ্ধান্ত এক,—এ সকলই হয়ত এক ; কিন্তু তথাপি এই একই অভিজ্ঞতা, একই মত, একই বিশ্বাস, একই সিদ্ধান্ত যখন আমি প্রতিষ্ঠিত করিতে যাই, তখন তার ভিতরে আমার মনের যে নিজস্ব সুরটুকু আছে, তাহাই বাজিয়া উঠে, আর তোমার মনের যে নিজস্ব সুরটুকু আছে, তোমার চিন্তাতে, তোমার বিচারে, তোমার অভিব্যক্তিতে তাহাই বাজিয়া উঠে। এই মনের সুরটার নামই ভাষা। আমাদের ভাষাতে, যেভাবে আমরা শব্দ-যোজনা করি, যেরূপে আমরা কথাবার্ত্তা কহি, যে প্রণালীতে আমরা বিবিধ বিষয়ের বিচার-আলোচনা করি, এককথায় আমাদের লেখার ধরণে, রচনার প্রণালীতে, সর্ব্বদাই আমাদের মনের এই সুরটি ফুটিয়া বাহির হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির রচনার গাঁথুনীর দ্বারা তাঁর মনেরো গাঁথুনীর পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁর চিন্তা লঘু, তাঁর ভাষাও লঘু হয়। যাঁর চিন্তা সতেজ, শক্ত, যুক্তি পরম্পরার উপরে সর্ব্বদা আপনার সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, যাঁর ভিতরকার মনের স্বভাব এরূপ, তাঁর ভাষাতেও ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই ভাষাটুকু আমাদের প্রত্যেকেরই আলাহিদা। রচনার কোনো বিশেষত্ব নাই, এমন লোকও আছেন। তাঁরা যখন যে বই পড়েন, তখন সেই লেখকের ভাষাই লেখেন ও বলেন। এরূপ তুলারাশি লোকের মনের বিশেষত্ব ফুটে নাই, ভাষারো বিশেষত্ব ফুটে নাই। তাঁদের মনেরো একটা বিশেষত্ব আছে, সত্য। কালক্রমে উপযুক্ত অনুশীলনে সে বিশেষত্বটুকু ফুটিয়া উঠিবে। আর তখন তাঁদের ভাষাও তাঁদের নিজস্ব বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। যাঁদের ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁদের লেখাতে সর্ব্বদাই তাঁদের নিজস্ব বা ব্যক্তিত্বটুকু ফুটিয়া বাহির হয়। অনেক লোকের ছবির মাঝখানে পরিচিত বন্ধুর ছবি যেমন সহজেই চেনা যায়, অনেক লেখকের রচনার ভিতরেও সেইরূপ

পরিচিত লেখকের লেখাটা সহজেই চিনিতে পারা যায়। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের লেখা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, বিপুল সাহিত্য সংগ্রহের ভিতর হইতেও তাঁদের পক্ষে এই দুই সাহিত্যরথীর রচনা পৃথক্ করা একটুও কঠিন কাজ নহে। আর ইহাও কি সত্য নহে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যখন পড়ি, তখন তার বর্ণে বর্ণে, পংক্তিতে পংক্তিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-রূপ আমাদের মানসচক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়? রবীন্দ্রনাথের লেখা যখন পড়ি, তখন কেবল তাঁর লেখা নয়, উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আমাদের মনের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হন? প্রত্যেক ব্যক্তির কণ্ঠে যেমন এক একটা বিশেষ সুর আছে, আর এই সুর যেমন তাঁর নিজস্ব বস্তু, ইহাতে তাঁর বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্বটুকুকে প্রকাশ করে; সেইরূপ প্রত্যেকের ভাষাতেও একটা বিশেষ সুর আছে, এ সুর কণ্ঠের নহে, মনের; আর তাঁদের মনের, চিন্তার যে বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্বটুকু আছে, তাহাই এই মনের সুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই যে ভাষার সুর, ইহার ভিতর কোন্ দিক্ দিয়া এই বিশাল বিশ্ব-সমস্যার মীমাংসা করিতেছেন, কে কোন্ ভাবে এই জগৎটাকে দেখিতেছেন, এটিও স্বল্পবিস্তর বুঝিতে পারা যায়। কারণ এই বিশ্ব-সমস্যাই আমাদের চিন্তার মূল বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই ইদং ও এই অহং—এই দুই বিরাটতত্ত্ব লইয়াই মন দিবানিশি ব্যস্ত রহিয়াছে। এই অহং ও ইদংএর জটিল সম্বন্ধের অর্থ কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইতেই মানুষের সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র-সাহিত্য, ও শিল্পবিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের লঘুগুরু, ক্ষুদ্রবৃহৎ, সকল আলোচনা ও সকল সমস্যার পশ্চাতেই এই বিশাল বিশ্বসমস্যা সতত দাঁড়াইয়া আছে। আমরা তাহাকে জ্ঞানে সকল সময় ধরিতে পারি না, সত্য; কিন্তু ধরি আর না ধরি, তাহাকে অতিক্রম করিয়া, ক্ষুদ্রবৃহৎ, বিশেষ-নির্ব্বিশেষে, কোনো সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। কোনো জ্ঞানই, ফলতঃ সম্ভব হইতে পারে না।

আমাদের শারীর ধর্ম্মে ও মানস ধর্ম্মে এই যে এক একটা বিশেষত্ব বা নিজত্ব আছে, যে বিশেষত্ব বা নিজত্বটুকুতে তোমাকে আমা হইতে, আমাকে তোমা হইতে পৃথক্ করিয়াছে, ও আমাদের উভয়কে, ও জগতের প্রত্যেক মানুষকে, অপর সকল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব। এইটুকুই আমাদের মৌলিকত্ব। ইহাই আমাদের নিজস্ব বস্তু। আর ব্যষ্টিভাবে, তোমার আমার এই যে ব্যক্তিত্ব, সমষ্টিভাবে, তাহাই প্রত্যেক জাতির জাতিত্ব। আমাদের প্রত্যেকের চেহারা যেমন স্বতন্ত্র, আমাদের সুর যেমন আলাহিদা, আমাদের চিন্তার ধরণ যেমন পৃথক্ পৃথক্, সেইরূপ সমষ্টিভাবে জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিরো চেহারা স্বতন্ত্র, সুর স্বতন্ত্র, সমাজগঠন ও চিন্তার ধরণ, এ সকলই স্বল্পবিস্তর স্বতন্ত্র ও পরস্পর হইতে বিভিন্ন। এই যে স্বাতন্ত্র্য, এই যে বিভিন্নতা, এই যে বিশেষত্ব ইহারই নাম জাতিত্ব। আর এই যে জাতিত্ব, ইহা প্রত্যেক জাতির শারীর ধর্ম্মে ও মানস ধর্ম্মে, উভয়ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির চেহারা যেমন আর এক ব্যক্তির চেহারা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ

জগতের ভিন্ন জাতি সমূহেরো পরস্পরের চেহারা বিভিন্ন। শরীরের বর্ণে ও গঠনে, এক জাতি অপর জাতি হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। জাপানের লোকের চেহারার সঙ্গে ভারতবর্ষের লোকের চেহারার মিল নাই। হিন্দুর চেহারার সঙ্গে কাফ্রির চেহারার মিল নাই। অতিশয় কালো হিন্দুকেও কৃষ্ণকায় কাফ্রি বলিয়া কেহ কখনো ভুল করিতে পারে না। আমেরিকাতে এমন প্রায়ই দেখা যায় যে রং দেখিয়া হঠাৎ কোনো হিন্দুকে লোকে কাফ্রি ভাবিয়াছে, কিন্তু মুখের দিকে চাহিয়াই, অপরাধীর মত, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। শরীর-গঠনে যেমন, মনের গঠনেও সেইরূপ প্রত্যেক জাতির এক একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্ব তাহাদের ভাষার গঠনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কতকগুলি ভাষাতে অহং প্রত্যয়ের জ্ঞান প্রবল, কতকগুলিতে ইদং প্রত্যয়ের উপরেই ঝোঁক বেশী। সংস্কৃত ও সংস্কৃতের সঙ্গে যাদের মৌলিক সম্বন্ধ আছে, লাটিন, গ্রীক্ প্রভৃতি আর্য্যভাষাতে, অহং আমি, আমি আছি, এই পদ সিদ্ধ হয়, অপর জাতির ভাষাতে ইহা সিদ্ধ হয় না। শুদ্ধ অস্তিত্বের জ্ঞান স্মরণাতীত কাল হইতে,—ইতিহাস যে কালের খোঁজ পাইয়াছে,—তার বহু পূর্ব্ব হইতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, এই সকল জাতির ভিতর আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়াছিল, তাই তাদের ভাষায় শুদ্ধ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক, অহং অস্মি ইত্যাকার পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে। এমন ভাষাও আছে, যাহা এই অস্তিত্বকে ব্যক্ত করিতে যাইয়া সর্ব্বদাই কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে তাহাকে যুক্ত করিয়া দেয়। আমরা যেখানে বলি, রাম আছে, সেখানে তারা বলে রাম বসিয়া আছে, বা দাঁড়াইয়া আছে, ইত্যাদি। এই যে বিভিন্ন জাতির আপন আপন ভাষার গঠনে এক একটা মৌলিক বিশেষত্ব আছে, ইহাতে এদের নিজস্ব চিন্তার ধরণটা প্রকাশিত হইতেছে। যে যে ভাবে চিন্তা করে, তার ভাষা সেইরূপই হয়। ইহা ব্যক্তির সম্বন্ধে যেমন সত্য, জাতিসমূহের সম্বন্ধেও সেইরূপ সত্য।

১৪। চিন্তা ও ভাষা।

ভাষার মুখ্য অঙ্গ তিনটী; কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া। এ তিনের মধ্যে যে ভাষায় যেরূপ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে,তাহারই দ্বারা সেই ভাষা যাহারা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের চিন্তার ধরণা জানিতে পারা যায়। কোনো জাতির ভাষায় কর্ত্তার উপরেই ঝোঁক বেশী, যাবার কোনো ভাষায় কর্ম্মের প্রতিই দৃষ্টি বেশী। এমন ভাষাও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে কর্ত্তার উপরেও নয়, কর্ম্মের উপরেও নয়, কিন্তু শুদ্ধ ক্রিয়ার উপরই চিন্তার সকল জোরটা যেন আসিয়া পড়িয়াছে। রাম আঘাত করিয়াছে, সকল আর্য্য ভাষাতেই এরূপ পদ নিষ্পন্ন হয়। এখানে রাম কর্ত্তা, রামই এখানে মুখ্য শব্দ। কাকে আঘাত করিয়াছে, কিরূপে আঘাত করিয়াছে, এ সকল বিষয় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বাদৌ কে আঘাত করিযাছে, মন এখানে তারই সন্ধান লইয়াছে। যে জাতির ভাষায় এই পদ নিষ্পন্ন হয়, সে জাতির চিন্তাতে কর্ত্তা বা অহংএর জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। আবার এমন ভাষাও আছে, যাহাতে এই

একই অভিজ্ঞতা অন্তভাবে ব্যক্ত হয়। যদি কোনো ভাষায়, "রাম যদুকে আঘাত করিয়াছে, এরূপ পদ নিষ্পন্ন না হইয়া কেবল এই হয় যে, "যদু আহত হইয়াছে," তবে সেই ভাষা যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের চিন্তায় ও জ্ঞানে কর্ত্তা অপেক্ষা কর্ম্মের জ্ঞানই যে আদিকাল হইতে অধিকতর প্রবল ছিল, এ সিদ্ধান্ত সহজেই উপলব্ধি হয়। আবার এমন ভাষাও আছে, যাতে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়েরই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, কেবল ক্রিয়ার জ্ঞানটাই নিরতিশয় প্রবল। এরূপ ভাষা আদিম কাল হইতে যে জাতি ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের চিন্তার ধরণ যে অপরের চিন্তার ধরণ হইতে স্বতন্ত্র হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

১৫। বিশ্বসমস্যা।

এই বিশ্বের মুখ্য তত্ত্ব দুটী—অহং ও ইদং। অহং কর্ত্তা, ইদং কর্ম্ম। অহং বিষয়ী, ইদং বিষয়। এই অহংএর সহিত এই ইদং এর সম্বন্ধ কি? ইহাই বিশ্বের বিশাল ও সনাতন সমস্যা। এদের সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে যাইয়াই মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান, শাস্ত্র সাহিত্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সকলই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে জাতি অনাদিকাল হইতে যে ভাবে এই বিশ্বসমস্যাকে দেখিয়াছে, ধরিয়াছে, তার যেরূপ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সে ভাবেই সেই জাতির ধর্ম্ম ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য, এক কথায় তার সাধনা ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। আর প্রত্যেক জাতির ভাষার মৌলিক গঠনের মধ্যে, সে জাতি এই বিশাল বিশ্বসমস্যাকে কিরূপে দেখিয়াছে ও ধরিয়াছে, তার মূল সূত্রটী খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কোথাও বা মানুষ অহংকে সকল অবস্থাতেই ইদং এর উপরে প্রভুত্ব করিতে দেখিয়াছে, সেখানে তার সাধনা ও সভ্যতা অহংমুখীন বা অন্তর্মুখীন হইয়াছে। সেখানে সে সর্ব্বদাই বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে খুঁজিয়াছে, বিষয়-জাল ছেদন করিয়া, বিষয়ীকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তার ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক, তার দর্শন অদ্বৈত, তার শিল্প অন্তর্মুখীন, তার সকলই একটা বিষয়াতীত, অতীন্দ্রিয় প্রভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। আবার কোথাও বা মানুষ বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিষয়ের প্রভাবে তার জ্ঞান এমনই অভিভূত হইয়াছে যে সে কিছুতেই বিষয়ীকে বিষয়ের উপরে একান্তভাবে স্থাপন করিতে পারে নাই। যে জাতি এইরূপে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া যায়, তার ধর্ম্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য সকলই অতিমাত্রায় বহির্মুখীন ও বিষয়াধীন হইয়া পড়ে। মানুষ আদিকাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই বিশ্বসমস্যাকে দেখিয়াছে। বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। এই জন্য তাদের সভ্যতাও পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এই চেষ্টা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৬। জাতিত্ব ও মনুষ্যত্ব।

কিন্তু জগতের বিভিন্ন মানুষের একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন জাতির একটা বিশেষ জাতিত্ব বা জাতীয়তা আছে বলিয়া যে তারা পরস্পরে সমান নহে, এমনো বলা

যায় না। জগতের সর্ব্বত্রই বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও সাম্যের মধ্যেই বৈষম্য রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির যেমন এক একটা বিশেষ জাতিত্ব আছে, তেমনি অপর সকলেরই মধ্যে একটা সাধারণ ও সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্ব রহিয়াছে। সকলেই মানুষ। মানুষে মানুষে আকারে বিভিন্নতা, গঠনে বিভিন্নতা, চাল্‌-চলনে বিভিন্নতা, ভাবে ও চিন্তাতে বিভিন্নতা, একের আকার অপর হইতে পৃথক্‌, একের মনের গতি অপরের মনের গতি হইতে পৃথক্‌, একের প্রকৃতি অপরের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র; কেহ বা তামসিক, কেহ বা রাজসিক, কেহ বা সাত্ত্বিক, কিন্তু এ সকল বৈষম্য সত্ত্বেও সকলেই মানুষ। স্বরূপতঃ সকলেই এক। সকলেরই মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। আর এই মনুষ্যত্ব বস্তু পূর্ণ বস্তু, অখণ্ড বস্তু; তার ভাগ বাটোয়ারা হয় না। কারো মধ্যে এই সাধারণ মনুষ্যত্ব বেশী ফুটিয়াছে, কারো মধ্যে এখনো পরিমাণে ততটা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। এইরূপে প্রকাশের অভিব্যক্তির ইতর-বিশেষ ভেদ আছে; কিন্তু মূল বস্তুর তারতম্য নাই। স্বরূপতঃ সকলে পরিপূর্ণ বস্তু। আর তাই বলিয়াই স্বরূপতঃ সকলে এক। আর স্বরূপতঃ সকলে এক বলিয়াই তারা পরস্পরকে জানিতে পারিতেছে, বুঝিতে পারিতেছে, পরস্পরের সঙ্গে ঐ এক ও অদ্বৈত স্বরূপের ভিতর দিয়া অশেষ প্রকারের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারিতেছে। এক ব্যক্তির মধ্যে যাহা প্রকট, অপরে তাহা অপ্রকট; এদের ভিতরে ইহাই পার্থক্য। সেইরূপ এক জাতির মধ্যে যাহা ব্যক্ত, অপরে তাহা এখনো অব্যক্ত রহিয়াছে। নতুবা মূলে তারা সকলে একই ছাঁচে ঢালা, একই পূর্ণতার প্রকাশ, একই অদ্বৈত অখণ্ড বস্তুর অভিব্যক্তি। এই অদ্বৈত, অখণ্ড পরিপূর্ণ অব্যক্ত বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন আধারের ভিতরে থাকিয়া, সেই সকল বিভিন্ন আধারের ভিতর দিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। এজন্য এই বিশ্বের বিপুল অভিব্যক্তিতে ঋণের বা দানের প্রয়োজন নাই, স্থানও নাই, প্রত্যেকেরই একটা নিজত্ব, একটা বিশেষত্ব, একটা ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া, অপরের নিকট হইতে সে কখনো আপনার জীবনের মূল বস্তুগুলি ধার করিয়া লইতে পারে না। এক রাজ্যে যেমন অপর রাজ্যের টাকাকড়ি চলে না, ভারতের টাকা বা পয়সা যেমন ফরাসীস দেশে রূপার বা তামার বাজার দরে বেচিতে হয়, টাকা বা পয়সা বলিয়া সেখানে তার কোনো দাম নাই, সেইরূপ এক ব্যক্তির সত্য ও ধর্ম্ম অপর ব্যক্তির জীবনে ও কর্ম্মে চলে না, সেখানে তার নিজস্ব মূল্যে বিকাইতে পারে না। সেইরূপ এক জাতির সভ্যতা এবং সাধনাও অপর জাতির ভিতরে তার নিজের দরে বিকায় না, বিকাইতে পারে না। সেখানে তাহাকে সাধারণ সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের ওজনে মাপিতে হয়, ও এই মনুষ্যত্বের দরে তার দাম-দস্তুর হইয়া থাকে। সেখানে তার বিশেষ মূল্যটুকু আর থাকে না। সেই মূল্যটুকু জোর করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে, তাহা ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইয়া উঠে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় ধারকর্জ্জও আর চলে না। তাহাতে লোকসান বই লাভ কখনো হইতে পারে না। আর এরূপ ধারকর্জ্জের কোনো প্রয়োজনও নাই। কারণ সকলের ভিতরে যখন একই পূর্ণ, অদ্বৈত,

অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে, সেই একই পূর্ণ ও অদ্বৈত বস্তু যখন নানাভাবে, নানা আকারে, সকল আধারের ভিতর দিয়াই আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তখন এক ব্যক্তি বা এক জাতি তার নিজস্ব ধনের জন্য অপরের দ্বারে কেনই বা প্রার্থী হইতে যাইব? এই জন্যই এ বিশ্ব-বিবর্ত্তনে দানের কণামাত্রও স্থান নাই, অনুকরণ একান্তই নিষ্প্রয়োজন।

১৭। মনুষ্যত্বের ইতিহাস।

সকল অপূর্ণের ভিতরেই যে পূর্ণ বস্তু রহিয়াছে, সকল দ্বৈতের মূলেই যে অদ্বৈত বস্তু, সকল ভাগবিভাগের ভিতরেই যে এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য তত্ত্বপদার্থ নিহিত রহিয়াছে, এবং বিশ্ববিবর্ত্তনে অনন্তভাবে, অনন্ত আধারে, অনন্তরূপে সেই নিত্য স্বরূপ বস্তু আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, য়ুরোপ এই সত্যকে এখনো ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। আর তারই জন্য য়ুরোপ অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াও এখনো পর্য্যন্ত মানবসমাজের একটা সার্ব্বজনীন ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। য়ুরোপ প্রাচীন কালের বহু সাধনা ও সভ্যতার আলোচনা করিয়াছে ও করিতেছে। সমাজের অতি প্রাচীন সময়ের অনেক লুপ্ততত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছে ও করিতেছে, বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শাস্ত্র সাহিত্য, আচার পদ্ধতি, এ সকলের অনেক সংগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে, কিন্তু এমন সুন্দর, এমন মূল্যবান, এরূপ বিরাট আয়োজন ও উপকরণ সত্ত্বেও, মানব সমাজের একটা সার্ব্বজনীন ইতিহাসের পত্তন পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। সমগ্র মানবমণ্ডলীকে য়ুরোপ এপর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড ভাবেই দেখিয়াছে। আর একটা কল্পিত, অলীক সূত্রে এ সকল খণ্ড বস্তুকে গাঁথিয়া তাহাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক একত্ব প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করিয়াছে। মানুষের যেমন পৌগণ্ড, বাল্য, যৌবন, জরা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা হয়; প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইয়া আপনার পরিণতি ও পরিপকতা লাভ করে, আর এক এক অবস্থা অতিক্রম করিয়া, মানুষ যেমন অপর পূর্ণতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ সমগ্র মানবজাতিও ধারাবাহিকরূপে, সমাজ-পরিবর্ত্তনের ভিন্ন ভিন্ন ধাপ্ বা অবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। ভারতে ও মিশরে, লুদিয়ায় ও ব্যাবিলনে, এই "বিশ্ব-মানব" পৌগণ্ড ও বাল্যদশায় ছিলেন। গ্রীসে ও রোমে যৌবনের প্রথম প্রান্ত প্রাপ্ত হন। আধুনিক য়ুরোপে যৌবনের পূর্ণতা ও জীবনের পরিপকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং য়ুরোপের বাহিরে যারা পড়িয়া আছে, আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার যারা অধিকারী নহে, তারা বালকরূপে স্নেহ, কৃপা, ও অনুকম্পার পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সমকক্ষরূপে কখনো সমাদৃত হইতে পারে না। য়ুরোপীয় পাণ্ডিত্য এইভাবেই মানবসমাজের একটা সার্ব্বজনীন ইতিহাস রচনা করিয়াছে ও করিতেছে।

কিন্তু পৌগণ্ড, বাল্য, যৌবন প্রভৃতি একই ব্যক্তির জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এক জনে পৌগণ্ডাবস্থা শেষ হইয়া, আর এক জনে বাল্যের সূচনা, ও তাহার বাল্যাবস্থার অবসানে তৃতীয় ব্যক্তির যৌবনের প্রতিষ্ঠা

কখনো হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ক্রমটা কখনো ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয় না। যার পৌগণ্ড, তারই বাল্য, তারই আবার যৌবন, সেই একই ব্যক্তি আবার যৌবনের পর ক্রমে জরা প্রাপ্ত হয়। এই যে একত্ব, ইহাই এই বিবর্ত্তনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। ভারতের পৌগণ্ড, বাল্য, যৌবন, জরা, এ সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি। কারণ এ সকল অবস্থার ভিতর দিয়া, ভারতে একত্ব বল, নিজত্ব বল, জাতিত্ব বল, তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারতের সমাজ-জীবনে কোন ভঙ্গ, কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই। সেইরূপ বিলাতেরও পৌগণ্ড যৌবনাদি অবস্থাভেদ, ও এই সকলের মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্ত্তন ও পরিণতি হইয়াছে, ইহা বুঝি। কিন্তু মিশরে বাল্য ছিল, আর আজ মিশরের পুরাতন পৌগণ্ড মার্কিনের যৌবনে পরিণত হইয়াছে, ইহা অতি অদ্ভুত কথা। অথচ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই অদ্ভুত তত্ত্বের উপরই মানবসমাজের সার্ব্বজনীন ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে মিশর, ভারত, পারস্য, চীন, আসিরীয়, ব্যাবিলন—এ সকল "বিশ্বমানবের" বিকাশের বিভিন্ন অবস্থার পরিচয় প্রদান করে। বর্ত্তমান য়ুরোপ সেই বিশ্বমানবের বিবর্ত্তনের সকলের শেষ অবস্থার প্রমাণ দিতেছে। এজন্য য়ুরোপীয় সাধনা প্রাচীন হিন্দু বা ইহুদীয় সভ্যতা ও সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপীয় সাধনার মাপকাটি দিয়া জগতের প্রাচীন সাধনা সকলের ভাল মন্দের বিচার করিতে হইবে। মিশর, ভারত, পারস্য, ব্যাবিলন্ প্রভৃতি প্রাচীন জাতি সকলের জীবনের ও ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিসকলের যদি একটা নিরবচ্ছিন্ন যোগ ও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইত, তবেও বা এই সিদ্ধান্ত কিয়ৎ পরিমাণে দাঁড়াইবার স্থান লাভ করিত। আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের একরূপ একটা সম্বন্ধ আছে। গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার সঙ্গে বর্ত্তমান য়ুরোপীয়সাধনার একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বর্ত্তমান য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য সকলই বহুল পরিমাণে, প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রীস ও রোমের অর্জ্জিত সম্পদেই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার বিভবগৌরব রচিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে কিয়ৎপরিমাণে, গ্রীস ও রোমকে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার বাল্য বা প্রথম যৌবনের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু মিশর বা চীন বা পারস্য বা ভারতের প্রাচীন সাধনার সঙ্গে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাধনার সে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমান য়ুরোপ এখনো প্রাচীন ভারত বা চীনের সাধনার উত্তরাধিকারী হয় নাই। সে সাধনাকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া, তাহারই উপর এক নূতন সাধনা গড়িয়া তোলে নাই। এ অবস্থায় ভারত বা চীনকে য়ুরোপীয় সাধনার পূর্ব্বতন পৌগণ্ড বা বাল্য অবস্থা বলা যাইতে পারে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

আশা-হত।

১

বড়দিনের ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তাসের ব্রে খেলা চলিতেছিল। ইস্কাবনের বিবির ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এমন সময় প্রভাস আসিয়া উপস্থিত।

আমি কহিলাম, "কি হে, কি মনে করে?"

প্রভাস কহিল, "বিশেষ দরকার আছে। একটু নিরিবিলিতে বলব।"

সে বাজি শেষ হইলে প্রভাসকে লইয়া পাশের নিভৃত কক্ষে গেলাম। প্রভাস কহিল, "একখানা নাটক লিখেছি!"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "আমাকে বুঝি সমজদার পেয়েছ, তাব? হায়, হায়!"

প্রভাস একটু অপ্রতিভভাবে কহিল, "তা নয়, তবে তোমার সঙ্গে না ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের ম্যানেজারের আলাপ আছে, কুঞ্জ বলছিল—তাই যদি একবার তাদের দেখিয়ে সুবিধা করে দিতে পার! তা ছাড়া, তোমাকেও একবার দেখাতে চাই, তোমার মতটা জানবার জন্য! কাউকে পড়িয়ে শোনাই নি' এখনো!"

আমি গণিতের অধ্যাপক। সাহিত্যরসের আস্বাদ-বোধ কি আমার সাধ্য! প্রভাসের কথায় মনে একটু গর্ব্ব হইল! আমি কহিলাম, "বেশ কথা—আজ রাত্রে পড়া যাবে! এখানেই খাওয়া-দাওয়া করো—সে সময়টা বেশ নিরিবিলিও থাকি!"

মলিন শালের মধ্য হইতে একখানি মোটা বাঁধানো খাতা লইয়া প্রভাস আমার হাতে দিল—আমি সেটি টেবিলের ড্রয়ারে রাখিয়া দিলাম। প্রভাস আমার সহপাঠী! ক্লাশে তাহার সহিত বরাবর আমার প্রতিদ্বন্দিতা চলিত! প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে পনেরো টাকা বৃত্তি পাইয়া আমাকে পরাস্ত করিয়াছিল। সেই আক্রোশে আমার ছাত্রজীবন এমন কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সরস্বতী তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপহার গুলি আমার হাতে তুলিয়া দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নাই!

বি, এ, পরীক্ষার ব্যূহভেদ করিতে না পারায় প্রভাসের ছাত্রজীবনের গতি মন্থর হইয়া পড়িল!

বাঙ্গালা সাহিত্যের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল! ছেলেবেলা হইতেই কেমন-একটা স্বপ্নময় অস্পষ্টভাবে তাহাকে ঘেরিয়া থাকিত। ক্রমে সেই ভাব তাহার চারিধারে এমন একটি সুনিবিড় জাল রচনা করিল যে, পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাহার অনুরাগ শিথিল হইয়া আসিল! কাব্যের ইন্দ্রজালময় রহস্যালোকে তাহার চিত্ত কিসের সন্ধানে ফিরিত, সেখানে সে কি সুখের স্বাদ পাইত, তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারিতাম না! তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন পাষাণ-ভবনের দ্বার তাহার বিরুদ্ধে রুদ্ধ হইলেও, কল্পনার কমলবনে বাণীদেবী তাহার জন্য স্নেহ আসন বিছাইয়া দিতেছিলেন! সহসা একদিন দেখা গেল, তাহার বন্ধুবান্ধব যখন ছাত্র-জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন

সে সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার কুহক-রচনার মধ্য দিয়া একটা সুপ্রতিষ্ঠ স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে এতটুকু অগ্রসর হইতে পারে নাই!

সাহিত্য আর যে আনন্দই দান করুক না কেন,—শূন্য উদর কিম্বা দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস হইতে পরিত্রাণ-লাভের কোন পন্থাই সে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না। অবশেষে একদিন বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের জন্য বাঙ্গালার উদীয়মান সাহিত্যিক সংবাদ-পত্রের অফিসে কর্ম্মের উমেদার হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল! লক্ষ্মীদেবী কৃপা করিলেন—সহজেই প্রভাসের চল্লিশ টাকার একটা চাকুরি মিলিল!

কিন্তু এ কি অসহ্য দুঃখ! তীব্র পরিহাস! মন যখন কল্পনা-কুঞ্জে পুষ্প-সুরভির জন্য আকুল হইয়া উঠে, গোপন ঊর্দ্ধলোকে আদর্শের সন্ধানে ফিরে, কর্ত্তব্য তখন খুন-জখমের বীভৎস রিপোর্ট লিখিবার জন্য তাগাদা দেয়! ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সার-সঙ্কলন, গরিলা-বনমানুষের বিচিত্র বার্ত্তা-সংগ্রহ, ও গ্রীণলণ্ডের রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া ত এমন একঘেয়ে হীন জীবনও বহন করা যায় না! কিন্তু উপায় নাই! লোকে আদর্শ বা কাব্য পড়িতে চাহে না, কারণ, তাহা দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। কাজকর্ম্মের অবসরে এইরূপ দুই-চারিটা উদ্ভট সংবাদ পাইলেই তাহারা কৃতার্থ হইয়া যায়!

রাত্রে প্রভাস কহিল, "খপরের কাগজে ত আর টেঁকা যায় না—জীবনে যেন ক্রমেই কালো কালি মাখছি! চাকরি রাখা দুষ্কর হয়েছে!"

প্রভাস পরচর্চ্চা বা গ্লানির কথা লিখিতে পারে না, কড়া দুই চারিটা সমালোচনায় সহ-যোগীর প্রতিষ্ঠা সে দূর করিতে পারে না, তোষামোদ করিয়া লেখনীর সাহায্যে ধনীর শিরে সে পুষ্পবৃষ্টিও করিতে পারে না, কাজেই স্বত্বাধিকারী বিরক্ত, পাঠকের দলও আগ্রহশূন্য!

প্রভাস কহিল, "শুনেছি থিয়েটারওলারা পয়সা দিয়ে বই নেয়—মোটা বাঁধা মাহিনাও দেয়—তাই বহু চেষ্টায় এই নাটক লিখেছি!"

আমি কহিলাম, "তুমিও যেমন—থিয়েটারে কেবল হীন রুচি, সেখানে নাটক জোগানো কি তোমার মত লোকের কাজ! কতকগুলো পচা অশ্লীল ইয়ারকি, আর নাটকের মাথায় লাঠি মেরে সেখানে নাটক লিখতে হয়!"

প্রভাস কহিল, "তবু তুমি একবার দেখ না!"

প্রভাস নাটক পড়িতে লাগিল—নাটকের নাম,"রাজকন্যা।" যেখানে যেমন প্রয়োজন, তেমনি ভাবভঙ্গীর সহিত সুর খেলাইয়া সে স্বরচিত নাটক পড়িতে লাগিল! রচনায় এমন একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, আমার নীরস গণিতচর্চ্চারত মস্তিষ্কও মুগ্ধ হইয়া গেল! করুণরসের স্নিগ্ধ ধারায় আমার চিত্ত আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছিল, অজানা লোকের দুঃখিনী রাজকন্যার মর্ম্মবেদনায় অন্তরটা হা-হা করিয়া উঠিতেছিল! যখন নাটক পাঠ শেষ হইল, তখন আমার মনে হইল, যেন একটা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম!

সাহিত্যের সহিত আমার কোন সংস্রব ছিল না, তবু এটুকু বুঝিলাম, যাহা সচরাচর পাঠ

করা যায় "রাজকন্যা" তেমন নহে! ইহাতে যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না! চরিত্রগুলিতে একটা অসাধারণত্ব ছিল!

২

আমার পিতৃব্য ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের এটর্ণি ছিলেন। সেই সূত্রে ম্যানেজারের সহিত আমার অল্প আলাপ ছিল!

প্রভাসকে লইয়া ম্যানেজার রামকালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সুদক্ষ অভি-নেতা ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামকালীর বাবুর নাম আর কে না শুনিয়াছে? রীতিমত আগ্রহের সহিত রামকালীবাবু প্রভাসের নাটক খানি হাতে লইলেন। বলিলেন, "দশ বারো দিন পরে সংবাদ দিব।"

আমি তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিলাম, "বহিখানা সাধারণ নাটকের মত নয়।"

রামকালীবাবু বলিলেন, "সাহিত্যে প্রভাস বাবুর নাম কে না জানে?"

দুই সপ্তাহ পরে রামকালী বাবুর বেহারা আসিয়া আমাকে একখানি পত্র দিল! পত্রের মর্ম্ম,—প্রভাসবাবুর নাটক সাহিত্য-হিসাবে সুন্দর হইলেও অভিনয়ে তেমন জমিবে না—দৃশ্যপটাদি অঙ্কনেও বিস্তর ব্যয় হইবে। নূতন গ্রন্থকারের জন্য সহসা এত টাকা ব্যয় করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় না। ওথেলো হ্যামলেট আজকাল অভিনীত হইলেও দর্শক জুটে না—তেমনি প্রভাস বাবুর নাটক দৃশ্য-কাব্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনয়ের উপযোগী নহে। কাজেই তিনি দুঃখের সহিত নাটক খানি ফেরত পাঠাইয়াছেন।

প্রভাস প্রত্যহই আপনার অদৃষ্ট-ফলের কথা জানিবার জন্য আমার নিকট আসিত। সেদিনও আসিয়াছিল! রামকালীবাবুর পত্র দেখিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তার মুখ সাদা হইয়া গেল। কোন কথা না বলিয়াই সে খাতাখানি লইয়া চলিয়া গেল! আমি ডাকিলাম, কিন্তু সে ফিরিয়াও একবার চাহিল না! বেচারার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল!

এই সময় চৌবাড়ীর জমিদার ক্ষিতীশ চৌধুরীরা এক সখের থিয়েটারের দল খুলিল। তাহারা নূতন নাটকের সন্ধান করিতেছিল। আমি প্রভাসের নাটকের কথা বলিতে সে পাঁচ শত টাকা দিয়া নাটকের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইতে উদ্যত হইল! আমি গিয়া প্রভাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিলাম।

প্রভাস কহিল, "সে খাতা পুড়িয়ে ফেলেছি!"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। "সে কি? তার নকল নাই?"

"না—তার কোন চিহ্ন রাখিনি! ব্যর্থতার সাক্ষ্য রেখে লাভ কি?"

ক্ষোভে আমার অন্তর ভরিয়া উঠিল!

প্রভাস কহিল, "কাল আমি ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে গেছলাম—নাটক দেখতে। যা দেখলাম—কদর্য্য!"

আমি কহিলাম, "রামকালীবাবুর নাটক?"

"না।"

"রামকালীবাবুর নাটক একদিন দেখে এস, কি রকম ধরণটা ওরা চায়!"

"দাসত্ব করতে বল, তুমি?"

"তা নয়, ঠিক! তবে ষ্টেজের জন্যই যদি

দেখ, তা হলে ষ্টেজকে একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? এতগুলো দর্শকের রুচি তুমি ত আর একরাত্রেই হঠিয়ে দিতে পারচ না?"

"তা বলে তাদের কুৎসিত রুচির অনুসরণ করতেও পারব না—এতে না খেয়ে সপরিবারে মরি যদি, সে-ও ভালো!"

৩

কিছুদিন পরে প্রভাস আসিয়া আবার সহসা দর্শন দিল। কহিল, "আজ থিয়েটারে যাবে? একখানা নূতন বই আছে।"

থিয়েটার দেখার প্রতি আমার কোন ঔৎসুক্য ছিল না! রাত্রি জাগরণ সহ্য হইত না,—তাহার উপর, হেদুয়ার ধারে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিতাম, সারারাত্রি বায়ু ও আলোক-হীন, অন্ধকূপের মত, থিয়েটার হইতে দর্শকের দল শীর্ণ মুখে শুষ্ক চোখে গৃহে ফিরিতেছে—এই নিষ্ঠুর আমোদ প্রিয়তা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিতাম। থিয়েটারের নামে আমার কেমন আতঙ্ক জন্মিয়াছিল।

তাই আমি কহিলাম,"সারারাত্রি গারদঘরে আটক থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না!"

প্রভাস কহিল, "সারারাত্রি না-ই বা থাকলাম—একখানা নূতন নাটকের অভিনয় হবে—রামকালীবাবুর লেখা!"

একখানিমাত্র নাটক! "জেলে খুন", "কালো ভূত" প্রভৃতি গীতিনাট্য ও প্রহসনে পাঁচ ফুলের সাজির ব্যবস্থা হয় নাই শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য ও আশ্বস্ত হইলাম!

প্রভাস আরো কহিল, "রামকালীবাবুর লেখার ধরণটা কেমন—দেখব!"

আমি কহিলাম, "কি নাটক?"

প্রভাস একখানা হ্যাণ্ডবিল ফেলিয়া দিল! কেমন করিয়া আত্ম-প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে হয়, হ্যাণ্ডবিলখানি তাহার চূড়ান্ত পরিচয়! এমন নাটক আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই—নাটকের রাজ্যে একেবারে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে ইত্যাদি বাগাড়ম্বরের ক্রটি ছিল না এবং খুব মোটা চিত্র-বিচিত্র অস্পষ্ট অক্ষরে নাটকের নাম লেখা—"কমলাবতী",—নূতন ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নায়ক বিনায়ক সাজিবেন, নাট্যকার স্বয়ং,—বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের আর্ভিং, শ্রীযুক্ত রামকালী হালদার।

রাত্রে ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম। দুইখানি টিকিট কিনিয়া ভিতরে গেলাম। কি ভিড়! কলিকাতার যত লোক যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একই রাত্রে এত লোকের থিয়েটার দেখিবার সখ জাগিয়া উঠিয়াছে ভাবিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। রামকালীবাবু গর্ব্বস্ফীত বক্ষে টিকিট-ঘরের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন—আমরা সাবধানে তাঁহার দৃষ্টিটুকু এড়াইয়া আসিলাম!

ঐক্যতান-বাদনের পর পটোত্তোলন হইল—প্রথম দৃশ্যে এক সুবিস্তীর্ণা নদী—দুই কূল দেখা যায় না! নদীবক্ষে একখানি সুদৃশ্য তরণী! তরণীর উপর বসিয়া রাজকন্যা কমলাবতী বাঁশী বাজাইতেছেন! দৃশ্যপটের আড়ম্বরে ও রাজকন্যার সুদক্ষ বাঁশীর সুরে কেমন-একটা বিভ্রম আনিয়া দিল! তাহার পর নানা ঘটনার মধ্য দিয়া নাটকের গতি ত্বরিতভাবে অগ্রসর হইয়া চলিল! দুই-চারিটা দৃশ্যের পর আমি চমকিয়া উঠিলাম,—এ যে প্রভাসের নাটক! কেবল নামগুলা ও দৃশ্য-যোজনায়

একটু পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে! রচনার ভাব, ভঙ্গী, উপাখ্যানের অভিনবত্ব, সমস্তই প্রভাসের! আশ্চর্য্য হইয়া আমি প্রভাসের দিকে চাহিলাম। অভিনয়ের মধ্যে সে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল! প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইলে, প্রভাস কহিল, "আমার 'রাজকন্যার' মত মনে হচ্ছে, না?"

আমি কহিলাম, "হুবহু তাই বলে ত আমার মনে হয়!"

চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া প্রভাস সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল! আমি কহিলাম, "আর একটু দেখা যাক! ভদ্রতায় না হয়, কোর্ট আছে!" প্রভাস কথা কহিল না!

তার পর দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল! কথাবার্ত্তায়, ভাবে-ভাষায় এতটুকু আর প্রভেদ রহিল না—হুবহু প্রভাসের রচনা! কেবল ঐ নামগুলাই যা বদলাইয়া দিয়াছে!

অভিনয় দেখিতে দেখিতে দর্শকের দল মাতিয়া উঠিল! এমন নাটক বাঙ্গালা থিয়েটারে কখনো অভিনীত হয় নাই! যেমন উচ্চভাব, গানগুলিতেও তেমনি কবিত্ব,—থিয়েটারী সাহিত্যে যে দুটি জিনিস একান্তই দুর্লভ!

পার্শ্বস্থ জনৈক দর্শক কহিল, "রামকালীবাবু কি আশ্চর্য্য নূতন ভাবে লেখার স্রোত ফিরিয়েছেন!"

আর একজন কহিল, "প্রতিভার লক্ষণই ত এই!"

প্রভাস ক্ষেপিয়া উঠিল। সে কহিল, "চুরি! আমার লেখা বেমালুম চুরি করেছে!"

লোক দুইজন অবাক হইয়া গেল! এমন অদ্ভুত কথা তাহারা শুনিবে বলিয়া কখনো আশাও করে নাই!

আমি কহিলাম, "কথাটা সত্য!"

তাহারা কহিল, "হুঁঃ! বলেন কি মশায়?"

উৎসাহী দর্শকের সঘন করতালিবর্ষণে প্রভাস অস্থির হইয়া পড়িল!

তখন তৃতীয় অঙ্ক চলিতেছিল। দৃশ্যটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল! নায়ক বিনায়ক যুদ্ধ জয় করিয়া আসিয়াছে—রাজা হংসবাহন বিপুল ভাবনা ও দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছেন—জয়মাল্য লইয়া রাজকন্যা কমলাবতী সম্মুখে উপস্থিত! এমন সময় ষড়যন্ত্রকারী কতিপয় রাজ অনুচরের প্রচুর প্রমাণে বিনায়কের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল—রাজা শিহরিয়া বিশ্বাসঘাতকের দণ্ডবিধান করিলেন! রাজকন্যার কর হইতে পুষ্পমাল্য খসিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। এ অসম্ভব কথায় সভাসদগণ অবাক হইয়া গিয়াছিল। রাজা নিরুপায়, প্রমাণ পাইয়া দোষীর দণ্ডবিধান না করিলে কর্ত্তব্যহানি হইবে! বিনায়ক অবিচলিত হৃদয়ে সমস্ত অপবাদ মাথায় বহিয়া কারাগৃহে যাইবার সময় ধীরস্বরে করুণ আক্ষেপবাণীতে দর্শকের হৃদয় আর্দ্র করিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় প্রভাস দাঁড়াইয়া উঠিল!

পিছন হইতে অধীর দর্শকের দল একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল—"আঃ বসুন না, মশায়—আপনি ত transparent নন যে, দেখতে পাব!"

প্রভাস ধীরস্বরে কহিল, "চোর—চোর! আমার বই চুরি করেছে—নির্লজ্জ চোর কোথাকার!"

আকস্মিক রসভঙ্গে অভিনেতাও স্থির হইল। চারিধারে রীতিমত গোল বাধিয়া

গেল! গ্যালারি হইতে চীৎকার উঠিল—"দূর করে দাও, মাতালটাকে—দূর করে দাও!

আমি প্রভাসের হাত ধরিলাম! প্রভাস কহিল, "বল, তুমিই বল, চুরি কি না! আমি মাতাল নই, অজ্ঞান নই—এ নাটক আমার লেখা। রামকালী বাবুকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল—তিনি ফেরত দিয়ে বলেন, ভালো হয়নি—তার পর সেই বই নিজে আগাগোড়া চুরি করে নিজের নামে চালিয়েছেন—চোর কোথাকার! প্রমাণ অবধি রাখিনি, আমি! ওঃ! সে খাতা পুড়িয়ে ফেলেছি!"

'দূর করে দাও', 'পাগল', 'মাতাল' শব্দে চারিধারে যেন বজ্রনিনাদ উঠিল! মধুচক্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে যেমন হয়, তেমনি ভাবখানা!

নায়ক বিনায়ক মঞ্চ হইতে হাঁকিলেন—"গার্ড!"

ষ্টেজের গার্ড আসিয়া প্রভাসের হাত ধরিল! প্রভাস কহিল, "ছেড়ে দাও—অসভ্য, বেয়াদব্।"

প্রভাসকে শান্ত করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। থিয়েটারের দুইচারি জন লোক আসিয়া প্রভাসের গলা ধরিয়া ধাক্কা দিল। আমি কোনমতে গোল থামাইয়া প্রভাসকে লইয়া বাহিরে আসিলাম!

রাস্তার ধারে আসিয়া গাড়ীর সন্ধান করিতেছি, এমন সময় ভিতরে তুমুল রবে করতালির ধ্বনি উঠিল! প্রভাস তখন আমার বুকে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তর্কী।

তর্কী ইংলণ্ডের দক্ষিণে ডিভনসায়ারে সমুদ্রতীরের উপর অবস্থিত একটি স্বাস্থ্য নিবাস। ষ্টেসনে গিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য। সকলেই প্রায় তর্কীতে যাইবার জন্য ব্যস্ত। সকলেরই হাতে এক একটি হ্যাণ্ডব্যাগ—তাহাতে দুই তিন দিনের মত তাঁহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথা,—শার্ট কলার রুমাল ইত্যাদি। আহার ও বাসোপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি সেখানকার হোটেলেই মিলিয়া থাকে। আমাদের এক দিন বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইলে কত ভাবনা হয়—কি খাইব, কোথায় থাকিব। কিন্তু এই সব দেশে সে কথা কিছুই ভাবিতে হয় না বলিয়া আমোদ বা ব্যবসার জন্য দেশ-ভ্রমণে কত সুবিধা।

যাত্রীর এত ভিড় যে সব গাড়ি গুলিই ভরিয়া গিয়াছে। ছেলেপিলে লইয়া বাপ মা আনন্দ করিতে করিতে চলিয়াছেন। কেহ বা লাল রঙের ধ্বজা উড়াইয়া গান গাহিতে গাহিতে ষ্টেসন ও রেলগাড়ি প্রতিধ্বনিত করিয়া চলিয়াছে। ছেলে মেয়েদের প্রায় সকলের বুকেই এক একটি ফুল গোঁজা।

এই স্থানে ষ্টেসনে ডাক্তার কার্শিজী

ব্রাউন সাহেবের সহিত দেখা হইল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ নিরাকরণ করিবার জন্য যে সমিতি আছে, ইনি তারই সেক্রেটারী। সাদরে আলাপ করিয়া—লণ্ডনে ফিরিলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়া তিনি তাঁহার নামের কার্ড আমাকে দিলেন। ঠিকানা ৩২ নং হারলী ষ্ট্রীট। সেখানে ডাক্তারের আপিস বাটী, কিন্তু তিনি থাকেন হ্যামষ্টেড্ নামক লণ্ডনের একটি নির্জ্জন পল্লীতে। এই মনোহর স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া সকালে কর্ম্ম-স্থানে আসেন ও সারা দিন সেখানেই কাজ করিয়া রাত্রে বাটী ফিরিয়া যান। মাঠের নীচে দিয়া যে রেললাইন গিয়াছে তাহার সাহায্যে আধ ঘণ্টার যাতায়াত হয়। সে দেশে আমাদের এদেশের মত এত গাড়ি ঘোড়ার খরচ নাই। সবাই পথে চলে ও সাধারণ লোকের সঙ্গে যাতায়াত করে; তাহাতে অপমান বোধ করে না। অনর্থক খরচ নিবারণ করা সে দেশের রীতি। তাই তাহাদের এত স্বচ্ছল অবস্থা।

সেই গাড়িতে ডিভনসায়ারেরই এক কৃষক ও কৃষকবধূর সহিত আলাপ হইল। তাঁহারাও দুই দিনের অবসরে স্বাস্থ্যকর স্থানে বিশ্রাম ও বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যাইতেছেন। তাঁহাদের খুব সরল ভাব। রমণীটি ক্ষীণাঙ্গী এবং দেখিতেও বেশ সুশ্রী। তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিবার সময় দেখিলাম—তাঁহার হাতগুলি চাষার ঘরের মোটা কাজ করিয়া, শক্ত হইয়া গিয়াছে—মোটেই কোমল নহে। তাঁহারা আমাদের দেশের কথা সাগ্রহে শুনিতে চাহিলেন।

আর একজন সহযাত্রী ছিলেন তিনি কারিগর। মজবুৎ লোহার তোরঙ্গ তৈয়ার করাই তাঁহার কাজ। কারখানার ভিতরটা বড়ই উত্তপ্ত—তাহারই মধ্যে তিনি দিনে প্রায় আট ঘণ্টা কাজ করেন! প্রতি সপ্তাহে দুই দিন ছুটি পান। আর সেই দুই দিন কালীঝুলী মাখা পোষাক ত্যাগ করিয়া আমোদ করিয়া বেড়ান। সপ্তাহে ছয় পাউণ্ড আয়। স্ত্রী আছেন, ও একটি দুই বছরের ছেলে আছে। স্ত্রী এখন ছেলেটিকে লইয়া তর্কীতেই রহিয়াছেন। আজ এক মাস পরে দুইজনের দেখা হইবে।

খোলা মাঠ, শস্যক্ষেত্র, ঘরবাড়ি, ও ষ্টেসনের পর ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ি অচিরে সমুদ্রের ধারে পৌঁছিল। তীরে কত ছেলে মেয়ে ও নরনারী শুধু পা করিয়া হাতের কাপড় গুটাইয়া বালি ঘাঁটিয়া ঝিনুক কুড়াইতেছে। কেহ বা ছোট নৌকায় করিয়া সমুদ্রে বেড়াইতেছে। সকলেই একটি না একটি খেলায় ব্যস্ত—কেহই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অপরের খেলা দেখিতেছে না!

তর্কীতে পৌঁছাইয়া সেখানকার নিকটবর্ত্তী একটি হোটেলে আহার করিলাম। পরে রেলের গুদামঘরে আমার হাতব্যাগটী জিম্মা রাখিয়া দেশ দেখিতে বাহির হইলাম। সে সব স্থানে ষ্টেসনেই মানুষের মোটঘাট জমা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। দুই এক পেনি দিলেই তাহারা একদিনের জন্য জিনিষপত্র জমা রাখে। ইহাতে কত সুবিধা,—মোটঘাটপত্র লইয়া বিব্রত হইতে হয় না।

এ ষ্টেসনটিও সমুদ্রের ধারে। সেখান হইতে সুনীল সমুদ্র অনেকদূর অবধি দেখা

যায়। দূরে দুই একটি ছোট দ্বীপ বুকে লইয়া নীল সমুদ্র নীল আকাশে মিলিয়া আছে। সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট জাহাজগুলি এদিক ওদিক করিয়া যাত্রী পার করিতেছে। নিকটেই ব্রাইটনের ঘাট। সমুদ্রে স্নান করিবার ছোট ছোট চাকা গাড়ির সারি। তাহার মধ্যে কাপড় ছাড়িয়া কৌপীন পরিয়া জলে নামিতে হয়। অনেক স্থলে Mixed bathing বা স্ত্রী পুরুষে একত্রে স্নানের আড্ডা আছে। সেগুলিতেই বেশি ভিড়। সাঁতার শিখার উপলক্ষ করিয়া যত অযথা ঘটনা হয় তার সব ছবি-ছাপা কাগজ বাজারে বিক্রয় হয়। এখন এ প্রথা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সমুদ্রের ধারে-ধারে পাথর-বাঁধান রাস্তা। তার তলায় কত সুন্দর জলজ উদ্ভিদ ভাসিয়া আছে। চলিতে চলিতেই সে সব দেখা যায়। কত জেলী মাছ দেখিলাম। ধীবরদের নৌকাগুলিতে বলিষ্ঠকায় ছেলেরা ঝাঁপাঝাঁপি করিতেছে। আর সমুদ্রের ধারে ধারে অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর বড় বড় বাড়ী। সেখান হইতে অসীম সমুদ্রের দৃশ্য কি সুন্দর! পাহাড়ের ধারে ধারে অসংখ্য ফুল গাছ। এ সব স্থান আমাদের ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানেরই মত প্রায় গরম। এমন কি—তাল গাছ অবধি দেখা যায়। রৌদ্রে বাহির হইলে মাথা ঢাকা দিতে হয়, তাই শীতকালেই এই স্থানে যাত্রীর এত জনতা। এই স্থানে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্ম অনেকগুলি চিকিৎসাশালা আছে। সেখানকার চিকিৎসার ব্যবস্থা ঔষধ খাওয়ানো নহে। নির্ম্মল বায়ু সেবন, নিয়মিত ব্যায়াম, ও সূর্য্যালোকে সারা দিন থাকাই নিয়ম। নিয়মিত সময়ে আহার ও নিদ্রা চাই। এইরূপ ব্যবস্থায় যক্ষ্মা কাশের রোগীরা যত শীঘ্র ও যত বেশি আরাম পায়, অন্য কোন প্রকারে তাহা পায় না। তাই এখন সকল সভ্য দেশে এইরূপ চিকিৎসারই বেশি চলন হইতেছে। আমাদের দেশে রোগী কেবল ঔষধ খাইয়াই তাহা মারা যায়!

স্থানটি ছোট ও সেখানে দেখিবার জিনিস অল্পই আছে। এবং দৈনিক খরচ প্রায় পনেরো শিলিং—এই কারণে সেই দিনই সেখান হইতে ফিরিবার মনস্থ করিলাম। কখন ট্রেণ পাওয়া যায়, জানা ছিল না;—ষ্টেসনে আহারের ঘরের তত্ত্বাবধান মেয়েরাই করেন, তাঁহারা বই দেখিয়া সমস্ত খবর আমাকে বলিয়া দিলেন। বিলাতে ও অন্যান্য সভ্য ও উন্নতিশীল স্থানে মেয়েদের উপযোগী সকল কাজে কেবল মেয়েদিগকেই নিযুক্ত করা হয়, যথা পোষ্ট আপিস, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন্ সংক্রান্ত কার্য্য, আহারের তত্ত্বাবধান, কেরাণীগিরি ইত্যাদি! এ সব না করিয়া রমণীরা পরমুখাপেক্ষী হইলে কেমন করিয়া তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিবে! এই সব কাজ রমণীগণ দিব্য সুচারুরূপে ও এমন সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে অন্য কাজ দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ করিয়া তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছুটি পান। তখন সুন্দরভাবে সাজ সজ্জা করিয়া তাঁহারা আমোদ-প্রমোদ করিতে বাহির হন। সেই সুন্দর পোষাকগুলি সবই প্রায় অবসর সময়ে তাঁহাদের নিজের হাতের তৈরী। সুতরাং সজ্জাতে তত অর্থ

ব্যয় করিতে হয় না—তাঁহারা নিজেরা শিক্ষিত ও নিপুণ বলিয়া তাঁহাদের কত দৈনিক খরচ বাঁচিয়া যায়।

সেইদিনই বৈকালে ট্রেণে চড়িয়া রাত্রি নয়টার সময় আমি লণ্ডনে পৌঁছিলাম।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

পোষ্যপুত্র।

৩৩

সারারাত্রি জাগিয়া ভোরের সময় ঘুমাইবার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অকৃতকার্য্য হইয়া বিরক্তচিত্তে নীরদকুমার বিছানা ছাড়িয়া জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় বাহিরে দরজায় ঘা পড়িল। কোন ছাত্র হয়ত কোন প্রয়োজনে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে এই কথাই তাহার মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রবেশ করিল যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র এখন আর একটু মোটা হইয়া গিয়াছে, মাথার চুলও দুইচারি গাছা সাদা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, বেশ ভূষার পারিপাট্যও তখনকার মত কিছু নাই, তবু তাহার মুখে সেই সরল প্রাণখোলা হাসিটুকুর অভাব ছিল না। ঘরে ঢুকিয়া একবার মাত্র বন্ধুর মুখের দিকে চাহিতেই যোগেন্দ্রের মুখে হাসির পরিবর্ত্তে ঘোর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে আর অগ্রসর না হইয়া সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল "একি! তোমার কি হয়েচে?"

নীরদ তাহার বিস্ময়ের কারণ কতকটা বুঝিয়াই তাড়াতাড়ি মুখের ভাব বদলাইবার চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি? ভুত দেখলে নাকি?" "ভুত আমি দেখচি কি, কাল রাত্রে তুমি ঐ জানলায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলে তাত ঠিক বুঝতে পারচিনে! যাহোক তোমার কি কোন বেশি রকম অসুখ করেছে?" সত্যই খুব বড় একটা কঠিন পীড়া মানুষকে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই যেন কত বৎসরের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া যায়, নীরদের মুখে সেই রকম একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির আক্রমণ শতচিহ্নে সুপরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। যোগেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া একটু বিচলিতভাবে সে সরিয়া আসিল। আবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "হাঁ, মাথাটা ভারী ধরেচে।" "সেইজন্য বুঝি কাল খেলে না? ঠাকুর বল্লে তুমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আছ,—আর ওদিকে বড়—বুঝেছ তো! আমিতো জানিনা তোমার অসুখ করেচে—একি! একবারও বিছানায় শোওনি নাকি? ঐ জন্যেই তো বলিরে দাদা, সাধু সন্ন্যাসীতে কি আর তোমার আমার ধাত বোঝে? সারা দিনরাত্রি ধরে যোগ-যাগ হ'চ্ছিল বুঝি?"

যোগেন্দ্রের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া নীরদ একটু হাসিল, বলিল, "পাগল নাকি! কে যোগ শিখচে? রজ্জুতে সর্পভ্রম করে যখন তখন খুব শিউরে উঠতে পারো, যাহোক!"

যোগেন্দ্র যেন গম্ভীর হইয়া কহিল "বাঁচালে,

সর্পেতে রজ্জুভ্রম করিনে ত, সেইটেই সাংঘাতিক" নীরদ হাসিয়া ফেলিল "ও একই কথা মোদ্দা ভ্রমতো বটেই"।

"আচ্ছা না হয় আমারি ভ্রম, কিন্তু সেই যে মত্থুরার অমন্ হাসিখুসি, আমোদ আহ্লাদ, খাসা বাড়ি, তোফা ব্যবস্থা, চা-কফি, পাঁঠা পাখী, কোথাও কোন ফাঁকটি ছিল না;—দেশের কাজ,নিজের সুখ একসঙ্গে সবি ছিল,—হুড়হুড় করে টাকা আসছিল,—আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত হঠাৎ কোথা থেকে এক দৈত্য এসে তোমার ঘাড়ে চাপলো বল দেখি? রাতারাতি একেবারে সন্ন্যাসী!"

যোগেন্দ্র আসন গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

নীরদ পরিহাস করিয়া বলিল "সে কষ্ট যে আর ভুলতে পারচো না? শুনেছিলুম সময়ে সকলি সহিয়া যায়। তোমার দেখচি ঠিক বিপরীত"।

"ভুলতে দিলে কৈ বলো, সেওতো ঐ তোমারি কীর্ত্তি! মাছ—এমন তোফা টাট্‌কা মাছ চোখের ওপোর দিয়ে জেলে ব্যাটারা ধরে নিয়ে যাবে রোজ দুবেলা—তাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখচি। উপায় নেই! জিভে যত চোখে তত জল ঝরতে থাকে। কাছে কেউ থাকলে বলি চোখে কি একটা পোকা না কি পড়ল। নিজেতো আলো চাল ধরেছ, যেন মা কি বাপ—"

নীরদ সকৌতুক হাস্যে যোগেন্দ্রের দুঃখ-কাহিনী শুনিতেছিল; শেষের দিকটায় অকস্মাৎ চমকিয়া সে বাধা দিল; "যোগেন যা খুসী তাই বলে বলোনা ওসব কি কথা—"

যোগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বন্ধুর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া সে বলিল "এ কি তুমি যে একেবারে আমায় অবাক করে দিলে? তামাসা করে কি নাকি একটা কথা বলেছি, তাতে চটবার এতো কি পেলে? এতেই বলে—উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত বল্লে মানুষ রুষ্ট—। সত্যিই তো আর তোমার স্বর্গগত বাপ দ্বিতীয়বার তোমাকে কাছা পরাবার জন্যে স্থানচ্যুত হয়ে আসচেন না! ভক্তি কত? বৎসরান্তে এক গণ্ডুষ জলও তো দিতে দেখিনে।—"

নীরদকুমার যোগেন্দ্রের পিঠের উপর একটা অধীর চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিয়া উঠিল, "ও সব কথা ছেড়ে দাও যোগেন, তুমি যদি সত্যসত্য এখানে ক্লান্ত হয়ে থাক তা হলে সেকথা স্পষ্ট করে বলেই কেন অবসর নাওনা, জোর তো কিছু নেই! আর জোর করলেই বা মানবে কেন? আর পার যদি", নীরদ একটু হাসিল, "এই হতভাগা স্কুলটাকে সিডিসনের আড্ডা বলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা রিপোর্ট করে দিও, খুব উন্নতি হয়ে যাবে এখন।"

যোগেন্দ্র এই বিদ্রূপে শিহরিয়া উঠিল, "বলে নাও; ভগবান মুখ দিয়েছেন যত পার বলো। জানো কিনা হতভাগাটাকে বঁড়শিতে বিঁধে রেখেছ, ওর আর কোথাও এক পা নড়বার জো নেই—তাই মাঝে মাঝে খেলিয়ে দেখে নেওয়া বইত না! তাই যদি পারবো নীরু, তাহলে আর মত্থুরার তেমন চাকরীটে খুইয়ে তোমার সঙ্গে এসে

বনবাসী হই? স্ত্রীপুত্র সব ছাড়িয়েছ, আরও তুমি বলো তোমায় ছেড়ে যেতে চাই?"

নীরদ মনে মনে অনেকখানি লজ্জা বোধ করিল, যোগেন্দ্র যাহা বলিতেছে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। যোগেন্দ্রের স্বার্থত্যাগ ও বন্ধুপ্রেম যথার্থই অনুকরণীয়। নীরদ জানিত যে কয়জন যুবক তাহার এই নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যোগেন্দ্রনাথ তাহাদেরই মধ্যে একজন নহে। অন্য সকলে দেশ.ক ভালবাসিয়া কর্ত্তব্যকে ভালবাসিয়া যশ ও ভবিষ্যতের আশা লইয়া তাহার সহিত যোগদান করিয়াছেন কিন্তু যোগেন্দ্র স্বেচ্ছায় এ কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে, সুধু তাহাকে ভালবাসিয়া! ইহার জন্য সে বেচারা ঘরে অনেকখানি নির্য্যাতন সহ্য করিয়া থাকে। পাছে নীরদ মণিমালার চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা জানিতে পারে সেই ভয়েই যে সে এই কয়মাস তাহাকে এখানে আনিতে পর্য্যন্ত সাহসী হয় নাই, একথাও নীরদ যে একটু একটু না বুঝিয়াছিল, এমন নয়। দুএকবার সে একটু আভাষ দিয়াও সাবধান করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। "গিন্নির কাছে অভিশপ্ত করো না ভাই, দেখো।"

নীরদ চুপ করিয়া রহিল। যোগেন্দ্র আরও একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল! অবশেষে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, আজ নীরদ অসুস্থ, এবং তাহার আহার হয় নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে সে বিরুদ্ধ ভাব হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল ইহা ভাবিয়া অনুতাপের ধিক্কারে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি সে বলিয়া ফেলিল, "ডাক্তারকে একবার ডাকতে পাঠাই তা হলে?" নীরদ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না ডাক্তার কি হবে? তেমন কিছুতো হয়নি"। "সে কি! মুখের চেহারা দেখলে যে ভয় করে! তবে না হয় থার্ম্মোমিটারটা আনি। নিশ্চয়ই তোমার শরীর বেশি খারাপ আছে।" যোগেন্দ্র উঠিল,—নীরদ ডাকিল, "না, না ও সব কিছু করতে হবে না,—যোগেন, শোন শোন—এসোনা একটু গল্প করা যাক। একটা কথা আছে—" যোগেন্দ্র ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "অসুখটা বাড়িয়ে কি হবে?"

"বেশতো তোমরা না হয় একটু সেবা যত্ন করবে! পারবে?" "রা আব আছি কই?" নীরদকুমার হাসিয়া বলিলেন "হওনা কেন তোমরা,—আমি কি বারণ করেছি? বিরহের পালা-অন্তে মিলনের নাট্য রচনা করো, আমি দেখে যাই।"

"কি বল্লে, দেখে যাই? অস্যার্থ?"

"ঐ যে আগে বল্লুম একটা কথা আছে, এটা তারি সূচনা।"

"সূচনা শুনেইতো হৃৎকম্প উপস্থিত! আরম্ভ করো তবে—দেখা যাক কোথায় গিয়ে শেষ—!"

৩৪

সেইদিন প্রাতঃকালে নীরদকুমারের গুরু বিদায় লইয়া গিয়াছেন। বৈকালে পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া একটুখানি অন্যমনস্ক হইবার আশায় নীরদকুমার ঘরটার চারিদিকে একবার প্রত্যাশিতনেত্রে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। ঘরের দুই কোণে দুইটা আলমারিতে

পুস্তক ভরা আছে, বাংলা সংস্কৃত ইংরাজি সকল ভাষার কিছু না-কিছু ভাল বই তাহার সংগ্রহে ছিল। ম্যাক্সমূলারের "অমিতাভ বুদ্ধ" একবার হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া যখন সে ঈষৎ ক্লান্তভাবে উপরের তাকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তখন একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তিকা নিজের পূর্ব্বস্মৃতির সবটুকু মধুরতা ঢালিয়া দিয়া উজ্জল স্বর্ণাক্ষরে হাসিয়া তাহাকে আহ্বান করিল। যন্ত্রচালিতের মত বইখানা তুলিয়া লইয়া নীরদ আলমারি বন্ধ করিয়া ঘরের মাঝখানে টেবিলের কাছে ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর সাদা কাপড়ের আস্তরণ বিছানো ও তাহার উপর কাশীর পিতলের সুন্দর কারুকার্য্য খচিত ফুলদানিতে এক গুচ্ছ হাসনাহানা ফুল তাহার শুষ্ক হৃদয়টির ভিতর হইতে ঘরখানিকে ক্ষীণ শেষ সুরভি দান করিয়া যেন সফলতার গৌরবে চাহিয়া দেখিতেছিল। আসন্ন মরণের পানে চাহিয়া সে যেন হাসিয়া বলিতেছে, "দেখ সবটুকু দিয়া দিয়াছি,—অনুতাপ করিবার কিছু নাই।" বাতাস তাহারি সুরভি স্মৃতিতে পূর্ণ হইয়া প্রাণপণে তাহাকে তাজা রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে-ও শুধু লইয়া সন্তুষ্ট নয়, কিছু দিতে চাহে। বইখানা খুলিতে প্রথমেই নীরদের চোখে পড়িল,

All look for thee Love, Light and Song,
Light in the sky deep red above
Song in the Lark of pinions strong
And in my heart true Love.
Apart we miss our nature's goal
Why strive to cheat our destinies ?
Was not my love for thy Soul ?
Thy beauty for mine eyes !
No longer sleep oh listen now !
I wait and weep, But where art thou ?"

অত্যন্ত ভাল লাগিল। And in my heart, true Love. সে দুইবার উচ্চারণ করিল, True Love ? "হাঁ সত্যই তাই! ইহাকেই True Love বলে! স্বার্থসিদ্ধি, রূপের মোহ, মিষ্টতার স্বাভাবিক আকর্ষণ, সে সব কি প্রেম ? ভুল, ভুল, সে সব ভুল! সত্য বলিয়া পূর্ণ মিথ্যাকে আশ্রয় করিতে সবেগে দুই হাত সে ঊর্দ্ধে তুলিয়াছিল, তাই সত্যের অধীশ্বর তাহার সে বাতুলতা সহ্য করিতে পারেন নাই! তাঁহার অমোঘ বজ্রনিক্ষেপে তাহার গতি প্রতিহত করিয়া দিয়া সত্যের গৌরব রক্ষা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও রক্ষা করিয়াছেন। অন্তরের মধ্যে একটা স্থানে যেন নীরদ একটু হাল্কা বোধ করিল। যাহা বজ্রাহত বলিয়া ভয় ছিল, ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল তাহা উপরের সামান্য আঁচড়মাত্র,—ভস্মচিহ্ন নয়।

পিছন হইতে যোগেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হরি তুমি সত্য! দেখো এতদিন তুমি আছ কি না আছ এ বিষয়ে বিষম সন্দেহ পোষণ করে এসেছিলাম; আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ব্বো যে তুমি আছ, আছ, আছ, এই পৃথিবীতেই আছ"। নীরদ হাসিয়া মুখ ফিরাইল, "হঠাৎ বেল্লিকের মুখে হরিধ্বনি শুনলে যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! লক্ষণ তো বড় শুভ মনে হচ্ছে না, যোগেন"! যোগেন্দ্র নীরদের পিঠে একটা চপেটাঘাত করিয়া সোৎসাহে বলিল, "শুভ লক্ষণ বলে তোমার মনে হচ্ছে না?

আমার কিন্তু এখনকার লক্ষণটা বড্ডই সু বলে মনে হচ্ছে! কি বলব দাদা যদি তোমার মত ছিপছিপে শরীরখানি আজকের জন্য পেতাম তাহলে একবার আহ্লাদটা প্রকাশ করে দেখাতাম। আমার ইচ্ছে করচে আনন্দে হয় নেচে, নয় গলা ছেড়ে একবার কেঁদে উঠি।"

"কেন হঠাৎ তোমার হলো কি, বলো দেখি? শ্রীমতী মণিমালা তবে আজই আসছেন, কেমন?"

"তিনি আসছেন, কাল। কিন্তু তা নয় নীরদ, তোমার এই রুচি পরিবর্ত্তন দেখে আমার আজ যে আনন্দটা হচ্ছে ভাই তা আর কি বল্‌ব!" যোগেন্দ্র খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া আবার বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল,"বেঁচে থাক, ভাই, আমার বড্ড ভাবনাই হয়েছিল, এখন আবার আশা হচ্ছে—।"

নীরদ দেহ সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া সরিয়া গেল। ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল "বেওয়ারিস্ মাল পেয়েছ, যোগেন! পিঠখানা ভেঙ্গে দেওয়ায় বিশেষ কোন লাভ তোমার নেই! হঠাৎ অতটা উচ্ছ্বাস ভাল নয়, একটু রেখে খরচ কর—।"

যোগেন্দ্র নীরদের পাশে আসন গ্রহণ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "যাই বল, ভাই আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম,— গম্ভীর মুখ আর ভাষ্য ভস্ম আমার প্রাণটাকে একেবারে চেপে মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল! নীর তোমার মুখে শেলি, বার্ণস্, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কত মিষ্ট শোনায়! ও গলা কি মোহ মুদ্গর আবৃত্তি করবার জন্য, ভাই! তুমি যে খোদার উপরেও খোদাগরি করেছিলে!—আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম অতটা বিদ্রোহ তোমার বরদাস্ত হবে না। এখন, কি কথাটা বলবে বলেছিলে—শুনি?"

নীরদ এতক্ষণ যোগেন্দ্রের কথায় বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছিল। শেষ প্রশ্নে সহসা সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। "বলবো 'খন"।

"কখন বলবে, পাঁজিপুঁথি আনতে হবে নাকি? তারপর দুখানা নৈবেদ্য একটা শাঁক ফুল ও চন্দন?"—নীরদ হাসিয়া ফেলিল, "জালিও না, থামো, কি বলবো?"

"যা বলবে বলেছিলে!" নীরদ অত্যন্ত সহসা বলিয়া উঠিল, "কি বলা উচিত, বুঝতে পারচি না"—তাহার মুখ চোখ গরম এবং লাল হইয়া উঠিল; মাথা ও মুখের ভিতর উত্তপ্ত রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দুইটী স্কুলের ছেলে ঘরে আসিয়া নত-মস্তকে দাঁড়াইল। নীরদ দরজার দিকে ফিরিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলচো সুধীর, বিনয়?" সুধীর সোজা নীরদের মুখের দিকে চাহিয়া অকুণ্ঠিতভাবে কহিল, "আপনি আজও কি বাগানে যাবেন না? রোজ রোজ আপনি না থাকলে কেমন করে চলবে?" বালকের এই কথা কয়টা আচমকা নীরদকে যেন আঘাত করিল। ছি, ছি, সে স্বার্থপর নিতান্ত কাপুরুষের মত নিজের অন্তর্দাহ লইয়া এ কোণে ও কোণে লুকাইয়া বেড়াইতেছে! নীরদের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যোগেন্দ্র একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "আজ নীরদের শরীর ভাল নেই সুধী, বিনু, তোমরা খেলতে যাও।

কাল থেকে তোমাদের খেলার সময় আমরা ঠিক উপস্থিত থাকব দেখো"। বালক দুইটি একসঙ্গে নীরদের স্তম্ভিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। বিনয় ধীরে ধীরে ব্যথিত নেত্র নামাইয়া বলিল,—"তবে থাক্—এসো সুধীর!"

তাহারা ফিরিল, কিন্তু তাহাদের মৌন অভিমানের প্রচ্ছন্ন ব্যথা নীরদের অপরাধী চিত্তকে তাহাদের মত সহজে ক্ষমা করিতে চাহিল না। সে অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "না না চলো আমি যাচ্চি। আজ তোমাদের ম্যাচ আছে, না?" বিনয় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে উত্তর করিল, "সেতো কাল হয়ে গেছে।" সুধীরের মুখ হইতে তখনও অভিমানের ছল-ছল ভাব চলিয়া যায় নাই। সে মুখ না ফিরাইয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, "আপনার শরীর ভাল নেই। আজ থাক' "তা হোক আমার কিছু কষ্ট হবে না এসো।" এই বলিয়া নীরদ দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল; যোগেন্দ্র একটু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—তারপর কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেল। খেয়ালী-লোকদের চরিত্র বোঝা তাহার সাধ্যের অতীত, সে কথা সে পুনঃপুনঃই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। আজ আর নূতন কি বলিবে?

ছেলেরা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল; যাহারা খেলা না করিতেছিল, তাহারা আপনা-আপনি দাঁড়াইয়া হাসি গল্প করিতেছিল। ছোট ছোট গাছগুলি বিকাল বেলার বাতাসে তাজা হইয়া ধীরে ধীরে মাথা কাঁপাইতেছিল, অদূরে নদীর পারে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রাঙা কিরণটুকু যেন ঋষিপত্নীর ক্ষৌম বসনের রাঙা পাড়টির মত আসন্ন সন্ধ্যার তলে ফুটিয়া রহিয়াছে। নীরদ সুধীরের হাত দৃঢ় ভাবে চাপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি না দেখলে তোমাদের খেলতে ভাল লাগে না?" সুধীর এখন অভিমান ভুলিয়া গিয়াছিল; সে সেই হাতখানার উপর অল্প একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "একটুও না।"

এই পৃথিবী এমন সুন্দর! এই স্নিগ্ধ বায়ু, প্রসন্ন সূর্য্যকিরণ, ঐ আকাশের গায় মিশিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে যে ছোট ছোট পাখীগুলি, নদীতীর হইতে ভাসিয়া আসা, সহজ হাস্য মিশ্র কলরব, এখানকার কিছুই তো নিরাশার অন্ধকার গায় মাখে না! উত্তাপে তাহারা ম্লান হয়, আবার বাতাসে হাসিয়া উঠে। অন্ধকারে ঘুমাইয়া থাকে, আলো আসিলেই জাগিয়া উঠে। তবে এই সজীব শান্ত আলোকিত জগতের মাঝখানে ইহাদেরি সঙ্গে মিশিয়া সে কেন এক হইয়া যাইতে পারে না! আরো, তাহার উপর অন্য সকলের এই যে নিঃস্বার্থ ভালবাসাটুকু, এই যে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি, ইহাই কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সে তো অনেক পাইয়াছে। তাহার জীবন ব্যর্থ নহে, সে ধন্য!

৩৫

সেদিন ও তার পরদিনটা পর্য্যন্ত নীরদ যোগেন্দ্রের হাত এড়াইয়া কোন রকমে আত্ম-রক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আবশ্যক তাহার নিজের,—কথাটা প্রথম সেইই তুলি-য়াছে,—বলিবার প্রয়োজন এখনও বিদ্যমান, অথচ যোগেন্দ্রকে দেখিলেই বুক যেন কাঁপিয়া

উঠে! হাত পায়ের তলাগুলা অসাড় হিম হইয়া আসিতে থাকে।

মণিমালা তাহার দুইটি পুত্র কন্যা সঙ্গে লইয়া আসিয়া পৌঁছিলে যোগেন্দ্রের হাত হইতে আপাতত রক্ষা পাইল মনে করিয়া নীরদ কতকটা আরাম বোধ করিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা ছেলে-দের লইয়া গল্প করিয়া রাত্রে যখন সে শয়ন করিতে গেল,—কল্যাণময়ী জননীর মত সর্ব্বসন্তাপহরা নিদ্রাদেবী তাহার শ্রান্ত ললাটের উপর কোমল হাতখানি বুলাইয়া দিলেন।

প্রভাত আবার যুদ্ধের সাজে সাজিয়া আসিল। আবার সেই জীবন-সংগ্রামে হৃদ-য়ের সহিত ধস্তাধস্তি! বিদ্রোহী চিত্তকে সহজ প্রলোভনে ভুলাইয়া বশীভূত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা!

তখনও ঠিক প্রভাত হয় নাই। দূরে পূর্ব্বা-কাশের একটি প্রান্ত সবেমাত্র লাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পাখীরা সদ্য জাগ্রত হইয়া আপনাদিগের শিশু শাবকগণের সহিত আলাপ শেষ করিয়া দিবসের মত বিদায় লইতেছিল। দুইটী পক্ষী-দম্পতী একটি গাছের ডালের কাছাকাছি বসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বালক দের সমবেত কণ্ঠোচ্চারিত সংস্কৃত স্তব আবৃত্তির গাম্ভীর্য্যময় ঝঙ্কার স্তব্ধ প্রভাতের বাতাসে-আকাশে কম্পিত হইতে লাগিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরদ এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কোন এক সময়ে আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল।

সেই দিন আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন কানন-পথে ফিরিতে ফিরিতে গ্রামের বৈরাগী যখন খঞ্জনী বাজাইয়া আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছিল, "সামাল মাঝি এই পারাবারে বান ডেকেছে সাগরে। এবার তোমার দফা, হল রফা, পড়ে গেলে ফাঁপরে"—তখন পাশে বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া নীরদ আপনার মনের সহিত শত-শত প্রশ্নোত্তর করিতেছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে। কল্য প্রভাতেই জীবন-ব্যাপী মহাসমরের সমাপ্তি—তার পর? তারপর কি অপূর্ব্ব শান্তি, অটুট সুখ! লুব্ধ বালকের মত আপনাকে আপনি সে ভুলাইতেছিল। গান একটা সামান্য ভিক্ষাজীবি গ্রাম্য বৈরাগীর অশিক্ষিত কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বরমাত্র, সারা-দিনের ধূলি-রৌদ্রমাখা ক্লান্তচিত্তের একটুখানি আত্মতৃপ্তি, কিন্তু নীরদের কানে ইহা আজ সংসারের মধ্যে সব চেয়ে মিষ্ট ও মধুর ঠেকিল। বৈরাগী যেন তাহার সঙ্কট বুঝিয়া দুরন্ত পারাবারে ভাসমান নৌকাখানিকে প্রাণপণে সামলাইতে বলিতেছে! বান ডাকিয়াছে, যদি সে সাবধান না হয়, তাহার ক্ষুদ্রতরী রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।

কয়দিন সমস্ত মানসিক শক্তি খরচ করিয়া করিয়া আর সব মীমাংসা একরকম সে করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু একটা অদম্য লজ্জা সে কিছুতে পরিত্যাগ করিতে পারিতে-ছিল না। লক্ষ্মীপুরে সে কাহার প্রতি-দ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে? সে যে শান্তির স্বামীকে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া দিয়াছে। আবার কি সে দান ফিরাইয়া লইবে? নীরদের আরক্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার চঞ্চল হৃৎপিণ্ড পুনঃপুনঃ নিশ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল। ঘড়িতে যেন দম আর একটুও নাই। সামলান বুঝি দায় হয়, যাত্রী

এবার ফাঁপরেই পড়িল! সদ্য ফোটা ফুলের মত আকাশভরা নক্ষত্রগুলা সকৌতুকে তাহার লজ্জাক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া রহিল; শীতের কনকনে বাতাস গায় তীরের মত বিঁধিয়া ফিরিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিল, অনেক দূর হইতে ক্ষীণ সঙ্গীতের ধ্বনি তখনও শুনা যাইতেছিল কিন্তু বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে অদূরস্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন কলাঝাড়ের পানে চাহিয়া চাহিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাসে সুগভীর লজ্জাকে যেন জোর করিয়া সে পরিত্যাগ করিতে চাহিল "আমার যেতে হবে, আমি যাবো,—তার সম্মুখে দাঁড়িয়েই আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে,—তাই করব,—আমার যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই।"

নীরদ যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল তখনও অপর দিকের ঘরগুলি হইতে ছেলেদের পাঠের সাড়া আসিতেছিল। তাহার ঘরে টুলের উপর একটি তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল ও যোগেন্দ্র আলোর কাছে একখানা চৌকিতে বসিয়া খপরের কাগজ হইতে পুনঃপুনঃ চোখ তুলিয়া দরজার দিকে চাহিতেছিল। নীরদ ঘরে ঢুকিতেই কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল "হ্যালো ম্যান! তোমার যে পাত্তাই পাওয়া যায় না—হলো কি? কেবলি ঠাণ্ডা বাতাস, আর দীর্ঘশ্বাস!—না, আর কিছু?" নীরদ যোগেন্দ্রের চৌকি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল, "না আর কিছু না।"

"I wait and weep but where art thou? সুধু তাই?"

"তাই, কিন্তু যোগেন, তামাসা যাক, কাজের কথা বলো, আমার কথার উত্তর কই? আমি চলে গেলে আমার কাজের ভার তুমি নেবেত?"

"আমার প্রশ্নটারি উত্তর কেন প্রথমে হোক না! তোমার মতলব কি?"

"কার মনে কখন কি মতলব ওঠে, তা কি সব সময় খুলে বলা যায়? তবে এই পর্য্যন্ত বলচি, মন্দ কিছু নয়, গুরুদেবের আদেশে আমি যাচ্ছি।"

"ঐ তো ওখানেই যে গলদ! তাঁর যে একটি তল্পি বয়বার চেলার দরকার হয়নি, তা ভরসা করব কি করে?"

মাথা নীচু করিয়া নীরদ কহিল, "তা হলে ত আমার সৌভাগ্য!"

বন্ধুর অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস যোগেন্দ্র শুনিতে পাইল না। সে মাথা নাড়িয়া অতি করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ওটাও যে একটা দুর্লক্ষণ! এ বোঝনা—মহা মহা পাপীরাই তো শেষ কালটায় বড় বড় সাধু হয়। জগাই মাধাই পাপী ছিল, হরিনামের গুণে তরে গেল। আর জানো তো মহামুনি বাল্মীকির পূর্ব্ব ইতিহাসটা? যত দেখবে মস্ত জটা, ততই তাঁর পূর্ব্বলীলার সন্ধান নিতে থাক, দেখবে যে কেউ আর বাদ পড়চেন না—"

আর একটু গাম্ভীর্য্যের চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, তাহলে এখন ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক—ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তুমি আপাততঃ কোন অজ্ঞাত মতলবে কিছু দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হচ্চো—না হয় পর্য্যটনেই বেরুচ্চো! এখন তোমার অনুপস্থিতিতে আমরা এখানকার সব দায়ভার নিজেদের স্কন্ধে বহন করি, তোমার অনুরোধ—এই, না? আমার এখন জিজ্ঞাসা, এই ভারবাহী গর্দ্দভের গলায় কত দিন আর এ রকম শিকল বাঁধা থাকবে?"

নীরদ একটু ভাবিয়া বলিল "তাতো জানি না। হয় তো খুব শীঘ্রও হতে পারে আর নয় তো অনেক দেরিও হয়ে যেতে পারে। কি জানি যোগেন কি হবে!" নীরদের স্বর কম্পিত হইতেছিল। যোগেন্দ্র জানিত ভাবুক লোকের কথা বার্ত্তা চাল চলন সাধারণ লোকের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। সে কহিল "তোমার আদেশ কবে অগ্রাহ্য করেছি। কিন্তু একটা কথা—এই বৎসরুন্দ নিয়ে দিন রাত গোষ্ঠলীলা করতে করতে যে সময় প্রাণটা পরিত্রাহি ডাক ছাড়বে সেই সময়টিতেই যে ঠিক মানভঞ্জনের পালা গাইতে খুব ভাল লাগবে এমন তো ভরসা করা যায় না। তাই ভাবচি ওপরের ঘরগুলো ওঁদের খাসমহল করে দিয়ে তোমার এই নারীবর্জ্জিত গৃহে আস্তানা গেড়ে একবার জিরিয়ে নেওয়া যাবে, নৈলে ত আর পাবা যায় না।"

নীরদ তীক্ষ্ণ শ্লেষের সহিত ব্যঙ্গ করিল, "যো খায়া উওভি পস্তায়া।—আর যো নেহি খায়া—উওভি পস্তায়া। তা ত দেখতে পাচ্চি মশায়! এখন বল দেখি কোথায় যাচ্চ, কোন দেশে?"

নীরদ হঠাৎ ঘামিয়া উঠিল, তাহার বুকের মধ্যে এত জোরে জোরে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল যে তাহার নিশ্বাস আটকাইয়া পড়িবার মত হইয়া আসিল। মাটির দিকে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে মৃদু স্বরে সে উত্তর করিল, "মাপ করো ভাই, আজ আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না।"

যোগেন্দ্র মনে মনে বিস্মিত হইল কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিল "এত লুকোচুরি কিসের বলো তো শুনি? তা যাও যাও যদি সঙ্গিনী-সংগ্রহের ইচ্ছা হয়ে থাকে তো বলে যাও আমি মণিকে দিয়ে বরণডালা সাজিয়ে রাখি। ও কি চমকালে যে? ঠিক ধরেছি নাকি? দেখ আজ তোমায় বলি—শান্তিকে ভালবেসেও তুমি যখন তাকে পাবার চেষ্টা করলে না তখনি আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল যে তোমার আত্মলীলার কোথাও কোন গলদ আছে। কে সে ভাগ্যবতী শুনি এতদিন পরে যার কপাল ফিরলো? নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্ম মেয়ে হবে নৈলে কে আর এখনও আইবুড় বসে আছে। নীরদ নীরদ! ও কি? রাগ কল্লে?" যোগেন্দ্রনাথ সহসা লজ্জাতাড়িত আবেগে এই কথা বলিয়া তাহার হাত ধরিবার জন্য নীরদের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু বন্ধু তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া বেত্রাহতের মত চমকিয়া দ্রুত পদে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সেথায় স্তব্ধভাবে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের অন্ধকার দৃশ্যের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

যদি তাহার বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ তখন হতবুদ্ধি না হইয়া গিয়া উঠিয়া আসিয়া একটা আলো হাতে করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইত, তাহা হইলে তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিত কারণ সে মুখে লজ্জার যে নিবিড় ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে অমার্জ্জনীয় অপ-রাধেরই চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল। যোগেন্দ্র তাহার বন্ধুকে ঠিক দেবতার মত পবিত্র বলিয়া জানে সে যখন জানিবে যে বাস্তবিক সে তাহা নয়!

ক্রমে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া কুয়াশা-

ছন্ন ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছড়াইয়া আকাশে চাঁদ উঠিল, জানালার নীচে টবের মধ্য হইতে চন্দ্রমল্লিকার গন্ধ আসিতে লাগিল, শাখা বিরল সজিনা গাছের উপর হইতে একটা নিশাচর পক্ষী কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করিতে করিতে বাতাসে ডানা মেলিয়া জানালার নিকট দিয়া উড়িয়া গেল।

ধীরে ধীরে নীরদ পূর্ব্বকক্ষে ফিরিয়া আসিল। সে ঘরে যেখানে সে তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল—ঠিক সেইখানটিতে সেই অবস্থায় যোগেন্দ্র তখনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। অনুতাপের গ্লানিতে তাহার মুখ পরিপূর্ণ। নীরদ ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল "যোগেন্ ভাই বলো, বরণডালা সাজাতেই বলো, আমি আমার স্ত্রীকে আনতে যাচ্ছি।" তাহার জিহ্বায় তখন আর একটুও জড়তা ছিল না। যোগেন্দ্রের কণ্ঠ মধ্য হইতে অস্ফুট চীৎকারের মত বাহির হইয়া পড়িল "তোমার স্ত্রী!"

নীরদ উত্তর ক'রল, "হাঁ আমার পরিত্যক্তা অত্যাচারিতা, স্ত্রী শিবানী।" সম্মুখে কোন অশরীরি মূর্ত্তির ছায়া দেখিলে লোকে যেমন চমকিয়া পলাইতে যায় তেমনি ভাবে পিছাইয়া গিয়া অস্ফুট কণ্ঠে যোগেন্দ্র কহিয়া উঠিল, "তবে তুমি, তবে তুমি শান্তির—" পরিত্যক্ত চৌকিখানা সরাইয়া বসিয়া নীরদ স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল "হাঁ। কিন্তু যোগেন ওসব কথা নিয়ে আলোচনা এখন থাক। প্রতিজ্ঞা কর, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি কারু কাছে এ কথা বলবে না?"

প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিতে করিতে যোগেন্দ্র কহিল "আচ্ছা।"

একই।

একই সুরে সবাই বাঁধা
 জান বা আর না জান।
একই তারে সবাই গাথা
 মান বা আর না মান।
একই মরণ, সবাই মরে
 মরতে চাও আর নাই বা চাও।
একই জনম সবাই ধরে
 ধরতে চাও আর নাইবা চাও।
একই কথা সবাই বলে
 ভাষা যতই হোক্ না কো।
এক রাগিণীই সবাই ভাঁজে
 সুরের তফাৎ থাক না কো।

এক জোড়নে সবাই জোড়া
 বাঁধা সবাই এক তাঁতে।
দশার ফেরে যতই ফিরুক
 আগ্-পিছুতে এক সাথে।
এক নিয়মে গড়ছে সবাই
 যতই কর কোলাহল।
ভাঙ্গতে তারে পারবে না কেউ
 কারিকরের এম্নি কল।
একই ধরম একই করম
 একেরই সব কারখানা।
এক ছাড়া দুই নাই রে ও ভাই
 যতই কর কল্পনা।

দো-সতীনা।

হুগলী জেলার অন্তর্গত 'দে পাড়া' একটি ক্ষুদ্রায়তন পল্লীগ্রাম। তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকঘর কর্ম্মকার, কুম্ভকার ও ক্ষৌর-কার মাত্র হিন্দু; অবশিষ্ট সকলে মুসলমান। গ্রামের পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র এবং তার পরেই দুইটি সুপ্রশস্ত পুষ্করিণী পথিকের মনে সুদূর অতীতের কোনো প্রাচীন স্মৃতি স্বতঃই জাগাইয়া তোলে। এই সুবৃহৎ প্রসিদ্ধ সরোবর দুইটিই "দো-সতীনা" নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত। এই পুরাতন বিখ্যাত সরোবর দুইটির সম্বন্ধে যে প্রবাদ-কথা প্রচলিত আছে তাহা ঐতিহাসিক মূল্যরঞ্জিত না হইলেও কৌতূহলোদ্দীপক, ভাবিয়া নিম্নে তাহা প্রকাশিত করিলাম।

প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের নাম ছিল, 'দেবপল্লী', এবং এখানে দেবপাল নামক একজন ভূপতি বাস করিতেন। তাঁহার মাতাপিতার পরিচয় পাওয়া যায় না—তিনি যে কত বৎসর যাবৎ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। রাজা দেবপাল প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তি, তরুণ বয়স ও অসাধারণ রূপলাবণ্য দৃষ্টে লক্ষ্মীকান্ত নামে জনৈক রাজা আপন কন্যা ইলাকে দেবপালের হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। দেবপালও ইলার অপরূপ রূপ-মাধুরী দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইলেন। যথাসময়ে বিবাহের দিনও স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে দেবপাল বরবেশে সুসজ্জিত হইয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণসহ রাজা লক্ষ্মীকান্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রীর দলে পরস্পরে আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল, উভয় পক্ষের অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণের মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রের বিচার ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে, বর সম্প্রদান স্থানে আনীত হইলেন। পুরমহিলারা শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন,—বাহিরে শানাইএর সহিত নহবৎ বাজিতে লাগিল; বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা পীঠোপরি উপবিষ্টা পাত্রীকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনা হইল। পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সম্প্রদানকার্য্য আরম্ভ করিলেন। এমন সময় সহসা রণভেরীর ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই সেইদিকে উৎকর্ণ হইলেন। দেখিতে দেখিতে বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যপাদভরে সম্প্রদান-ভূমি কাঁপিয়া উঠিল। অগণ্য সেনা ভীমরবে সকলের প্রাণে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়া তোরণ-দ্বার হইতে বিবাহ স্থান অবধি দুই সারিতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বিবাহ আর হইতে পারিল না। সৈন্যগণ ইলাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সভাস্থ সকলে চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কাহারো মুখে একটি কথা নাই। ক্ষণকাল পরে বাড়ির ভিতর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল, কয়েকজন দস্যুদলের অনুসন্ধানে ছুটিল। ক্রমে রাত্রি অবসান হইয়া আসিলে, দেবপাল উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা 'মালতী' ও 'মাধবী' নাম্নী ইলার দুই সখীকে লইয়া

গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং যথারীতি তাহাদের দুজনকেই বিবাহ করিলেন। কিন্তু ঐ দুজনের মধ্যে একজনও ব্রাহ্মণকন্যা নহে; একটি কর্ম্মকার ও অপরটি কুম্ভকারের কন্যা। এই কথা প্রচার হইবামাত্র গ্রামস্থ সকলেই দেবপালের উপর অসন্তুষ্ট হইল। অনন্তর রাজা দেবপাল স্বীয় প্রাসাদের পূর্ব্ব প্রান্তে দুইটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইলেন এবং উহার মধ্যস্থলে এক-একটি বাড়ি প্রস্তুত করাইয়া দুই স্ত্রীকে তথায় রাখিলেন। তদবধি ঐ দুই দীঘির নাম "দে'-সতীনা" বলিয়া চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল। অতঃপর কেহই আর দেবপালকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য করিত না এবং তাঁহার সংশ্রবে থাকিলে জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় সেই গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্ব স্ব পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সেই অবধি ঐ গ্রাম ব্রাহ্মণশূন্য হইয়াছে। রাজা দেবপাল দীর্ঘকাল বাঁচিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার কোনো পুত্রকন্যা জন্মে নাই। কালক্রমে ঐ দেবপল্লীর নাম 'দে-পাড়া' হইয়াছে। উক্ত গ্রামবাসীদের নিকট রাজা দেপালের নাম ও অনেক বিচিত্র কাহিনী শুনা যায়। তাহাদের কথিত দেপালই যে সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেবপাল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ এই "দে-সতীনা" দীর্ঘিকা আজ অবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

শারদ-লক্ষ্মী।

পুলক-ঢালা আকাশ-নীলে ছায় কি তব স্পর্শ?
উড়িয়ে-চলা মেঘের কোলে বেড়ায় ছুটে হর্ষ?
ছড়িয়ে-পড়া সোনার রোদে ভাসে মুখের দীপ্তি?
আকাশ বন সমীর চুমি ভায় কি তব তৃপ্তি?
সবুজ ধানে ঢেউ তুলিয়ে বহ কি তুমি বহ গো?
কৃষাণ বধূ পরাণ মধু চুমিয়া তুমি রহ গো?
মদিরঘন শেফালিবাসে বিকাশে হৃদি-বেদনা?
কল-আরাবে কুহরে কি গো মুখর শত কামনা?
পরাণ আজি করুণ বাজি খুঁজিয়া ফিরে তোমারে,
নয়ন-মনে পরশসুখে চাই যে তব দেখা রে?
কপোতগলে বরণ-মালে চকিতে যাও মিলায়ে,
কাশের ফুলে ধরিতে গেলে যাও যে মেঘে পলায়ে!
ফাটিয়ে-টুটা চকিতে-ছুটা তোমার পাব দেখা কি?
বাঁধন-হারা কণাগুলির কোথাও আছে মেলা কি?

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

প্রেম ও মিলন।

প্রেম চায় মিলনের নিবিড় সংযোগ,
অনিবৃত্ত আকাঙ্ক্ষার অবিচ্ছেদ ভোগ;
মিলন কাঁদিয়া ফিরে মরমের মাঝে,—
প্রেম-কণ্ঠে নিরাশার ভগ্নবীণা বাজে!

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

সন্ন্যাসী।

১

ঘাটের ধারে বৃদ্ধ বটগাছের ছায়ায় যে জীর্ণপ্রায় পরিত্যক্ত কুটীর বহুদিন শূন্য পড়িয়াছিল, হঠাৎ একদিন প্রাতে গ্রামবাসীগণ বিস্মিত হইয়া দেখিল, সেখানে এক সন্ন্যাসী!

রং গৌরবর্ণ, মাথায় দীর্ঘ জটা, পরণে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড; এই সন্ন্যাসী একদিনের মধ্যেই সমগ্র গ্রামবাসীর কৌতূহল আকর্ষণ করিল।

সন্ন্যাসী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া সমস্তদিন ধরিয়া হোম করে, মাথার উপর রৌদ্র যখন খর হয় তখনও তাহার বিরতি নাই, এবং সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভোজনের জন্ম তাহার কোন প্রয়োজন বা চেষ্টার লক্ষণ দেখা যায় না।

এত বড় একটা অদ্ভুত প্রাণী সচরাচর মেলে না—বিশেষ এই ললিতগাঁয়ে।

গ্রামবাসীরা সমস্ত দিন তাহার দুয়ারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে বেলা-অবসানেও যখন তাহারা কিছুতে সন্ন্যাসীর লক্ষ্য আকর্ষণ করিতে পারিল না, তখন ফিরিয়া গেল।

২

পরদিন এক বৃদ্ধা আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ডাকিল, "ঠাকুর"—

সন্ন্যাসী কহিল, "কি?"

"আপনি কে আমাদের দয়া করে এখেনে এসেছেন?" সন্ন্যাসী একটু হাসিল, "আপনাদেরই মত মানুষ—বোধ হয় তাও নয়—"

বৃদ্ধা জিভ কাটিল,"অমন কথা বলবেন না—আপনি দেবতা—"

হোমের আগুন লক্ লক্ করিয়া উঠিল, সন্ন্যাসী কহিল, "মা, যাকে তাকে দেবতা বলে পাপের ভাগী করবেন না—দেবতা কি সহজে হয়?"

বৃদ্ধা আর একবার গড় করিল, "একটা কথা বলব?"

সন্ন্যাসী কহিল, "বলুন"—

"আপনার সেবার জন্যে কিছু এনেছি, যদি দয়া করে গ্রহণ করেন"—বলিয়া একথাল অন্ন এবং অন্যান্য ভোজ্য সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাখিল।

সন্ন্যাসীর মুখে আবার হাসি দেখা দিল, "গ্রহণ করব বৈ কি মা! পরের দেওয়া অন্নে আট বৎসর উদর পুর্ত্তি কচ্ছি, আজ আর তা নইলে আমার চলে না।"

সেইদিন হইতে প্রত্যহ গ্রামবাসীগণ সন্ন্যাসীর জন্য অন্ন দিয়া যাইত।

৩

সন্ন্যাসীর কুটির হইতে খানিকটা দূরে জমিদার বিপিনবাবুর বাটি।

নবীন যৌবনে বিপিনবাবুর উদ্দাম চরিত্রের কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর সহসা একদিন কোথা হইতে তিনি কাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া কলিকাতাবাসী হইলেন। চার-পাঁচ বৎসর কলিকাতায় থাকার পর যখন তিনি দেশে ফিরিলেন,—তখন তাঁহার সঙ্গে আসিল তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার ছোট ফুটফুটে মেয়ে মন্দা।

এই বিবাহ সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগ

উঠিয়াছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত অস্ফুট, কারণ বিপিনবাবু জমিদার!

কলিকাতায় যখন বিপিনবাবু ছিলেন তখন দেশের লোকে বাচিয়াছিল—তিনি যখন ফিরিলেন, তখন তাহারা প্রমাদ গণিল।

৪

কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসীর কতকগুলি ভক্ত এবং বন্ধু জুটিয়া গেল। জমিদারকন্যা মন্দা দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত।

দুপুরবেলা একটা ছিন্ন বই হাতে লইয়া মন্দা আসিয়া উপস্থিত, "সন্ন্যাসী ঠাকুর—"

সন্ন্যাসী ধ্যান-মগ্ন ছিল, চোখ খুলিয়া বলিল "মা এসেছ?—এই দুপুর রৌদ্রে ঘুমোলেনা কেন?"

মন্দা প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল "নাঃ,—কত পড়েছি আপনাকে তাই দেখাতে এলাম,—আর একটা জিনিষ এনেছি সন্ন্যাসী ঠাকুর—"

ধ্যান অগত্যা বন্ধ রাখিতে হইল। সন্ন্যাসী কহিল, "কি, দেখি?"

কাপড়ের ভিতর হইতে একটা পুতুল বাহির করিয়া মন্দা কহিল, "এ হচ্ছে বড় বৌ। আরো মেজ বৌ, সেজ বৌ, ন বৌ, ছোট বৌ, ঘরে আছে, নিয়ে আসব?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিল, "না থাক্, আজ আর আন্‌তে হবে না, কাল এ না।"

তখন বড় বৌকে কোলে রাখিয়া মন্দা তার ঘরকন্নার কথা পাড়িল। 'ওদের বাড়ীর কুন্দর ছেলের সহিত বড় বৌএর মেয়ের এই সে দিন বিবাহ হইয়া গেছে—তাতে কত ঘটা কত আমোদ!' ছোট দুইখানি হাত ঘুরাইয়া মন্দা তাহারই কথা বলিতে লাগিল!

সন্ন্যাসীর কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, চোখে জল আসিয়াছিল। এই একটা অবোধ ছোট মেয়ে,—কি জানি কেন এর এত মোহ! সে তার ছোট দুখানি হাতে এমন সুদৃঢ় বন্ধন রচনা করিয়াছে যে, এই দীর্ঘ আট বৎসরের কঠিন সংযমের পরও সন্ন্যাসী সে বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। ওই তার সুন্দর মুখখানি—সে কাহার কথা মনে করাইয়া দেয়! কিসের একটা আভাষ—কিসের একটা স্মৃতি! নদীর জল ছলছল করিতে থাকে, গাছের পাতায় হাওয়া সির্ সির্ করিয়া উঠে, চোখের জল কোন রকম করিয়া ঢাকিয়া সন্ন্যাসী মন্দাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, "যাও মা, বাড়ী যাও, বেলা পড়ে আসছে।"

অনর্গল কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ মন্দা থামিয়া যায়—"সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনার চোখে জল কেন?"

সন্ন্যাসী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে "আমার কি চোখে জল আসে মা? ঐ হোমের আগুনে সব শুকিয়ে গেছে—"

মন্দা গলা জড়াইয়া ধরে "কিন্তু ঐ ত' রয়েছে—!" তখন অশ্রুজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। মন্দার মুখচুম্বন করিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

৫

বাড়ীতে ইহার জন্য মন্দাকে অল্প লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না। তাহার ঠাকুমা দেখিবামাত্র তাহাকে শাসন করিতেন, কহিতেন,

"কোথা গিয়েছিলি রে?"

মন্দা একটা ঢোক গিলিয়া বলিত, "ঘাটের ধারে।"

"সন্ন্যাসীর কাছে বুঝি ?"

মন্দা চুপ করিয়া থাকিত।

তখন ঠাকুমা গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন "এমন মেয়েও ত দেখিনি! সন্ন্যাসীর কাছে দিবারাত্র পড়ে থাকা এমন ত শুনিনি! হতভাগা মেয়ে,—তারা কত কি জানে, তাদের কাছে কি থাকতে আছে,—তারা নজর দিলে অনাছিষ্টি হয়—অসুখ বিসুখ করে দিয়ে মেরে ফেলে,—কতবার বলি—রাক্ষুসী মেয়ে তবু শোনে না!"

মন্দা কহিত "না ঠাকুমা, সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে কত ভালবাসেন, কত গল্প বলেন,—কত আদর করেন—"

ঠাকুমা সভয়ে বলিতেন, "ঐ রে, মেয়েটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিপাকে ফেল্‌বে দেখ্‌ছি—"

সন্ন্যাসীরও বিপদের অন্ত ছিল না। মন্দার মত দুএকটি বন্ধু ছাড়া তাহার অসংখ্য ভক্তও জুটিয়াছিল। সময়ে সময়ে তাহাদের ভক্তিস্রোত যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত তখন সন্ন্যাসী প্রমাদ গণিত।

কিন্তু প্রকৃত বিপদ ছিল এই যে, ভক্তের প্রার্থনা প্রায় ঔষধ-যাচ্ঞারূপেই প্রকাশ পাইত। "সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমার মেজবৌমার হজম হয় না"। "আমার ছেলেটার পিলে হয়েছে", "নাতিটা জ্বর-বিকারে মর মর", "মেয়েটা কেমন রোগা হয়ে যাচ্চে" ইত্যাকার রোগের বিবরণ ও তাহার পর ঔষধ প্রার্থনা, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত —ইহার বিরাম থাকিত না।

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া ভাবিত, চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাহার এ অধিকার কবে হইতে! এতগুলা লোকের বিশ্বাস সে কেমন করিয়া বিনা প্রমাণে জন্মাইয়া দিয়াছে! এবং এ বিশ্বাসের মূলই বা কি?

সে কিছুতেই ঔষধ দিতে সম্মত হইত না, কিন্তু ভক্তেরা নাছোড়বন্দ। অগত্যা প্রত্যেক প্রার্থীকেই একটু করিয়া হোমের ভস্ম দিয়া তুষ্ট করিতে হইত।

তাহার ফল এই হইত, যাহারা বাঁচিবার তাহারা বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতেই সন্ন্যাসীর খ্যাতি বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং ঔষধ-প্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু সব চেয়ে বড় বিপদ হইয়াছিল, মন্দাকে লইয়া। সে এমন করিয়া হৃদয়কে অভিভূত করিয়া দেয় কেন,—সন্ন্যাসীর কঠিন প্রাণকে এমন করিয়া স্নেহ-কোমল প্রেম-আর্দ্র করিয়া দেয়, কিসের মোহে! ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে মন্দার মুখ; মন সমস্ত দিন উন্মুখ হইয়া থাকে, মন্দার লঘু-পদ-শব্দের প্রতীক্ষায়! সংসারের মায়া কাটাইয়া এ কি মায়াবিনীর মোহ-পাশে আজ নূতন করিয়া বন্ধন!

দুই হাত জোড় করিয়া সে কহে "দেবতা আমার! যেমন করিয়া আমাকে সেবার সংসার হ'তে মুক্তি দিয়েছিলে, তেমনি করে এ নতুন বন্ধন কেটে দিয়ে আমাকে তোমার পায়ের তলায় নিয়ে চলো!"

সন্ন্যাসীর চারিপার্শ্বে দেশের লোক যে বিরক্তি এবং মন্দা যে আকর্ষণ গড়িয়া তুলিয়াছিল, সন্ন্যাসী একদিন স্থির করিল তাহা হইতে আপনাকে সেই রাত্রে সে মুক্তি দিবে।

কিন্তু মন্দা! দু'দিন মন্দা আসে নাই, তাই তাহার জন্য প্রাণ ছটফট করিয়াছে! কেন? আজ রাত্রে সে মুক্ত হইবে, বন্ধনহীন হইবে—তবে আর কাহার জন্য চিন্তা। সে আজ চিত্ত দৃঢ় করিয়াছে!

কিন্তু হায়, তবু মন বলে, মন্দা!

৬

সন্ধ্যার সময় বন্দনা শেষ করিয়া সন্ন্যাসী বসিয়াছে। আজ গভীর রাত্রে সে ললিতগাঁ ত্যাগ করিবে।

এমন সময় মন্দার ঠাকুমা আসিয়া প্রণাম করিল, "ঠাকুর, মন্দার বড় অসুখ করেছে, একবার তাকে দেখ্‌বেন চলুন।"

সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিল, "মন্দার অসুখ—কি অসুখ?"

"বসন্ত হয়েছে।"

সন্ন্যাসী কাঠের মত বসিয়া রহিল। এ কি পরীক্ষা! আজ সে যখন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতেছিল, তখন সব চেয়ে কঠিন বন্ধনের কি এ নিদারুণ আকর্ষণ! মন্দা তাহার কেহ নয়, বিশেষ সে চিকিৎসক নহে, কি হবে মন্দাকে দেখিয়া? আর নহে, আবার নূতন করিয়া সে ধরা দিতে রাজী নহে।

"আমি গৃহীর বাড়ীতে যাই না ত আপনাকে আমি এই ছাই দিচ্ছি, এতেই ভাল হবে।"

বৃদ্ধা অনেক অনুনয় করিল, কহিল, "ঠাকুর তোমারই কাছে সে আস্‌ত, এখানেই কি অপরাধ করে সে রোগগ্রস্ত হয়েছে,—তুমি দয়া করলেই সে সেরে উঠ্‌বে—একটিবার চলো।"

সন্ন্যাসী কহিল, "না"—।

৭

হোমের আগুণ নিভিয়া গিয়াছে—এইবার গ্রাম ত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। অদূরে মন্দাদের বাড়ী, একটা ঘর হইতে আলো আসিতেছিল—বোধ হয়, ঐ ঘরে মন্দা আছে।

সেই দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসীর চোখে জল আসিল,—কিন্তু না!

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিল, এইবার সে ললিতগাঁ ও তাহার স্মৃতির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ শেষ করিবে।

এমন সময় কুটিরের দ্বারে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল,—বস্ত্রে সমস্ত দেহ সংবৃত, মুখ খোলা।

বিস্মিত সন্ন্যাসী কহিল, "কে?"

সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রাখিয়া সে কহিল, "কমলা—"

মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসী দশ হাত সরিয়া গেল,—ক্ষীণ আলোকে একবার মুখখানা দেখিয়া লইল—"কমলা?"

বোধ হয় দাঁড়াইবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল—সন্ন্যাসী বসিয়া পড়িল। "এ কি?"

দুই পা বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কমলা কাঁদিতে লাগিল "এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা আমাকে কি পাপের মাঝখানে এনে ফেলেছে—তা তোমাকে কি বলব? তোমার সমস্ত হোমাগ্নির দাহর চেয়ে তীব্র জ্বালা আমাকে দিনরাত্রি পুড়িয়ে মারচে—উপায় নেই,—উপায় নেই—"

সন্ন্যাসী পা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল—"আমাকে স্পর্শ করোনা—"

কমলা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"তোমাকে ছেড়ে এসে অবধি কি চিতার আগুনে আমি পুড়চি তা বলতে পারবো না। সারাজীবন তেমনি পুড়তে হবে; তোমার পায়ের তলায় আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য তার বিরাম হয়েছে,—দয়া করো, এই এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমাকে বঞ্চিত করোনা,—তুমি দেবতা, তোমার স্পর্শ আমাকে ভিক্ষা দাও!"

সন্ন্যাসী কহিল, "আমি এখনি এ গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাব—"

কমলা কহিল "তবে বিলম্ব করোনা—আমার ক্ষমা নেই, আমার অনন্ত নরক, অনন্ত দাহ, জানি, কিন্তু তোমার ঐ ছোট মেয়ে মন্দা, সেই তোমার একমাত্র স্মৃতি, যাকে বুকে করে তোমার কথা মনে করে, প্রাণ জুড়োই,—তা'কে তুমি বাঁচাও, তুমি মনে করলে, তুমি দয়া করলে সে নিশ্চয় বাঁচবে। একমাসের মেয়ে,—তাকে কোলে করে আমি বেরিয়ে ছিলাম—"

সন্ন্যাসী ব্যগ্রভাবে কহিল, "চুপ কর, চুপ কর, সে কাহিনী শুন্‌লে, বাতাস নিশ্চল হবে, গাছপালা শিউরে উঠবে!"

সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রাখিয়া কমলা কহিল, "তবে থাক্। কিন্তু তুমি চলো—তাকে বাঁচাও, দয়া করো, দয়া করো।"

যন্ত্রচালিতের মত সন্ন্যাসী কহিল, "চল"।

৮

মন্দার মাথার শিয়রে আসিয়া যখন সন্ন্যাসী বসিল, তখন মন্দার ঠাকুমা কহিলেন, "ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শুনে অবশেষে যে তুমি মন্দাকে দেখ্‌তে এসেছ, এতেই আমার মনে হচ্ছে, মন্দা নিশ্চয় বাঁচবে।"

সন্ন্যাসী কহিল, "বাঁচবে বৈ কি—বাঁচবে। ভেবেছিলাম আস্‌বনা—কিন্তু মন্দাকে না দেখে থাকতে পারলাম না—"

ঠাকুমা কহিলেন, "তার ওপর এই দয়া চিরকাল রেখো, ঠাকুর।"

সে কি অক্লান্ত সেবা! দিন এবং রাত্রির মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া গেল—বিনিদ্র, নিরলস ভাবে সন্ন্যাসী সাতদিন মন্দার মাথার শিয়রে কাটাইয়া দিল। যে রাত্রে মন্দাকে সে দেখিতে আসে,—সে রাত্রের কথা একটা স্বপ্ন-কাহিনীর মত, ঐ ছোট মেয়ে মন্দা, যে আজ ব্যাধির প্রকোপে সংজ্ঞাহীন, সে তারই, সে সেই ছোট এক মাসের মেয়ে, যে তার ক্রোড়-চ্যুত হয়েছিল! তার ব্রণাঙ্কিত অধরে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চুম্বন দান করে,—সেবার মধ্যে দিবারাত্রি প্রার্থনা করে, "হে ঠাকুর মন্দাকে বাঁচাও, পতিতার, আশ্রয়হীনা কলঙ্কিনীর সেই একটি মাত্র শীতল সান্ত্বনা, একটিমাত্র স্মৃতি! তাকে ফিরিয়ে দাও!"

সাতদিনের পর যখন মন্দা রোগমুক্ত হইল, তখন সন্ন্যাসী বলিল, "এখন তবে যাই!"

ঠাকুমা কহিলেন, "ঠাকুর আপনাকে কি বলব, কি দেবো, জানিনে! আপনি দেবতা।"

সন্ন্যাসী কহিল, "আমাকে আর কিছু দিতে হবে না, শুধু মুক্তি দিন, আর আবার যদি কখনও ফিরি, মন্দাকে দেখ্‌তে দেবেন।"

ঠাকুমা কহিলেন, "মন্দা ত ঠাকুর, আপনারই! আপনি তার প্রাণ দিয়েছেন, সে আর আমাদের নয়। তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে কল্লেই দেখতে পাবেন—এ ত ছোট কথা!"

বিদায়ের সময় মন্দাকে বুকের মধ্যে লইয়া সন্ন্যাসী বার-বার আদর করিতে লাগিল—

ছাড়িতে ইচ্ছা করে না,—তার পর অশ্রুজল রোধ করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইল!

৯

ললিতগাঁ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বাহির হইল,—সমস্ত অঙ্গে নিদারুণ বেদনা! সাত দিন ও রাত্রির পরিশ্রমের জন্য শরীরটা বড়ই অসুস্থ বোধ হইতেছিল—তবু আর একদণ্ড থাকিবে না। স্মৃতি আবার তাহার ভাগ্যে সত্যরূপ ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে—সুতরাং আর না!

ললিতগাঁ হইতে সে বেশী দূর হইবে না, এক ক্রোশের মধ্যেই,—ততদূর গিয়া আর চলিতে পারিল না, একটা গাছের তলায় সন্ন্যাসী বসিয়া পড়িল।

কেন,এমন হইল? আপনার দেহের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী দেখিল, বসন্ত-গুটিকায় সমস্ত দেহ ভরিয়া গিয়াছে!

চোখ বুজিয়া সন্ন্যাসী ভাবিল, "আঃ—এই ত ভাল! আমার মত অভাগার মৃত্যু লোকালয়ে শোভা পেত না, তাই ভগবান মনুষ্যের সম্পর্ক থেকে দূরে এইখেনে আমাকে এনে ফেলেছেন! এখানকার মুক্ত বাতাস, গভীর স্তব্ধতা, এই ত সন্ন্যাসীর মৃত্যুর উপযোগী!"

গাছের একটা শিকড়ে মাথা রাখিয়া সন্ন্যাসী শয়ন করিল।

নিদ্রার মধ্যে,চেতনা-হীনতার মধ্যে একটি মাত্র মুখ ভাসিয়া উঠে, সে মন্দার! সেই একমাসের ছোট মেয়ে মন্দার, তাহার স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়-শায়িতা মন্দার, আটবৎসর পূর্ব্বেকার লতাপাতাঘেরা আনন্দ ও প্রেমোজ্জ্বল গৃহের মন্দার!

১০

কতদিন এমন ভাবে কাটিয়াছিল স্থির নাই। যেদিন সন্ন্যাসী চোখ খুলিল, সেদিন তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া সুনিবিড় হইয়া আসিয়াছিল।

একটা গরুর গাড়ী যাইতেছিল, গাড়োয়ান সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নামিয়া আসিল। ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিল, ললিতগাঁর সেই সন্ন্যাসী যে তাহার গ্রামে আরাম করিয়াছিল।

হাতজোড় করিয়া সে কহিল, "ঠাকুর আপনার এ দশা কেন? আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?"

সন্ন্যাসী কহিল, "দয়া করে যদি একটি কাজ করো। তোমার ঐ গাড়ীতে আমাকে একটু জায়গা দিয়ে ললিতগাঁর বিপিনবাবুর বাড়ীতে পৌঁছে দাও—একবার মন্দাকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছে।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। অতি ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া সন্ন্যাসী রোয়াকে উপবেশন করিল।

ভাল আওয়াজ বাহির হয় না,—কম্পিত-কণ্ঠে সন্ন্যাসী ডাকিল, "মন্দা---ও মন্দা—"

শুনিয়া মন্দার ঠাকুমা মুখ বাড়াইলেন, "ওমা সন্ন্যাসী ঠাকুর যে! বসন্ত হয়েছে দেখছি—এমন অবস্থায় এখেনে এলেন কেন, —ছেলেপুলের বাড়ী—"

সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে কহিল, "একবার মন্দাকে দেখতে এসেছি—"

ঠাকুমা স্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন, "না, না, সে কাহিল, এখন সে উঠতে পারবেনা,—তাকে এখন দেখা হতে পারে না—"

গোলমাল শুনিয়া বিপিনবাবু বাহিরে আসিলেন, "কি হয়েছে ?"

তাঁহার মাতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "একবার মন্দাকে ত ঐ অসুখে ফেলেছিলেন, আবার এই অবস্থায় তাকে দেখতে চান,—কেন, বাপু, তার ওপর এত নজর—"

বিপিন বাবুর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী কহিল, "মরবার আগে একটিবার শুধু চোখের দেখা দেখব—দয়া করুন—"

ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী রোয়াকে শুইয়া পড়িতেছিল।

বিপিনবাবু ক্রোধের ভরে বলিলেন, "না—না, তা হবে না। মন্দা, মন্দা, সমস্ত দিন শুধু মন্দা, মন্দার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ—?"

সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধে চাহিল, "তিনি জানেন!"

আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বিপিনবাবু কহিলেন, "যাও, যাও, ও সব হবে না বল্‌ছি, আমার বাড়ী থেকে বেরোও—"

চোখের জল বাধা মানিল না। "এক-বার, একটিবার, শুধু—তারপর চলে যাবো—"

ক্রোধের তখন পরিসীমা ছিল না, বিপিন-বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তবু যাবে না—দারোয়ান, এই পাগলটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে!"

শুনিয়া সন্ন্যাসী দুই হাতের উপর ভর করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল,—অবলম্বনহীন মস্তক দুই হাতের মাঝখানে ঝুলিয়া পড়িল,—তবু সে চেষ্টা করিতে লাগিল,—এবং অদূরে দরোয়ান আসিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় মন্দার হাত ধরিয়া মন্দার মা সেই কোলাহলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর শির আপনার কোলের উপর রক্ষা করিয়া তাহাকে শয়ন করাইল, তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া নিশ্বাস-সৌরভে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া লইল, এবং তাহার ব্রণাঙ্কিত কপোলে বারবার চুম্বন দান করিয়া কহিল, "ঐ এসেছে, তোমার মন্দা এসেছে,—আমি তাকে এনেছি—"

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া কমলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর মন্দার হাত আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া আবার চোখ বুজিল!

বিস্মিত দর্শকের দল নিস্পন্দ নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া রহিল!

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

জাপানের সহর।

যখন আমরা জাপান যাই তখন মনে করিয়াছিলাম যে তথায় কলিকাতার চেয়েও কত বড় বড় হর্ম্ম্যমালাসুশোভিত নগর দেখিতে পাইব। হয়ত কত গগনভেদী অকটারলোনী মনুমেণ্ট জাপানের নব উচ্চতালাভের পরিচয় প্রদান করিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; হয়ত লাটভবন, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ প্রভৃতির ন্যায় কত বড় বড় মনোহর প্রাসাদশ্রেণী দর্শকের দৃষ্টি স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে! যে জাপান বাস্তবিকই রুষিয়ার ন্যায় একটি ইউরোপের অতি প্রধান শক্তিকে জলে স্থলে পরাভূত করিল, অট্টালিকাগৌরবে ইয়োরোপের কোন

সহরের অসমতুল্য হইবে না ইহাই আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম। যখন আমাদেব জাহাজ ইয়োকোহামা বন্দরে পৌঁছিল এবং সিঙাপুর ছাড়িয়া আমরা ঠিক দুই সপ্তাহ পরে লোকালয়ের দর্শন লাভ করিলাম তখনও জাপানের সহর সম্বন্ধে একেবারে নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হই নাই। প্রকাণ্ড ইয়োকোহামা সহর দেখিয়া মনে করিলাম রাজধানী তোকিও সহর নিশ্চয়ই ইহার চেয়ে অধিক জাঁকাল এবং জাতীয় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক! কিন্তু যখন তোকিও সহরে গিয়া পৌঁছিলাম,তখন পূর্ব্বকল্পনা লোপ পাইতে লাগিল। কয়েকদিন সহরের আদ্যন্ত খুঁজিয়াও চৌরঙ্গী, গড়ের মাঠ, ডালহৌসী-স্কোয়ার প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাইলাম না, আর সে মাড়োয়ারীদেব অত্যুচ্চ আকাশস্পর্শী হর্ম্ম্যরাজিও দেখিতে পাইলাম না। পক্ষান্তরে দেখিতে পাইলাম বাড়ী ঘর ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে, বাস্তা ঘাট তুলিতে অঙ্কিত চিত্রপটের ন্যায়। দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর, লর্ড, রাজমন্ত্রী, ক্রোরপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত দীনদরিদ্র মুটে মজুরও সমভাবে ইডেন গার্ডেনে আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সেখানে ইডেন্-গার্ডেন্ নামে কোন গার্ডেন না থাকিলেও সেইরূপ গার্ডেন এবং পার্ক অনেক আছে। সকলেই এক আসনে উপবেশন করিয়া আলাপ করিতেছে; এবং একই মঞ্চে দাঁড়াইয়া দেশের কথা, দশের কথা এবং প্রকৃতির কথা আলোচনা করিতেছে। আর এক বৈশিষ্ট্য, সহরের ভিতর ছোট বড় অধিকাংশ বাড়ীতে এবং দোকানে ছোটখাট ধরণের কোন জিনিষ প্রস্তুতের কারখানা; আর দেখিলাম সহরতলীর চারিধারেই সারি সারি বড় বড় ফ্যাক্টরীর অসংখ্য চিম্‌নির ধূম মেঘের ন্যায় সূর্য্যরশ্মি-বিকাশ প্রতিবন্ধক জন্মাইতেছে। রাস্তাঘাটে লোকজন কলের মত দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া কাজ করিতেছে। নিভৃত পল্লীগ্রামের লোক কলিকাতায় গিয়া রাস্তায় লোকজনের দ্রুততা দেখিয়া যেমন অবাক হয় তেমনি কলিকাতার লোক জাপানের এই অতিস্ফূর্ত্তিময় ভাব দেখিয়া অবাক না হইয়া থাকিতে পারে না।

কলিকাতার রাস্তায় দলে দলে লোক ছোটে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকের বদনমণ্ডলে যেন বিষাদের ছায়া প্রকটিত। যাঁহারা ভদ্রসন্তান এবং যাহাদের উদরান্নের কথঞ্চিৎ সংস্থান আছে তাঁহারাও উপরওয়ালার তাড়না ও গঞ্জনার ভয়ে বিষণ্ণ স্ফূর্ত্তিহীন মনে আফিসপানে ছুটিতেছে। স্কুল কলেজের ছেলেরাও যেন গারদে বা মসানে যাইবার পথে থরথর করিয়া চলিতেছে। এই স্থলে কবিবর নবীনচন্দ্রের একটি কথা মনে পড়িল। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় করালবদনী নৃমুণ্ড-মালিনী কালিকাদেবীর ন্যায় পরীক্ষারূপ তরবারি দ্বারা সহস্র সহস্র সবলপ্রকৃতি তরুণ যুবকদের মস্তক ছেদন করিতেছে।" তারপর অপর সাধারণ উদরান্নচিন্তাভারগ্রস্ত হইয়া যেন চক্ষে সরিষাফুল নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছে। ভাবনায় সকলেরই স্বাস্থ্য বসিয়া গিয়াছে, হৃদয় দমিয়া পড়িয়াছে। আর জাপানের রাস্তায় সকলকেই যেন রামমূর্ত্তিবৎ দেখিতে পাইলাম। যেমন হৃষ্টপুষ্ট শরীর, তেমনি বদনমণ্ডলে স্ফূর্ত্তি সংজ্ঞাপক

ভাব। অন্ন চিন্তা কাহার নাই? কিন্তু তাহাই তাহাদের প্রধান চিন্তা নহে, জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে সকলেই ব্যস্ত। পশুর ন্যায় শুধু উদরান্নের সংস্থানে মনুষ্য সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, অন্যান্য জন্তুর চেয়ে তাহাদের জীবনের অপর কর্ত্তব্য আছে। তাই তাহারা স্ত্রী পুরুষ সকলেই রাস্তায় ঘাটে কলের ন্যায় দ্রুতভাবে কর্ত্তব সাধনে ব্যস্ত।

জাপানী সহরের ঘবদরজাব দিকে তাকাইয়া দেখিলাম উহা কত সামান্য ধরণেব। কাষ্ঠ নির্ম্মিত একতালা কি দোতালা—বড় জোর কচিৎ দুই একটা তিনতালা দালান দেখিলাম। ইয়োকোহামা এবং কোবে সহব দুটী সমুদ্র-তীরস্থ বড় বন্দর। এই দুই সহরেই বৈদেশিক বণিকদের অত্যন্ত বড় বড় আমদানী রপ্তানীর কারবার রহিয়াছে। তাই এ সহর দুটী অনেকটা ইউরোপীয় সহর অর্থাৎ কতকটা কলিকাতার ধরণের। তোকিও সম্পূণ জাপানী সহর। ইয়োকোহামা এবং কোবে বাদে অন্যান্য সকল সহরই জাপানী সহর। জাপানী সহরে নীরস কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরই প্রাবল্য অধিক। সহরের ভিতর কত পার্ক, গাছপালা এবং বাগান। অনেক সহরের ভিতব ছোট ছোট পাহাড় এবং হ্রদ ও সরিৎ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে ভরিয়া রহিয়াছে। আবার জাপানের অধিকাংশ প্রধান প্রধান সহরের পাদদেশই প্রশান্ত মহাসাগরে বিধৌত হইতেছে, বাস্তবিক জাপান যেন প্রকৃতি দেবীকে আয়ত্তাধীন রাখিবার জন্য নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; প্রকৃতি দেবীও প্রিয় সন্তানগণের মনস্তুষ্টির জন্য প্রতিনিয়ত তাহাদের সম্মুখে নানারূপ বেশভূষায় অলঙ্কৃতা হইয়া বিরাজিতা। জাপানীরা গাছপালা, লতাপাতা, ফুল প্রভৃতির যেরূপ সমাদর করিয়া থাকে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তেমন করে কিনা জানি না। তাহারা সহরের নীরস ক্ষেত্রকেও কুঞ্জবনে পরিণত করিয়া তাহাতে বাস করে, প্রায় সকলেব বাড়ীর সম্মুখেই অন্ততঃ ছোট একটী বাগান আছে। যাহাদের বাড়ীর সম্মুখে বাগানের স্থান নাই তাহারা কতকগুলি টবের সাহায্যে বারেন্দায় অতি ক্ষুদ্র একটী বাগান রচনা কবিয়া রাখে।

জাপানে যে সহরের লোক-সংখ্যা বিশ হাজাবের উপর তাহাকে সি অর্থাৎ নগর এবং তন্নিম্নে মাচি অর্থাৎ সহর বলা হয়। ক্ষুদ্র দেশের তুলনায় জাপানে নগরেব সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। উত্তর দক্ষিণে প্রায় বারশত মাইলের মধ্যে অধিকাংশ প্রধান সহরই আমি দেখিয়াছি। তন্মধ্যে তোকিও, ওসাকা, কিওতো, কোবে, নাগোইয়া, ইয়োকোহামা, ছেনদাই, মোরিওকা, আওমোরি হাকোদাতে, ওতারু, ছাপ্পোরো, ইয়োকোমুকা এবং মোজি বিখ্যাত। নাগাসাকি, হিরোসিমা এবং ওকাইয়ামা সহরত্রয়ও বেশ কারবারী। স্থূল কথা একটী সহর দেখিলেই সকল জাপানী সহরেরই ধারণা করা যায়। জাপানে ৪৬টী জেলা সহর, উহার প্রত্যেকটীর লোক সংখ্যাই প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপব। সংক্ষেপে রাজধানী তোকিও সহরের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ তোকিও উপসাগরের উপর সহরটি অবস্থিত। আয়তনে ৬৪ বর্গ মাইল। জাপান টাইমস্ রিপোর্টে দেখিয়াছি আয়তনে তোকিও সহর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বা-

পেক্ষা বড়; আর তোকিও সহরে দৈনিক তাড়িতের খরচ লণ্ডন অপেক্ষাও অধিক। ঘুরিয়া ফিরিয়া সহরের কূলকিনারা ঠিক পাওয়াও মুস্কিল। কাষ্ঠনির্ম্মিত একতালা বাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সহরের ভিতর কয়েকটি বড় বড় পার্ক আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি পাহাড় আছে। এই সকল কারণে সহরটি অনেক জায়গা জুড়িয়া আছে। সহরের ভিতর দিয়া হুগলী নদীর চেয়ে কিঞ্চিৎ অল্প পরিসর বিশিষ্ট ছুমিদানদী প্রবাহিতা। নদীর দুই তীরেই সহর। চারিটি সেতুর উপর দিয় লোকজন গাড়ী ঘোড়া এবং ট্রাম নদীর অপর তীরে যাতায়াত করিতেছে। ছুমিদানদীর ছোট ছোট শাখা সহরের ভিতরে চলিয়া যাওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। একখানি গ্রন্থে দেখিয়াছি এই সকল খালের উপর দিয়া চলাচলের সুবিধার জন্য তোকিও সহরে ছোট বড় অন্যূন তিন সহস্র সেতু (bridges and culverts) রহিয়াছে। প্রতিদিনই সহরের চতুষ্পার্শ্বের আয়তন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত আদম সুমারীর পর লোকসংখ্যা বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন এখন লোকসংখ্যা একুশ লক্ষের উপর, আমার মনে হয় বিশ লক্ষের কম নহে।

হিরিয়া, শিবা, উয়েনো, আছাকুছা এবং কুদান এই পাঁচটী পার্ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্রাটের বাড়ী এবং হিরিয়া পার্কের মধ্যে কেবল পরিখা মাত্র ব্যবধান। এই পার্ক সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার পাশেই মিকাদোর বাড়ী, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার হাউস্ অব লর্ডস্ এবং হাউস্ অব্ কমন্স্, এবং তোকিও সহরের গবর্ণরের অফিস। নিকটেই সমরবিভাগের অফিস, চেম্বার অব কমার্স, শিক্ষাবিভাগের অফিস, বড় বড় সংবাদপত্র অফিস, পিয়ার্স ক্লাব; ইম্পিরিয়াল হোটেল, নিষ্টল ইউমেন কাইমা অপিস, সেণ্ট্রাল ও শিম্বাসী রেলওয়ে ষ্টেশন এবং বিখ্যাত গিঞ্জা ষ্ট্রীট। পার্কের ভিতরে স্থানে স্থানে বিশ্রামাগার এবং ভোজনালয় রহিয়াছে। রাস্তাগুলি ধব্‌ধবে; কোন যায়গায় ফুলের বাগান আবার কোথাও বা সুন্দর সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী ও কুঞ্জবন। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে নানা রঙের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। ফোয়ারায় জল উঠিতেছে, কোথাও তালে তালে ব্যাণ্ড বাজিতেছে। স্থানে স্থানে যুবকের দল জিমখানাতে ব্যায়াম করিতেছে। কোথাও ব্যাটবল খেলিতেছে। ব্যাটবল জাপানের প্রধান খেলা। ইহারা আমেরিকা হইতে এই খেলার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যে ইহা প্রধান খেলা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আবার স্থানে স্থানে ছোট কৃত্রিম পাহাড়ের উপর বসিবার আসন রহিয়াছে, রাত্রিবেলায় তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত পার্কটী নন্দনকানন বলিয়া মনে হয়। পরিষ্কার দিনে সন্ধ্যাবেলায় বিশেষতঃ বসন্তের সন্ধ্যায় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। রুষ জাপান যুদ্ধের সময় যখন প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন জয়ের সংবাদ আসিতেছিল, পার্কে দিন রাত সমভাবে আনন্দের ছড়াছড়ি চলিত। আমরাও কোন কোন দিন সে আনন্দে যোগ দিতাম। পার্কের চারিধারেই প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ট্রাম চলিয়া থাকে।

হিবিয়া পার্ক হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে শিবা পার্ক, দুই মাইল দূরে উয়েনো পার্ক। শিবা পার্কে কতকগুলি অত্যুচ্চ প্রাচীন বৃক্ষ আছে। ক্ষুদ্র পাহাড়ের একটী স্থান বেশ উঁচু। তাহার উপর একটি ধ্যানস্থ দেবমূর্ত্তি রাখিয়াছে। ঐ উচ্চ স্থানে উঠিলে অদূরে সমুদ্রের দৃশ্য এবং চতুর্দ্দিকস্থ সহরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। শিবাপার্কের দেব মন্দির এবং নিকটবর্ত্তী স্থায়ী প্রদর্শনী (কাঙ্কোবা) বিশেষ বিখ্যাত। শিবার দেব মন্দিরেই সব চেয়ে মূল্যবান প্রস্তর এবং ধাতব পদার্থ রহিয়াছে। সময় সময় সম্রাট এবং সম্রাট পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি তথায় গিয়া থাকেন।

উয়েনো পার্ক একটি দেখিবার জিনিস। উয়েনোপার্কের পাদদেশে হ্রদ। হ্রদ মধ্যস্থ দ্বীপের উপর বিখ্যাত বেস্তেন দেবীর মন্দির,



উয়েনো পার্কের নিকটবর্ত্তী হ্রদ।

বিশ্রামাগার, এবং দ্বীপে যাইবার রাস্তা। পার্কটী অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। উহার একধারে একটী হ্রদ এবং দুই ধারে রেলের রাস্তা আর অপর পার্শ্বে পল্লী। হ্রদের চতুর্দ্দিকে বেড়াইবার প্রশস্ত রাস্তা আছে। জুন মাসে হ্রদের ভিতর পদ্মফুল ফুটিলে সৌন্দর্য্যের তুলনা থাকে না। প্রাতে ও সন্ধ্যায় লোকের ভিড় হইয়া থাকে। এই হ্রদের তীরে জয়মাল্যে ভূষিত প্রত্যাগত মার্শ্যাল ওইয়ামাকে অভ্যর্থনা করা হয়। সে দিন অবিরল বৃষ্টিপাতেও যেরূপ লোক সমাগম দেখিয়াছি জীবনে কোন সমারোহ-ব্যাপারে

তেমনটি দ্বিতীয়বার দেখিব বলিয়া কল্পনাও করিতে পারি না। এই হ্রদের তীরেই যুদ্ধের পর জাপানের বিখ্যাত প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ঐ রাস্তা হ্রদের অপর তীর পর্য্যন্ত প্রস্তর সেতুর সাহায্যে যোগ করা হইয়াছে। উয়েনো পার্কের গাছপালাগুলি বেশ বড় বড়, এখানে সাকুরা বা চেরি পুষ্পের সময় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। চেরি পুষ্প সম্বন্ধে অন্য কোনো সময় লিখিবার আশা রহিল। পার্কের ভিতরে যাদুঘর; চিড়িয়াখানা, ২৫ ফিট উচ্চ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, অনেকগুলি ধর্ম্ম মন্দির, মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার আঙ্গিনা, আর্টস্কুল এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী রহিয়াছে। প্যানোরামা মন্দির সর্ব্বসমক্ষে রুষ জাপান যুদ্ধের জীবন্ত দৃশ্য ধরিয়া আছে। পার্কের নীচেই প্রসিদ্ধ উয়েনো রেল ষ্টেশন। নিকটেই উয়েনো কাঙ্কোবা বা স্থায়ী প্রদর্শনী।

আছাকুছা পার্ক আমোদ-প্রমোদের প্রধান স্থল। তথায় পদস্থ ব্যক্তির ততদূর সমাগম দেখা যায় না। দিন রাত থিয়েটার সার্কাস্, বায়োস্কোপ, পুতুল নাচ, পাখীর



আছাকুছা পার্ক।

গান, কুস্তি, জীবন্ত চিত্র টেব্লো, গেইসা নাচ, নানারূপ জুয়াখেলা, প্যানোরামা দৃশ্য প্রভৃতি দেখিবার জন্য সকালে বিকালে কোন সময়েই জনস্রোতের বিরাম নাই। পর্ব্বদিনে লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। কারণ, ঐ দিন কল কারখানা অফিষ প্রভৃতি বন্ধ থাকায় সকলেরই ছুটি। একটি পুকুরের চতুষ্পার্শ্বে ঐ সকল আমোদ উৎসব হইয়া থাকে। ফোয়ারার পিছনে ক্ষুদ্র মন্দির, অদূরে প্রকাণ্ড এবং বুদ্ধদেবের

এক বিখ্যাত মন্দির। অনেক সময় স্ত্রীলোকে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধার সংখ্যাই অধিক। সকলেই ভক্তি গদগদ চিত্তে হাত জোড় করিয়া নিবিষ্ট মনে পুরোহিত মহাশয়ের উচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য ঐ মন্ত্র স্ত্রীলোকদের কেন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও বুঝিয়া উঠা মুস্কিল; যেহেতু উহা পালি এবং দুর্ব্বোধ্য প্রাচীন জাপানী, কোরিয়ান এবং চীনা ভাষার সংমিশ্রণ। অনেক দিন কলেজের জাপানী বন্ধুদের সহিত আমি মন্দিরে গিয়া দেখিয়াছি ইঁহারাও সে মন্ত্র বোঝেন না। বৃদ্ধারা বুদ্ধদেবের সম্মুখস্থ অগ্নিপাত্রে ধূপ ধুনা নিক্ষেপ করিতেছেন, কেহ বা মোমের বাতি জ্বালাইতেছেন। কেহ কেহ পাইন-বৃক্ষের পল্লব, পুষ্প বিশেষতঃ পদ্মফুল ফলমূল, এবং নানারূপ মিষ্ট দ্রব্যে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন। এবং মাঝে মাঝে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া অস্পষ্টস্বরে কি বলিতেছেন। অনেকেই জানেন যে জাপানীদের নাক চেপটা। ধর্ম্মমন্দিরের স্থানে স্থানে বুদ্ধদেবের যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত অনেককে তাহার নাকের সহিত নিজ নিজ নাক স্পর্শ করাইতে দেখিয়াছি। তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধাদের নিকট শুনিয়াছি সমুন্নত নাকের প্রত্যাশায় প্রাচীন কাল হইতেই জাপানীরা এইরূপ করিয়া আসিতেছে। ফলতঃ এই দাঁড়াইয়াছে যে ঘষিতে ঘষিতে বুদ্ধদেবের নাক একেবারে লোপ পাইয়াছে। এই মন্দিরের অনতিদূরেই জুনিকাই অর্থাৎ বারতালা উচ্চ স্তম্ভের ন্যায় সঙ্কীর্ণ দালান বিশেষ! উহার উপর উঠিলে দূরবীক্ষণের সাহায্যে তোকিও সহরের দৃশ্য অতি বিশাল দেখায়।

হিরিয়া পার্কের বিপরীত দিকে সম্রাটের বাড়ীর অপর পার্শ্বে কুদান পার্ক অবস্থিত। কুদান পার্কের ভিতর একটী মিউজিয়ম আছে। এখানে গত রুষ জাপান এবং চীন জাপান-যুদ্ধে লব্ধ বন্দুক, কামান, তরবারি এমন কি সেনাপতির খাট ও বিছানাপত্র সর্ব্বসাধারণকে দেখাইবার জন্য সুন্দরভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। পার্কের ভিতর প্রসিদ্ধ শিন্তো মন্দির। প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে এই মন্দিরে মৃত সৈনিক পুরুষদের বার্ষিক শ্রাদ্ধ-উৎসব হইয়া থাকে। স্বয়ং সম্রাট সেনাপতিগণ সহ উপস্থিত থাকিয়া প্রথম দিন ক্রিয়া আরম্ভ করেন। তিন দিনে এই ব্যাপার শেষ হয়। দিবসত্রয় প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সেই লোক-সমুদ্রে একবার শরীর ঢালিয়া দিলে যেন পদ-সঞ্চালনের দরকার হয় না; অনায়াসে পার্কের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া যাওয়া যায়। সে তিন দিন তথায় সার্কাস, থিয়েটার প্রভৃতির অবধি নাই। রাত্রে আতস বাজীর মহা ধুম। শোকে অভিভূত হওয়া জাপানে কাপুরুষতার লক্ষণ। মৃতব্যক্তির সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধ দিনে বিশেষতঃ সৈনিকের শ্রাদ্ধে তাহারা আমোদ উৎসব করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে অন্য কোন সময়ে বিস্তারিত লিখিবার ইচ্ছা রহিল। শিন্তো মন্দিরের পশ্চাৎভাগে অন্যান্য পার্কের ন্যায় এ পার্কেও পুকুর ফোয়ারা, কুঞ্জবন প্রভৃতি যথেষ্টই আছে।

এই কয়েকটী উল্লেখযোগ্য পার্ক ছাড়া আরও ছোট ছোট পার্ক যথেষ্ট আছে।

অনেক ভদ্রলোকের বাগানগুলিও কতকটা পার্কের অনুকরণে রচিত। তোকিও সহরের উশিগোম অঞ্চলে বোটানিকাল গার্ডেন আছে। জাপানের সহর গ্রাম সকলই গাছ-পালায় সজ্জিত বলিয়া সর্ব্বত্রই যেন বোটানিকাল গার্ডেন। উশিগোমের বোটানিকাল গার্ডেন, আমাদের শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনের চেয়ে অনেক ছোট। আশ্চর্য্যের বিষয় জাপানের ছাত্রগণ এমন কি মেয়েরা এবং সাধারণ লোক পর্য্যন্ত অনেকে সাধারণ গাছ পালার বোটা-নিকাল শ্রেণী বিভাগ বেশ বুঝিতে পারে।

উয়েনো পার্কের ভিতর যে যাদুঘরের কথার উল্লেখ করিয়াছি উহাই জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুঘর। উহা আমাদের কলিকাতার যাদুঘর অপেক্ষা অনেক ছোট। কলিকাতার যাদুঘর পৃথিবীর মধ্যে একটী উল্লেখ যোগ্য যাদুঘর। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ব্রায়ান সাহেব উহাকে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। জাপানের প্রত্যেক জেলা সহরেই একটী করিয়া যাদুঘর আছে। এক তোকিও সহরেই বলিতে গেলে অনেকগুলি যাদুঘর। উয়েনোর ইম্পিরিয়াল মিউজিয়াম ছাড়া গবর্ণ-মেণ্টের কৃষি এবং বাণিজ্য বিষয়ক একটী মিউজিয়ম (নোশোমুখো) রহিয়াছে। তা ছাড়া সুন্দর সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়ীতে সহরের স্থানে স্থানে কাঙ্কোবা নামক প্রদর্শনীর ন্যায় স্থায়ী বাজার প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অসংখ্য দর্শক এবং ক্রেতাদের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে।

প্রাচীনকাল হইতেই জাপানীরা সামরিক জাতি। আর পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি উহাদের অসাধারণ উচ্চবিশ্বাস এবং অচলা ভক্তি। তাই যাদুঘরের দুই তিনটা ঘর কেবল প্রাচীন তরবারিতেই পূর্ণ। প্রাচীন ধনুর্ব্বাণ প্রাচীন পোষাক, প্রাচীন দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতিতে যাদুঘর সজ্জিত। আধুনিক কলা ও শিল্পবিদ্যা সম্ভূত জিনিসপত্র তথায় অতি অল্প। সে সমস্ত রাস্তাঘাটে ও হাটে-বাজারে সর্ব্বত্রই দ্রষ্টব্য। একস্থলে দুই ব্যক্তির জীর্ণ বস্ত্র এবং টুপি আর তাঁহাদের তৈল চিত্র অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। উহারা উভয়ে ইউরোপে গিয়া সর্ব্বপ্রথম খনিজবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং খনিতে কায করিতে করিতে পাথরের চাপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাই জাতীয় সম্মান প্রদর্শনের জন্য উহাঁদের স্মৃতি সাধারণের সমক্ষে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের কোন ভারতীর বন্ধু বলিয়াছেন, ভারতের তুলনায় জাপান অতি ক্ষুদ্র দেশ অথচ পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যাহা জাপানে নাই! তাই সমগ্র জাপান দেশকে একটী বড় আকারের যাদুঘর মনে করিলেও চলে। সহর কিম্বা গ্রামে পুকুরের সংখ্যা অতি অল্প; নাই বলিলেও চলে। কোন কোন বন্ধু বলেন একে ক্ষুদ্র দেশের ৮৪ ভাগ পাহাড়ে আবৃত তাহার উপর যদি পুকুর খনন করা যায় তবে কৃষি করিবে কোথায়!

মিউজিয়মের অনতিদূরে পার্কের ভিতরই চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু অধিকাংশই বিদেশ হইতে আনীত—যেহেতু জাপানে জীবজন্তুর বৈচিত্র্য এবং সংখ্যা অতি অল্প। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, বানর, ভল্লুক প্রভৃতি গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হইতেই আমদানী করা হয়। শকট পরিচালন এবং কৃষি-

কার্য্যের জন্য গরু এবং ঘোড়া ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনীত হইয়া থাকে। সমগ্র জাপানে তিনটী বই হাতী নাই। আমাদের আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিলে আর জাপানের চিড়িয়াখানায় দেখিবার উপযোগী কিছুই থাকে না। সময় সময় দুই একটী বিশেষ শ্রেণীর জাপানী মোরগ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের পুচ্ছ ১২।১৪ হাত লম্বা। ঐরূপ এক একটী মোরগের দাম নাকি চারি পাঁচ শত টাকা।

তোকিও সহরে বৌদ্ধ ও শিন্তো মন্দিরের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। সাধারণ পার্কে, রাস্তার ধারে নদীর ঘাটে, পাহাড়ের উপর কত যে মন্দির তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজপুতানায় বিকানীর রাজ্যে যেখানে সেখানে মন্দির; কিন্তু জাপানে মন্দিরের সংখ্যা তার চেয়েও ঢের বেশী। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের বাড়ীতে অনেকের ঘরের মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র আয়তনের একটী করিয়া মন্দির আছে। উহা কাষ্ঠে নির্ম্মিত, অনেকটা আমাদের পাখীর খাঁচা বা পিঁজরার মত। প্রতিদিন তথায় ভাতের ভোগ দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় মোমের বাতি জ্বালান হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ সরকার।

চয়ন।

যবদ্বীপে।

বুধবার—১২ ডিসেম্বর

আজ প্রাতে, ছয় ঘটিকার সময়, হোটেলের সম্মুখস্থ উদ্যান হইতে একটি চমৎকার দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল; সম্মুখের সমভূমি হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র স্ফীতোদর পাহাড় উঠিয়াছে, উহার উপর তেঙ্গেরেসের কতকগুলি গ্রাম; তাহার পশ্চাতে জলপ্লাবিত ধানের ক্ষেত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; দক্ষিণে নীল সমুদ্র—পাতলা কুয়াসায় আচ্ছন্ন; বামে, ঈষৎ-ধূসরবর্ণের কুজ্ঝটিকা-জাল প্রসারিত; তাহার পশ্চাতে, বিরাট-দর্শন কৃষ্ণবর্ণ কতকগুলা আগ্নেয়গিরি। বর্ষাকালে, প্রভাতেই কচিৎ-কখন এইরূপ প্রসারিত ভূখণ্ডের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

হোটেলের ঘোড়াগুলা সবই ভাড়া হইয়া গিয়াছে; তাই আজ ব্রোমায় যাওয়া হইল না; কাল যাইব। আজিকার একটা দিন হাতে পাইয়াছি। এই অবসরে তোসারীর আশপাশগুলা পদব্রজে ভ্রমণ করিব। Ngadivono নামক একটি গ্রাম দেখিবার জন্য একজন পাণ্ডা সঙ্গে লইলাম; কিন্তু এই পাণ্ডার পথ দেখাইবার ধরণটা অতি অদ্ভুত; রাস্তার প্রত্যেক চৌমাথায় থামিয়া আমাকে একটা পথ নির্ব্বাচণ করিতে বলে এবং মালাই ভাষায় একটা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ে...হোটেলে ফিরিয়া গিয়া, তাহাকে সেইখানে ছাড়িয়া দিলাম; আমি একলাই হাঁটিয়া চলিলাম।

পর্ব্বতের সুঁড়ি পথগুলি ধরিয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে বড়ই ভাল লাগে। এই সকল গ্রাম ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। তাহার

চারিদিকে বেড়ার ঘের ; কোন কোন গৃহে যেরূপ এক একটা তোরণ আছে, এই ঘেরের মধ্যেও সেইরূপ একটা তোরণ আছে ; এই তোরণদ্বার আড়াআড়ি বাঁশ দিয়া নির্ম্মিত। এখানকার লোকেরা সমভূমির লোক হইতে খুবই তফাৎ ; ইহারা রূঢ় প্রকৃতি বলিষ্ঠ পর্ব্বতবাসী ; উহাদের চালচলনে বেশ একটা তেজ ও বীর্য্যের ভাব লক্ষিত হয়। ইহারা এই গ্রামের চত্বরে ক্রীড়ামোদ করে। আমি একজন অপূর্ব্ব-ধরণের য়ুরোপীয়, পাণ্ডা না লইয়া যেখানে-সেখানে ইচ্ছামত বেড়াইতেছি —আমাকে দেখিয়া উহারা কিছুমাত্র ভয় করিতেছে না। পাহাড়ের ধার দিয়া ছোট ছোট রাস্তা গিয়াছে—সেই সব রাস্তা ধরিয়া আমি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতেছি। ক্ষেতে য়ুরোপ-সুলভ শাকসব্জি জন্মিয়াছে ; তাহার পর, কতকগুলা ভেরাণ্ডা, কতকগুলা পর্ণতুরু, কতকগুলা কলা-গাছ। আমাকে দেখিয়া ভয়ে গণ্ডা পাঁচ কেনারী পাখী তাহাদের ক্ষুদ্র পীত পক্ষ বিস্তার করিয়া ঝাঁ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা সুঁড়ি পথের বাঁকে আসিয়া, একটী স্রোতোস্বিনী পাইলাম। একটি দেশীয় তরুণী তাহার জলে স্নান করিতেছে, আমাকে দেখিয়া একটা চীৎকার শব্দ করিয়া, তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া, ছুটিয়া পলাইল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

আমি তোসাবীতে ফিরিয়া আসিলাম। শাকসব্‌জি বহন করিয়া দুইজন কৃষক-রমণীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা প্রকাণ্ড কালো প্রজাপতি উড়িতেছিল,—উহারা আমাকে দেখাইল এবং মালাই ভাষায় কি বলিতে লাগিল—আমি ফরাসী ভাষায় বলিলাম এইরূপ পরস্পরের সহিত দুই চারিটা কথার বিনিময় হইল, কিন্তু আমরা কেহই কাহার কথা বুঝিলাম না। পরে, হঠাৎ এই হাস্যজনক অবস্থাটা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় আমাদের ভারী মজা লাগিল,—আমরা সকলেই এক সঙ্গে হাসিতে লাগিলাম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দী।

২৪

বেলা দশটা বাজিয়াছে !

আমার মেরির কথা মনে পড়িতেছিল। হা হতভাগিনী কন্যা আমার, আর ছয় ঘণ্টা পরে কোথায় এ পৃথিবী, কোথায় আমি ! হাঁসপাতালের টেবিলে একটা কদর্য্য মাংসপিণ্ডের মত আমি পড়িয়া রহিব। দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া তবে তাঁহারা আমাকে মুক্তি দিবে ! তারপর সেই টুকরা-টুকরা মাংস ও অস্থিগুলা ধরণীর কোলে বিছাইয়া দিবে—তবে আমার ছুটি মিলিবে ! হায় মেরি, তোমার পিতার জীবনের এ কি পরিণাম !

অথচ এখানে কেহ আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না ! করুণায় সকলের প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে ! যত্ন বা সেবার এতটুকু

ত্রুটি নাই! তবু আমাকে বাঁচিতে দিবে না! করুণা—কিন্তু এ কি নির্ম্মম তার বিধি! আমাকে হত্যা করিবে—কিছুতে ছাড়িবে না!

বেচারী মেরি আমার! পিতার সে কি ভালবাসা তোমাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল, তার সে কি মধুর চুম্বনে তুমি তৃপ্তি পাইতে, তোমার ঐ কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছে মৃদু দোল দিয়া পিতা সে কি আদর করিত—ফুলের মত তোমার কচি নরম মুখখানি হাসিতে নিত্য ভরিয়া রহিত—আনন্দের কলহাস্যে সারা গৃহে সে কি বিচিত্র সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিত, তার পর নিদ্রার পূর্ব্বে ছোট হাতদুটিতে মুঠি ভরিয়া পিতার সহিত বিধাতার বন্দনা-গীতে যোগ দিয়া দিনের সকল শ্রান্তি, সকল তাপ ঘুচাইয়া দিতে—কি সে আবেগপূর্ণ আন্তরিক আরাধনা! এমন সুখের স্বাদ আর কে পাইয়াছে—কিন্তু হায়,আজ সে সব যেন স্বপ্ন! হায় বালিকা, তেমন করিয়া তোমাকে বুকে তুলিয়া কে আর অজস্র চুমায় তোমার ছোট মুখখানি ভরাইয়া দিবে—তেমন ভাল আর কে বাসিবে! সবার গৃহে ছোট ছেলে মেয়ে গুলি যখন সুখে-দুঃখে উৎসবে-আনন্দে পিতার আদরে নাচিয়া মাতিয়া উঠিবে, তখন তোমরা আঁখির কোণ শুধু জলে ভরিয়া উঠিবে—গভীর বেদনার তাপে তোমার ঢলঢল মুখখানি শুখাইয়া যাইবে ম্লান নেত্রে সবার পানে চাহিয়াই তোমার দিন কাটিবে! বৎসরের প্রথম দিনে না আছে কোন উপহার, না আছে পিতার আদর! নাই, কিছু নাই, হা রে অভাগিনী, স্নেহকাঙ্গালিনী, তোর হৃদয় স্নেহের তৃষায় আকুল তৃষিত হইয়া উঠিবে—কিন্তু তার পরিতৃপ্তির কোন আশা থাকিবে না! পিতৃহারা অনাথিনী মেরি!

জুরির দল একবার যদি আমার মেরিকে দেখিত, তাহা হইলে এ মৃত্যুদণ্ড দিবার পূর্ব্বে আমার কথাটা একটুও বুঝি তারা বিবেচনা করিত! তিন বৎসরের অবোধ সে বালিকা! তবু তার সাশ্রু নেত্র দেখিয়া তাদের কঠোর চিত্ত নিশ্চয় চঞ্চল হইত! সন্দেহ নাই, কোন সন্দেহ নাই! আমার মেরি,—তার দুঃখ দেখিলে কার না প্রাণ ফাটিয়া যায়!

মেরি! যখন তার বয়স বাড়িবে, জ্ঞান হইবে, সকল কথা বুঝিবার তার শক্তি হইবে, তখন কোথায় আমি! সারা প্যারিস একটা কলঙ্কিত স্মৃতি মাত্র। আমার নামে তার প্রাণ কি শিহরিয়া উঠিবে না! আমার নামে জীবনের যত দুর্দ্দৈব, যত লজ্জা, নিমেষে তার অন্তরে কি জাগিয়া উঠিবে না! লোকের ঘৃণায় তার সমস্ত জীবন কি এক অসহ্য জ্বালায় ভরিয়া যাইবে! মেরি, আদরিণী মেরি আমার—পিতার নামে একবিন্দু অশ্রুর পরিবর্ত্তে কি তোমার চক্ষু বীভৎস ঘৃণার দাহ বর্ষণ করিবে! না, মেরি, না, একবিন্দু অশ্রু দিও! শুধু একবিন্দু মাত্র! হা ভগবান, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, পাপ করিয়াছি যে, সমাজ আজ এমন একটা গুরুতর অপরাধ ও পাপে তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছে!

আজিকার সূর্য্য যখন অস্ত যাইবে—তখন কোথায় আমি! এ পৃথিবীতে সকল অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি! আজ আমার জীবনের শেষ দিন! ইহা কি সত্য? স্বপ্ন নয়?

বাহিরে অস্পষ্ট একটা কি কোলাহল! আমারি মৃত্যু দেখিবার জন্য সকলে বুঝি ছুটিয়া চলিয়াছে! কৌতূহলী দর্শক, স্পদ্ধিত প্রহরী, সজ্জিত আচার্য্য—আমাকে দেখিবার জন্যই সকলের এত আগ্রহ! মৃত্যু তবে সত্যই আজ আমাকে গ্রহণ করিবে! আমাকে—? যে আমি বসিয়া রহিয়াছি, নিশ্বাস ফেলিতেছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি, বায়ু-স্পর্শ অনুভব করিতেছি—সেই আমি এখনই মরিব!

২৫

এ ব্যাপারখানা আমারো কিছু জানা আছে! প্লে দি গ্রীভের পাশ দিয়া যাইতে-ছিলাম—সে আজ বহুদিনের কথা! বেলা তখন এগারোটা বাজিয়াছিল! সহসা আমার গাড়ী থামিয়া পড়িল।

পথে বিস্তর লোক জমিয়াছিল। গাড়ীর মধ্য হইতে আমি মাথা বাহির করিয়া দেখি, আবালবৃদ্ধবনিতায় সারা পথ ভরিয়া গিয়াছে! নরশিরের সংখ্যা ছিল না! গৃহের প্রাচীর, বৃক্ষচূড়া কোন স্থান বাদ যায় নাই! এবং অদূরে ঊর্দ্ধে স্থাপিত—ফাঁসিকাঠও দেখা যাইতেছিল! ফাঁসির সকল সরঞ্জামই প্রস্তুত ছিল!

আজও সেইদিন! কিন্তু আজ আমি দর্শক নই, আজ আমাকে দেখিবার জন্যই সেখানে তেমনি লোক জমিয়াছে!

একটী রজ্জুকে অবলম্বন করিব—নিমেষে অমনি কি বিরাট অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া পড়িব! জমাট অন্ধকার! তারপর—

আঃ, একখণ্ড প্রস্তর যদি কুড়াইয়া পাই, ত তারি আঘাতে এখনি মস্তকটা চূর্ণ করিয়া ফেলি!

২৬

মার্জ্জনা! ওগো, মার্জ্জনা! আমায় মার্জ্জনা কর! হয়ত আমি মুক্তি পাইব! রাজার প্রাণ করুণায় গলিবে—মার্জ্জনার আজ্ঞা বহিয়া এখনি দূত ছুটিয়া আসিবে! শীঘ্র—শীঘ্র এসো! তখন এই সমস্ত অন্ধকার চকিতে মুছিয়া যাইবে—এবং কি সে তীব্র দীপ্ত মুক্ত আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিব! জয়ের সে কি বিকট উল্লাসে সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিবে!

আমায় প্রাণ ভিক্ষা দাও! ওগো, স্নেহমায়াভরা এমন সুন্দর পৃথিবী,—প্রাণ যে ছাড়িতে চাহে না! আমায় রক্ষা কর! ওগো, তপ্ত লৌহশলাকায় সর্ব্বদেহ আমার বিঁধিয়া দাও—লোকালয়ে প্রবেশ করিতে দিও না—বিশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর জেলে রাখিয়া দাও, শুধু এই সূর্য্যের আলো আকাশ বাতাস হইতে বঞ্চিত করিও না—বন্দী যে,সে-ও চলে, দেখে, ভাবে, কথা কয়, সে-ও সুখী! শুধু এই প্রাণটা ভিক্ষা দাও,—আর আমার কোন প্রার্থনা নাই!

২৭

আচার্য্য ফিরিয়া আসিল। তাঁর পলিত কেশ, শান্ত কথাবার্ত্তা, নম্র প্রকৃতি। শ্রদ্ধার যোগ্য পাত্র বটে।

আজই সকালে আপনার সমস্ত জ্ঞান বন্দীর দলে তাঁহাকে বিতরণ করিতে দেখিয়াছি! কিন্তু আমার তাহাতে কি লাভ! তাঁর কথার দিকে আমার মনই ছিল না! বৃষ্টির জল সার্শির গায় লাগিয়া যেমন ঝরিয়া পিছলাইয়া

যায়, আমার মনে লাগিয়া তাঁহার অমূল্য-বাণীও তেমন পিছলাইয়া যাইতেছিল!

তবু তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণটা যেন জুড়াইল! চারিধারে এই পরুষ রুক্ষতার মধ্যে তিনি যেন কি এক আনন্দশ্রী বিকশিত করিয়া দিলেন!

আমরা বসিলাম—তিনি চেয়ারে এবং আমি আমার সেই জীর্ণ শয্যার উপর।

"ভাই!" তিনি কহিলেন—কথাটা আমার হৃদয়ে বিঁধিল! তিনি কহিলেন, "ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস আছে কি?"

আমি কহিলাম, "আছে।"

"এই যে উদার ক্যাথলিক ধর্ম্ম—ইহার প্রতি তোমার ভক্তি আছে?"

আমি কহিলাম, "নিশ্চয় আছে।"

"তবে শোন।" আচার্য্য বলিতে লাগিলেন! কি বলিতেছিলেন তাহা আমার মনে নাই, কতক্ষণ বলিতেছিলেন তাহাও জানি না! আমি অন্যদিকে চাহিয়াছিলাম—সহসা তিনি কহিলেন, "কি?" আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। কহিলাম, "অনুগ্রহ করে আমাকে একলা থাকতে দিন। আমার কিছু ভাল লাগছেনা।"

"কখন আসব আমি, বল।"

"খবর দেব'খন।"

তিনি উঠিলেন, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "নাস্তিক।"

নাস্তিক! না—যতই কেন হীন হই না আমি, তবু নাস্তিক নই! ভগবান জানেন তাঁর প্রতি কি গভীর আমার বিশ্বাস! কিন্তু এ আচার্য্য আর নূতন এমন কি কথা বলিবে! আমার সংক্ষুব্ধ আত্মা যাহা পাইয়া পূর্ণ তৃপ্তি পাইবে, তাহা দিতে ইহার সামর্থ্যই বা কোথা? কতকগুলা বাঁধা গৎ বকিয়া শুধু অস্থির করিবে মাত্র!

খুনী ও ডাকাতের সম্মুখে মুখস্থ বিদ্যা জাহির করা যাহার পেশা, ক্ষুব্ধ আত্মাকে শান্তি দিবার চেষ্টা করা, তার পক্ষে ধৃষ্টতা! ভগবানের নাম লইয়া কি এ শ্ব-বৃত্তি? বিধাতার নামে এমন পরিহাস! অথচ ইহাই রাজধর্ম্মে অনুমোদিত হইয়া কতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে! আশ্চর্য্য!

কিন্তু এই বৃদ্ধ আচার্য্য! ইহারই বা দোষ কি? কি তার শিক্ষা, কি তার জ্ঞান? তুচ্ছ কয়টা মুদ্রার জন্য সে এই কাজ করিতেছে! ইহাই তার জীবিকার অবলম্বন,—নহিলে উদরপূর্ত্তি হয় না যে! এমন অশ্রদ্ধা দেখানোটা আমার পক্ষে উচিত হয় নাই! কিন্তু উপায় নাই! আমার নিশ্বাস-বায়ুস্পর্শে চারিধার জ্বলিয়া যাইতেছে, মুখের কথায় বিষ বাহির হইতেছে, আমি ত উপলক্ষ্যমাত্র, ভবিতব্য কঠিন!

প্রহরী আমার জন্য নানাবিধ আহার লইয়া আসিয়াছে! ইহজীবনের মত একবার বাসনা মিটাইয়া খাইয়া লইতে হইবে। যথেষ্ট হইয়াছে! এমন কদর্য্য ঘৃণা, এমন হীনতা আর গলাধঃকরণ করা যায় না!

২৮

একটা লোক,—মাথায় টুপি—হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত! ব্যস্ত ভাব, কোনদিকে তার লক্ষ্য নাই! হাতে গজের ফিতা ও কাগজপত্রের বাণ্ডিল! আসিয়াই সে দেয়াল মাপিতে লাগিল! 'আচ্ছা'—'পাঁচফুট' এখানটা বদলানো

দরকার' প্রভৃতি নানা কথা আপনার মনেই সে বকিয়া যাইতে লাগিল।

প্রহরীর মুখে শুনিলাম, সে একজন কণ্ট্রাক্টর! কারাগৃহের সংস্কার হইবে, তাই সে মাপ করিতে আসিয়াছে!

কাজ শেষ হইলে সে আমাকে কহিল, "আপনার বুঝি আজ ফাঁসি হবে—আহা!"

আমি উত্তর দিলাম না। সে আমার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

সে কহিল, "ছ'মাস পরে এ জেল আর চেনা যাবে না, এর আগাগোড়া বদল হয়ে যাবে, আর কি জমকালো রকমই না সে দেখতে হবে।"

অর্থাৎ তার কথার মর্ম্ম,—আমি নিতান্তই বেচারা, এমন কাণ্ড দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটিবে না—।

তার মুখে কাষ্ঠ হাসি দেখা দিল। প্রহরী তাহাকে কহিল, "এখানে দাঁড়াবার হুকুম নাই! আপনার কাজ হয়ে থাকে যদি ত, বাহিরে গেলে ভালো হয়!"

সে চলিয়া গেল। আর আমি—যে পাষাণ-দেয়াল সে ফিতা লইয়া মাপিতেছিল—সেই পাষাণ দেয়ালেরই মত নিশ্চল মূক হইয়া বসিয়া রহিলাম।

২৯

এমন সময় এক মজার কাণ্ড ঘটিল। প্রহরী বদল হইল। নূতন প্রহরীর অসভ্য-ভাব-ভঙ্গী, বিশ্রী চেহারা, কর্কশ স্বর! যেন যমদূত!

প্রহরী কহিল, "ওহে, তোমার মনে দয়া-মায়া কিছু আছে কি, ভাই?" আমি কহিলাম, "না!"

আমার স্বরে একটা তীক্ষ্ণতা ছিল—কিন্তু সে হঠিবার পাত্র নহে। সে কহিল, "বলি, একটা কথা, শোনই না!"

আমি কহিলাম, "অত রসিকতা আমার সহ্য হবে না।"

সে কহিল,"আমি বড় দুঃখী, ভাই, নেহাৎ হতভাগা। তুমি একটু দয়া করলে যদি ভালো হয় ত,কর না! চিরদিন আমি কৃতজ্ঞ থাকব!"

চিরদিন! আমার সে 'চির' ত সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ফুরাইয়া যাইবে! আমি কহিলাম, "তুমি কি পাগল? তোমার সুখদুঃখের খোঁজ নিয়ে আমি মিছে মাথা ঘামাই কেন?"

তবু সে ছাড়িবে না—কহিল, "বলি শোনইনা কথাটা!" তার পর চারিধারে চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে সে কহিতে লাগিল, "দেখ দাদা, আমার যা কিছু সুখ, যা কিছু ভালো, তা তোমারি হাতে নির্ভর কচ্ছে! নেহাৎ গরীব আমি—এ কাজে কি পরিশ্রম, আর মাহিনাটা কি কম! এর উপর আবার নিজের খরচে একটা ঘোড়া রাখতে হয়! চাকরির সুখ কত! তাই বুঝেই, ভাই, লটারির টিকিটটা আসটা মাঝে-মাঝে আমি কিনি! জীবনে একটা কিছু করা চাই ত! কিন্তু এই যে আজ সাত-আট বৎসর লটারিতে এত টাকা দিচ্ছি, তা এ ত লটারিতে নয়, সব জলে দিচ্ছি! আমার নম্বর যদি হয়, ৭৬, ত ঠিক ৭৭ নম্বরের টিকিট টাকা পেয়ে বসে আছে। আবার যদি দেখে-শুনে ৭৭ নম্বরের টিকিট কিনি ত, হয় ৭৬ নম্বর, নয় ৭৮ নম্বর টাকা পায়! বরাত দেখ না! তাই মনে করেছি কি জানো?" কথাটা বলিয়া সে আমার দিকে চাহিল। আমি কহিলাম, "কি মনে করেছ?"

সে কহিল,—"তাই মনে করছি একটা সুবিধা হতে পারে তোমা হতে।"

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কহিলাম, "আমা হতে সুবিধা ?"

সে কহিল, "হাঁ, দাদা সে তোমারি হাত। দেখ,মানুষ মরে গেলে ভূতভবিষ্যত সব দেখতে পায়, তা তুমি ত এই ক'ঘণ্টা পরেই মবচ, তাই বলছি কি, জানো, আমাকে যদি ঐ ঠিক নম্বরটি বলে দাও ত আমি সেই নম্বরের টিকিট-খানি কিনি! বেশ দু পয়সা তা হলে হাতেও আসে! রাতারাতি বড়মানুষ হয়ে পড়ি,আর এই লক্ষীছাড়া চাকরি ছেড়ে বাঁচি—ভূতকে আমি ভয় করি না, বুঝলে কি না—কোন বাধা নাই! আমার নাম কাসেঁ পাঁপিকুর! বি নম্বর ঘর, ২৬ নম্বর বিছানা—মনে থাকবে ত? আজই সন্ধ্যার পর তা হলে বলে দিও, দাদা। দোহাই তোমার।"

এ কথার আমি উত্তর দিতাম না—প্রবৃত্তি ছিল না—কিন্তু একটা উন্মদ আশা আমার মনে জাগিয়া উঠিল—একবার শেষ চেষ্টা! আমি কহিলাম, "দেখ, তুমি টাকা চাও ?"

"হাঁ, দাদা! আর পয়সার দুঃখ ভোগ করতে পারিনে!"

আমি কহিলাম, "বেশ—আমি তোমাকে রাজার ঐশ্বর্য্য দেব, অগাধ টাকা যদি এক কাজ করতে পার!"

তার চোখ যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে কহিল, "বল, আমি এখনি করব—যত বড় শক্ত সে কাজ হোক, তবু পেছুবো না।"

আমি কহিলাম, "শুধু আমাদের পোষাক বদল করতে হবে, ব্যস—আর কিছু নয়!"

"এই কাজ! ওঃ, এখনি রাজী আছি।" বলিয়াই সে জামার বোতাম খুলিতে লাগিল।

ক্ষিপ্র গতিতে আমি উঠিলাম। বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল। আর একমুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—এখনি সব পণ্ড হইবে! আঃ, ভগবান, ধন্য তুমি! নিমেষে আমি দেখিলাম, আমার সম্মুখে আগাগোড়া সমস্ত দ্বার মুক্ত—কোথাও বাধা নাই, বন্ধ নাই—মুক্ত আকাশতলে আবার আমি দাঁড়াইয়াছি—মাথার উপর পাখীর দল উড়িয়া চলিয়াছে, স্নিগ্ধ শীতল বায়ুর স্পর্শ অবধি যেন আমি স্পষ্ট অনুভব করিলাম,—সে এক সম্পূর্ণ নূতন জীবন!

সহসা প্রহরীটা থমকিয়া গেল—কহিল, "ওহো! বুঝেছি তোমার মতলবখানা—তুমি পালিয়ে যেতে চাও ?"

একটা ঢোক গিলিয়া আমি কহিলাম, "তাইত চাই, নইলে তোমাকে টাকা দেব কি করে ?"

প্রহরী জামার বোতাম আঁটিতে লাগিল। আমার অন্তরের মধ্য দিয়া একটা তীব্র বিদ্যুৎ শিখা বহিয়া গেল—মাথায় রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল।

সে কহিল, "না—তা কি হয়? ও সব হাঙ্গামায় আমি নাই—মরে তুমি টাকার কিনারা করো ভাই, যেমন বললুম—এ রকম পালিয়ে—আরে না—না।"

আমি বসিয়া পড়িলাম—আমার পা টলিতেছিল! আশা নাই—কোন আশা নাই! নিরাশার সুগভীর বেদনায় আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

দ্বিতীয় ভাগ।

ভারতবর্ষের অনেকগুলি নাম আছে। পূর্ব্বে ইহাকে সিণ্টু নামে অভিহিত করা হইত। কেহ কেহ ইহাকে হিয়েনটোও বলিত। কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম হইতেছে ইণ্টু। নিজ নিজ জিলা অনুযায়ী ইণ্টু দেশীয় লোকেরা ইহার নামকরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশের আচার ব্যবহার বিভিন্ন প্রকারের। চীন ভাষায় ইণ্টু অর্থে চন্দ্র।

ভারতবর্ষের ব্যক্তিগণ বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কৌলীন্য ও চরিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি ব্রাহ্মণদের কাহিনী পবিত্রতাপূর্ণ করিয়াছে। জনসাধারণে ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মণদের দেশ এইরূপ বলিয়া থাকে।

পরিমাণ, জলবায়ু প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ নামক পরিচিত দেশগুলি পঞ্চসিন্ধু নামে কথিত হইয়া থাকে। এই দেশের পরিধি ৯০,০০০ লি; ইহার তিন দিকেই সুবিশাল সাগর এবং ইহার উত্তরে তুষার পর্ব্বত। ইহার উত্তরাংশ প্রশস্ত, দক্ষিণাংশ সঙ্কীর্ণ। দেখিতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি। সমগ্র দেশটী ৭০ কি ততোধিক প্রদেশ বিভক্ত। ঋতুগুলি অত্যন্ত উষ্ণ; ভারতভূমি সুজলা এবং আর্দ্র। উত্তরাংশ উপত্যকাপূর্ণ ও সমতল। এই সকল উপত্যকা ও সমতল ক্ষেত্রগুলি সুজলা ও কর্ষিত বলিয়া উর্ব্বর ও ফলোৎপাদক দক্ষিণাংশ বনরাজি ও শাক পরিপূর্ণ। পশ্চিমাংশ কঙ্করময় এবং অনুর্ব্বর

ভারতবর্ষের পরিমাপ লইতে হইলে প্রথমে যোজন গণনা করা হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সৈন্যদের একদিনের কুচকে যোজন বলে। পুরাতন পুস্তকাদিতে ৪০ লিতে এক যোজন এইরূপ দেখা যায়। সাধারণতঃ ৩০লিতে এক যোজন পরিগণিত করা হয়—কিন্তু ধর্ম্ম পুস্তকে দেখা যায় যে ১৬ লিতে এক যোজন হয়। আট ক্রোশে এক যোজন। গরুর ডাক যতদূর হইতে কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে সেই দূরত্বকে ক্রোশ বলে। এক ক্রোশে ৫০০ শত ধনু। চার হাতে এক ধনু এবং ২৪ অঙ্গুলিতে এক হস্ত হয়। ৭ যবে এক অঙ্গুলি এবং এই প্রকারে আরও নানাপ্রকার পরিমাপের প্রণালী আছে। ইহার পরে আবার অণু ও পরমাণু আছে।

জ্যোতিষ, পঞ্জিকা ইত্যাদি।

সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সময়কে ক্ষণ বলে। একশত বিশ ক্ষণে তৎক্ষণ; ৬০ তৎক্ষণে এক পল, ৩০ পলে এক মুহূর্ত্ত এবং ৫ মুহূর্ত্তে কাল এবং ৬ কালে এক অহোরাত্র হয়। সাধারণতঃ দিবারাত্রি আট-কালে বিভক্ত করা হয়। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যাকে কৃষ্ণপক্ষ বলা হয়। চৌদ্দ কি পনের দিনে কৃষ্ণপক্ষ হয়—কেননা মাস কখন দীর্ঘ কখন ছোট হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষ ও তৎপরবর্ত্তী শুক্লপক্ষ লইয়া একমাস। ছয় মাসে দুই অয়ন। সূর্য্য যখন বিষবরেখার মধ্যবর্ত্তী থাকে তখন ইহাকে উত্তরায়ন ও বহির্ভাগে থাকিলে দক্ষিণায়ন বলে এই দুই অয়ন লইয়া এক বৎসর পরিগণিত হয়।

বৎসর ছয় ঋতুতে বিভক্ত। প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে তৃতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল; তৃতীয় মাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত পূর্ণ গ্রীষ্মকাল; পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত বর্ষাকাল। সপ্তম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শস্যবৃদ্ধিকাল। নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে একাদশ মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শীত ঋতুর প্রারম্ভকাল ও একাদশ মাসের ষোড়শ দিন হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পূর্ণ শীতকাল।

তথাগতের শাস্ত্রানুযায়ী বৎসরে মাত্র ৩টী ঋতু। প্রথমমাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মঋতু। পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত বর্ষাঋতু ও নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ

দিবস পর্য্যন্ত শীত ঋতু। আবার চারিঋতুও কথিত হইয়া থাকে—বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত। বসন্তের মাস হইতেছে চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে চতুর্থ মাসের পঞ্চদশ দিবসের সহিত এই মাসত্রয়ের ঐক্য দেখা যায়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রপদ মাস লইয়া গ্রীষ্মকাল। চতুর্থ মাসের ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এই গ্রীষ্মকালের ঐক্য দেখা যায়। আশ্বিন কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ এই তিনমাস লইয়া হেমন্ত। সপ্তম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে দশম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত সময়ের ঐক্য আছে। পৌষ, মাঘ, এবং ফাল্গুন --এই কয়মাস শীতকাল। দশম মাসের ষোড়শ দিন হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এই কাল। পুরাকালে পুরোহিতগণ বুদ্ধদেবের নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া বর্ষাকালে দুইবার বিশ্রাম করিতেন *—প্রথম তিনমাস অথবা শেষ তিন মাস। সূত্র ও বিনয় অনুবাদকারীগণ—এই বিষয় শুদ্ধরূপে অনুধাবন করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই যে সামন্ত প্রদেশের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ মধ্যপ্রদেশের ভাষা বোধগম্য করিতে পারিত না। এবং এই কারণেই তথাগতের জন্ম, গৃহত্যাগ, নির্ব্বাণ প্রভৃতির সঠিক সময় নির্দ্ধারিত হইয়া উঠে নাই।

নগর ইত্যাদি।

নগর ও গ্রামের মধ্যে দরজা আছে। প্রাচীর উচ্চ ও প্রশস্ত। পথ ও উপপথ সকল পাকানো এবং রাজপথগুলি ঘোরানো। পথগুলি অপরিষ্কার এবং ইহাদের পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণিগুলি যথাযোগ্য চিহ্নে শোভিত। কসাই, মৎস্যজীবি, নর্ত্তক নর্ত্তকী, জল্লাদ ও সম্মার্জ্জক প্রভৃতির বাস নগরের বহির্ভাগে। ইহাদিগকে রাজপথের বামপার্শ্ব দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। ইহাদের গৃহাদি অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এবং উপনগর বলিয়া খ্যাত। মৃত্তিকা নরম ও কর্দ্দমময় বলিয়া নগরের প্রাচীরগুলি ইষ্টক বা টালী দ্বারা প্রস্তুত। প্রাচীরের উপরিস্থ প্রাসাদগুলি কাষ্ঠ বা বংশনির্ম্মিত গৃহাদিতে বারান্দা ও আমোদগৃহ আছে। এইগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত। তবে ইহাদের বহির্দ্দেশে চুণ বা সুরকীর আস্তরণ থাকে এবং ছাদ ইষ্টকের। চীনের ন্যায় তৃণ, শুষ্ক শাখা, টালি বা কাষ্ঠ ছাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। দেওয়ালগুলি চুণ ও কর্দ্দমলিপ্ত এবং পবিত্রতার জন্য গোময়ও মিশ্রিত হইয়া থাকে।

সঙ্ঘারামগুলির নির্ম্মাণ কৌশল অত্যন্ত অসাধারণ। চতুষ্কোণের চতুর্দ্দিকেই এক একটী ত্রিতল মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কড়িকাঠ ও কার্ণিস নানাপ্রকারে খোদিত হইয়া থাকে। দরজা জানালা এবং অনুচ্চ প্রাচীরগুলি মুক্তহস্তে চিত্রিত। সন্ন্যাসীগণের কক্ষের অভ্যন্তর কারুকার্য্যখচিত কিন্তু বহির্দ্দেশ অনলঙ্কৃত। মধ্যস্থলে উচ্চ ও বিস্তৃত ঘর। দরজাগুলি পূর্ব্বমুখ; রাজসিংহাসনও পূর্ব্বমুখে স্থাপিত।

আসন, বসন ইত্যাদি।

ভারতবাসীরা উপবেশন বা বিশ্রামের কালে মাদুর ব্যবহার করে। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও সহকারী কর্ম্মচারীগণ কারুকার্য্য শোভিত মাদুর ব্যবহার করে কিন্তু আকারে সকল মাদুরই এক প্রকার। রাজার সিংহাসন বৃহৎ উচ্চ এবং মূল্যবান মণিমুক্তাসজ্জিত। ইহাকে সিংহাসন বলে। সিংহাসন অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত; পাদদানটী পর্য্যন্ত মণিমুক্তাখচিত। সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী সুচিত্রিত ও মূল্যবান আসন ব্যবহার করেন।

পোষাক পরিচ্ছদের কোনরূপ "ছাট কাট" নাই। শুভ্র পোষাকই তাহারা পছন্দ করে; বহুবর্ণ বা সুশোভিত পরিচ্ছদ তাহাদের মনঃপূত হয় না। পুরুষেরা মধ্যদেশে তাহাদের পরিচ্ছদ জড়াইয়া, কুক্ষিতলে ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ঝুলাইয়া দেয়। স্ত্রীলোকের পোষাক মৃত্তিকা স্পর্শ করে এবং সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্কন্ধ আবৃত করে। তাহারা মস্তকোপরি কেশের কিয়দংশ দ্বারা কবরী বন্ধন করে

* এই সকল আচার ব্যবহারগুলি ইৎসিংও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এবং অন্য চুলগুলি আলগা করিয়া রাখে। কেহ কেহ গোঁফ ছেদন করে *। মস্তকোপরি তাহারা মুকুট ও মণিময় মাল্য ব্যবহার করে। তাহাদের পরিচ্ছদ কৌষের * ও কার্পাস নির্ম্মিত। ক্ষৌম বস্ত্রের পরিচ্ছদও দেখা যায়। উৎকৃষ্ট ছাগলোম দ্বারা কম্বল প্রস্তুত হয়। করাল (বন্য পশুর সূচিক্‌ণ-লোম) দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হয়। ইহা বয়ন করা সহজসাধ্য নয় এবং সেই জন্য ইহার পরিচ্ছদ মূল্যবান এবং ইহা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদরূপে গণিত হয়।

উত্তর ভারতে বায়ু শীতল এবং সেই জন্য তথায় তাহারা ছোট এবং আঁটা পোষাক ব্যবহার করে। অবিশ্বাসীদিগের পরিচ্ছদ ও গহনা বহুবিধ ও মিশ্রিত। কেহ ময়ূরপুচ্ছ, কেহ নরকঙ্কাল ব্যবহার করে। কেহ বা উলঙ্গ থাকে, আবার কেহ পত্র বা বল্কল পরিধান করে। কেহ কেশ কর্ত্তন করে, কেহ বা গোঁফ মুণ্ডন করে। পক্ষান্তরে দীর্ঘ গোঁফ এবং মাথার উপর চুলের কবরী ও দেখা যায়। ইহাদের পরিচ্ছদ একরূপ নহে এবং এক এক সময় এক এক প্রকার রংয়ের পোষাক ব্যবহার করে।

শ্রমণগণের তিন প্রকার পরিচ্ছদ *। এই তিন প্রকার পরিচ্ছদের "ছাঁট" এক প্রকার নহে - ইহা সম্প্রদায় বিশেষের উপর নির্ভর করে। কাহারও কাহারও ক্ষুদ্রপাড় কাহার আবার চওড়া। কোন কোন পোষাক আবার কমবেশী ঝুলিয়া পড়ে। এক প্রকার পোষাক কেবল বাম স্কন্ধ ও উভয় কুক্ষিতল আবৃত রাখে। ইহা বামদিকে অনাবৃত রাখিয়া দক্ষিণদিক আবৃত করিয়া রাখে। কোমরের নীচে ইহা ঝুলিয়া পড়ে। অন্য প্রকার পোষাকের কটিবন্ধ বা থোবা নাই। পরিধানকালীন ইহার নিম্নাংশ ভাঁজ করিয়া পরিতে হয় ও কটিদেশে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিতে হয়। সম্প্রদায় সকলের পরিচ্ছদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু —পীত ও লোহিত উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন এবং সাদাসিধা ভাবে ও মিতব্যয়িতার সহিত জীবন ধারণ করেন। রাজা এবং মন্ত্রীগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ব্যবহার করেন। রত্নখচিত উষ্ণীষ এবং পুষ্প কেশে ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলয় ও মাল্য দ্বারা নিজেদের ভূষিত করেন।

অনেক ধনবান বণিক স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকেন। ইঁহারা নগ্নপদে যাতায়াত করেন—কদাচিৎ কেহ উপানৎ ব্যবহার করে। ইহারা দন্ত লোহিত কিম্বা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত এবং কর্ণ বিদ্ধ করে। ইহাদের নাসিকা চিত্রিত এবং চক্ষুগুলি আয়ত।

পরিচ্ছন্নতা।

ইহারা শারীরিক পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী এবং এই বিষয়ে কোনরূপেই শৈথিল্য প্রকাশ করে না। আহারের পূর্ব্বে সকলেই স্নান করিয়া থাকে; কখনও উচ্ছিষ্ট ভোজন করে না এবং একের ভোজনপাত্র অপরে ব্যবহার করে না। কাষ্ঠ বা প্রস্তর পাত্র ব্যবহৃত হইলেই নষ্ট করিয়া ফেলে। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা লৌহ পাত্র প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর ধৌত ও মার্জ্জিত করে। আহারাদির পরে তাহারা দন্তকাষ্ঠ + ব্যবহার করে এবং মুখ ও হস্ত প্রক্ষালন করে *। স্নানের পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে না। । শৌচান্তে প্রত্যেকবার তাহারা গাত্র ধৌত করে এবং চন্দন ও হরিদ্রার সুগন্ধি ব্যবহার করে। রাজার স্নানকালে ঢক্কা নাদ হয় ও বাদ্যযন্ত্র যোগে সঙ্গীত হয়। পূজা বা প্রার্থনার পূর্ব্বে ইহারা অবগাহন করে।

লিখন, বর্ণমালা, ভাষা পুস্তক প্রভৃতি।

ভারতবর্ষীয়দের বর্ণমালা ব্রহ্মদেব কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। সংখ্যায় ইহারা ৪৭ এবং দেশ কালপাত্র অনুযায়ী

* এই সকল আচার ব্যবহারগুলি ইৎসিংও উল্লেখ করিয়া গিয়াছে।

+ দন্তকাষ্ঠের ব্যবহার ইৎসিংয়ের গ্রন্থে এবং আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। "বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা" প্রবন্ধে (ভারতী ১৩১৬ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

শব্দ রচনার উপযোগী ভাবে সংযুক্ত। এই বর্ণমালা নানা দেশের নানা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই দেশভেদে উচ্চারণে ব্যতিক্রম দেখা যায় কিন্তু সাধারণতঃ বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। মধ্য ভারতে ইহা আদিকাল হইতে এক ভাবেই আছে। এই স্থানের উচ্চারণ শুনিতে মধুর এবং দেবতাদিগের ভাষার ন্যায়। সীমান্ত প্রদেশবাসীদের উচ্চারণে ভ্রম দেখা যায় কেন না চরিত্রগত দোষের জন্য তাহাদের ভাষাও দূষিত হইয়া পড়ে।

প্রত্যেক প্রদেশে সাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। এই সকল বিবরণকে নীলপিত বলে। শুভাশুভ সর্ব্ববিধ ঘটনাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হয়।

বালকদিগের শিক্ষা ও উৎসাহের জন্য তাহাদিগকে প্রথমতঃ দ্বাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট সিদ্ধবস্ত নামক পুস্তক অধ্যয়ন করান হয়। সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলে তাহারা পঞ্চবিদ্যা নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। প্রথমেই তাহারা শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করে। এই পুস্তক শব্দের অন্বয় এবং পদের ব্যুৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্ব শিক্ষা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা শিল্পস্থান বিদ্যা অর্থাৎ শিল্পশক্তি নির্ণয়কবিদ্যা এবং জ্যোতিষ অধ্যয়ন করে। পরে চিকিৎসাবিদ্যা অর্থাৎ যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও গুপ্তমন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেয় তাহাই অধ্যয়ন করে। পরে হেতুবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষোক্তটিতে পঞ্চ বৌদ্ধ শাস্ত্রের * সকল তত্ত্ব নিদ্ধারিত আছে।

ব্রাহ্মণে চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। প্রথম বেদকে আয়ুর্ব্বেদ বলে কেন না ইহা জীবনরক্ষণ বিষয়ে পর্য্যালোচনা করে। দ্বিতীয় যজুর্ব্বেদ, তৃতীয় সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ব্ববেদ।

এই সকল বেদে যে সকল গূঢ় ও গুপ্ততত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে তাহা এতদ্দেশীয় শিক্ষকগণ যে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা প্রথমতঃ উহাদের ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিয়া পরে ছাত্রদিগকে দুরূহ শব্দ সমূহের অর্থ বোধগম্য করাইয়া দেন। তাঁহারা শিষ্যদিগকে উৎসাহিত করেন এবং সুকৌশলে তাহাদের পরিচালিত করেন। যদি তাঁহারা দেখেন যে তাঁহাদের শিষ্যগণ অধীত বিদ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছুক তাহা হইলে তাঁহারা উহাদের স্বকীয় বশে রাখেন। তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে এবং ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে তাহাদের চরিত্র গঠিত এবং জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যখন তাহারা কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় তখন প্রথমে তাহারা গুরুদেবের যত্নের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেয়। পুরাতত্ত্বে অভিজ্ঞ অনেকে বিদ্যাচর্চ্চাতেই জীবনাতিপাত করেন এবং এবং সংসার হইতে দূরে বাস করিয়া নিজেদের স্বভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। পার্থিব বিষয়ের ইহারা কিছুই ধার ধারেন না; নিন্দা বা প্রশংসায় ইঁহাদের কিছুই যায় আসে না। তাঁহাদের সুযশ দিগদিগন্তে বিস্তৃত হওয়ায়, রাজন্যবর্গ তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন কিন্তু তাঁহারা কদাপিও রাজসভায় উপস্থিত হন না। গুণের জন্য নরপতি তাঁহাদের সম্মান করেন এবং প্রজাবৃন্দ তাঁহাদের যশোরাশির প্রশংসা করে এবং সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদের ভক্তি করে। এই কারণেই তাঁহারা দৃঢ়তা ও উৎসাহ সহকারে অক্লান্ত ভাবে বিদ্যাচর্চ্চায় সময়াতিপাত করিতে পারেন। তাঁহারা আত্মবলে নির্ভর করিয়া জ্ঞানান্বেষণ করেন। যদিও তাঁহারা বিপুল ধনের অধিকারী তথাপি তাঁহারা সামান্য জীবিকার জন্য নানাস্থান ভ্রমণ করেন। পক্ষান্তরে, এরূপ লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াও নির্লজ্জভাবে কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইয়া কেবল মাত্র সুখলালসায় অর্থরাশির অপচয় করে। ইহারা বহুমূল্য আহারাদি ও বস্ত্র নিজ সম্পত্তি বিনষ্ট করে। নিজেদের নৈতিক বল এবং অধ্যয়নস্পৃহা না থাকাতে ইহারা অপমানিত হয় এবং ইহাদের দুর্নাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

নিজ নিজ শ্রেণী অনুযায়ী, সকলেই তথাগতের

* পঞ্চযান—(১) বুদ্ধ (২) বোধিসত্ত্ব (৩) প্রত্যেক বুদ্ধ (৪) যতি (৫) অন্যান্য শিষ্য।

ধর্ম্মমত জ্ঞাত আছে। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পরে বহুকাল গত হওয়াতে, তাঁহার মতের রূপান্তর হইয়াছে এবং কেবলমাত্র তত্ত্বান্বেষিগণের অনুসন্ধানের উপরই এইক্ষণ এই জ্ঞান নির্ভর করে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়, পুস্তক, বিচার, বিনয় প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মতের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় এবং সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক উত্থিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য আছেন এবং যদিও তাঁহাদের মতামত বিভিন্নমুখী, তথাপি তাহাদের লক্ষ্য এক।

অষ্টাদশটী সম্প্রদায় আছে এবং প্রত্যেকই অপরের উপর প্রাধান্য প্রকাশ করিতে অভিলাষী। মহাযান এবং হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ পৃথক পৃথক বাস করিতেই ইচ্ছুক। অনেকে নীরব ধ্যানেই আসক্ত এবং ভ্রমণে, উপবেশনে, দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল সময়েই জ্ঞানার্জ্জন ও সূক্ষ্ম দর্শনের জন্য নিমগ্ন থাকেন। কেহ কেহ স্ব স্ব মতের পোষকার্থে চীৎকার করিয়া তর্ক বিতর্ক করেন। নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক নিয়ম অনুসারে বৌদ্ধগণ চালিত হন।

বিনয়, বিচার, এবং সুত্তপিটক—সকলই বৌদ্ধ-পুস্তক। যিনি এই সকল গ্রন্থের এক শ্রেণীর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাহাকে কর্ম্মদানের শাসন হইতে মুক্ত দেওয়া হয়। যদি তিনি দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যা করিতে পারেন তবে তাহাকে দ্বিতীয় তলে বাসের জন্য আসবাব দেওয়া হয়। যিনি তিন অংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিবার জন্য কয়েকটী ভৃত্য দেওয়া হয়। যিনি চারি অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে উপাসক নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যিনি পঞ্চাংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে হস্তিযান দেওয়া হয়। যিনি ছয় অংশেরই ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে শরীররক্ষা প্রদত্ত হয়। যখন কাহারও সুযশ উচ্চ সীমায় উপনীত হয়, তখন বিচারের জন্য তিনি সভা আহ্বান করেন। যাঁহারা সভায় উপস্থিত হন, তিনি তাঁহাদের গুণের বিচার করেন; তিনি বুদ্ধিমানদিগকে প্রশংসা করেন এবং ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন। সভায় যদি কেহ মার্জ্জিত ভাষা, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দেন তাহা হইলে তাঁহাকে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া এবং বহুসংখ্যক সহচর সঙ্গে দিয়া মঠের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আনয়ন করা হয়। পক্ষান্তরে, যদি কেহ বিচারকালীন অসাধু ভাষা প্রয়োগ করেন, অথবা কুতর্ক অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলে তাহার মুখ লাল ও সাদা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দেয়, তাহার সর্ব্বাবয়বে ধূলি ও কর্দ্দম মাখাইয়া দেয় এবং পরে কোন নির্জ্জন স্থানে বা পয়ঃপ্রণালীতে রাখিয়া আইসে। এই প্রকারে তাহারা গুণী ব্যক্তিকে সম্মান এবং গুণহীনকে অপদস্থ করে।

ভোগবিলাস সাংসারিক জীবনেই শোভা পায় এবং জ্ঞানার্জ্জনই ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ। শেষোক্ত জীবন পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক ভোগবিলাসে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত গর্হিত। যদি কেহ বিনয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে তবে তাহাকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করা হয়। সামান্য দোষে, তিরস্কার বা কয়েকদিবসের জন্য নির্ব্বাসন দেওয়া হয়। অপরাধ গুরুতর হইলে চিরদিনের জন্য মঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা এইরূপে বহিষ্কৃত হয় তাহারা অন্যত্র আবাস অন্বেষণ করে এবং যদি তাহাতে অসমর্থ হয় তবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও তাহারা পুনরায় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করে।

বর্ণবিভাগ ও বিবাহ।

ইহারা চারিবর্ণে বিভক্ত। প্রথম ব্রাহ্মণ—ইঁহারা সদাচারী। ইহারাই ধর্ম্মপরায়ণ এবং নিয়মাবলী পালনে বিশেষ তৎপর। দ্বিতীয় শ্রেণীকে ক্ষত্রিয় বলে, ইহারা রাজজাতীয়। বহুদিন হইতে ইঁহারা দেশ শাসন করিতেছেন। ইহারাও ধার্ম্মিক ও দয়াশীল। তৃতীয় বৈশ্য—ইহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

ইহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে ও দেশ বিদেশে ধনার্জ্জন করে। চতুর্থ শ্রেণীকে শূদ্র বলে—ইহারা কৃষিজীবি। ইহারা হলচালন ও কর্ষণ করে। এই চতুর্ব্বর্ণে জাতীয় বিশুদ্ধতা বা অবিশুদ্ধতা অনুসারেই পদ-মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হয়! যখন ইহারা বিবাহ করে, তখন নূতন কুটুম্বিতা অনুসারে ইহাদের পদমর্য্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আত্মীয় স্বজনের সহিত বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। একবার স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে আর বিবাহ হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু জাতি আছে যাহারা নিজ নিজ ব্যবসানুযায়ী বিবাহ করে।

ক্রমশঃ

ছবি।

(ইংরাজী হইতে)

শরতের স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে প্রসিদ্ধ চিত্রকর সেমুর সস্ত্রীক নদীতীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যকিরণে তখন নদীর জল লাল হইয়া গিয়াছিল।

অদূরে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া এক বালক কাষ্ঠখণ্ড লইয়া ছুরিকার সাহায্যে ছোট নৌকা তৈয়ার করিতেছিল। বালকের বেশ ছিন্ন ও মলিন। আপনার কাযে সে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, পথের দিকে তার কোন লক্ষ্যই ছিল না।

সেমুর ভাবিল, বাঃ—চিত্রের যোগ্য বটে! স্ত্রী কিটিকে কহিল, "আঁকবার মত নয় কি ?"

কিটি কহিল, "নিশ্চয়, সুন্দর হবে।"

অগ্রসর হইয়া বালকটির কাঁধে হাত দিয়া সেমুর কহিল, "তোমার নাম কি ?"

বালক চমকাইয়া সেমুরের মুখের দিকে চাহিল, কহিল, "আমি জিম"। বলিয়া সে আবার আপনার কাযে মন দিল।

কিটির নিকট আসিয়া সেমুর কহিল, "আমি এখনি সব জিনিষপত্র আন্‌ছি—তুমি একে কিছুতে উঠ্‌তে দিও না, কোন রকমে ভুলিয়ে রেখো।"

সেমুর যখন ফিরিয়া আসিল, বালকটি তখনো তেমনিভাবে নৌকা তৈয়ার করিতেছিল। সেমুর পট লইয়া বসিয়া গেল।

তখন চারিধারে আঁধার নামিতেছিল। জিম্ একবার আকাশের দিকে চাহিয়া ছোট নৌকাটী বুকে লইয়া উঠিয়া পড়িল।

সেমুর কহিল, "আর একটু,—জিম, আর একটু বস।" পরে পকেট হইতে একটী রৌপ্যমুদ্রা বাহির করিয়া কহিল, "আর একটু বসলে দেব ?"

জিম্ অবাক হইয়া গেল। কহিল, "আমাকে দেবেন ?"

"হাঁ, তুমি আর একটু ঐখানে বস, তা হলে দেব। কিন্তু কাল আবার আসা চাই, আবার দেব। কেমন আসবে ত, জিম ?"

জিম্ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

সে রাত্রে সেমুর বাড়ীওয়ালীকে জিমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, "ওঃ, নিশ্চয় তবে সে জিম মেরিডিথ। আহা

বেচারা জিম্! তাদের দুঃখের কথা আর বলব কি, সে আজ প্রায় দু বৎসরের কথা। হাঁ, ঠিক দু বৎসর। জিমের বাপ ওয়েনের সঙ্গে তার বন্ধু রিজের কি বচসা হয়, ওয়েন রিজকে একটা ধাক্কা দেয়। ওয়েনের ধাক্কায় রিজ কেমন বে-কায়দায় পড়ে অজ্ঞান হয়। রিজ বুঝি মারা গেল ভেবে ভয়ে দুঃখে ওয়েনও কোথা চলে গেল। তার পর, তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।"

কিটি কহিল, "রিজ কি সত্যই মারা গেছে?"

"নাঃ, মরবে কেন? জোয়ান মানুষ, একটা ধাক্কায় কি মরে কখনো? প্রায় হপ্তা দুই পরে সে বেশ সেরে উঠল! ওয়েনের জন্য কতদিন সে কেঁদেছে, তার কত খোঁজও করেছে—আহা,বড় ভাব ছিল দুজনে. তার উপর রিজেরই নাকি দোষ ছিল—তা কোথায় ওয়েন—তার কোন সন্ধানই নেই!" কথাটা বলিয়া বাড়ীওয়ালী ছোটখাট একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

২

পরদিন সেমুর নদীতীরে আসিয়া দেখে জিম্ তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কিন্তু আজ আর সে জিম নয়—আজিকার জিম দিব্য পরিচ্ছন্ন! বেশ ধোপদস্ত পোষাক পরিয়া সে আসিয়াছে। মুখের কালি সাবানে ধুইয়া ফেলিয়াছে, উস্ক-খুস্ক চুলগুলা তৈল-চিক্কণ, ব্রসের সাহায্যে তার পারিপাট্যই বা কি!

সেমুর কহিল, "এ কি করেছ জিম্—তুমি আর সে জিম নও যে—এঃ, এমন সেজে আসতে কে বলেছিল?"

বালকের মুখ শুখাইয়া গেল। সে বলিল, "মা সাজিয়ে দিয়েছে, ছবি তোলার কথা বল্‌তে, মা—"

"না, না শীঘ্র যাও, কাল যেমন ছিলে, তেমনটী হয়ে এস—কিছু মনে করোনা জিম্, এই দেখ তোমার চুলে এমন তেল মেখেছ—এ সব ঠিক করে এস, যাও, না হলে ছবি ভাল হবে না ত। ঠিক কালকের মত পোষাকে এস।"

এমন ভদ্রোচিত বেশ সেমুরের কেন যে মনঃপূত হইল না,—জিম তাহার মর্ম্মই মোটে গ্রহণ করিতে পারিল না।

* * * *

ছবিখানি সম্পূর্ণ হইল। সেমুরের নিপুণ তুলিকাপাতে সুন্দর ফুটিল! চিত্রশিল্পে তার দক্ষতাও ছিল অসামান্য!

কিটি ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সোৎসাহে স্বামীকে কহিল, "বাঃ, চমৎকার হয়েছে।"

"তোমার ভাল লেগেছে ত কিটি, তাহলেই আমি সুখী। জিম তুমিও একবার এসে তোমার ছবি দেখ।"

জিম গৃহমধ্যে যাইয়া অনেকক্ষণ একদৃষ্টে ছবির পানে চাহিয়া রহিল! এই কি সে! দেখিল, একেবারে ঠিক—ক্রমে আপনার বেশের প্রতি তার নজর পড়িল—লজ্জায় সে আপন বেশের ছিন্ন স্থান গুলা হাত দিয়া ঢাকিতেছিল। তার কেমন একটা সঙ্কোচ হইতেছিল—'তাইত ছবিতে এগুলাও আঁকা হইয়া গিয়াছে!'

জিমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেমুর হাসিয়া

কহিল, "জিম্ ঐ শুনার জন্যই ত ছবি খানির দাম ! বুঝলে ?"

পরে কহিল, "আর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই আমরা চলে যাচ্ছি!"

বালক কাতর দৃষ্টিতে সেমুরের প্রতি চাহিল, কহিল, "চলে যাবেন ? কোথায়?"

"লণ্ডনে যাব, বুঝলে, জিম্, তুমি যাবে ?" বালক বলিয়া উঠিল, "মা বলছিল সেখানে আমার বাবা আছেন", পরে সে আবার কহিল,"সেখানে আপনারা আমার বাবাকে নিশ্চয় দেখবেন, দেখা হলে আমার আর মার কথা যদি বলেন—" বলিতে বলিতে বালকের চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

সেমুর ও কিটির অন্তর দুঃখে ভরিয়া গেল! জিমকে বুকে টানিয়া কিটি কহিল, "কেঁদোনা জিম। চুপ কর।" সেমুর কহিল, "জিম তোমার বাবাকে নিশ্চয় আমি এখানে পাঠিয়ে দেব, তোমার মাকে বলো।"

*　　*　　*　　*

৩

স্তব্ধ রাত্রি। লণ্ডনের এক গৃহমধ্যে নিম্নকণ্ঠে কে কহিল "হা ভগবান !" লোকটীর মুখ শুষ্ক বিবর্ণ! সে চোর, চুরি করিতে আসিয়াছিল।

রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। গৃহের মেঝেতে চোরের পরিশ্রমলব্ধ জিনিষপত্র সংগৃহীত—সকলগুলিই রৌপ্য-নির্ম্মিত—ঝক্ ঝক্ করিতেছে! নিকটে একটী থলিও পড়িয়াছিল।

চোর সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাহারো কোনো সাড়াশব্দ নাই—চারিধার নিস্তব্ধ!

বাহিরে কেবল খড়খড়ির গায় বৃষ্টির ফোঁটার পট-পট শব্দ আর রাস্তায় ক্বচিৎ গৃহমুখী গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। চারিধারে বিরাট নিস্তব্ধতা! চোরের মুখ পাংশুবর্ণ, তার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ।

সম্মুখে গৃহকোণে একটী চিত্রের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের মত সে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে দেয়াল হইতে ছবিখানি সে নামাইয়া লইল।

দ্বার খোলার শব্দ হইল—সে শুনিতে পাইল না, তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছিল।

একখানি চেয়ারে সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। পশ্চাতে তখনো প্রবেশদ্বার অর্দ্ধমুক্ত রহিয়া গেল। হাঁটুর উপর ছবিখানি রাখিয়া একমনে সে তাহাই দেখিতেছিল।

নদীতীরে শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট এক বালকের প্রতিমূর্ত্তি—বালকের বেশ ছিন্ন মলিন! মুখে কেমন করুণ ভাব! সুন্দর!

দেখিতে দেখিতে একটা অব্যক্ত বেদনায় তার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল—অলক্ষিতে তার চক্ষু হইতে বড় একফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া চিত্রের উপর পড়িল। ক্রমে দুইটী—তিনটী। আপনাকে সে আর কোনমতে সম্বরণ করিতে পারিল না।

এমন ভাবেই খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। তখনও সে ছবি দেখিতেছিল। চোখের জলে ছবি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল! এতক্ষণ কখন সে চলিয়া যাইত, কিন্তু আজ তার একি মোহ!

তখন উষার প্রথম আলোকচ্ছটা ধরণীতে ব্যাপ্ত হইতেছিল। তাহারই একটী অস্পষ্ট

কণা খড়খড়ির ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে কক্ষমধ্যে বাতির আলোও ম্লান হইয়া আসিল।

রাস্তায় ময়লা গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। সম্মুখে থলি ও মেঝেতে স্তূপীকৃত দ্রব্যাদির প্রতি চাহিতেই সব কথা তার মনে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে ছবিখানি দেয়ালে টাঙ্গাইয়া সে ভাবিল, "হা, ভগবান! ধন্য তুমি,—আজ রাত্রে এ কি নূতন পথ দেখালে। আজ হতে আমি নূতন মানুষ! আর আমার কোন লোভ নাই—অভাব নাই, আজ হতে আমি চুরি ছাড়লাম।" ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে সে অগ্রসর হইল। কে যেন তার বুক চাপিয়া ধরিয়াছিল। দ্বারের নিকট আসিয়া সে দেখে, বাহির হইতে তাহা রুদ্ধ। আর সম্মুখে রিভলভার হস্তে দাঁড়াইয়া স্বয়ং গৃহস্বামী তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে!

গৃহস্বামী কহিল, "দাঁড়াও!" তার স্বর বজ্রগম্ভীর!

চোর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। চোরের দিকে রিভলভার তুলিয়া গৃহস্বামী হাঁকিল, 'চুরি—চুরি করতে এসেছে, যাও যেমন বসেছিলে তেমন ভাবে বস, নইলে এখনি মাথা উড়িয়ে দেব!"

চোর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল, কহিল, "বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, আমি সত্য কথা বলব—ঐ ছবি! এখানা চোখে না পড়লে কোন্ মুহূর্ত্তে আমি এ সব জিনিষ নিয়ে সরে পড়তাম! শুধু ঐ ছবি। ঐ ছবি খানিই আজ চোরের হাত হতে আপনার জিনিষপত্র রক্ষা করেছে!"

চোরের কথা শুনিয়া গৃহস্বামী রিভলভার নামাইয়া একপদ অগ্রসর হইল, বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ছবি,—কোন্ ছবি?"

চোর কহিল, "ঐ যে একটি ছেলে নদীর ধারে পাথরের উপর বসে, উস্ক-খুস্ক চুল —ছেঁড়া পোষাক—"

গৃহস্বামী কহিল, "ওহো! বুঝেছি সেই ছবি—ভালো, তোমার নাম? তুমি—"

"ওয়েন মেরিডিথ—ঐ ছেলেটির মত আমারো একটি ছেলে—"

গৃহস্বামী অধীরভাবে কহিল, "তার নাম?"

চোর কহিল, "জিম্।"

গৃহস্বামী স্তম্ভিত হইলেন। চোরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া কহিলেন, "ওয়েন মেরিডিথ্ তোমাকে এমন চোরের বেশে দেখব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি!"

শিশুর ন্যায় ওয়েন কাঁদিয়া উঠিল। পরে রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমার জিমের ছবি কেমন করে পেলেন?"

সুগভীর বেদনায় গৃহস্বামীর অন্তর আকুল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "সে আজ চার বৎসর, ঠিক চার বৎসরের কথা—যখন আমি ঐ ছবি আঁকি। ঐ ছবিই আমার উন্নতির প্রথম সোপান—সে এক শুভ মুহূর্ত্তের কি উজ্জ্বল স্মৃতি! আমার স্ত্রী কিটি ও আমি বেড়াতে গেছলাম—দুজনে জিমকে দেখি,—আমি এই ছবি আঁকি— তারপর আমার জীবনের উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেল—আজ কোথায় কিটি—এ ছবি আমাদের সেই মহা সুখের স্মৃতি—তাই

আবার আমি কিনে রেখেছি, ওয়েন আজ তোমাকে পেয়ে আমার বড় আহ্লাদ হচ্ছে! তোমার জন্য বাড়ীতে তোমার স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু সকলে অধীর, তোমারই সন্ধান করছে। তোমার বন্ধু—"

ওয়েনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল—"জানেন ত—খুনের দায়ে আমি,—"

"ওহো, সে তোমার ভুল, ওয়েন, রিজ মরেনি—বেঁচে আছে! তোমার দুঃখিনী স্ত্রী, আদরের জিম্, প্রাণের বন্ধু রিজ সকলে তোমারই জন্য আজ অধীর।"

ওয়েনের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, এ কি স্বপ্ন! উন্মাদের মত সে জড়িতস্বরে কহিল "রিজ,—রিজ বেঁচে আছে!—কি আশ্চর্য্য, আর আমি—"

সেমুর কহিল "তুমি চারটি খেয়ে নিয়ে আজই বাড়ী যাও—আমি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।"

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

বিজ্ঞানের নূতন বাণী।

এতদিন পর্য্যন্ত লোকে কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এই পার্থক্যটাই লক্ষ্য করিয়াছে যে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির দুয়ার পর্য্যন্ত মাত্র অগ্রসর হইয়াই ক্ষান্ত হন, কিন্তু কবি সে গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে ধরা দেন না; তিনি প্রকৃতির গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া প্রকৃতি অহরহ যে পাদপদ্মের দিকে তাহার অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রেরণ করিতেছেন তাহারই সন্ধান গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক নাকি কবির এই কাজটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন—অন্ততঃ অনেকেই তাহা মনে করে। এই জন্যই কবির সহিত বৈজ্ঞানিকের বিরোধ অনেকটা প্রবাদে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সেদিন আর থাকিবার নহে। যাঁহারা বিজ্ঞানের কেবল কাঠামো'টুকু লইয়া আলোচনা করেন তাঁহারা সেই পুরাতনটা লইয়াই আছেন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা এই দলের। কিন্তু আজকাল যাঁহারা বিজ্ঞানের অন্তরদেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা বিজ্ঞানের ভিতর হইতেই একটা বড় কথার সন্ধান পাইয়াছেন। তাহাতে কবির সহিত বৈজ্ঞানিকের সমস্ত বিরোধ দূর হইয়াছে, এবং দুইদিক হইতে দুইজনের লক্ষ্য যে একই দিকে ফিরিয়া আছে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে দেখিবার সাধক। তিনি নানা প্রাকৃতিক ঘটনা লইয়া আলোচনা করিয়া তাহাদের সকলগুলির ভিতরে সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে যে সত্যটি কাজ করিতেছে তাহাই আবিষ্কার করিয়া থাকেন। এই গুলিই তাঁহার বিজ্ঞান-সৌধ নির্ম্মাণের ইষ্টক। বৈচিত্র্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। গরমিল দেখিয়া তিনি নিরাশ হন না, বরঞ্চ সেই গরমিলের মধ্যে মিল খুঁজিবার জন্য তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম জাগ্রত হইয়া উঠে। লোকে

যেখানে কোনো মিল দেখে না বৈজ্ঞানিককে সেই স্থানেই মিল আবিষ্কার করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক যে নিয়মের সূত্রে নানা প্রাকৃতিক ঘটনাকে একত্র বাঁধেন সেগুলি এই ঐক্যের অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ। এই নিয়মগুলিই একটা ঘটনার সহিত আর একটা ঘটনাকে এবং অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যৎকে বন্ধন করিয়া ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে একসূত্রে বাঁধে। যে কারণে একবার যাহা ঘটিয়াছে, এখনো সে কারণে তাহাই ঘটে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। দশটি ঘটনা যে সুদৃঢ় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ঘটে সেই নিয়মগুলিই বিজ্ঞানের প্রাণ।

এক সময় ছিল যখন লোকে বৃক্ষ হইতে ফলের পতনের কারণ এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর গতি অব্যাহত থাকার কারণ যে একই তাহা কল্পনাই করিতে পারিত না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই দুই ঘটনার মধ্যেও ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাই প্রচারিত হইয়া গিয়াছে যে সৌর জগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের গতি যে ক্ষতিরহিত হইয়া অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে মহাকর্ষণই তাহার কারণ। সমগ্র সৌর জগৎটি যে সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি হইয়া আছে তাহা মহাকর্ষণ। পৃথিবীর অতি প্রচণ্ড বেগ সত্ত্বেও যে কারণে ভূপৃষ্ঠস্থ কোনো পদার্থই পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে না তাহাও মহাকর্ষণ। যে শক্তিতে পরমাণুর সম্পাতে অণু এবং অণুর সম্পাতে পদার্থ গঠিত হইয়া রহিয়াছে তাহাও আকর্ষণ। অত্যতি সূক্ষ্ম হইতে অত্যতি বৃহৎ ক্ষেত্রেও সেই এক মহাকর্ষণ শক্তি যে কাজ করিতেছে তাহাই আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান কি কম ঐক্যের সাধনার পরিচয় দিয়াছে?

জ্যোতিষীরা বলেন, আমরা আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই তাহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি সূর্য্য। তাহাদের এক একটির চারিদিকে তাহাদের আপন আপন গ্রহগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ কথাও অসম্ভব নহে। এমন কথাও বলা হয় যে গ্রহ উপগ্রহ সহ আমাদের এই সৌর জগৎটি এমনিতর আরো কত কত জগতের সহিত কোনো এক অজ্ঞাত বৃহত্তর সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। নক্ষত্রগুলি আমাদের নিকট হইতে এত দূরে যে সে গুলির কোনোটিরই সহিত সৌর জগতের কোনো সম্পর্ক আজো স্থাপিত হইতে পারে নাই। এইটা হইলে বিশ্বাকাশকে একই সূত্রে গ্রথিত দেখিতে পাইতাম। একদিন ছিল যখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে একটি মাত্র কারণে সৌর জগৎ এক হইয়া আছে এবং তাহার প্রতি অংশেরই গতি এরূপ নিয়মবদ্ধ; কিন্তু আজ সেটাও যে সত্য তাহাতে আমাদের কোনো সন্দেহ উপস্থিত হইবার আর অবকাশ মাত্র নাই। একদিন হয়তো জানা যাইবে যে মহাকর্ষণই একমাত্র শক্তি যাহাতে কেবল সৌর জগৎ নহে, সমগ্র বিশ্বযন্ত্র সুনিয়মে চলিতেছে। তখন সৌরজগৎকে বিশ্বের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তখন দশ বিশটা পদার্থের মধ্যে যে ঐক্য দেখিয়া আমরা এত আনন্দ লাভ করিতেছি তাহাই আরো প্রসারতা লাভ করিয়া একটা মহা ঐক্যরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে।

জীব জগতেও এমনিতর একটা সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু এখনো কোনো কথা জোরের সহিত বলিবার সামর্থ জন্মে নাই। দারউইন্ বানরত্বকে মানুষের পূর্ব্বাবস্থারূপে নির্দ্দেশ করিয়া এই দুইটি জীবের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

দারউইনের পথে আজো কোনো মহা-ঐক্যে উপস্থিত হইতে পারা যায় নাই সত্য এবং মহাকর্ষণের ভিতর দিয়াও আমরা কোনো পরম ঐক্যকে দেখি নাই সত্য কিন্তু আর এক স্থানে বৈজ্ঞানিক ঐক্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সমগ্র জগৎকে তিনি এক করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন।

এতদিন এইটুকু মাত্র জানিতাম যে পরমাণুর সম্পাতে অণু এবং অণুর সম্পাতে পদার্থ গঠিত হইয়াছে। এক সময় ছিল যখন অণুতেই আমাদের গতিবিধি শেষ হইত, আরো সূক্ষ্মতায় যাওয়া কাহারো সাধ্য ছিল না। এ গণ্ডী এখন উত্তীর্ণ হওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান এই এক সত্য প্রচার করিয়াছে যে, ভৌতিক পদার্থের অণুগুলি অভৌতিক পদার্থের সম্পাতে গঠিত। সাধারণত যে যে গুণ থাকিলে আমরা কোনো কিছুকে পদার্থ বলি এই অভৌতিক পদার্থ গুলিতে সেগুলির কোনোটিই নাই। এ গুলি শক্তিকণা। সকল বস্তুরই অণু এই শক্তিকণার সম্পাতে গঠিত। এই সম্পাতের বিশেষত্ব অনুসারে পদার্থের মধ্যে বিশেষত্ব জন্মে। স্বর্ণ যাহা, রৌপ্যও তাহাই, আবার সামান্য অঙ্গার খণ্ডের উপাদান ও সেই একই শক্তি। একই এই জগতের উপাদন। ভূলোক, ভুবলোক এবং অন্তরীক্ষ একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ।

বিজ্ঞান এই এক শক্তিকে জগতের উপাদানরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিয়া ঐক্যের সাধনায় সিদ্ধির সংবাদ দিয়াছে। বিপুলভাবে এককে উপলব্ধি করিয়া বৈজ্ঞানিক কবির সহিত তাহার দ্বন্দ্ব মিটাইয়া ফেলিয়াছে এবং উভয়েই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মূল এক।

বর্ত্তমান যুগ আমাদিগকে একটি একটি করিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর উপলব্ধির মধ্যে লইয়া যাইতেছে। যে বিজ্ঞানকে এতদিন আধ্যাত্মিকতার শত্রু বলিয়া লোকে মনে করিত সেই আজ এমন এক নূতন বাণী প্রচারিত করিয়াছে যে তাহাতে ভগবদ্ভক্তের ঈশ্বরোপলব্ধি স্বতই সায় পাইতেছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সীতারাম।

সীতারামের ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রতাপাদিত্যের লীলাস্থল, সেই সোণার যশোহর আজ আর নাই। যে যশোহর একদিন সহস্র সহস্র যোদ্ধার হুঙ্কারে নিত্য মুখরিত হইত, অসি যষ্টি ও বন্দুক ক্রীড়ায়, মগ, ফিরিঙ্গি, পাঠান ও মোগলের ভীতি সঞ্চারিত করিত, সুপ্রসিদ্ধ গৌড় নগরীর যশহর—করিয়াছিল বলিয়া যাহা যশোহর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল, যথাকার প্রতি পল্লী—প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম নির্ম্মিত, গোবিন্দদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ ও

কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর উচ্চ শীর্ষ মন্দিরাবলীতে সুশোভিত ছিল, যেখানকার পল্লী, ছত্র, দেবমন্দির স‌ংহ একদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী ও অতিথিকে চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয় আহারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিত, প্রতাপ এবং সীতারামের সুবিখ্যাত সেই রাজধানী আজ আর নাই। এখন তাহার কতক অংশ সমুদ্র গর্ভে নিহিত, কতক অংশ বা গভীর অরণ্যে পরিণত; অবশিষ্ট যেটুকু আছে, তাহা ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ সামান্য পল্লীগ্রাম মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আজ সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই—আছে কেবল তাহার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু।—সেই স্মৃতিটুকু লইয়াই আমরা ধন্য। ইতিহাসের উজ্জ্বল অক্ষরে সেই ক্ষীণ আলোকটুকুও যদি স্থায়ী করিতে পারি তবেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হইবে।

দুঃখের বিষয় অতীত ইতিহাস এ সব কথা বড় বলে না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এ সকল বীরের কথা ফুৎকারে নির্ব্বাণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাই সীতারামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ আমরা যশোহরবাসী জানি না। কেহ কেহ বলেন যে ১৭১২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার "যশোহরের বিবরণী"তে তাহাই লিখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতে চান যে সীতারাম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও জীবিত ছিলেন। শেষোক্ত পক্ষীয় ব্যক্তিগণ Long's Selections from the records of Government নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্রের উপর নির্ভর করিয়াই ঐ কথা বলেন।

"যে পত্রে আপনি রোজ সাহেব নামক ইংরাজ সওদাগরের নৌকা লুট ও তাঁহার মৃত্যুর কথা লিখিয়াছেন সে পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। বাখরগঞ্জের নিকট যে তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে এবং ডাকাইতগণ যে সীতারামের জমিদারীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাও আপনার পত্রে অবগত হইয়াছি। আপনার অনুরোধানুযায়ী যাহাতে উক্ত জমিদার ঐ লুণ্ঠিত সম্পত্তি ফেরত দেন ও ঐ অঞ্চলে যাহাতে আর দস্যুভয় না থাকে তজ্জন্য বন্দোবস্ত করিতে সৈয়দ রেজা খাঁকে অন্য পত্র দিয়াছি।" (কলিকাতার শাসনকর্ত্তার নামে নবাবের পত্র) [প্রথম খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা]। ঐ খণ্ডের ৩৮৭, ৩৮৮ এবং ৩৮৯ পৃষ্ঠায় পুনরায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর তারিখে গবর্ণর মহাশয় নবাবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারও মর্ম্ম এইরূপ—"পূর্ব্বেই আপনাকে রোজ সাহেবের নৌকা-লুট ও তাঁহার মৃত্যুর কথা এবং দস্যুগণ যে সীতারামের জমিদারীতে আশ্রয় লইয়াছে তাহাও বলিয়াছি। আমি একজন ইংরাজকে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে সীতারামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম কিন্তু উক্ত জমিদার এই দূতকে গ্রাহ্যই করেন নাই!" এইত গেল এক কথা।

দ্বিতীয়তঃ, ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় একটী প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সীতারামকে ধৃত করিবার জন্য যে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয় তাহার সহিত দয়ারাম প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবং সীতারামের পরাজয়ের পর দয়ারাম নবাব কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া-

ছিলেন। (কলিকাতা রিভিউ ১৮৮৩ সনের জানুয়ারী)। লং সাহেবের পুস্তকে উপরোক্ত রোজ সাহেবের মৃত্যু-ঘটনা বিবৃত হওয়ার অব্যবহিত পরেই দয়ারাম সংক্রান্ত একটী ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ১৭৬। খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে গবর্ণর কর্ত্তৃক লিখিত পত্রে জানা যায় যে কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ উইলিয়ামসন্ গবর্ণরকে অবগত করিয়াছিলেন যে, রামপুর বোয়ালিয়া হইতে নৌকাযোগে কোম্পানির ১০০ শত মণ রেশম আসিতেছিল কিন্তু দয়ারাম ঐ রেশম আটক করেন। এই সকল ঘটনা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে সীতারাম এই সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ, উপর্য্যুক্ত সীতারাম যদি আমাদেরই সীতারাম হন, তবে বলিতে হইবে যে কোম্পানির দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্তির ২।১ বৎসর পূর্ব্বেও তিনি জীবিত ছিলেন। আমরা দেখাইতে চেষ্ট করিব যে তাহা সম্ভবপর নহে।

প্রথমতঃ সীতারাম মুর্শীদকুলীখাঁর আমলেই সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুর্শীদকুলিখাঁ ১৭০৪ হইতে ১৭২৫ পর্য্যন্ত বাংলার গদী উপভোগ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, সীতারাম তাঁহার দেওয়ান যদু মজুমদারকে যে সনন্দ প্রদান করেন তাহাতে ১১১৪ সনের ২৫ বৈশাখ তারিখ আছে। এই বাংলা তারিখ ইংরাজী ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ।

তৃতীয়তঃ, সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত দশভুজা মন্দিরে নিম্নলিখিত কবিতা লিখিত ছিল—

"মহীভুজরসক্ষৌণীশকে দশভুজালয়ং
অকারি শ্রীমতাসীতারামরায়েণ মন্দিরং।"

অর্থঃ—মহী এই স্থলে '১'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহী বা পৃথিবী মাত্র একটী—সেইজন্য মহী=১

ভুজ—এই স্থলে '২'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভুজ বলিতে দুই বা দুই বুঝায় সেইজন্য ভুজ=২

রস—এই স্থলে '৬'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। রস ছয়টী। সেইজন্য রস=৬

ক্ষৌণী—এই স্থলে (১)র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্ষৌণী বা পৃথিবী মাত্র একটী—সেইজন্য ক্ষৌণী=১।

ইহা হইতে আমরা ১,২,৬,১, এই অঙ্ক চারিটী সজ্জিত করিয়া ১২৬১ শকে যে এই মন্দিরটী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি। ১২৬১ শক ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরম্ভ হইয়াছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে নিম্নলিখিত শিলালিপি ছিল।

"লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূমিতে
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থে সীতারামেণ মন্দিরং।"

অর্থাৎ তর্ক (ন্যায় (৬)), অক্ষি (২,), রস (৬), ভূমি (১) হইতে আমরা ১৬২৬ শকের নিদর্শন পাই। এই শক ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যাঁহারা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সীতারামকে টানাটানি করিতে চান, তাঁহাদের যুক্তি ভ্রমসঙ্কুল।

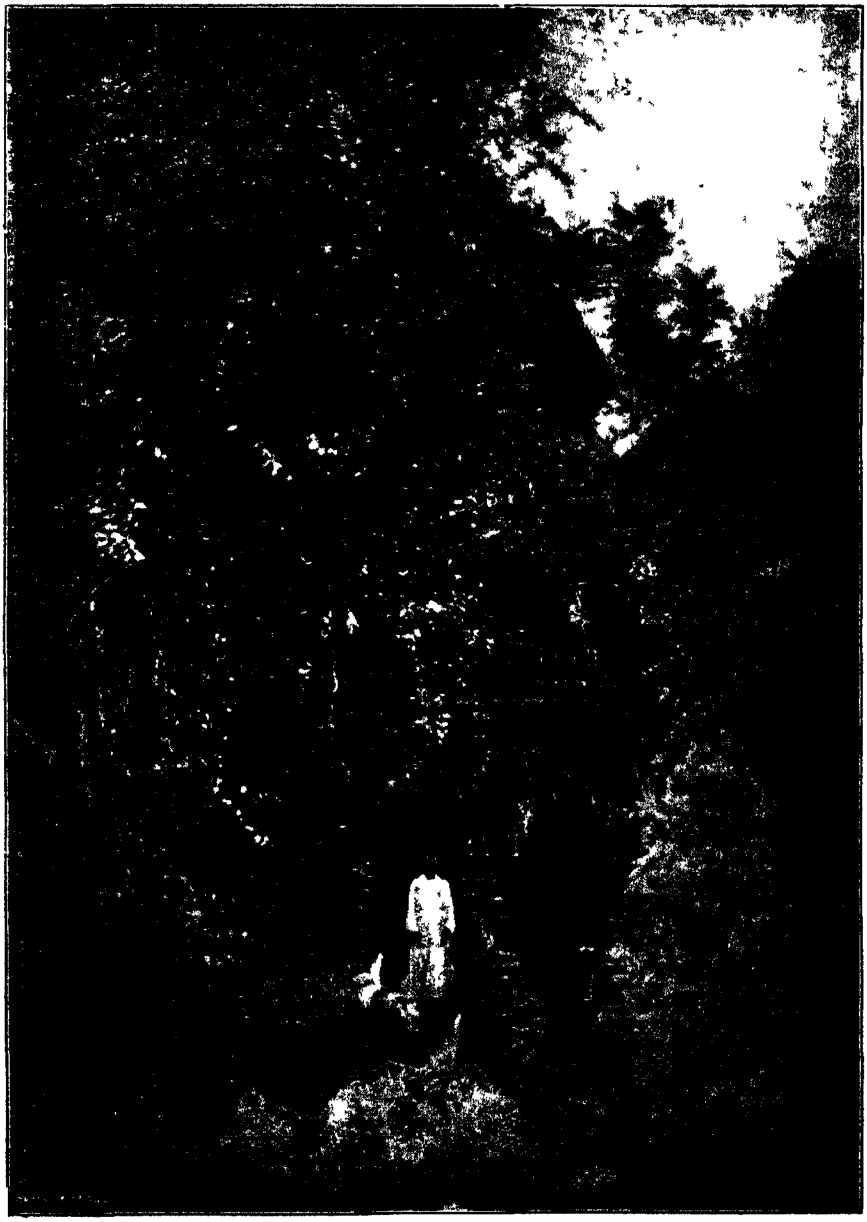
ঐতিহাসিক ষ্টয়ার্ট সাহেব তাঁহার "বাংলার ইতিহাসে" সীতারামের নিম্নলিখিত কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা ষ্টুয়ার্টের বর্ণিত কাহিনীর স্থূলবৃত্তান্ত পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম।

"আবু তোরাব নামক একজন সদ্বংশজাত ওমরাহ বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়, ভূষণার নিকট সীতারাম নামক একজন অবাধ্য জমিদারের অধীনে অনেকগুলি দস্যু থাকিত। সীতারাম ইচ্ছানুযায়ী নিজ লোকজন সহায়তায় ডাকাতী করিতেন। আবুতোরাব এই দুর্দ্দান্ত দস্যু দমন মানসে নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করা



দশভুজা মন্দির।

সত্ত্বেও নবাব তাঁহাকে কোন সাহায্য প্রদান করেন নাই। অবশেষে, এই দস্যুকে ধৃত করিবার জন্য ফৌজদার পিরখাঁ নামক তাঁহার একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। সীতারাম এই সংবাদ পাইয়া নিজ আড্ডা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন



লক্ষ্মীনারায়ণ।

ঘটনাচক্রে ফৌজদার আবু তোরাব এই স্থলেই মৃগয়ার্থ আগমন করিয়াছিলেন এবং সীতারাম পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার অধীনস্থ দস্যুগণ আবু তোরাবকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করে। সীতারাম এই ঘটনায় অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন এবং আবুতোরাবের মৃতদেহ তাঁহার অনুচরগণের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। আবুতোরাবের অনুচরগণ মৃতদেহ ভূষণার নিকটেই কবর দেয়।

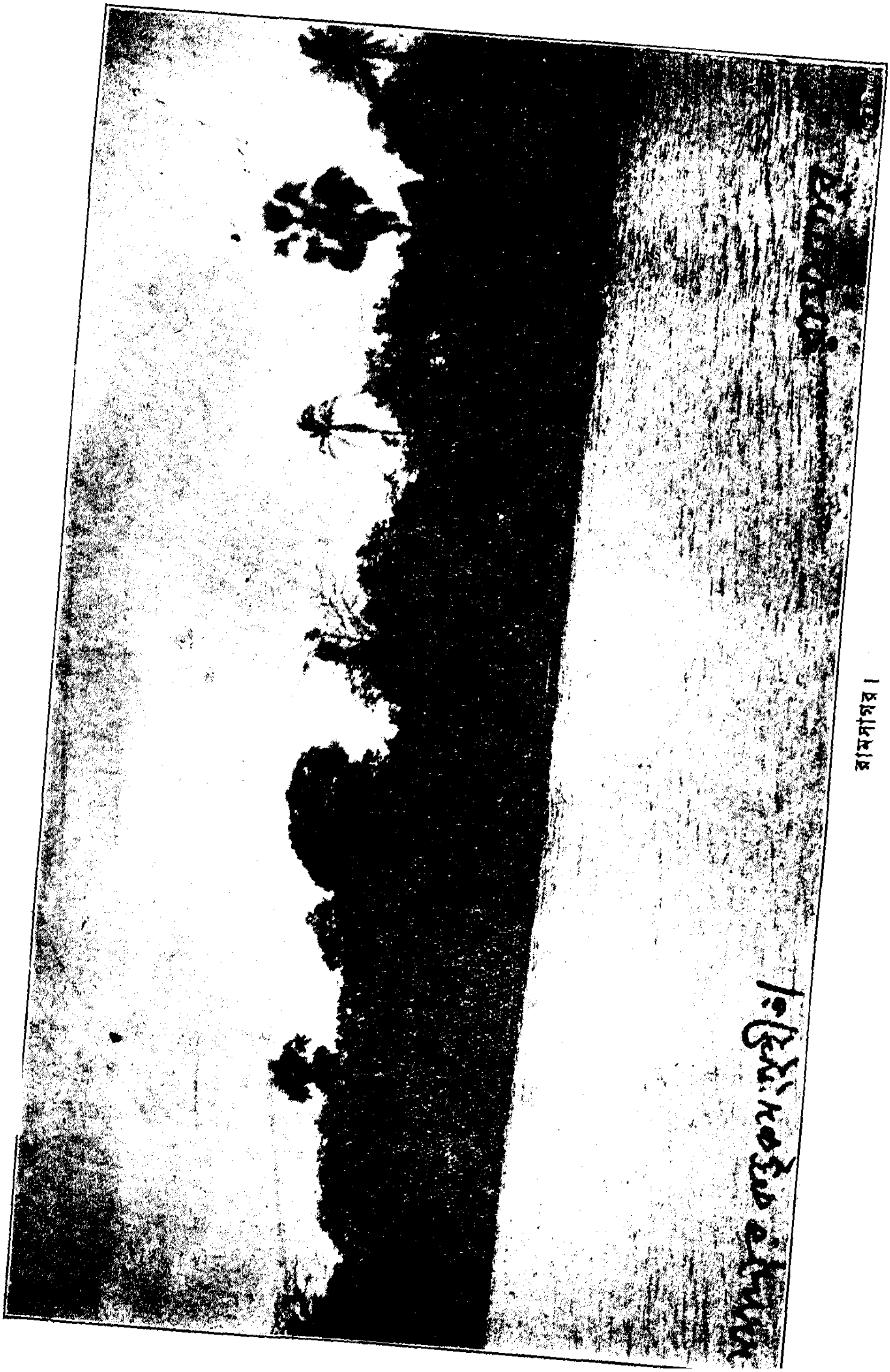
নবাব, আবুতোরাবের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বক্স ইলাহি খাঁ নামক সেনাপতিকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং ইলাহি খাঁকে সাহায্য করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী জমিদারদিগকে পরোয়ানা প্রেরণ করেন। সীতারাম সপরিবারে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। সেইস্থানে পৌঁছিবামাত্র তাঁহার পরিবারবর্গকে বিক্রয় করা এবং সীতারামের মৃত্যুদণ্ড হয়।”

ষ্টুয়ার্ট সাহেব যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা উপন্যাস হইতে পারে কিন্তু আমরা ইহাকে ইতিহাসে পরিগণিত করিতে পারি না। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব সত্যই লিখিয়াছেন যে "The tanks and temples and ruins at Muhammadpur consist far better with the local legend than with the Muhammadpur account." অর্থাৎ সীতারামকৃত দীর্ঘিকা, মন্দির এবং মহম্মদপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সীতারাম সম্বন্ধীয় প্রবাদই সত্য।

ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব * যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন আমরা সেই বৃত্তান্তকেই মোটের উপর সত্য বলিয়া গণ্য করি এবং তাহাই আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বঙ্গদেশে এই সময় দ্বাদশটী ভূঁইয়া ছিলেন। এই ভূঁইয়াগণ এক প্রকার স্বাধীন ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং বাদসাহ বা তাঁহার প্রতিনিধি নবাবকে বিশেষ গণ্যমান্যও করিতেন না বা নিরূপিত রূপে রাজস্বও প্রেরণ করিতেন না। সম্ভবতঃ কোন এক ভূঁইয়াকে শাসন করিবার জন্যই হোক বা ফতেয়াবাদ স্থিত কোন পাঠান ওমরাহকে দমন করিবার জন্যই হোক নবাব সায়েস্তাখাঁ কর্ত্তৃক সীতারাম বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়াতেই পুরস্কার স্বরূপ নলদী পরগণা লাভ করেন। এবং সম্রাট আউরংজীব তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করিয়া রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। সম্রাট প্রদত্ত ফার্ম্মাণসহ সীতারাম মুর্শীদকুলি খাঁর নিকট পৌঁছিয়া রীতিমত নজর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে নবাব তাঁহাকে কয়েক বৎসরের জন্য ঐ সকল ভূমি নিষ্কর দখল করিতে অনুমতি প্রদান করেন। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া মহম্মদপুর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। কি কারণে হিন্দু-কুলতিলক সীতারাম তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুর নামে আখ্যাত করেন তাহা সঠিক

* Mr. Blochman supposes him to be one of the descendants of successors of the equally notorious Mokund, who possessed the Sirkar of Fathabad and Pergunna of Bhoosna..—Ibid.



রামসাগর।

জানা যায় না। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মতে সীতারাম যেস্থানে নিজ প্রাসাদ নির্ম্মাণে মনস্থ করেন, সেই স্থানে এক ফকীর বাস করিতেন। সীতারাম ফকীরকে ঐ স্থান পরিত্যাগে অনুরোধ করিলে ফকীর অস্বীকার করেন। পরে, অনেক অনুরোধ উপরোধে স্থান পরিত্যাগে স্বীকৃত হন কিন্তু সীতারাম ফকীরের নামানুযায়ী ঐ স্থান মহম্মদপুর নামে আখ্যাত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। জনশ্রুতি এইরূপও শোনা যায় যে, মহম্মদ আলি নামক এক ফকীর সীতারামকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ও আবশ্যক মত উপদেশাদি প্রদান করিতেন। নব-রাজ্য সংস্থাপনোদ্যত সীতারামকে তিনি উপদেশ দিলেন যে সীতারাম হিন্দু হইয়া যদি মুসলমান-পয়গম্বরের নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে মুসলমান প্রজাও সন্তুষ্ট হইবে। এই নূতন রাজা যে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই অপত্যনির্ব্বিশেষে ও নিরপেক্ষভাবে দেখিবেন, ইহা তাহারা বুঝিবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস সীতারামে এই মতই অবলম্বন করিয়াছেন।*

প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ একদিন অশ্বারোহণে এই স্থান দিয়া যাইবার সময় তাঁহার অশ্বক্ষুর কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া যায়। বহুকষ্টে অশ্বপদ কর্দ্দম হইতে উঠান হইলে দেখা গেল যে অশ্বক্ষুর ত্রিশূলে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং অনুসন্ধানে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাও এইস্থানে পাওয়া গেল। অন্য একটী প্রবাদ এইরূপ যে সীতারামের অশ্বই এই ত্রিশূলে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং সেইজন্য সীতারাম এই স্থলেই রাজধানী ও দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন।

সীতারাম রাজা হইয়া অন্যান্য ভূঁইয়াদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতে আরম্ভ করেন। মেনাহাতী, বক্তার, ফকীর মাছকাটা, রূপচাঁদ ঢালি প্রভৃতি সৈনিকদিগের তত্ত্বাবধানে তাঁহার বহু সৈন্যদল সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল। সাধারণতঃ নিকটবর্ত্তী জনপদ সমূহ হইতেই এই সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। সীতারামের সৈন্যদলমধ্যে ক্ষত্রিয়েরও অভাব ছিল না। মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী ২।১টী স্থলে এখনও ক্ষত্রিয় বাস আছে।

এই অঞ্চলে তখন আবুতোরাব নামক এক ব্যক্তি নবাবের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি সীতারাম রায়ের উন্নতি সহ্য করিতে পারিলেন না। গৃহশত্রু সীতারামের উকীলও গোপনে আবুতোরাবকে সকল অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিলেন। ফলে,

* "The ruins at Mohamadpur called after Mahmud Shah, the twelfth king of Bengal wrongly designated by Mr. Westland Muhammadpur. They all belong to the period of Sitaram Rai, the notorious Zemindar of Bhoosnah, styled by the writer of the Report Raja".. Calcutta Review CXXV. রেণী সাহেবের এ ব্যঙ্গোক্তিতে ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন ইহা সকলেই অবগত আছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সীতারাম নামে এক নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে "সন্তোষ রঙ্গমঞ্চে" ইহার অভিনয়ও দেখিয়াছি। নাটকখানি প্রকাশিত হইলে সীতারাম সম্বন্ধে আমরা আরও কিছু নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারিব।

আবুতোরাব দলবলসহ সীতারামকে আক্রমণ করিলেন। সীতারাম প্রস্তুত ছিলেন। এ যুদ্ধে *বাঙ্গালীর নিকট আবুতোরাব পরাস্ত* হইলেন। তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ মেনাহাতী তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সীতারামকে উপহার প্রদান করিলেন। *বক্স ইলাহিখাঁর অধীনে আবার সৈন্য প্রেরিত* হইল। সীতারাম এই যুদ্ধে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ



সীতারামের দুর্গাবশেষ।

কালা খাঁ ও ঝুমঝুম খাঁ নামক ২টী কামান দ্বারা মুসলমানবাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। জয়শ্রী সীতারামকে জয়মাল্য দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিলেন না।

এই দুই যুদ্ধের ফলে সীতারাম বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার "মস্তকের জন্য" পুরস্কার ঘোষিত হইল এবং সীতারামকে সমূলে দলন করিবার জন্য সিংহরাম নামক এক প্রথিতনামা সেনানী প্রেরিত হইলেন। গুপ্তচরে সিংহরামকে সংবাদ দিল যে মেনা-হাতী যতদিন জীবিত আছেন ততদিন সীতা-রাম অপরাজেয়। তাই মেনাহাতী একদিন যখন দোলমঞ্চ সমীপে সন্ধ্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে সিংহরাম সমীপে আনয়ন করা হইল। নিরস্ত্র বীর আত্মরক্ষায় সক্ষম হই-লেন না। প্রবাদ এই, মেনাহাতী নিজ শরীরে গুপ্তভাবে একপ্রকার ঔষধ ধারণ করিতেন। সেই ঔষধপ্রভাবে কোনপ্রকার অস্ত্রই তাঁহার শরীরে ক্ষত করিতে পারিত না। কিন্তু বেদনা নিবারণের কোন উপায় তিনি জানিতেন না। তাই যখন শত্রুপক্ষীয় সৈনিকগণ তাঁহাকে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, তখন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি ঔষধের কথা ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার ছিন্নশির নবাব সমীপে প্রেরিত হইলে নবাব এরূপ বীরের এই শোচনীয় মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে ইহাঁকে জীবন্ত ধৃত করিয়া আনাই সমীচীন ছিল।

মেনাহাতীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সীতারাম মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তত্রাপি তিনি সিংহরামকে যুদ্ধে পরাস্ত করি-লেন। দুঃখের বিষয়, তিনি সিংহরামকে পরাস্ত করিলেও তাহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না। সিংহরাম তাঁহার দুর্গাধিকার করিলেন।

সীতারামের মৃত্যু কাহিনীর সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন যে দুর্গ আক্রমণ কালে সীতারাম বীরের ন্যায় মুসলমান বাহিনীর গতিরোধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অন্য প্রবাদ, ফকীর মহম্মদ আলি তাঁহার এক শিষ্যকে সীতারামের রাজপোষাকে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শিষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মুসলমানসৈন্যগণ সীতারাম হত হইয়াছেন ইহা মনে করিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া পড়িলে ফকীর সীতা-রামকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে লইয়া শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে জীবন দান করেন।

আমরা সংক্ষেপে সীতারাম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু মহা-পুরুষের কাহিনী সামান্য কয়েক পৃষ্ঠায় বিবৃত করা সম্ভবপর নহে। বারান্তরে এই বীরের কাহিনী আরও পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। অন্য কেহ সীতারাম ও যশোহরের লুপ্ত কাহিনী উদ্ধারে আমাদিগকে সাহায্য করিলে আমরা কৃতার্থ বিবেচনা করিব।*

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

---

* বহু দিন পূর্ব্বে যশোহরের ইতিহাসের জন্য উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলাম। গৃহদাহে সবই ভস্মীভূত হইয়াছে। আবার এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার বাসনা জাগিয়াছে। কিন্তু সমগ্র যশোহর-বাসীর আন্তরিক ইচ্ছা ও অনুগ্রহ ব্যতীত এ কার্য্য অসম্ভব—তাই সকলের নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

তরু দত্ত।

"Full many a flower is born to
blush unseen,
And waste its sweetness on the
desert air." Gray

কবি তরু দত্তের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার কবিতার সহিত আমরা বঙ্গীয় পাঠকের পরিচয় সাধন করিব মাত্র।

তরুবালা ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় রামবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। অব্জু, অরু এবং তরু তিন ভগ্নী, তন্মধ্যে তরু সর্ব্ব



কনিষ্ঠা। তের বৎসর বয়সে তরু পিতার সহিত য়ুরোপ ভ্রমণে গমন করেন এবং ফ্রান্স ও কেম্ব্রিজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর য়ুরোপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিদেশ ভ্রমণের এরূপ সুযোগ কুমারী তরুর ন্যায় অপর কোন ভারত রমণীর ভাগ্যে সচরাচর ঘটে না। য়ুরোপে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দৈনিক লিপিতে লিপিবদ্ধ রাখিতেন। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি সুন্দর পিয়ানো বাজাইতে ও গান করিতে পারিতেন, এবং তাঁহার অসাধারণ স্মরণ শক্তি ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি সেক্সপিয়র, মিল্টন, গেটে, ভিক্টর হিউগো, ব্রাউনিং প্রভৃতির কাব্য পাঠ করিতেন। সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষায় লিখিত বহু কবিতা ও গল্প তিনি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়াছেন। বিদেশীয় ভাষা সুন্দররূপে আয়ত্ত করা ও সেই ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। মিল্টন ইটালীয় ভাষায় এবং সুইনবর্ণ ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরদেশীয় ভাষায় উচ্চশ্রেণীর কবিতা রচনা করার দৃষ্টান্ত সাহিত্য জগতে অপর এই দুইটী ভিন্ন আর বড় একটা দেখা যায় না। তরুদত্ত ইংরাজী ভাষায় বহু কবিতা লিখিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয়া করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে অধিক দিন এ সংসারে রাখিলেন না। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, ২১ বৎসর মাত্র বয়সে, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে অমর কবি Keats এর কথা মনে পড়ে। তরুর নিজের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

> "A creature of the starry skies,
> Too lovely for the earth to keep."

তরুদত্তের বাল্যরচিত কবিতার কতকগুলি উল্লেখ যোগ্যও নহে। কতকগুলি নিতান্ত অপরিপক্ব, গাম্ভীর্য্য-বিহীন, এবং দোষবহুল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবের কিরূপ বিকাশ হয় তাঁহার কবিতা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষভাগে লিখিত কবিতাবলী হইতে যথার্থ কবিত্বরসের আস্বাদ যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকেরাও জানেন সেক্সপিয়রের 'Midsummer Night's Dream' এবং 'Hamlet' এ রচনার কিরূপ প্রভেদ। সকল কবির সম্বন্ধে এই একই কথা খাটে।

তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার রচনায় কবিত্বের একটা লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। তাঁহার রচনা স্বতঃই সরল, অনাড়ম্বর এবং কবিতার ছন্দ মধুর ও সাবলীল।

'Ancient Ballads and Legends of Hindustan' নামক গ্রন্থটীতে হিন্দুদিগের কতকগুলি পুরাতন গল্প মধুর ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ হিন্দু রমণী না সাবিত্রীর উপাখ্যান পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হন? তরু দত্ত এইরূপ বহু প্রচলিত ভারতীয় গল্প তাঁহার সুললিত ভাষায় নূতনতর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

'Royal Ascetic and the Hind' কবিতায় নির্জ্জন কাননে কিরূপে একজন বানপ্রস্থাবলম্বী সম্রাটের মন একটী মৃগশাবকের

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিয়া কবি মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতার একটী হৃদয়গ্রাহী চিত্র প্রদান করিয়াছেন। সম্রাটের মৃত্যুকালে মৃগশিশুটী সজলনয়নে, পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে মলিনমুখ শিশুরই ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে! কি সুন্দর প্রাণস্পর্শী বর্ণনা! কবির প্রতিপাদ্য, কেবল কঠোর শারীর নির্য্যাতন দ্বারা দয়ার আধার ঈশ্বরকে পাইবার চেষ্টা করা ভুল। গল্পের এই মর্ম্মার্থটুকু শেষে সুন্দররূপে কয় ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"Not in seclusion, not apart from all,
Not in a place elected for its peace,
But in the heat and bustle of the world,
'Mid sorrow, sickness, suffering, and sin,
Must he still labour with a loving soul
Who strives to enter through the narrow gate."

তাঁহাকে পাইতে হইলে সংসারের দুঃখ, দৈন্য, বেদনা সমস্তই বরণ করিতে হইবে। তিনিই সমস্ত, কাজেই সমস্তকে স্বীকার না করিলে তাঁহাকে স্বীকার করা হয় না, তাঁহাকে পাওয়াও যায় না।

ধ্রুবোপাখ্যানটী এই মণিকাঞ্চনময় কাব্য-কুসুম মালার একটী উজ্জ্বল রত্ন। বালক ধ্রুব তাহার পিতার ক্রোড়ে উঠিবার আশায় পিতার নিকট গিয়া রাজার প্রিয়া ভার্য্যা মুখরা সুরুচির তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া মাতার নিকট ক্রন্দন করিতেছে। সুনীতি তাহাকে বুঝাইলেন—

"The sins of previous lives must bear their fruit."

কিন্তু কর্ম্মফলে মানুষ কষ্ট পায়, ধ্রুবের মন এ কথায় ভুলিল না, তাহার উত্তর কি বীরত্ব-পূর্ণ!

"There is a crown above my father's crown,
I shall obtain it, and at any cost
Of toil, or penance, or unceasing prayer."

কঠোর অধ্যবসায়, কঠোরতর প্রায়শ্চিত্ত এবং অবিচ্ছিন্ন প্রার্থনা দ্বারা—কিম্বা যেমন করিয়াই হউক সে পিতার মুকুট লাভ করিবেই।

"Well kept the boy his promise made that day!
By prayer and penance Dhruba gained at last
The highest heavens, and there he shines a star!
Nightly men see him in the firmament,"

ধ্রুব আপনার কথা রাখিয়াছিল। স্বর্গলোকের শীর্ষদেশে আজো সে অপূর্ব্ব আলোকে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিতেছে।

সিন্ধু, বটু, প্রহ্লাদ, সীতা প্রভৃতি কবিতাগুলির ছন্দ যেমন মধুর ভাবও তেমনি সুগম্ভীর! প্রবন্ধবিস্তারের আশঙ্কায় এগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা দমন করিতে হইল।

'Our Casurina Tree' কবিতাটি অতি সুন্দর! কবি বলিতেছেন,

"Dear is the Casurina to my soul :
Beneath it we have played ;
though year may roll,
O sweet companions, loved
with love intense,
For your sakes shall the tree
be ever dear !
Blent with your images,
it shall arise
In Memory, till the hot tears
blind mine eyes !"

কবি অতীত স্মৃতিতে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্টবন্ধনে আবদ্ধ ! গাছটির ছায়ায় কেমন করিয়া একদিন সঙ্গীদের সহিত আনন্দে কাল কাটাইযাছেন সেই শৈশবের স্বর্গসুখের দিন স্মরণ হওয়ায় গাছটি কবির নিকট কি এক অভিনবরূপে প্রকাশ পাইয়াছে !

তরু দত্তের প্রকৃতি বর্ণনা বড়ই সুন্দর। 'Ancient Ballads'এর কবিতাবলী পারিজাতকুসুমমাল্যের ন্যায় সদাই নূতন। যত পাঠ করা যায় প্রতিবারই নব নব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়।

'A sheaf gleaned in French fields' নামক গ্রন্থ chateaubriand, Heine, Victor Hugo, Sainte-Beuve, Dupont, Gramont প্রভৃতি নানা বিখ্যাত (অধিকাংশ ফরাসী) কবির অনুবাদ সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সাহিত্য-জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে মূলের ভাব ও সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস না করিয়া কবি নিজের কবিত্বেরও প্রভুত পরিচয় দিয়াছেন।

'The young Captive' (Andre Chenierএর অনুবাদ) কবিতার নায়িকার চক্ষে মানবজীবনই সৃষ্টিকর্ত্তার শ্রেষ্ঠ দান। তাহার উক্তি কি কারুণ্যে পূর্ণ—

"At the banquet of life
I have barely sat down,
My lips have but pressed
the bright foaming Crown
Of the wine in my cup
bubbling high.

* * *

O Death, thou canst wait ;
leave, leave me to dream ;

* * *

The world has delights,
the Muses have songs,
I wish not to perish too soon"

সে আজো জগৎপিতার শ্রেষ্ঠ দানটির সদ্ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারে নাই, এখনো যে সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই ! কবির নিজের জীবনদীপটি এমনি অকালে নিভিয়া গিয়াছিল !

ভিক্টর হিউগোর 'Universal Republic' কবিতা বেশ সুচারুরূপে অনূদিত হইয়াছে। ইহাতে টেনিসনের "Parliament of man, the Federation of the world"এর মত মানবের ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃভাবের কথা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে।

"Rancour and hatred are effaced
One picture in all hearts is traced,
One purpose animates all minds ;
Equality—no king, no chief."

পাঠ করিলে Shelleyর ছত্রগুলি মনে পড়ে—

"The loathsome mask has fallen,
the man remains—
Sceptreles, free, uncircumscribed,
but man :
Equal, unclassed, tribeless,
and nationless."

সমস্ত স্বাতন্ত্র্যের ভাব চলিয়া গিয়াছে। কোথাও আর বাধা নাই; শাসকের দণ্ড কোথায় খসিয়া পড়িয়াছে! বিশ্বে আর শ্রেণী নাই, জাতি নাই—সকলেই সমান।

'To a bereaved mother' (Jean Reboul এর অনুবাদ) কবিতায় শোকাকুলা মাতাকে পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ পাওয়া যায় না—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" প্রভৃতি কথায় দেবদূত শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—

"Here never is an unmixed joy,
Distinct from suffering and from pain,
Nothing, alas, without alloy ;
No smile but has its sigh again.

বাল্যকালাবধি তরুবালার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করিবেন এবং চিত্রবিদ্যাকুশলা ভগ্নী অরুবালা তাহার চিত্র অঙ্কন করিবেন। এই উপন্যাসখানি ফরাসীভাষায় এবং দৈনিকলিপির আকারে লিখিত হইয়াছে। ইহা ফরাসীদেশের একটি চিত্র, এবং নায়কনায়িকাগণও সেই দেশীয়। এখানি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

ইংরাজদিগের মধ্যে Elizabeth Barrett Browning প্রভৃতি অনেক মহিলা স্বীয় ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। একজন বঙ্গ-মহিলা যে ইংরাজী ও ফরাসীভাষায় এরূপ কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা ভারতের পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নহে। সুবিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Edmund Gosse তরুবালার 'Ancient Ballads' গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বিদেশীয় সাহিত্যে তরুবালার স্থান কত উচ্চে।

শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্রশিল্প।

ভারতীয় চিত্রের আদর্শ আমরা পাই, প্রথমত বৌদ্ধ গুহা থেকে, দ্বিতীয়ত—মোগল রাজাদের প্রাসাদ এবং পুস্তকে অঙ্কিত চিত্রাদি থেকে।

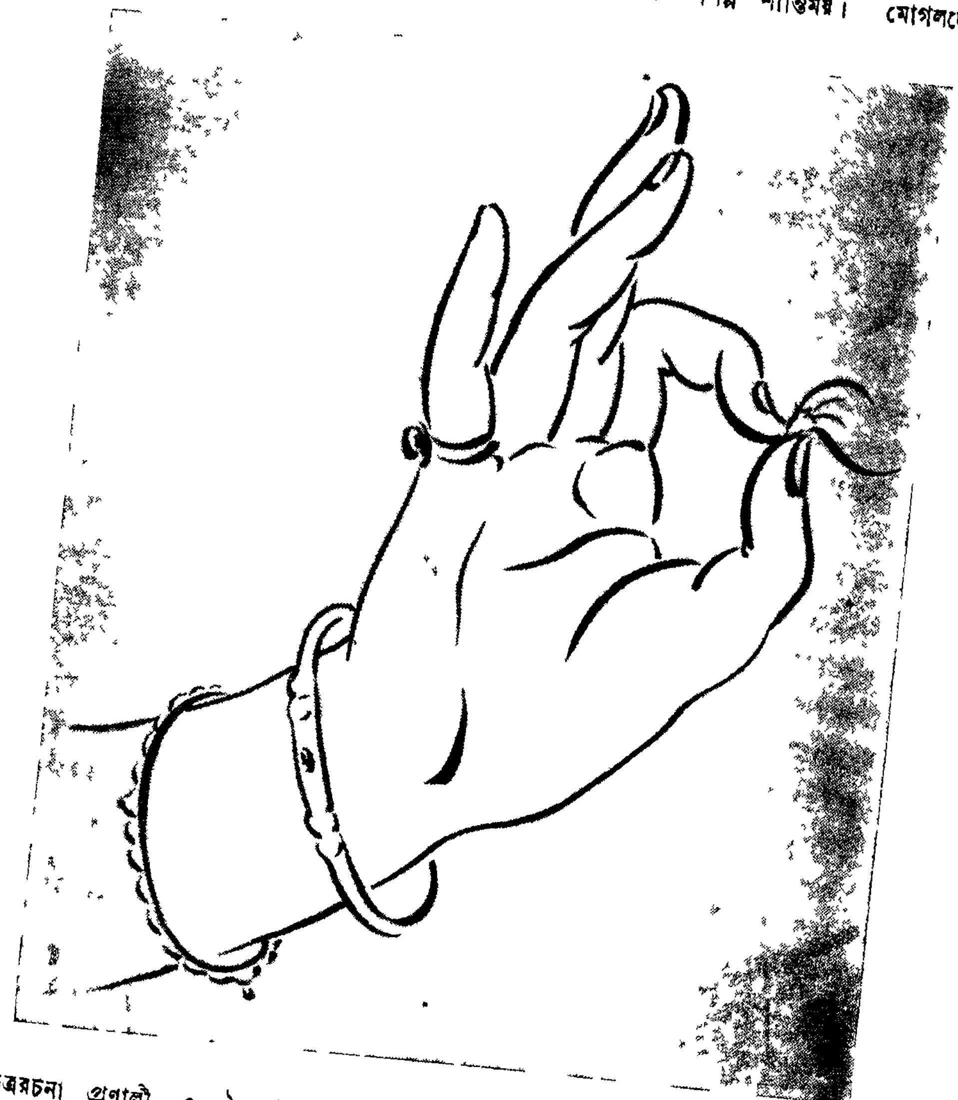
আমরা এখন দেখাতে চাই, এই বৌদ্ধ-যুগের আর মুসলমান যুগের ছবির মধ্যে কি কি বিষয়েই বা পার্থক্য এবং কি কি বিষয়েই বা ঐক্য আছে। মূলে দেখতে গেলে আমরা দেখি, উভয় শিল্প প্রায় একই নিয়মে রচিত। পাশ্চাত্য শিল্পের মত ওগুলি শুধু আলো ও ছায়ার খেলা দেখিয়ে পালাতে চায় না; ওরা ভাব ফুটিয়ে তোলবারই কেবল চেষ্টা করে। যাঁদের ধারণা, স্বভাবের হুবহু নকল করার নাম,

অথবা কাগজে থিয়েটার দেখানরই নামই চিত্র-শিল্প, তাঁরা যদি অজন্তা গুহায় পদার্পণ করেন তবে নিশ্চয়ই তাঁদের সে ভুল বিশ্বাস দূর হবে! একদিকে তাঁরা সুবৃহৎ চিত্র-ভাণ্ডার গুলির অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দেখে বিস্মিত হয়ে যাবেন, অন্যদিকে আমাদের দেশে শত-সহস্র বৎসর আগে এইরকম সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছিল বলে—আত্মগৌরবে অভিভূত হয়ে পড়বেন।

অজন্তার শিল্পীরা যে সমস্ত পরিকল্পিত চিত্রে গিরি-গুহা পরিশোভিত করে রেখে গেছেন সে সমস্তগুলির শুধু নকল করতে পারাও বিশেষ ক্ষমতার কায। এমন কি আমরা শুনেছি বিলাতের বড় বড় শিল্পিরাও সুন্দররূপে তার দুএকটা ছবিরও সামান্য প্রতিলিপি করে উঠতে পারেননি। বিশেষত ছবির যেখানে প্রাণ, অর্থাৎ ছবির আসল ভাবটা একেবারেই বজায় রাখতে পারেননি। মোগলশিল্পও ইংরাজ চিত্রকরগণের কাছে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! একটা নখের মত স্থানের মধ্যে সংখ্যাতীত কারু শিল্প যে কি করে দেখান যায়, তা' তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না। সূক্ষ্ম কারু-শিল্প বিষয়ে মোগল শিল্প শ্রেষ্ঠ; আর বৌদ্ধ শিল্প ভাব পরিকল্পনায় সর্ব্বপ্রধান।

আমরা যখন গিরি-গুহায় প্রবেশ ক'রে সর্ব্বপ্রথম সেই অনন্ত অসংখ্য কারু-শিল্প দেখলুম, তখন মনে হয়েছিল, এই সকল কাজ না জানি কত যুগ ধরে কতশত শিল্পী মিলে এঁকেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যতই সেগুলি দেখতে লাগলুম ততই আমাদের মনে হ'তে লাগ্‌ল, যেন অবলীলাক্রমে নির্ঝরের মত এই সকল বিচিত্র কারুশিল্পসমূহ শিল্পিগণের অন্তর হতে প্রবাহিত। সেগুলো তখন দেখ্‌লে আর মনেই হত না যে,সে সব অনেক মাথা ঘামিয়ে বা বহু পরিশ্রমে আঁকা। যেন আলাদিনের প্রদীপের গল্পের মত সে এক বিচিত্র ব্যাপার! এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন সূর্য্যালোক গুহাগুলো আলোকিত করত; তখন, গুহার দেয়ালের ছবিগুলি আলোতে যেন প্রাণ পেয়ে সজীব হ'য়ে উঠে আমাদের চোখে সে যে কি বিস্ময়ময় সৌন্দর্য্যের অবতারণা করতো তা বলা অসম্ভব! সে ব্যাপার যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনিই কেবল বুঝতে পারেন। দেয়ালের কোথাও রাজারাণী পারিষদবর্গে বেষ্টিত হ'য়ে সিংহাসনে ব'সে, কোথাও রাজ্যাভিষেক,—বাইরে ভিখারী বিদায় হ'চ্চে, কোথাও গান-বাজনা,—বেণু-বীণা বাজিয়ে নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা আসর জমিয়ে তুলেচে; কোথাও বা রাস্তায় রাস্তায় ঢোল মৃদঙ্গ নিয়ে সংকীর্ত্তন বেরিয়েছে, এই রকম আরও শত শত চিত্র এক সঙ্গে চোখের উপর ফুটে উঠে আমাদের যেন কোন্ এক নূতন অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাজ্যের মধ্যে নিয়ে যেত। প্রথম প্রথম আমরা কোন্‌টা ছেড়ে যে কোন্‌টা দেখ্‌বো ভেবে ঠিক্ করতেই পারতুম না! মনে হত যেন কি এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের মধ্যে পড়ে আত্মহারা হয়ে পড়চি! মোগল চিত্র দেখে এরকম ভাব আমাদের কখনও হয়নি। মোগল চিত্র চোখের সামনে ধরে তার মধ্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পের বিচার করে তবে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায়। মোগলচিত্রে আমরা প্রধানত বিলাস ও

ক্রীড়ার ভাবই দেখতে পাই। কিন্তু সমস্ত বৌদ্ধ চিত্রই একটা আধ্যাত্মিক আবেশও শান্তির ভাবে মণ্ডিত! এমন কি যুদ্ধ বিদ্রোহের ছবিতে পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব প্রবেশ করেছে। তা'হলে বুঝতে হবে মোগলশিল্প বিলাসপ্রধান এবং বৌদ্ধ শিল্প শান্তিময়। মোগলদের



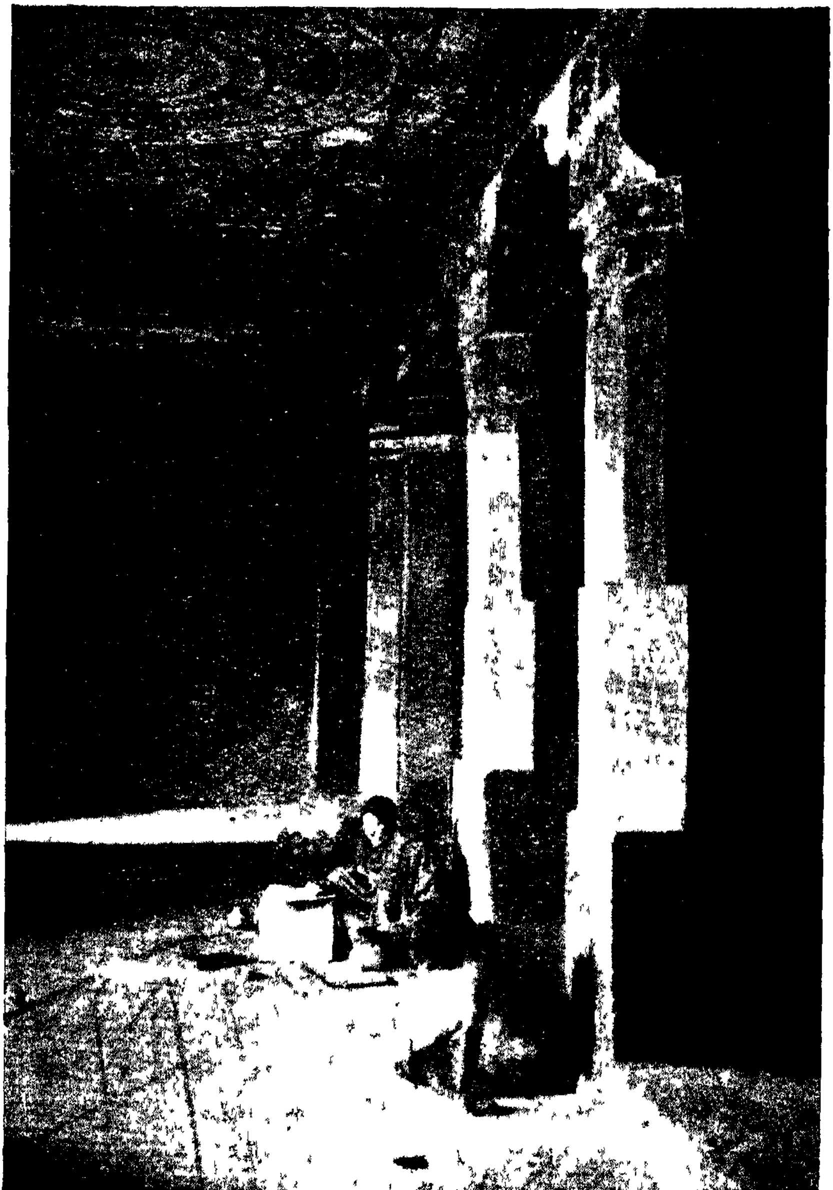
চিত্ররচনা প্রণালী ও বৌদ্ধ শিল্পিদের চিত্ররচনা প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। মোগল শিল্পিরা চিত্রের যে ভাব অতি চেষ্টা ও যত্ন নিয়ে ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা ফুটিয়ে তোলেন বৌদ্ধশিল্পীরা সেটা দুই চারটা সরু-মোটা রেখার টানে দেখিয়ে দেন। বৌদ্ধশিল্পী অঙ্কিত উপরের ছবিখানি দেখলে সেটা বোঝা যাবে। অজন্তাচিত্র

বর্ণসমাবেশেও অতি মনোরম!* তার প্রতিবর্ণ যেন চোখে স্নিগ্ধ শীতল ভাব আনে। মোগল কিম্বা অন্য কোন শিল্পে সে রকমটা প্রায় দেখা যায় না! বৌদ্ধ আর মোগলচিত্র উভয়েরই রঙের একটা প্রধান গুণ, শত শত বৎসরের পুরাতন মোগল ছবি এবং সহস্র বৎসরের জীর্ণ বৌদ্ধ ছবিগুলির কোনোটারই বর্ণে অদ্যাপি কোন রকম পরিবর্ত্তন ঘটেনি। সেগুলি যেন চিরনবীন! দেখলে হঠাৎ মনে হয়, এইমাত্র বুঝি কেউ রং দিয়ে গেল। স্বভাবত পরিবর্ত্তনশীল রঙের মধ্যে সাদা আর নীল রংগুলি অজন্তার ছবিতে এখনও এত পারক্ষাবরূপে বর্ত্তমান যে, ইংরাজ দর্শকেরা সে যে সহস্র বৎসরের পুরাতন রং, একথা মোটেই স্বীকার করতে চান না! তাঁরা বলেন, পরবর্ত্তী চিত্রকরেরা সংস্কারের সময় ওগুলিতে নূতন করে রঙ দিয়েছিলেন। যাহ হক্, ভারতীয় চিত্রের রঙ যে ইউরোপীয় তৈলচিত্রের চেয়ে স্থায়িত্বে শ্রেষ্ঠ সেকথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বৌদ্ধ শিল্পিদের অসীম ধৈর্য্য দেখলেও স্তম্ভিত হতে হয়! সেই অবরুদ্ধ অন্ধকার গুহার ভিতর নানান অসুবিধার মধ্যে বিশেষত ছাদের নীচে (ceiling) যে কি করে ঐ সমস্ত বিস্ময়কর ও নয়নানন্দ কারুকার্য্য করে গেছেন, এখন তা বোঝাই অসাধ্য। এ বিষয়ে মোগল চিত্রকর অথবা অন্য কোন দেশের চিত্রকরকেই এতটা কষ্ট স্বীকার করতে দেখা যায় না। আলঙ্কারিকশিল্প(decorative art) সম্বন্ধে বৌদ্ধশিল্পী এবং মোগল শিল্পিগণ প্রায় সমকক্ষ। অজন্তা গুহার শীর্ষদেশ সজ্জা (ceiling decoration) এক বিচিত্রকাণ্ড! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন মাথার উপর একখানি বহুমূল্য শালের চাঁদোয়া টাঙান রয়েছে! প্রত্যেক চাঁদোয়ার মধ্যে একটা করে প্রকাণ্ড শ্বেত পদ্ম বিকশিত; আর চারিধারে গোলভাবে সজ্জিত সারি সারি হাঁস, কিম্বা ময়ূর, অথবা মৃণাল দল-মন্থন-তৎপর হাতীর পাল; এবং চার কোণে নানারকম লতা-পাতার কাজ। সেগুলির মধ্যে যে একটা বিশেষ অর্থ আছে তা দেখলেই বোধ হয়। মোগল decorative চিত্র সূক্ষ্মতা হিসাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রের মত অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় না। অজন্তাগুহায় গাছপালার চিত্রগুলিও প্রায় নিখুঁত। মোগল চিত্রেও বৃক্ষাদির ছবি অতি সুন্দর! পাশ্চাত্য শিল্পিদের মত ওঁরা শুধু তুলির স্পর্শে একটা গাছের ভঙ্গ খাড়া করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন না; তাঁরা যতদূর সম্ভব গাছের পাতাগুলি এমন কি গুঁড়ির আকারের তারতম্য ঠিকভাবে এঁকে গাছের পরিচয় দিয়ে দেন; অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় চিত্রের গাছপালা দেখলে জিজ্ঞাসা করতে হয় না যে, 'এটা কী গাছ?' Perspective সম্বন্ধে অজন্তার ছবিতে প্রায় কোন ভুল দেখলুম না। মোগল শিল্পিরা বোধ হয় ও বিষয়ে ততটা লক্ষ্য রাখতেন না। আমরা এক নম্বর গুহার দেয়ালের এক জায়গায় একটা ছবির নকল নেবার সময় হঠাৎ পিছন ফিরতেই দেখলুম গুহার চারিদিকের বারান্দা দেওয়া প্রকাণ্ড হল ঘরটা

* এ সংখ্যা 'ভারতী'তে মুখপত্রের ছবি দ্রষ্টব্য।

যেমন, চিত্রকরেরা যেন ঠিক সেইটে ছবি এঁকেছেন। এতে বোধ হয় যে, দেখেই ছবিতে একটা বাবাণ্ডা দেওয়া হলের তখন Perspective বলে একটা কিছু কথা



ছাদের নীচের কারুকার্য্য

(অজন্তার সপ্তদশ গুহার চিত্র হইতে)

না থাকলেও তাঁরা ও বিষয় নেহাৎ অজ্ঞ ছিলেন না। তবে, তাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পিদের মত ওটাকেই ছবির সার বা চূড়ান্ত জিনিস বলে মানতেন না। অজন্তা ছবি ছায়া-আলোক সমাবেশেও (shade and light) নয়ন-তৃপ্তিকর। বিলাতী ছবিতে যেমন ছবির একদিকে খুব আলো আর অপর দিকে আঁধার ঘনিয়ে দিয়ে ছবির কোমলত্ব ঘুচিয়ে দেয়, এ তা নয়। অজন্তার ছবিতে গঠন দেখাবার জন্যে কোন কোন জায়গায় সামান্য, কোন কোন জায়গায় প্রচুর shade দেওয়া আছে।—তাতে ছবিতে ভারি চমৎকার এক স্নিগ্ধ ও স্বাভাবিক ভাব এনে ফেলেচে! মোগল ছবিতে কচিৎ shade দেওয়া দেখতে পাই। ইহার প্রধান কারণ,—তাঁরা সাধারণতঃ ছোট ছোট ছবি আঁকতেন বলে তাঁদের ছবিতে যেটুকু shade দিতেন তা চোখে প্রায় দেখা যায় না।

অজন্তার চিত্রে আমরা অ্যানাটমির ভুল কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। আমাদের সঙ্গে যে একজন ইংরাজ মহিলা শিল্পী (Mrs. Herringham) ছিলেন, তিনি বল্‌তেন, "এত প্রাচীন কালে আঁকা তোমাদের দেশে এরকম নিখুঁত ছবি দেখলে সত্য সত্যই আনন্দ হয়। আমাদের দেশে এ রকম ছবি থাক্‌লে আমরা তাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশী যত্ন করতুম! বড় দুঃখের বিষয় যে তোমরা এমন অমূল্য বস্তুর আদর জান না।" মোগল চিত্রকরগণ স্থানে স্থানে anatomy এবং proportion সম্বন্ধে বিশেষ অন্যথা করেচেন বটে, কিন্তু তাতে যে তাঁদের ছবির ছবিত্ব লোপ পেয়েছে তা নয়, বরং সেই জন্যেই তাঁদের অনেক ছবিতে সুন্দর শান্ত ভাব এসেছে।

অজন্তার ছবিতে আমরা যে সমস্ত নানা রকমের নিখুঁত ভাবে আঁকা জীবজন্তু, পশু, পক্ষী, গাছ-পালা, প্রাসাদ, দোকান, প্রাচীর, কুটীর প্রভৃতির চিত্র দেখ্‌তে পাই, সে সমস্ত কোনো আদর্শের অনুকরণ না করে কেবল কল্পনার দ্বারা যে কি রূপে তাঁদের মাথায় এসেছিল তা আমাদের জ্ঞানাতীত! তাঁরা তাঁদের চিত্রের দু এক জায়গায় যে সমস্ত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করেছেন, সে গুলির স্থানে স্থানে রং উঠে যাওয়ায়, তাহা অল্প অল্প প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সেগুলি দেখে, বেশ স্পষ্ট বোধ হ'ল যে, তাঁদের যা-কিছু যখন মাথায় আস্‌ত, অমনি গোবরমাটী-লেপা দেয়ালে সাদা রঙের একটা জমি করে এক এক তুলির টানে তা এঁকে যেতেন। তার পরে, তাঁদের ইচ্ছামত তার উপর রং দিয়ে ঢেকে সংশোধন কিম্বা পরিবর্ত্তন করতেন। আজকালকার মত পেনসিলের দাগ বারবার রবারে ঘসে ঘসে ইচ্ছামত বদল কিম্বা শোধ্‌রাতে পার্‌তেন না। এ বিষয়ে তৈল-চিত্রে অনেক সুবিধা; কেন না, নরম মাটীতে পুতুল গড়ার মত একটা ছবির উপর অবলীলাক্রমে যেমন ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করা চলে। অজন্তার শিল্পিরা ছবিতে সংশোধন করা একপ্রকার অসম্ভব জেনে, যে বিষয়টা আঁকতেন যথাসম্ভব তার রূপ ধ্যান করতে করতে যখন মানসচক্ষে দেখতেন সাদা দেয়ালের উপর ছবিটা ফুটে উঠেছে তখন তুলিতে হাত দিতেন! মোগল চিত্রকরগণ কিম্বা অন্য দেশের খুব অল্প শিল্পী

মহাত্মারাই ওরকম পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে জানতেন।

অজন্তা গুহার এক এক দেয়ালে এক এক ধরণের (style) ছবি। তা'তে বেশ বোঝা যায় যে গুহাগুলি একটা বিরাট শিল্প-বিদ্যালয় বা আশ্রম ছিল; এবং গুরু শিষ্যেরা মিলে এক একটা দেয়ালে ছবি আঁকতেন। আমরা অজন্তার দেয়ালে অসম্পূর্ণ ছবিও অনেক দেখেছি; কিন্তু, সে গুলির মধ্যে কতকগুলি অসম্পূর্ণ হ'লেও দেখে মনে হ'ল যেন কোন ওস্তাদেরই হাতের কাজ। ৮ নম্বর গুহায় এ অসম্পূর্ণ কাজের সংখ্যা অধিক। অল্পবয়স্ক বালকের হাতের কাজও কোন কোন দেয়ালে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

গুহার ক্ষোদিত শিল্পেও চিত্রশিল্পীগণ রং দিতে ছাড়েন নি; দুয়ের নম্বর গুহার বারাণ্ডায় দেখলুম থামের উপর এবং থামের ধারে ধারে সাদা high light দিয়ে থামের গঠন ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই নির্জ্জন ইন্দ্র-পুরী তুল্য গিরিগুহায় নির্ঝরিণীর পাশে, স্তব্ধ স্নিগ্ধ ভাবে বিভোর হ'য়ে পুণ্যাত্মা শিল্পিরা বাঁদর পেঁচা যা কিছু এঁকে গেছেন তারই ভিতর থেকে যেন আমরা এক অমৃতময় শান্তি ও আনন্দের বিকাশ দেখতে পাই! অজন্তার ছবির আর একটি বিশেষ বাহাদুরী এই যে, কোন ছবি কোনটার নকলে আঁকা হয় নি। প্রত্যেকটার ভাব ও ব্যাপার ভিন্ন। কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিরা বর্ণনায় যে সে ভাব ব্যক্ত করে গেছেন, অজন্তার ছবিতে সেই সমস্ত ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। কালিদাস যেমন বিবাহের বরযাত্রী দেখবার জন্যে উৎসুক মহিলাদের কাউকে লাজ-বর্ষণ-তৎপরা, কাউকে চুল বাঁধতে বাঁধতে,—কাউকে বা আলতা পায়ে দিতে দিতে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে জানালার কাছে উঠে আসতে দেখিয়েছেন;—অজন্তাতেও ঠিক্ সেই সমস্ত ভাবের ছবি অঙ্কিত আছে। পদ্মবনে হাতী, হংস-মিথুন, চকা-চকি, মৃগ-মৃগী প্রভৃতি পূর্ব্ব কবিদের বর্ণিত বিষয় অজন্তার ছবিতে দেখতে পাই। পূর্ব্ব কবিরা যেমন সুন্দরী ললনার উপমায় কৃশাঙ্গী, পীনপয়োধরা প্রভৃতির দ্বারা আকৃতি-বর্ণনা করতেন, আমরা অজন্তাতে ঠিক্ সেই বর্ণনার অনুরূপ চিত্র দেখতে পাই। কালিদাসের রঘুবংশে আছে, বন পথ দিয়ে যখন মহারাজ দিলীপ আর রাণী সুদক্ষিণা পুত্রকামনায় বিমানে চড়ে বশিষ্ঠঋষির আশ্রমে যাচ্ছেন, তখন তাঁদের রথের শব্দে হরিণ-হরিণীগণ কিছু মাত্রও ভীত ত্রস্ত না হ'য়ে বরং যেন রাজা রাণীকে দেখবার জন্যেই পথ ছেড়ে রথবর্ত্মের দিকে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে। অজন্তা চিত্রের মধ্যেও একটা ঠিক্ এই ভাবেরই ছবি আছে।

আমরা ছবিতে এমন-সব অনেক জিনিষ আঁকা দেখতে পাই, যে গুলো আমরা আমাদের ভারতের জিনিষ ব'লে মোটেই জানি না।—আমাদের বোধ হয় কারো ধারণাই নেই যে, বগলস'টা আমাদের দেশে অনেকদিন থেকে চলে আসচে! একটা ঘরে, কলকাতার ঠিক্ কুক কম্পানির ঘোড়ার আড়গড়ার মত অনেকগুলি ঘোড়া রাখা আর হুকের উপর সাজসরঞ্জাম টাঙান। দেখলে সত্যি সত্যি অবাক্ হয়ে যেতে হয়!

অজন্তার ছবি দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আদব কায়দায় যেমন কোট বা কুর্ত্তা-না পর্‌লে সভ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না, এবং অধিক গহনা পরাটা যেমন ভয়ানক বর্ব্বরতা, অজন্তার ছবিতে দেখি, ঠিক্ তার বিপরীত। যত নর্ত্তক-নর্ত্তকী আর সাধারণ লোকদের গায় কোর্ত্তা আঁটা, গয়না নেই বল্লেও হয়। আর যত বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকের অঙ্গেই অলঙ্কারের পরিমাণ বেশী। বড় লোকদের গায় কখনও কখনও কোমরে একটা নাম মাত্র সূক্ষ্ম উত্তরীয় ফিতের মত ক'রে বাঁধা। আর ভৃত্যগণ তাঁদের পার্শ্বে পান-পাত্র কিম্বা আর কিছু নিয়ে একান্ত অনুগত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব সেই সমস্ত দাসেরা বিদেশীয়। যাঁর যত পদমর্য্যাদা ও সম্মান বেশী তাঁর গায়ের গহনার মূল্যও তত অধিক।

অজন্তায় যে কেবল বড় বড় ছবিই আছে তা' নয়। ১৭নং গুহার সাম্‌নের বারান্দার এক পাশে দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড রথের চাকার ভিতর টুক্‌রো টুক্‌রো ছোট ছোট অনেক ছবি সুন্দর ভাবে আঁকা আছে। অজন্তায় যেমন মানুষের চেয়ে বড় ছবি দেখা যায়, তেম্‌নি চার পাঁচ ইঞ্চি ছবিও বিরল নয়। মোগল ছবি সাধারণত ছোটই বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সূক্ষ্মত্ব হিসাবে আজ পর্য্যন্ত কোন দেশের চিত্র ওর কাছে ঘেঁস্‌তে পারেনি, কিন্তু অজন্তার মত প্রশান্ত ভাবপূর্ণ এবং বড় চিত্রও বোধ হয় আর কোথাও নেই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

অঙ্কমালার উৎপত্তি।

পাটীগণিত বাঙলার নিজস্ব বলিলেও চলে; কারণ শুভঙ্কর বাঙালী ছিলেন এবং তাঁহার আর্য্যা, দেহের পক্ষে মাতৃদুগ্ধের ন্যায় প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক পরিপোষক! মানসাঙ্ক এই পাটীগণিতেরই অঙ্গ মাত্র, এবং বাঙালী যে এককালে বর্ত্তমান মাড়ওয়ারীগণের ন্যায় অতীব চতুর ও কর্ম্মঠ ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার অদ্ভুত ক্ষিপ্রগণনাকৌশলই তাহার প্রমাণ। বিবিধ প্রকার Table বা Ready Reckoner সাহায্যে, উচ্চ বেতন-ভোগী বর্ত্তমান হিসাব-নবীশ যাহা কষিতে গিয়া ডেসিমেলের সাহায্যে (দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা আবার মধ্যে মধ্যে Recurring এ পরিণত হয়) কোনরূপ একটা মোটামুটী সমাধা বাহির করেন, অনধিক-পঞ্চদশমুদ্রা-বেতন সে কালের পাঠশালে পড়া সরকার বা মুহুরী, কড়াক্রান্তি মিলাইয়া তাহার সিকি সময়ে সেই সমাধাটি মুখে মুখে বলিয়া দেন। দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গিয়া আজি কালিকার শিক্ষাভিমানী কয়জন, দাম ঠিক হইল কিনা বুঝিয়া লইয়া মূল্য দিয়া থাকেন? বিশেষতঃ ইংরাজের দোকানে

হইলে বিনা বাক্যব্যয়ে বিক্রেতানির্দ্ধারিত মূল্য দিয়া আসিয়া, পরে বাটীতে কাগজ কলমের সাহায্যে হিসাব করিয়া দেখিতে হয়।

শুভঙ্করের মানসাঙ্কের শিক্ষা থাকিলে আর এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙালী যে পাটীগণিত বা তদঙ্গীভূত মানসাঙ্কে নির্ব্বিবাদে পৃথিবীর অপরজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ ইহা বলা যাইতে পারে যে বঙ্গদেশ হইতেই অঙ্কমালার (Numerals) সৃষ্টি। যে জাতি যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর সেই জাতির মধ্যেই তাহার উদ্ভব বা প্রথমাবিষ্কার ঘটাইয়া থাকেন। বিজ্ঞানপটু ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যেই বাষ্পীয়যান ও বিদ্যুৎযান প্রভৃতি যন্ত্রের প্রথমাবিষ্কার; অধুনা কৃত্রিম শিল্প-বিদ্যাবলে সস্তার প্রলোভন দেখাইয়া জর্ম্মাণ, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যেও নিজ বাণিজ্য বিস্তারে প্রয়াসী, সেই জন্য কৃত্রিম প্রণয়ণ বিদ্যা এক্ষণে জর্ম্মণিরই একরূপ একচেটিয়া বলিলেই হয়। বাণিজ্যকুশল বাঙালী, সেই জন্যই বহুপূর্ব্বে, অঙ্কমালার উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

উক্ত কথার সমর্থনোপযোগী প্রমাণ প্রয়োগের পূর্ব্বে এইটুকু বলিয়া রাখি যে ইয়োরোপীয়গণ এক্ষণে স্বীকার করেন যে ভারতেই পাটীগণিতের প্রথম আবির্ভাব। ছোট বড় সকল ঐতিহাসিকই বলেন পাটীগণিত ভারতভূমি হইতে প্রাচীন আরবগণ কর্ত্তৃক মিশ্রদেশ পথে ইয়ুরোপে আনীত হয়—সুতরাং উহার পুনঃ সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ বা দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি। আমি নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা এইটুকু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব যে আমাদের 'সোনার বাঙলা'ই অঙ্কমালার উৎপত্তি স্থান।

প্রমাণ।

১। এক, দুই, তিন, চারি, প্রভৃতি শব্দের মাত্রা বর্জ্জিত প্রথম বা প্রধান অক্ষর ও অঙ্কমালার অঙ্কগুলি পরস্পর পার্শ্বে রাখিয়া উহাদের আকার সাদৃশ্য অবলোকন করুন। যথা:—

১	এ	এক
২	দ	দুই
৩	ত	তিন
৪	চ	চারি
৫	প	পাঁচ
৬	ছ	ছয়
৭	স	সাত
৮	ট	আট
৯	৯	নয়
১০	শ	দশ

বলা বাহুল্য, ট-ই আট শব্দের প্রধান অক্ষর ও শ-ই দশ শব্দের প্রধান অক্ষর! প ও ছ অক্ষর দুইটীর সামান্য পরিবর্ত্তনেই অর্থাৎ একের দাঁড়ি ও অপরের পুচ্ছ বাদ দিলেই ৫ ও ৬ হয়। "যোড়া পুটুলী শ লেখো!" কে জানিত এই যোড়া পুটুলী শ-ই অঙ্ক মালার 'জান' "০" অঙ্কের উদ্ভাবক? শ এর দাঁড়ি বাদ দিলেই ১০ অঙ্কটী পাওয়া যায় এবং শ এর দ্বিতীয় পুটুলীই শূন্য "০" অঙ্কের মূল।

দৈব সাহায্যই অনেক আবিষ্কারের মূল! মৃত ভেক-দেহের সহসা স্পন্দনই বিদ্যুৎ শক্তির উদ্ভাবক। দ্বিবিধ ধাতু ও তাহাদের সংযোগ সঙ্কেতের নির্দ্দেশক। দশ শব্দের শ অক্ষরটির এই বিচিত্র পুটুলী বহুল আকৃতি না থাকিলে

'শূন্য' প্রাণ অঙ্ক মালার সৃষ্টি আদৌ হইত কি না, কে বলিতে পারে?

২। এগারো, বারো, তেরো, প্রভৃতি শব্দের ও তাহার অর্থ ও অঙ্ক লিখন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝা যায় দশ অঙ্ক দুই অঙ্ক বিশিষ্ট (১ ও ০) হইবার পর, এগারো অর্থাৎ এক আর ও, বারো অর্থাৎ দুই আরও, তেরো অর্থাৎ তিন আরও এই রূপ ভাবে পর পর অঙ্কগুলি এক অঙ্কের পাশে যোজনা করিয়া অপর অঙ্কগুলি লেখা হয়।

৩। শ হইতেই যে শূন্য (০) অঙ্কের সৃষ্টি, তাহা বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ প্রভৃতির অঙ্কপাত প্রণালী দ্বারা সমর্থিত হয়।

৪ শূন্যের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা উপলব্ধি হইবার পর, অপর শূন্য প্রয়োগে ১০০, ১০০০, প্রভৃতি অঙ্কের সৃষ্টি হইয়া পাটীগণিত সম্পূর্ণ হইয়াছে—বলা বাহুল্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

ঝুমঝুমি। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউশ হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এখানি শিশুপাঠ্য গল্পের বহি। গল্পগুলি জাপানীগল্পের ভাব লইয়া রচিত। লিপিচাতুর্য্যে মৌলিক গল্পেরই মত সুন্দর ফুটিয়াছে। গল্পগুলি সহজ সরল ভাষায় উপভোগ্য, কৌতুক ও আনন্দ-রসের ধারায় স্নিগ্ধ। পাঠ করিলে দুরন্ত শিশুও বশ মানিবে। শিশুসাহিত্য-রচনায় মণিলাল বাবুর দক্ষতা অসাধারণ। "ইঁদুরের মোকর্দ্দমা" কবিতাটি সুন্দর,বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব ও মনোরম। গ্রন্থে এগার খানি নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মলাটের উপর কার্ণী ছাদে গ্রন্থের নাম ও ঝুমঝুমির চিত্রখানি চমৎকার হইয়াছে। ছাপা কাগজও উৎকৃষ্ট।

হৃদয় ও মনের ভাষা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-নাথ সিংহ প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। 'আগে ভাব খোঁজ, ভাবার অভাব থাকিবে না,' 'যে মানুষ ও যে জাতি যেমন, তাহার চিন্তা ও ভাবও তেমন—তাহার ভাষাও তেমন। ইংরাজী ও পার্শী শক্তির ভাষা—বলের ভাষা। সংস্কৃত ও গ্রীক, সত্য ও সুন্দরের ভাষা। লাটিন জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা। ইটালিয়ান, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা স্নেহের কোমলতার ভাষা,''ভাষার মধ্যে মানবের চিন্তা ভাব ও জীবনের অস্থি, কঙ্কাল সমাধিস্থ' প্রভৃতি কয়েকটি সুগভীর সত্য লেখকের যুক্তিতর্কে বেশ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুই এক স্থলে লেখকের সহিত আমাদিগের মতের মিল হয় নাই, তথাপি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা লেখকের সুগভীর চিন্তাশীলতা, ও কাব্যরসগ্রাহিতার পরিচয় পাইয়াছি। গ্রন্থখানিতে একটিও বাজে কথা নাই, এইটুকুই ইহার মনোরম বিশেষত্ব।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৭। বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে এইখানিই প্রথম গ্রন্থ। ভূমিকা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের আলোচনা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বে কেহই করেন নাই। সাহিত্য পথের পরবর্ত্তী পথিকেরা * কেহই নূতন মার্গে বিচরণ করিতে পারেন নাই। * * ন্যায়রত্ন মহাশয় যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন,

পরবর্ত্তীগণ পতিয়া সেই অট্টালিকার চুণ-বালি ধরাইয়া রঙ ফলাইয়া শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন মাত্র, নক্সা বদলাইতে পারেন নাই।" গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তনের কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা। অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাবকাল অবধি বাল্য, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস এই কালের লেখক। পরে ভারতচন্দ্রের সময় অবধি যৌবন, মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম, রামপ্রসাদ প্রভৃতি এই কালের লেখক এবং তাহার পর ইদানীন্তন অথবা বাঙ্গালা ভাষার প্রৌঢ়কাল। গ্রন্থখানির উপাদেয়তা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও ইহা বেশ সহজভাবে আগাগোড়া পাঠ করিতে পারিবেন। গবেষণার অত্যধিক ভারে বক্তব্য কোথাও চাপা পড়ে নাই—গ্রন্থের ধারাবাহিকতাটুকু গ্রন্থকারের লিপিকুশলতায় কোনখানে প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্যের কাল-নিরূপণাদি সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয় ফুটনোটে সে সমস্তই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পুরাতন মতও বাদ দেওয়া হয় নাই। গ্রন্থকার সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও কবিবর মাইকেল সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত অনেকেরই সহানুভূতি হইবে না। গ্রন্থের পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সমগ্র সাময়িক পত্রাদির সতারিখ এবং কতিপয় নবীন গ্রন্থকারের বর্ণানুক্রমিক তালিকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের নামের তালিকায় সম্পাদক মহাশয় 'বাহুল্যভয়ে' বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারেন নাই; উক্ত তালিকায় অপ্রথিত বা অজ্ঞাত নামা প্রায় সাত আট জন লেখকের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অথচ সুকবি ৺রজনীকান্ত সেন, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ও নবীন আরো দুই চারি জন প্রতিভাশালী লেখক এবং কবি প্রিয়ম্বদা দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী প্রভৃতির নামোল্লেখ দেখিলাম না। সম্পাদক মহাশয়ের এ কর্ত্তব্য-শৈথিল্য উপেক্ষণীয় নহে। আশা করি ভবিষ্যতে এ ত্রুটি স্খালিত হইবে।

কবীর। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। বোলপুর। মূল্য ছয় আনা। সাধু কবীর রচিত প্রায় শতাধিক দোঁহাবলী অনুবাদসহ সংগৃহীত হইয়াছে। কবীরের দোঁহার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। ক্ষিতিবাবু বিস্তর পরিশ্রম করিয়া বহু নূতন দোঁহা সংগ্রহ করিয়াছেন,—অনুবাদ গুলির ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল—মূলের ভাব কোথাও নষ্ট হয় নাই। এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার সম্পদ যে সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। গ্রন্থের ভূমিকায় কবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী-পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখকের উদ্যম জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

সাবিত্রী। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণে আমরা বই খানির যে প্রশংসা করিয়াছিলাম তাহার অতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই।

রেখা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতার বই। যতীন্দ্রবাবু কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার রচনায় কবিত্ব আছে, ভাবে মৌলিকতা, ভাষায় সরলতা, শব্দচিত্রে নিপুণতা ও ছন্দে একটা লীলা আছে। তাঁহার বর্ণনাগুলি ছবির মত ফুটিয়া উঠে। তাঁহার কোনো কোনো কবিতা রবিবাবুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও সেগুলি উপভোগ্য।

টুনটুনির বই। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি শিশুপাঠ্য গল্পের বহি। 'টুনটুনি পাখী,' 'দুষ্টু বিড়াল,' 'নরহরি দাস,' 'বুদ্ধুর বাপ,' 'পান্তবুড়ী' প্রভৃতি চিরপরিচিত গল্পগুলি গ্রন্থকারের সহজ সরল রূপকথার ভাষায় চমৎকার ফুটিয়াছে। বহিখানির জন্য শিশুরাজ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে। গল্পগুলি আগাগোড়া হৃদয়-গ্রাহী এবং সেগুলির মধ্যে বেশ একটি মনোরম বৈচিত্র্য আছে। বহিখানির পাতায় পাতায় ছবি—আকারে ছোট হইলেও সংখ্যায় অনেক। কভার

কাগজ পরিপাটি, এবং ছাপা, কান্তিক প্রেসের স্বাভাবিক মুদ্রণ-নৈপুণ্যেরই প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

আর্য্য-বিধবা। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত ও বগুড়া হইতে প্রকাশিত। রায়প্রেসে মুদ্রিত। ১২৯৯ সাল। মূল্য তিন আনা। ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে বিধবার কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে লেখক সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। সুখপ্রিয়া শিরাশ্রয়া বা সংযম-অক্ষমা নারীর পক্ষে বিবাহ দোষের নহে, কর্ত্তব্য; তবে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ-গৌরব চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহাই এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির প্রতিপাদ্য। লেখকের যুক্তিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত; গ্রন্থে কোথাও গোঁড়ামি নাই—সকলদিকই লেখক সহৃদয়তার সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

আর্য্য। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা। গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন—তাঁহার বিরাট ভাষা-গহন ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। রচনা যেমন নীরস, তেমনি দুর্ব্বোধ্য জটিল, গ্রন্থে ভাষার দোষ ও দৈন্যের দৃষ্টান্তও প্রচুর।

বঙ্গের রত্নমালা। বা বঙ্গীয় সমাজের কতিপয় নীতিগর্ভ ঘটনা ও চরিত্র। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নববিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। বাঁধাই মূল্য দশ আনা। বালকবালিকাগণের নীতিশিক্ষা প্রদানোদ্দেশ্যে সাধারণ ও অসাধারণ বাঙ্গালী-জীবনের ছোট বড় ঘটনা হইতে সৌভ্রাত্র, পরদুঃখানুভব, আহারে সংযম, চরিত্রে বল, কর্ত্তব্য-পালন, প্রভুপরায়ণতা প্রভৃতি শিক্ষণীয় গুণাবলীর দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার একটা উপভোগের দিক আছে। দেবচরিত্র বা বিদেশীয় মহৎচরিত্র অনেকস্থলে হৃদয়ে ঠিক ততখানি দাগ টানিতে পারে না, যতখানি আমাদিগেরই মত 'সাদাসিধা' বাঙ্গালী চরিত্রের দ্বারা সম্ভব হয়। গ্রন্থকার কলেজের অধ্যাপক হইলেও তাঁহার ভাষা বজ্র-নির্ঘোষের মত কর্ণপটহের পীড়াদায়িকা নহে, তাহা বেশ সরল ও সতেজ। সহৃদয়তার গুণে গল্পগুলি বেশ ফুটিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে ভাবভঙ্গির অভিব্যক্তিতে অযথা বাড়াবাড়ি আছে। যথা, "জননী এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।" 'চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির' প্রভৃতি রচনারীতি নিতান্তই অসহ্য ঠেকে! বালক বালিকাগণের নীতিশিক্ষার উপযোগী ত গ্রন্থখানি বটেই, উপরন্তু অভিভাবকগণও ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

খোকার বই। দ্বিতীয় ভাগ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসু প্রণীত। বারদী ঢাকা হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা মাত্র। এখানি শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থের ভাষা কটমট, নীরস এবং দুরূহ। "হরিভক্ত প্রহ্লাদ", "ভারতবর্ষ" প্রভৃতির ভাষা নিতান্তই অসহ্য! কবিতাগুলিতে না আছে ভাব বা ভাষা, না আছে কোমল ল্যালিত্য। কোন আখ্যানই ভালো করিয়া ফুটে নাই! শিশুদিগের পক্ষে গ্রন্থখানির উপযোগিতা বিষয়ে আমাদিগের ঘোরতর সন্দেহ আছে পাঠে অনুরাগের পরিবর্ত্তে শিশুহৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার হইবে।

মেহেরনেগার-কাব্য। শ্রীযুক্ত আব্বাচ আলী প্রণীত। মৈমনসিং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। গ্রন্থখানি কাব্য কি হেঁয়ালি ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। কবিত্বেরও একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইল। নমুনা স্বরূপ দুই ছত্র উদ্ধৃত হইল।

"* * বলি, এক কৌটা বিষপূর্ণ,
স্বকরে গলায় ঢালি পড়িলা ভূতলে।"

উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক। প্রকৃত ঘটনামূলক উপন্যাস। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। সাধনপুর "শরৎ পুস্তকালয়" হইতে প্রকাশিত। চট্টগ্রাম সনাতন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এমন বীভৎস ও সৃষ্টিছাড়া কল্পনা কচিৎ দেখা যায়। পনের বৎসরের বালক ও বারো বৎসরের বালিকা সকলেই গ্রামের পাঠশালায় একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করেন এবং প্রেমে পড়েন। গ্রন্থের নায়ক স্কুল পরিদর্শনে গিয়া একটী বার বৎসরের বালিকার হাত ধরিয়া 'বেণী বড় দুরন্ত বালক' পড়াইতেছিলেন, সহসা তাঁহার "শরীর শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ে তাড়িৎ-

বং কি প্রবেশ করিল। চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে পাইলেন; পুনঃ পুনঃ বালিকার মুখ দেখিবার ইচ্ছা জন্মিল।' আবার টিপ্পনী আছে,—"ঈশ্বরের সব ইচ্ছা" আমরা বলি, প্রভু ঔপন্যাসিক, আপনারই সব ইচ্ছা। এমন হীন প্রকৃতির যুবককে বালিকাবিদ্যালয়ের সীমানায় প্রবেশ করিতে দিতে নাই,—প্রেমে পড়িবার জন্য ইহারা যেন সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। এমন কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত লেখককেও উপন্যাস লিখিতে হইবে! হায় বঙ্গসাহিত্য!

কায়স্থ দর্পণ। প্রথম ভাগ, শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। সাবনপুর কায়স্থ সভা হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা বিশ্বকোষ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার বিধেয় এবং উপনয়নের প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখক বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কায়স্থগণের আচার ব্যবহার ও প্রধান প্রধান বংশের পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি নানা তথ্যে পূর্ণ, কৌতূহলোদ্দীপক। কায়স্থগণের নিকট সমাদর লাভের যোগ্য।

শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা। শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য লিখিত নাই। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। 'তিনি শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে এক বিপুল গ্রন্থের আয়োজন করিয়াছেন, এই পুস্তিকা তাঁহার ভূমিকা।" প্রথম ভাগে "শিক্ষাতত্ত্ব" ও দ্বিতীয় ভাগে "শিক্ষার প্রণালী" সবিস্তারে আলোচিত হইবে। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "গ্রন্থকারের যোগ্যতা অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া" এ মহৎ অনুষ্ঠানের সফলতা সম্বন্ধে সবিশেষ আশান্বিত। আমরাও তদ্রূপ আশান্বিত। গ্রন্থকার শিক্ষাব্রতে আপনার সকল চিন্তা সকল চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। শিক্ষাদান কার্য্যে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন। 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা' পাঠে গ্রন্থকারের শক্তি সম্বন্ধে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না। এমন পাণ্ডিত্য ও তাহার সদ্ব্যবহার আজিকালিকার এ স্বার্থের যুগে দুর্ল্লভ, প্রাচীন ভারতের কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক। শিক্ষার প্রকৃষ্টতর আদর্শ বাঙ্গালী উন্নতির পথে উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

ধ্রুব। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। লেখক আধুনিক নভেলের ছাঁচে ধ্রুবোপাখ্যান লিখিয়াছেন। রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে। যাত্রার ধরণের উচ্ছ্বাস ও হীন নাটকের রুচির পরিচয়ই সর্ব্বত্র প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ সুরুচি-চরিত্রে রুচির মর্য্যাদায় লগুড়াঘাত করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সঙ্কলিত। সরকার এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। লোকনাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের সংক্ষেপ-সঙ্কলনে সঙ্কলয়িতা বেশ কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। প্রয়োজনীয় অংশগুলি কোথাও বাদ পড়ে নাই। ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। তবে ফুটনোটের টীকাগুলি সর্ব্বত্র সহজ হয় নাই। 'স্বয়ম্বরা'র ব্যাখ্যা 'নিজেই স্বামী বাছিয়া নিতে ইচ্ছিতা' তেমন সহজ বলিয়া মনে হইল না। গ্রন্থে দুইখানি হাফটোন চিত্র আছে—ছাপা ভাল, তবে পরিকল্পনা সুখ্যাতির যোগ্য নহে। গ্রন্থের মূল্য সুলভ।

অভিনয়-প্রণালী ও অথার। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত প্রণীত। শ্রীঅমূল্যচরণ নাগচৌধুরী (নাট্যভূষণ) কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রেট ইডিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনামাত্র। 'অভিনয় সম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব হেতু এবং অধুনা অভিনয়ের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া' গ্রন্থকার লেখনী ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। গ্রন্থকার 'অভিনয় প্রথারূপ পথের আবর্জ্জনা' দূর করিতে গিয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া প্রহসনকারের গীতের ছত্র মনে পড়ে, 'আপনি অন্ধ দৃষ্টি বন্ধ, পরকে দেখায় পথ।' 'অথার' ক্ষুদ্র রঙ্গপ্রহসন, 'অথার' নামধারী অক্ষম লেখককে ব্যঙ্গ করাই 'অথারের'

উদ্দেশ্য। পাঠ করিয়া 'ছুঁচ' ও 'চালুনীর' প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ-কথা, মনে পড়ে।

সংসারী। (হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা পুস্তক) ডাক্তার এম, সি, ব্যানার্জী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পশুপতি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। গ্রন্থখানিতে হোমিওপ্যাথি মতে রোগ নির্দ্দেশ ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা বেশ সহজ ভাষায় সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জ্বর, ওলাউঠা, ও জটিল স্ত্রী-ব্যাধি হইতে ক্রিমি, চুলকণা অবধি রোগের ঔষধ নির্দ্দেশে গ্রন্থখানি সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ উপ-যোগী হইয়াছে। অথচ গ্রন্থের কলেবর হিসাবে মূল্যও সুলভ। ডাক্তার মহাশয়ের ইংরাজী ধরণে নামকরণের সহিত আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই। এ ব্যাধি তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিল কেন, ইহার প্রতিকার সাধনে ডাক্তার মহাশয়ের মনোযোগ আমরা সবিনয়ে আকর্ষণ করিতেছি। এ নাম-বিভ্রাট আর কেন?

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

খাদ্য। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু প্রণীত। মূল্য এক টাকা। আমরা চুনীলাল বাবুর খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তকখানি অতি যত্নের সহিত পড়িয়াছি। পুস্তকখানি প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ ও নানা বিষয়ের অনুশীলনে বড়ই শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

সাধারণ পাঠকের বুঝিবার সুবিধার জন্য শারীর বিজ্ঞানের পরিপাক প্রণালীর ও ছবির সহিত সরল বিবৃতি আছে। তা ছাড়া আরও অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা

স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের গুণ।

খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণ। নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

রন্ধন। আমিষ ও নিরামিষ ভোজন। খাদ্যে ভেজাল ও তন্নিরূপণের উপায়। ইত্যাদি।

আমাদের দেশের খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি বিরল। ডাক্তারবাবুর এই ছোট পুস্তকখানিতে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সঙ্গত অনেক কথা বিবৃত আছে। তাহাতে পুস্তকখানি দেশের লোকের খাদ্য সম্বন্ধে পড়িবার ও শিখিবার বড়ই উপযোগী হইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা অতি সরল ও বলিবার প্রথা অতি প্রাঞ্জল হওয়াতে সকলেরই সহজে বোধগম্য হয়।

আমাদের দেশে বিশেষ কলিকাতায় প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যই অল্প বিস্তর ভেজাল দেওয়া। আইন করিবার সময় এমন একটু শিথিলতা ছিল যে লোকে ভেজাল জিনিষ বেচিলেও যদি

"ভেজাল দেওয়া" "মিশ্র দুধ" "মিশ্র ঘী"

বলিয়া বেচে, তবু তার আইনমত দোষ হয় না। চুনীবাবু এসকল নিবারণ করিবার অনেকগুলি উপায় দেখাইয়াছেন। তিনি সাধারণ লোকদেরও সাবধান হইতে বলেন ও কোম্পানী বাহাদুরকে আইন সংস্কার করিতে বলেন।

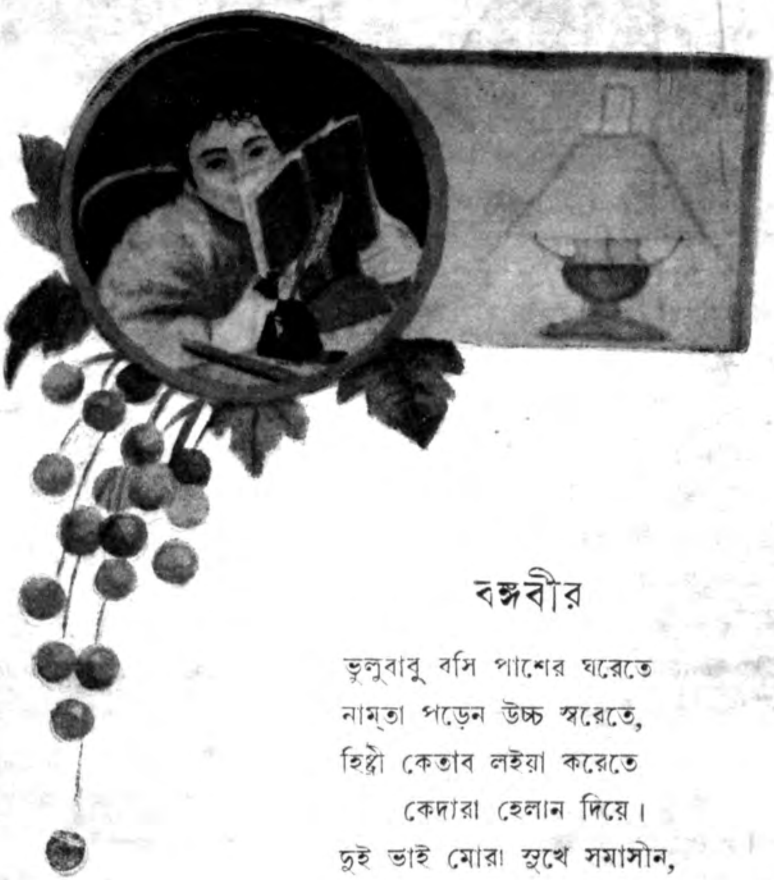
চুনীবাবুর এই মত অনুসরণ করিয়া যদি ভেজাল দেওয়া খাদ্যের প্রচলন বন্ধ হয় ত দেশের কত উপকার হইবে। কলিকাতায় খাদ্যের দোষে কত লোক মন্দাগ্নি অম্ল প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেছে। ও কলেরা টাইফইড যক্ষ্মাকাশ ইত্যাদি রোগও দুষ্ট খাদ্য হইতে উৎপন্ন। দুধ ঘী প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের অনেক জিনিষই ভেজাল দেওয়া। দেশের লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা কত হানিকর। দুধের অভাবে ও দুধের দোষে আমাদের দেশে হাজার করা তিন শত তেত্রিশটি শিশু মারা যায়। এ সকলের প্রতিকার স্বরূপ তিনি যে কয়টি উপায় করিতে বলিয়াছেন তা মোটামুটি এই

১ লোক শিক্ষা। ২ আইন সংস্কার। ৩ আব-শ্যকীয় ব্যবসায় যৌথ কারবার রূপে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের—মনোযোগ ও চেষ্টা।

এই সদুপদেশপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত পুস্তকখানি আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীদের হাতে পড়িয়া নিশ্চয় অশেষ সুফল দিবে। এ পুস্তকখানি ঘরে ঘরে রাখা উচিত।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বঙ্গবীর

ভুলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে
নাম্‌তা পড়েন উচ্চ স্বরেতে,
হিষ্ট্রী কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান দিয়ে।
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরোসিন,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন,
দাদা এম এ, আমি বি এ।

—রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা হইতে।

ইউ, রায় কর্ত্তৃক ব্লক]

[কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ [৮ম সংখ্যা

ভাবসাধন।

চিরকাল যাহার সঙ্গে আড়ি করিয়া বসিয়া আছি, আজ হঠাৎ 'এস' বলিয়া তাহার দিকে কর প্রসারণ করিলেই যে সে আমাদের হইয়া যাইবে এমন কথা কে বলিল? ঘরের শিল্প, তাহার সঙ্গে ভাব রাখিবার কোন পন্থা, কোন ইচ্ছা আমরা এতকাল রাখি নাই, আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই নিজস্ব শিল্পের সঙ্গে ভাবের অভাব ঘটাইবার জন্যই এতদিন প্রয়োগ করিয়া আসিতেছিলাম, আজ সখ হইয়াছে ভাব করিব কিন্তু তাহা হয় কই? এখন সাধিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া ভাব করা ছাড়া তো উপায় নাই।

শিল্প তো সখের খেলনা নহে, সাধনার বস্তু। রত্নহার নির্জীব পদার্থ, তাহাকে যখন ইচ্ছা টানিয়া ফেল, যখন ইচ্ছা কণ্ঠে ধর। কিন্তু বন্ধুর বাহুপাশের মত পূর্ব্বপুরুষগণের ভাব সঞ্জীবিত যে শিল্প তাহাকে আজ টানিয়া ফেলিলে কাল চাহিবামাত্র ফিরিয়া পাওয়া দুষ্কর।

ভা ও ব সহজ দুইটা অক্ষর যে টানকে বুঝায় মনে সেটার অভাব থাকিতে প্রাচীন ভারতশিল্পটা যে আমাদের যত্নের আদরের ও গৌরবের সামগ্রী এটা আমরা কিছুতেই বোধ করিতে পারিব না, সুতরাং এ অবস্থায় তাহাকে বুঝিতে অথবা বুঝাইতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। ঠিক কোন্ ভাবে ভারতশিল্পটা গ্রহণ করিব তাহা বোঝা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিতেছি যে পাশ্চাত্য শিল্পটা যেমন অবাধে আমাদের কাছে ধরা দিতেছে মনে হইতেছে, ভারতশিল্পটা সেরূপ করিতেছে না। শিল্পের যে একটা গুণ সহজে সাধারণের বোধগম্য ও মনোরঞ্জক হওয়া যেন সেই গুণের অভাব ভারতশিল্পে লক্ষ্য করিয়া আমরা ভারতশিল্পকে নানা দোষদুষ্ট অপরিণত এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদের নিকট কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই যে সকল সময়ে ভারতশিল্পটারই দোষ একথা বলিতে পারি না, এ বিষয়ে আমাদের নিজের দিকেও যে ভারতশিল্পকে বুঝিবার একটা প্রকাণ্ড অক্ষমতা জন্মিয়াছে সেটা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

অল্পকালই হইল আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পড়িয়াছি এবং এই অল্প কালের মধ্যেই প্রাচীন ভারতবাসীর ভাব গতিকের সহিত আমাদের ভাবগতিকের একটা প্রচণ্ড বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন করিয়া যে কাজটি করিতেন, যে সকল বিষয় লইয়া

যে ভাবে চিন্তা করিতেন, আমরা আজকাল ঠিক সেরূপটা করিনা। উন্নতির পথেই বল বা অবনতির দিকেই বল অগ্রসর হইতে হইতে আমরা প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার সহিত যোগাযোগের পথ প্রায় রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছি সুতরাং এ অবস্থায় ভারতশিল্পের নিগূঢ় সৌন্দর্য্য বুঝিবার অবসর আমাদের কোথায়? অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রাচীন ভাব নদীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পিপাসা তো আমাদের কোন দিন মিটিবে না উপরন্তু নবীন নাম ধরিয়া চিৎকার করিলে স্বরভঙ্গ হইয়া মরিবারই সম্ভাবনা। এ অবস্থায় তপস্যা করিয়া নদীর স্রোত নিজের দিকে আনা, নিজেকে প্রাণপণে নদীর দিকেই অগ্রসর করা অথবা ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিয়া স্থির থাকা ছাড়া উপায় কি! নীরস আধুনিক ও বিজ্ঞান যুগের মরু প্রান্তরে আমরা প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি, জীবনে ভাবের প্রভাব সৌন্দর্য্যের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া কোন নরকের দিকে যে আমরা অগ্রসর হইতেছি তাহা বুঝিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত আমাদের লোপ হইয়াছে।

বিজ্ঞানের চোখে শিল্পটাকে দেখা চলেনা, ভাবের চক্ষে ধরা যায়। বিজ্ঞানের চক্ষে শিল্পে এটার অভাব ওটার অভাব, আর ভাবের চক্ষে সকল অভাব পূর্ণ হইয়া শিল্পের স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। কি ভারত কি ইউরোপীয় সকল শিল্পকেই বুঝিবার এই একমাত্র অমোঘ উপায়।

প্রাচীন ভারতশিল্প যেটা প্রাচীন ভারতবাসীর ভাবের বিকাশ সেটাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহি কিন্তু হৃদয়টাকে বিপরীত ভাবের বর্ম্মাচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিয়া। এ অবস্থায় ভারতশিল্প যে কোনদিন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে এ আশা দুরাশা।

এই নবযুগের সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের অনুবীক্ষণ সাহায্যে লুপ্ত অক্ষর উদ্ধার করিয়া প্রত্নতত্ত্ব প্রকাশ করা চলে কিন্তু তাহাতে পুরাতন পুঁথির ভাব ও রস গ্রহণে কোন সহায়তা করে না। শিল্পেও তেমনি ভাবের চশমা না লাগাইলে আমাদের কোন লাভেরই আশা নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রাচীন সভ্যতার ও ভাবের সহিত যদি আধুনিক আমরা বিচ্ছিন্নই হইলাম তবে প্রাচীন শিল্পটাকেই বা ধরিয়া থাকিব কেন? আমরা একটা নূতন অবস্থার উপযোগী নব শিল্পের অবতারণা কেন না করি? অবশ্য এ কথা গ্রাহ্য হইবে সেইদিন যেদিন আমরা নবভাবে এমনই অনুপ্রাণিত হইব যে ভারতবাসী বলিয়া আমরা নিজেকে স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারিব না, যে দিন আমাদের কাব্য সঙ্গীত আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম আমাদের নিকটে অসভ্যের খেয়াল কৌতুকের সামগ্রী মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

নব নব জ্ঞানের রেলগাড়িতে চলিয়া যে দ্রুত গতিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি—তাহাতে সেদিনের আর বড় বিলম্ব নাই, কিন্তু আশার বিষয় এই যে ভারতের কোটী কোটী নরনারীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক জীবই এই মহাযাত্রায় টিকিট কিনিয়াছি।

দেশের কুলকামিনীগণের হস্ত হইতে সেই সত্যযুগের শঙ্খ আভরণ এখনও স্খলিত হয় নাই। বেদ ধ্বনিতে ব্রাহ্মণেরা এখনও আকাশ

ধ্বনিত করিয়া থাকেন, দেশের সাড়ে পনরো আনা শিল্পির নির্ভর এখনও সেই প্রাচীন শিল্পেরই উপর, দীন দরিদ্র ধনী গৃহস্থ যতি সন্ন্যাসী এখনও অন্তরে অন্তরে সেই আর্য্য সভ্যতার অম্লান তিলকাঙ্ক বহন করিতেছে, আর ভগবান এই ভারতের ষড়ঋতুর সৌন্দর্য্যবিকাশে চিরন্তন প্রথার কোন ব্যতিক্রম ঘটতে দিতেছেন না। কালিদাস যে বর্ষার গান শরতের শোভা বসন্তের মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন সেই গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুগণ ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়া আজও আসিতেছে যাইতেছে তবে কেমন করিয়া বলি নূতন শিল্প আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে!

এই কলিকাতা সহরে এখনও এমন লোকও আমি দেখিয়াছি যিনি ক্রোরপতি হইয়াও নিজের Portrait অঙ্কিত করাইবার সময় নিজেকে মহামূল্য সিংহাসনে না বসাইয়া গুরুদেবের ছত্রধারিরূপে অঙ্কিত করাইয়াছেন। আর্য্য সভ্যতা যখন এখনও ওতঃপ্রোতভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে তখন অতি শিক্ষিত আমাদের মত দুই দশজন বাঙালীর কথায় আর্য্যশিল্পকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন দিতে যাওয়া মূর্খতার কার্য্য।

যতদিন না এই ভারতখণ্ড তাহার তেত্রিশকোটী নরনারী তাহার এই শস্যশ্যামলা মূর্ত্তি লইয়া সমুদ্রের অতল গর্ভে প্রবেশ করে ততদিন জগতের লোক আমাদের প্রাচ্যজাতি বলিয়াই জানিবে এবং আমাদের নিকট হইতে প্রাচ্য শিল্পই প্রত্যাশা করিবে, ইতালীয় শিল্পও নয় ফ্রেঞ্চ শিল্পও নয় অথবা প্রাচ্য ইতালীয় এবং ফ্রেঞ্চ শিল্পের খিচুড়িও নয়। এ অবস্থায় ইউরোপের সহিত Loan খুলিবার যে বিশেষ আবশ্যক আছে এমন বোধ করি না।

আমরা নিজের ভাণ্ডার হইতে সল্প হইলেও যেটুকু দান করিব জগৎবাসীর নিকটে তাহারই মূল্য আছে, আর ধার করিয়া যেটা বিতরণ করিয়া যাইব তাহা চিরদিন চোরাই মালের সামিল হইয়া থাকিবে।

সমস্ত মানবজাতির মধ্যেই ভাবের আদানপ্রদান যখন চলিতেছে তখন শিল্পও আদানপ্রদান চলিতে থাকিবে, সেটাকে ঠেকাইবার সাধ্য কাহারও নাই এবং সেরূপ আদানপ্রদানে দোষও দেখি না, কিন্তু দানই গ্রহণ করিতেছি দান করিতে অপারক এরূপটা হইলে আজ না হউক দশদিন পরেও অর্দ্ধচন্দ্র আমাদের ভাগ্যে সুনিশ্চিত।

Science of Perspective ইত্যাদি তুচ্ছ সামগ্রীর লোভে পুরুষ-পরম্পরাক্ষ যে আশ্চর্য্য শিল্প কৌশলটা হারাইতে বসিয়াছি সেটা জগতের আর কোন শিল্পও আমাদের দিতে পারিবে না। এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া perspective, anatomy আরও কত কি আমরা দখল করিয়াছি কিন্তু প্রাচীন ভারতের একটা মন্দির চূড়া অথবা একটি চিত্রের এক রেখা এক বর্ণও পুনঃসংস্কার করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছি বলিয়া তো বোধ হয় না! তবে বৃথা পরিশ্রমে কোন্ লাভ? নূতন artএর সৃষ্টি করিতেছি এমন অহঙ্কারও আমরা রাখিতে পারি না, কেননা এই পঞ্চাশ বৎসরে ইউরোপীয়

শিল্প আমার যেটুকু অধিগত হইল সেটুকুও ইউরোপে এখন অপ্রচলিত out of fashion হইয়া পড়িয়াছে সুতরাং সেটা লইয়া ইউরোপের হাটবাজার গরম করিতে চেষ্টাও বৃথা, ইউরোপ এখন প্রাচ্যদেশের পুরাতন প্রদীপের মূল্য বুঝিয়াছে এবং তাহার আদরও করিতে শিখিয়াছে।

একবার আমার এক সাহেব বন্ধু আমাদের দেশের ঠিক বিলাতি দস্তুর মত লেখা কতকগুলি oil painting দেখিয়া বলিলেন এরূপ তো আমাদের Englandএ মেয়েরা পর্য্যন্ত আঁকে! লোকটা নিজেই artist এবং যেভাবে ঐ কথাগুলা বলিল তাহাতে আমার একটু রাগ হইল। ঠিক সেই সময় আমার হাতের কাছে কয়েকখানা চিত্র পুস্তক ছিল আমি তাহা হইতে একখানা লইয়া বলিলাম 'দেখ দেখি এগুলা কেমন'? সে বলিল এমন সুন্দর ফুল পাতা ইউরোপের কোন artistই আঁকিতে পারে না। আমি এইবার শোধ তুলিয়া বলিলাম এগুলি জাপানের Girl Schoolএর বালিকাগণের হাতের কাজ। তারপর আমাদের প্রাচীন শিল্পের পালা পড়িল। অর্দ্ধ ঘণ্টা আহা উহু ইত্যাদির পর সাহেবটি আমায় বলিয়া গেলেন যে "যে হিসাবে জাপানের Girl Schoolর drawing গুলি ইউরোপকেও হার মানায়, ঠিক সেই হিসাবে ভারত-শিল্পের নিজস্ব সামগ্রীটাও জগৎবাসীর কাছে আদর পাইবার যোগ্য এবং সে সামগ্রীটি হচ্ছে individuality.

সৃষ্টি হওয়া অবধি কালে কালে সকল দেশের সকল শিল্পই জগতের বক্ষে আপন আপন ছাপ রাখিয়া গেছে। শিল মোহরের মত এক ছাপ অন্যের গ্রহণ করিবার অধিকার নাই! আমাদের ভারতশিল্প যে ছাপ রাখিয়া গেছে তাহা ভারতসন্তান হইয়া পরিবর্জ্জন করিবার ক্ষমতা আমাদের কোথায়! এই শিলমোহরের ছাপ ভৃগুপদচিহ্নের মত চিরদিন ভারতের বক্ষে শোভা পাইবে, আমাদের ডসনের বুটের শত ঘর্ষণেও মুছিবার নয়। প্রাচীন শিল মোহরটা হল্ মার্কের মত সুদৃশ্য না হউক কিন্তু জগৎ শিল্পের খাতায় ভারতশিল্পের মোহরে অদলবদল ঘটাইবার ক্ষমতা আর্য্য শিল্পের স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত কোন্ ভারতবাসীর আছে!

সমরক্ষেত্রে যুদ্ধের নিশানটা সব সময়ে মহামূল্যও নয় মহাসুন্দরও নয় কিন্তু লোকে প্রাণপণে তাহারই গৌরব রক্ষায় ব্যস্ত! আর ভারতশিল্পের ইন্দ্রধ্বজাটা কুশ্রী বলিয়া ধূলায় লুটাইয়া আমরা কোন্ কীর্ত্তিলাভ করিতে চলিয়াছি?

ভারতশিল্পের আকৃতি বিকৃতি ইহারই তর্ক মীমাংসা করিতে দিন কাটাইয়া কি লাভ। যে সুচেহারা দেখিয়া বন্ধুতা করিতে চলে তাহার পক্ষে বন্ধুলাভ যেমন দুর্ঘট, বিচার করিয়া তেমনি ভারতশিল্প কেন জগতের কোন শিল্পকেই পাইবার সম্ভাবনা নাই। অনিন্দ্য সুন্দর শিল্প মর্ত্তলোকে দুর্ল্লভ। যদি সত্যই আমরা ভারতশিল্পের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া সুখী হইতে চাহি তবে তুমি সুন্দর নও, তোমার হাত পা কাঠির মত, তোমাতে perspective নাই, তোমার দেহের অস্থিগুলা ডাক্তারি শাস্ত্রসম্মত নয়, ইহা বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলে কই? তুমি

কালো অতএব আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমার হৃদয় আলো করিয়া থাক তোমাকে সকলে তুচ্ছ করে করুক আমি তোমাকে গৃহে স্থান দিব, তোমাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইতে পারিব না, আমার কাছে তোমার তুলনা সে একমাত্র তুমি!—এই ভাব সাধন করিয়া যেদিন আমরা ভারতশিল্পের দিকে অগ্রসর হইব সেইদিনই শিল্পচর্চ্চায় আমরা সফলতা লাভ করিব। সেইদিন ভারতশিল্পের শীর্ণ কঙ্কালের ভিতরে আমরা যে পরমানন্দের অমৃত কণার সন্ধান পাইব তাহার কাছে শিল্পের বহিরঙ্গীন অংশগুলার মাদক আকর্ষণ কত না তুচ্ছ হইয়া যাইবে। বিকলাঙ্গী জননীকে যদি ভালবাসিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমাদের দেশের পাশ্চাত্য শিল্পপন্থীরা যাহার হাড়গোড় মুচড়াইয়া ডাক্তারি শাস্ত্রমতে সোজা করিতে প্রয়াস পাইতেছে সেই অনাদৃত শিল্পকে ভাল বাসিবার পক্ষে ভারতবাসী আমাদের যে কোন বাধা আছে এরূপ কল্পনা মনে স্থান দেওয়াতেও পাপ আছে মনে করি।

ভারতশিল্পটা আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য হইবার কারণ ভারতশিল্পের মধ্যে নাই, কারণটা সম্পূর্ণরূপেই আমাদের অন্তরে কৃমিকীটের মত বাসা বাঁধিয়া আছে।

"যাকো রহে ভাবনা যৈসি
প্রভু মুরত দেখি তিন্ তৈসি।"

দুর্ভাবনার দিনে শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রও আমাদের কাছে মলিন বোধ হয়, সেটা বিশ্বশিল্পিরও দোষ নয়, চন্দ্রেরও দোষ নয়, দোষ এই অধীর মনেরই বলিতে হয়।

নব সভ্যতার স্রোত প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা হইতে আমাদের দিন দিন দূরেই লইতেছে। প্রাচীন শিল্প সাহিত্য কাব্য অলঙ্কার ভাব ভাষা প্রভৃতির সহস্র বন্ধন হইতে ক্রমশ বিযুক্ত হইয়া এমন অবস্থায় আমরা পড়িয়াছি যে এককালে যে শিল্পটা সম্পূর্ণ আমাদের ছিল আজ তাহাকে আলোচনা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা পাইতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে? শিল্প বিষয়ে এরূপ দীনতা আর কোন জাতির অদৃষ্টে কোন দিন ঘটিয়াছে কি! এই দীনতা আমাদের কিছুতেই ঘুচিবেনা যতদিন না প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও কলাবিদ্যাকে আর সকল শিল্প সকল সভ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠ মানিয়া চলিতে শিখিব।

আধুনিক শিক্ষায় আমরা মজবুদ্ কেরাণী সুপটু উকিল এবং R.A, বা রোমীয় artistএর যৎকুৎসিৎ নকল হইতেছি মাত্র। আমরা ভারতবাসীরা যদি নিজস্ব শিল্পের কোন চিহ্ন জগতে রাখিয়া যাইতে চাহি তবে এই কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ডাক্তারি শিখিতে মৃতদেহ যেমন প্রয়োজন উকিলের পক্ষে সাবেক কালের Roman Law, কেরাণীর পক্ষে চিরপুরাতন অঙ্কশাস্ত্র যেমন অত্যাবশ্যক প্রাচীন শিল্পটাও আমাদের সুশিক্ষার পক্ষে তেমনি অপরিহার্য্য। পুরাতনকে মৃত বলিয়া যে অগ্রাহ্য করে তাহার মত মূর্খ কোথায়! শিল্প সাধনে যদি আমরা অগ্রসর হইতে চাহি তবে ভারত শিল্পের শবাসনই আমাদের আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারত শিল্পকে আমাদের জীবনে পুনর-ধিষ্ঠিত করিতে হইলে, তাহার শ্রেষ্ঠতা ও আমাদের পক্ষে তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে

একেবারে নিঃসংশয় হইতে হইবে, তর্ক ও আলোচনা কোন দিন আমাদের নিঃসংশয় করিয়া দিতে পারিবে না।

হৃদয় রতন যাচিয়া মেলে, অযাচিত ও পাওয়া যায় কিন্তু যে যাচাইয়া গ্রহণ করিতে চাহে তাহাকে ঠেকিতে হয়।

আমাদের প্রাচীন শিল্পটাকে আমরা তামাকু ধরাইবার টিকাটার মত যৎসামান্য করিয়া দেখি সুতরাং তাহার যেখানে সেখানে আগুন ধরাইয়া সেটাকে ছাই ভস্ম করিয়া দিতে আমাদের কোন ভাবনা উপস্থিত হয় না। আমরা কথায় কথায় বলিয়া ফেলি, ভারত শিল্পের আকৃতি প্রকৃতিটা ইউরোপীয় দস্তর দিয়া একটু আধটু সোজা করিয়া দিলে ক্ষতিটা কি? এস তাহার বেমানান্ হাত পায়ের স্থানে গ্রীকমূর্ত্তির হাত পা কাটিয়া বসাইয়া দেওয়া যাউক, তাহার চম্পক অঙ্গুলের পরিমাণ উখা ঘসিয়া খাটো করিয়া ফেলি; তাহার গালের একদিক সাদা একদিক কালো করিয়া তাহার সুচেহারাটা ফুটাইয়া তুলি, তাহার তপস্যায় শীর্ণ দেহটাকে গোস্ত খাওয়াইয়া তাজা করিয়া তোলা যাক—ঠিক গ্রীসিয় কুস্তিগিরের মত!

শিল্প যে ছেলাখেলা নয় আমাদের জীবনের উপরে তাহার একটা প্রভাব আছে এটা যদি আমাদের জ্ঞান থাকিত তবে এত সহজে আমরা ভারত শিল্পের উপরে ছুরি চালানো ব্যাপারে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারিতাম না!

যাঁহারা হাতে কলমে শিল্প চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে কোন চিত্রের বা কোন মূর্ত্তির রেখাপাত বা বর্ণ সন্নিবেশ প্রথায় সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইলে চিত্রটার বা মূর্ত্তিটার ভাবে ও অর্থের কতই না বদল হইয়া পড়ে। চিত্রণের মুখে গঠনের বেলায় যেটা বাহির হয় তাহার উপরে হাত চালাইতে যিনি শিল্পি তিনিই সাহস করেন না আর আমরা অতি সহজে বলিয়া ফেলি কেন এরূপ পরিবর্ত্তনে দোষ কি? দোষ যে কি তাহা প্রস্তাবকারীর চোখে না পড়িতে পারে কিন্তু যাহাদের প্রাণ আছে প্রাণ থাকিতে তাহারা আনাড়ির হাতে ভারত শিল্পের চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কই!

যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারত শিল্পের ভিত্তিতলে কত না শিল্পের কত তরঙ্গ আসিয়া বারম্বার আঘাত করিয়াছে কিন্তু কোন দিন তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই কিন্তু এই যে তাহার আশ্রয়-ভূমি আমাদের মন তাহার ভিতর হইতে যে একটা জিঘাংসা প্রবল ভূমিকম্পের মত সজোরে তাহাকে নাড়া দিতেছে তাহাতে ভারত শিল্পের পতন অবশ্যম্ভাবী। ভারত শিল্পের মন্দির চূড়া পাকা মসলায় গাঁথা দুই চারিটা ভূমিকম্প সে সহিবে কিন্তু তাহার অধিক নয়। সেই প্রলয়ের দিনে যে ভূমি তাহাকে নাড়া দিতেছে সেই ভূখণ্ডের সহিত কোন অতলে সে প্রবেশ করিবে তাহাই ভাবিয়া দেখ।

চ বর্গের উষ্ট্রবঙ্ক ঞ-র মত ভারত শিল্পটা যদি বা আমাদের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকে তথাপি ঞ-কে N করিয়া যেমন আমাদের কোন লাভ নাই তেমনি ভারত শিল্পকে পাশ্চাত্য শিল্পের ভারবাহী গর্দ্দভ করিয়াও আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

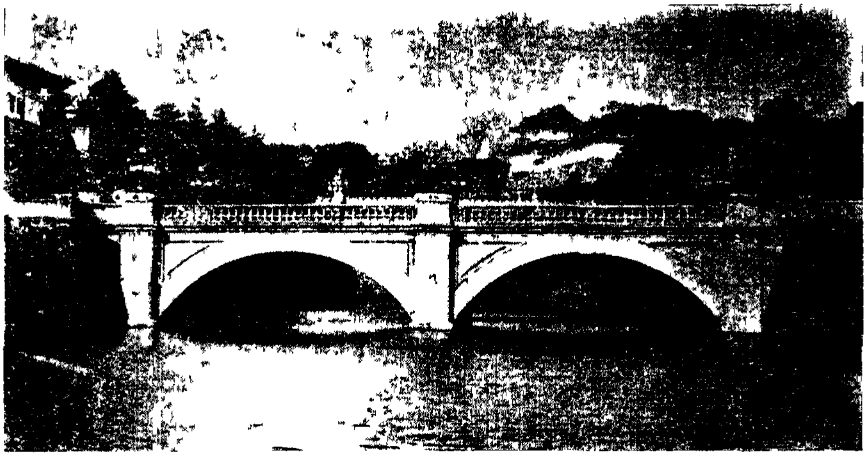
জাপানের সহর।

(২)

জাপানের দৃশ্য অতি মনোরম। সমগ্র জাপানই যেন শিলং, দার্জিলিং, শিমলা, মুসুরী, নাইনিতাল প্রভৃতি স্থানে পূর্ণ। জাপানের শতকরা ৮৪.৩ ভাগ পাহাড়ে আবৃত। শত শত ঝরণা, প্রস্রবণ প্রভৃতির ঝরঝর শব্দ বড়ই আনন্দদায়ক। আবার কোন কোন জায়গার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড waterfallগুলি ভীতিসঞ্চার করিয়া থাকে। আর সে শীতপ্রধান দেশে বরফের কোন নূতনত্ব নাই। পার্ব্বত্য জাপান ছোট বড় ৬০০ দ্বীপ সমষ্টি। ছোট ছোট নদীর সংখ্যা অল্প নয়। পর্ব্বতের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দেশের নানাস্থানের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সমুদ্র এবং পর্ব্বতের সম্মিলনেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চূড়ান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

গতমাসে তোকিও সহরের ভিন্ন ভিন্ন পার্কের বিবরণ ভারতীয় পাঠকবর্গের নিকট বিবৃত করিয়াছি। অদ্য সহরের অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে জাপান সম্রাট মিকাদোর প্রাসাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। ১৮৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত সোগুণ উপাধিধারী সম্রাটের প্রধান সেনাপতি তোকিও সহরে বাস করিতেন। সে সময়ে তোকিও ইয়েদো নামে অভিহিত হইত। নামে সেনাপতি হইলেও সোগুণের প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল যে কার্য্যতঃ তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; সম্রাট মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় সহর হইতেই তিন শতাধিক মাইল দূরবর্ত্তী কিওতো রাজধানীতে অবস্থান করিতেছিলেন। যে রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের মধ্যযুগের অবসান হইয়া বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তন হয় সেই রাষ্ট্রবিপ্লবই প্রকৃত প্রস্তাবে তোকিও সহরকে রাজধানী পদে উন্নীত করে। তোকিও তখন অতি ক্ষুদ্র সহর ছিল। সেনাপতি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে আপন বাসভবন সম্রাটকে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ মনে করেন। সে আজ প্রায় ৩৩ বৎসরের কথা। তদবধি তোকিও জাপানের রাজধানী। তখন জাপানে রেল ছিল না। সম্রাট শিবিকারোহণে দূরবর্ত্তী কিওতো হইতে নূতন রাজধানী তোকিও সহরে আগমন করেন। পাঠক মনে করিবেন না যে সেনাপতির বড় বলিয়া সম্রাটের বর্ত্তমান প্রাসাদ ছোট বা সামান্য ধরণের। উহা বিশাল এবং বিস্তৃত। আমার যে সকল বন্ধু ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য দেখিয়া জাপানে আসিয়াছেন সকলেই মিকাদোর বাড়ীকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। কোন কোন সম্রাট কিম্বা প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ অপেক্ষাকৃত বড় হইলেও মোটের উপর জাপান রাজভবন অনেক বিষয়ে অধিকতর সুন্দর। বাড়ী খানা একটা দুর্গের মত; তোকিও সহরের মধ্যস্থলে দৈর্ঘে প্রস্থে আনুমানিক এক মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত

এবং পরিখায় বেষ্টিত। পরিখাগর্ভ হইতে উত্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হার্কিউলিয়ান পাথরে গ্রথিত অত্যুচ্চ দিব্য দেওয়ালের উপর সবুজ দূর্ব্বাচ্ছাদিত বেষ্টন এবং তাহার উপর সারি সারি কামান। পরিখার উপরিস্থিত ভিন্ন ভিন্ন দ্বারদেশের প্রশস্ত প্রস্তর সেতু সহরের



সম্রাটের বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা, তদুপরিস্থ সেতু, হার্কিউলিয়ান পাথরের দেয়াল এবং প্রহরীদের বিশ্রামাগার।

বিস্তৃত রাস্তার সহিত সংযোজিত রহিয়াছে। বহির্দেশের তৃণাবৃত বিস্তৃত আঙ্গিনাগুলি এতই পরিষ্কার যে বহুমূল্য মকমল এবং কার্পেটাবৃত প্রাঙ্গণও তাহার নিকট লজ্জা পায়। সাধারণ লোক বহির্দ্দেশের কয়েকটী প্রাঙ্গণ পর্য্যন্তই অগ্রসর হইতে পারে। রাজভবনের দুই ধারে দুইটী পাব্লিক পার্ক। রাজবাড়ীর চা'র ধারেই বৈদ্যুতিক ট্রামের রাস্তা।

রাজবাটীর প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে এক বিস্তৃত জায়গায় রাজপুত্রের (ক্রাউন প্রিন্সের) বাড়ী। এ বাড়ীর আয়তনও স্বয়ং সম্রাটের বাড়ীর অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে, ইহারও কয়েক ধারে বিস্তৃত রাস্তা। তিন ধার দিয়া বৈদ্যুতিক ট্রাম এবং অপর ধারের তলদেশ দিয়া সুড়ঙ্গ পথে রেলগাড়ী ও বৈদ্যুতিক ট্রাম উভয়ই চলিতেছে। সম্প্রতি শ্বেত প্রাসাদ নামে নামক রাজপুত্রের জন্য যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা দেখিবার জিনিস। রাজপুত্র তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিসহ এই বাড়ীতে অবস্থান করেন। এই বাড়ীর এক পার্শ্বে সৈন্যদের কাওয়াজ খেলিবার বিস্তৃত মাঠ; ব্যারাক, এবং মিলিটারী কলেজ। রাজপুত্রের প্রাসাদ আওইয়ামা প্যালেস্ নামে পরিচিত। সহরের ঐ অঞ্চলের নাম আওই-য়ামা। আমাদের ভারতীয় ছাত্রদের তোকিওস্থ ইণ্ডিয়ান হাউস্ রাজপুত্রের বাড়ীর এক পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই বৈদেশিক নৃপতি মণ্ডলীর প্রতিনিধি বর্গের আবাসস্থল। রাজবাড়ীর নিকটেই শাসন, শিক্ষা, যুদ্ধ, এবং অন্যান্য বিভাগীয় বড় বড় আফিষ এবং পার্লিয়ামেণ্ট হাউসদ্বয়,

পার্লিয়ামেণ্ট এবং বড় বড় আফিষের অধিকাংশ বাড়ীই কাষ্ঠ নির্ম্মিত। জাপানীরা বাহ্যিক আড়ম্বরের বশবর্ত্তী হইয়া কোন বিষয়ে প্রচুর অর্থ আটক রাখিতে এবং তন্নিবন্ধন দেশের কারবারের প্রতিবন্ধক জন্মাইতে প্রস্তুত নহে। খর্ব্বাকৃতি, ক্ষুদ্রদেহধারী জাপানী সাধারণ ভাবে থাকিয়া বড় বড় কায করিতেই অভ্যস্ত।



শ্বেত প্রাসাদ

প্রাচীন রাজধানী কিওতোর প্রাসাদ আজও পর্য্যন্ত অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির পরিচয় পত্র লইয়া উক্ত প্রাসাদ দেখিয়া আসিয়াছি। অন্দর এবং বাহিবাটী সমস্তই প্রাচীন ধরণের, অনেকটা হিন্দুস্থানী ধরণের। টেবিল চেয়ারের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই তাতামি অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর মাদুরে আচ্ছাদিত মেজে বা ভূমিতল। নানারূপ চিত্রিত পটে দেওয়াল সুসজ্জিত। প্রাচীনকালের চিত্রিত পট বলিতেই বুঝিতে হইবে যে সামুরাই জাতির যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র। যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র ছাড়া কোন কোন স্থানে জীবজন্তুর এবং গাছপালার চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রাজপ্রাসাদ দেখিলে বেশ প্রতীতি জন্মে যে প্রাচ্যের সভ্যতা জাপানে অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই বিস্তারিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ছুমিদা নদীর দুই ধারে তোকিও সহর অবস্থিত। ইতিপূর্ব্বে যতকিছু উল্লেখ করিয়াছি সমস্তই ছুমিদা নদীর পশ্চিম তীরে। অপর তীরে রাশি রাশি কল কারখানা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই। মারিন স্কুল, কিশারি স্কুল প্রভৃতি কয়েকটী নূতন ধরণের ইন্‌ষ্টিটিউশন সহরের এই অঞ্চলেই। এ অঞ্চলে প্রত্যেক বাড়ীতেই ছোট খাট কোন না কোন কারখানা আছেই। আমাদের ভারতীয় ছাত্রদের

যাহারা কারখানায় কাজ শিখিতে যায় তাহাদের অধিকাংশকেই ছুমিদা নদীর এই পারে কায শিখিতে আসিতে হয়।

ছুমিদা নদী ক্ষুদ্র হইলেও বাণিজ্য-বহুল; ছোট ছোট ষ্টীমার এবং নৌকায় পূর্ণ; প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর ছোট ছোট ফেরি ষ্টীমার সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আরোহী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। অর্দ্ধ কিম্বা এক মাইল অন্তর অন্তরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেশন। এই নদীর উপর রিওগোকু জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতু। ইহার উপর বৎসরে জুলাই মাসে একদিন "হানাবি" অর্থাৎ আতসবাজির মহাসমারোহ হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকসমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী রাত্রিকালে তাড়িতালোক এবং আতসবাজির সাহায্যে স্ব স্ব ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকে। সহস্র সহস্র নৌকা সমাগমে সেদিন জলে ও স্থলে যেন কোন ভেদ থাকে না।

নদীর ধারে বসন্তকালে মুকোজিমা নামক স্থানের চেরি প্রস্ফুটিত হইবার সময় প্রায় একমাস কাল সংসার-চিন্তা ভুলিয়া সহস্র সহস্র লোক অপার আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। তখন তথায় রোজই যেন চূড়ামণি যোগ লাগিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

জাপানের বড় সহরের সহিত ছোট সহরের পার্থক্য কেবল আয়তনে এবং লোকসংখ্যায়। চাল চলন সর্ব্বত্রই এক। রাস্তা ঘাট, ঘর, দুয়ার অধিকাংশ সহরেই এক রকম। উত্তর অঞ্চল অর্থাৎ শীতপ্রধান প্রদেশস্থ সহরগুলির এবং তোকিও, ওসাকা, কোবে এবং ইয়োকোহামা প্রভৃতি কারবারী সহরের লোকগুলি সুচতুর এবং কর্ম্মঠ।

মার্কিন জাতির ন্যায় জাপানীরা আজকাল সহর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; দেশের গণ্য মান্য এবং নব্য ভদ্রলোকগণ রাজধানী অথবা অন্য কোন বড় সহরে বাড়ী করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সমুদ্রতীরে, হ্রদ অথবা বিখ্যাত জলপ্রপাতের নিকটবর্ত্তী স্থানে গ্রীষ্মাবাস দেখিতে পাওয়া যায়।

জাপানের মিউনিসিপালিটী আমাদের মিউনিসিপালিটীর ন্যায় নহে। সহরের রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও নর্দ্দামাগুলি খোলা; ঢাকা সহরের নর্দ্দামার মত। নূতন রাস্তা ঘাট প্রস্তুত কিম্বা পুরাতনের মেরামত ভার মিউনিসিপালিটীর হস্তে। মিউনি-সিপালিটীর পার্ক প্রভৃতিতে মিউনিসিপালিটী হইতেই আলো দেওয়া হয়। তাছাড়া দোকানদারগণ এবং সহরের অধিবাসিগণ নিজ নিজ ব্যয়ে স্ব স্ব বাড়ীর সম্মুখে আলো দিয়া থাকে। অবস্থানুযায়ী কেহ তাড়িতা-লোক, কেহ বা গ্যাসের, আবার কেহ বা কেরোশিনের আলো বাড়ীর সম্মুখদেশে ব্যবহার করিয়া থাকে। আর বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী রাস্তাতেও গৃহস্বামীই পরিষ্কার রাখিয়া জল সিঞ্চন করিয়া থাকে। প্রত্যেক বাড়ীর আবর্জ্জনাদি নিক্ষেপ করিবার জন্য বাড়ীর এক পাশে একটি কাঠের বাক্স রাখিয়া দেওয়া হয়। দুই একদিন পর পর উহা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি লোক নিয়োজিত আছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ অতি সামান্যই দিতে হয়; যেহেতু আবর্জ্জনা জমির পক্ষে মূল্যবান। উহারা

উহা মফস্বলে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সহরে আলো দেওয়ার জন্য অনেক প্রাইভেট কোম্পানী রহিয়াছে, মাসের শেষে বিল করিয়া আলোর খরচ লইয়া থাকে। বড় বড় সহরে জলের কল আছে। সহরতলি এবং ক্ষুদ্র সহরে কূপের জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাপানীরা অদ্ভুত জীব। হোকাইদো দ্বীপে একটি ক্ষুদ্র সহরের লোক সংখ্যা বিশ হাজার। লৌহ এবং কয়লার আকর থাকায় ইহা একটি বাণিজ্যস্থান। কিন্তু এখানে জলের বড়ই অভাব। ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী ছাপ্পোরের সহর হইতে রোজ রেলে তথায় জল নীত হইতেছে।

তোকিওর ন্যায় বড় সহরের রাস্তাতেও জল সিঞ্চনের বেশ বন্দোবস্ত নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দোকানদার এবং সাধারণ বাসিন্দাগণ নিজেদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা সিক্ত করিয়া থাকে। উহারা খোলা নর্দ্দামার কিম্বা নিকটবর্ত্তী খালের জল অথবা নিজ বাড়ীর কূপ অথবা কলের জলই রাস্তায় ছিটায়। আর পাবলিক রাস্তা এবং পার্ক প্রভৃতির জন্য স্থানে স্থানে রাস্তার ধারে কূপ আছে। ভিস্তি একরূপ কাঠের গাড়ীতে জল লইয়া রাস্তায় দেয়।

পায়খানার বিবরণ ভারতবাসীর নিকট একটু অভিনব। সহরে এবং গ্রামে সর্ব্বত্রই পায়খানার প্রচলন, মিউনিসিপালিটীর সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই; উহা গৃহস্বামীরই তত্ত্বাবধানে। সহরে কতকগুলি কোম্পানী আছে, ময়লা সংগ্রহ করাই তাহাদের ব্যবসা। কোম্পানীনিয়োজিত লোক কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে ময়লা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এক একজন ঐরূপ ৮।১০টী পাত্র একখানা গাড়ীর উপর সাজাইয়া মফস্বলে টানিয়া লইয়া যায়। যে সময়েই তোকিওর পথে বাহির হও না কেন দেখিবে সারি সারি ময়লা গাড়ীর যেন শেষ নাই। জাপানীরা উহার গন্ধে অভ্যস্ত; আমরা কিন্তু নাকে রুমাল না দিয়া চলিতে পারিতাম না। জাপানীদের উহাতে একটু ঘৃণার ভাবও পরিলক্ষিত হয় না। এমন কি সহরের অনেক কেন্দ্রস্থলে ঐ সকল গাড়ীর আড্ডা দেখিতে পাওয়া যায়। জলপথেও বহু দূরবর্ত্তী গ্রামে ঐ সকল গাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। তোকিও সহরে জলপথে নৌকাযোগে উহা রপ্তানী হইবার উল্লেখযোগ্য প্রধান ষ্টেশন আছাকুশার বিখ্যাত হায়াব পলিটেকনিক ইন্‌ষ্টিটিউশানের দ্বারদেশের সম্মুখভাগ। আমাদের দেশে—সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখেও এরূপ ষ্টেশন থাকিতে পারে না। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি সে বিষয়ে আদৌ আকৃষ্ট হয় না; যেহেতু উহা অনেকটা ধানের বস্তা, তুলার বস্তা, পাটের বস্তা প্রভৃতির ন্যায় বিবেচিত হইয়া থাকে।

শীতপ্রধান দেশ বলিয়াই ইহাদ্বারা সহজে ব্যারামের বীজ ছড়াইয়া পড়ে না। কোম্পানীর লোকগণ মফস্বলের কৃষকদের নিকট উহা বিক্রয় করিয়া থাকে। গৃহস্বামীকে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য মেথরকে কিছুই দিতে হয় না বরং ইচ্ছা করিলে গৃহস্বামী মেথরের নিকট হইতে ময়লার মূল্যস্বরূপ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে পারে। সাধারণতঃ অনেকেই নগদ মূল্য গ্রহণ করে না। ময়লার পরিবর্ত্তে মাঝে মাঝে শাক শব্জীর ভেট লইয়া থাকে। জাপানে মেথরশ্রেণী বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট

শ্রেণী নাই। যে কেহ পায়খানা পরিষ্কার করিতে পারে, তাহাতে জাতিভ্রষ্ট কিম্বা সমাজচ্যুত হইবার কোনরূপ আশঙ্কা নাই।

অনেকেই জানেন যে গরুর বিষ্ঠা জমির পক্ষে মূল্যবান সার। মনুষ্যের বিষ্ঠা উহা অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান, যেহেতু মনুষ্য গরুর চেয়ে পুষ্টিকর এবং মূল্যবান পদার্থ আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের ভুক্ত পদার্থের কিয়দংশ অস্থি, মাংস ও রক্তে পরিণত হইয়া দেহ পুষ্ট করে এবং বাকী অধিকাংশই রূপান্তরিত হইয়া বিষ্ঠারূপে বহির্গত হয়। উহা উদ্ভিজ্জের পরিপোষণে বিস্তর সহায়তা করে। মনুষ্য খাদ্যের সহিত উহা পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকে। অতি অল্প খরচে এই মূল্যবান সার সকলেই লইতে পারে। জাপানে ছোট বড় ধনী দরিদ্র কেহই এ সার জমিতে প্রয়োগ করিতে ঘৃণা বোধ করে না।

মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্সের দায়ে গরীব সহরবাসীকে ঝালাপালা হইতে হয় না। যে যেরূপ চালচলনে চলিতে চায় তেমনি পারে। গরীব ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে বাড়ীর সম্মুখে আলো নাও জ্বালাইতে পারে। আর পাড়াপ্রতিবেশীর কলের জলেই তাহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

সহরে এবং বড় বড় গ্রামে গতায়াতের সুবিধার জন্য ট্রাম এবং রিকশার বন্দোবস্ত আছে। তোকিও সহর কলিকাতার চেয়ে অনেক বড় হইলেও সেখানে গাড়ী ঘোড়া এবং মোটরকারের ধূম কলিকাতা হইতে অনেক কম। তোকিও সহর বৈদ্যুতিক ট্রামে ছাইয়া ফেলিয়াছে। তথায় চারি বৎসর অবস্থান কালে সংবাদপত্র স্তম্ভে একদিনের জন্যেও মোটর গাড়ী কিম্বা বৈদ্যুতিক ট্রামের চাপায় একটী ব্যক্তিরও অপমৃত্যুর সংবাদ অবগত হই নাই। তোকিওর ন্যায় ভারী সহরে ১৫।২০ খানার বেশী মোটর গাড়ীও নাই। ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যাও প্রায় তদ্রূপই। বাইসিকেল আজকাল ভদ্রলোকে কমই ব্যবহার করিয়া থাকে। ফেরিওয়ালা এবং সংবাদবাহকগণের ভিতরই উহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। স্কুল কলেজের ছেলেরাও ব্যবহার করিয়া থাকে।

গাড়ী ঘোড়ার আড়ম্বর নাই বলিয়াই যে জাপানীরা আমাদের চেয়ে গরীব তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উহারা এরূপ ব্যয়কে অপব্যয় বলিয়া মনে করে। একবার হায়দরাবাদের নিজামের ভাগিনেয় এক নবাব তোকিও সহরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সেক্রেটারী এবং সৈন্যবিভাগীয় কাপ্তেনের সহিত তাঁহাদের আগমনের দ্বিতীয় দিবস সহর ভ্রমণে বাহির হই। তাঁহারা কয়েক মিনিটের অভিজ্ঞতাতেই গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতির আড়ম্বর না দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "আরে ভিকারী সম্রাট রে! আরে ভিকারী মিউনিসিপালিটী রে। আরে ভিকারী জাপান রে।" বলাবাহুল্য মাসাধিক কাল অবস্থানের পর তাঁহাদের মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহারা তখন দরিদ্র জাপানীদের ভিতরও ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞাপক কিছু না কিছু দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিক দরিদ্র চাকরাণীগুলির রাশি রাশি যেরূপ মূল্যবান রেশমী বস্ত্র দেখিতাম আমাদের দেশের বিশিষ্ট অবস্থাপন্না ভদ্র

মহিলারও তেমন আছে কিনা বলিতে পারি না। জাপানের দরিদ্র কৃষকও তিন বার পরিতোষ সহকারে উদর পূর্ত্তি আর রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। তেমন স্বচ্ছল অবস্থা আমরা কি কখন হিন্দুস্থানে আশা করিতে পারি।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

বহ্বারম্ভ।

(১)

নীহারিকা একদিন তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমি যদি এখন মরি, তুমি কি কর?"

সুকুমার গম্ভীর ব্যথার ব্যঙ্গভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "ওঃ। তা হলে?—একটা মস্ত কবিতা লিখে ফেলি!"

নীহারিকা কহিল, "না—ঠাট্টা নয়! সত্যি বল—তুমি ফের বে কর?"

"তুমি আমায় এত অধম ভাব?"

নীহারিকা হাসিয়া বলিল, "দেখা যাবে!"

"কি দেখ্‌বে?"

"এই, ফের বে কর কিনা।"

সুকুমার একটু বিরক্ত ব্যথিত হইয়া বলিল—"যদি বে-ই করি তুমি আর দেখ্‌বে কোত্থেকে?"

নীহারিকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল— "সে তখন বুঝবে!"

ইহার কিছু দিন পরে নীহারিকা তার পিতার কর্ম্মস্থল—হাজারিবাগে গেল। তার বড় বোন প্রভাতকুমারীও স্বামীর সহিত তখন পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। অরুণ বাবুর শরীর খারাপ। ছুটি লইয়াছেন—এখন হাজারিবাগেই থাকিবেন। লোকনাথ বাবু, জামাতাকে পৃথক বাটী ভাড়া করিতে দেন নাই।

(২)

এপ্রিল মাসের আর বেশী দেরী নাই। প্রভাত বলিল, "নীহার, আয় সুকুমার বাবুকে 'এপ্রিল্ ফুল্' করি।"

নীহারিকা সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল— "বেশ! আমার একটা প্ল্যানও তৈরি আছে।"

"সত্যি নাকি? কি, বল্ দেখি! যাতে ঠকে, এমন করতে হবে!"

"নিশ্চয়ই ঠক্‌বেন, তা ছাড়া সেই সঙ্গে বেশ একটা রীতিমত একজামিনও করা হবে!"

"তা হলেত খুব মজা!—কি প্ল্যান করেচিস্?"

নীহারিকা বলিতে লাগিল, "একদিন তাকে জিজ্ঞেস্ কল্লুম—'আমি যদি মরে যাই তুমি কি কর'—?"

প্রভাত খুব হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ও হরি! সকলেরি দেখচি এক রোগ!"

নীহারিকা বলিল, "ওমা! তুমিও বুঝি ঐ কথা জিজ্ঞেস্ করো?—তা, কি উত্তর পাও?"

তিনি অমনি চোখদুটো কপালে তুলে

বলেন, "তা হলে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাবো আর কবিতা লিখিব!"

নীহারিকা গালে হাত দিয়া বলিল—"সকলেরি দেখ্‌চি এক প্রেস্কৃপশান!"

"তা যাক এখন তোর প্ল্যানটা কি শুনি।"

"অরুণ বাবুকে দিয়ে একখানা চিঠি তাঁকে লেখান যাক যে, হঠাৎ হার্টফেল হয়ে আমি মারা গেছি! দেখি কি করেন।"

প্রভাতের মনে প্ল্যানটা তত সুবিধার বলিয়া মনে হইল না; নীহারিকার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "দূর! সেকি ভাল?—"

নীহার বলিল, "তোমার ভয় নেই দিদি, আমি মরবো না!"

"দূর, তা কেন?"

"তবে কি?"

"যদি আবার বে করে বসে!"

নীহারিকার মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল—সে বলিল, "না, সেটুকু বিশ্বাস আছে।"

প্রভাত কহিল—"তবে আবার একজামিন কেন?"

"ভাল ছাত্রকেও তো একজামিন দিতে হয়!"

প্রভাত কৃত্রিম দুঃখে বলিল—"আহা, বেচারা সেই বেলা থেকে একজামিন দিতে দিতে জ্বালাতন হয়ে গেচে—আবার তোর কাছে একজামিন!'

নীহারিকা হাসিয়া বলিল—"পুরুষের সারাজীবনই ত একজামিন।"

এমন সময়ে অরুণচন্দ্র সেখানে আসিয়া বলিলেন—"আর মশায়রা বুঝি বসে বসে প্রাইজ দিবেন!" অরুণবাবুর দিকে না চাহিয়াই নীহার হাসিয়া বলিল—"সেই রকম ত মনে হয়!"

(৩)

'এপ্রিল ফুলের' প্ল্যান শুনিয়া অরুণচন্দ্র প্রথমটা রাজি হইলেন না কিন্তু হঠাৎ আর একটা মতলব তাঁর মাথায় আসিল—তিনি বলিলেন, "বেশ, আমিও রাজী!"

নীহারিকা ও প্রভাত সকৌতুক ব্যগ্রতার সহিত সুকুমারের পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পাঁচ দিনের দিন সুকুমারের নিকট হইতে পত্র আসিল। অরুণ বলিলেন, "নীহার, দেখো, সুকুমার 'মাই ডিয়ার অরুণবাবু'—লিখেই তোমার শোকে চোখের জলে ভেসে গেছে—এই দেখো কাগজ চুপসে গেছে!"

স্বামীর সুগভীর স্নেহ স্মরণ করিয়া নীহারিকার ডাগর চক্ষু দুটী অশ্রুসজল হইয়া উঠিল!

কিছু দিন পরে প্রভাতের নিকট সুকুমারের সম্পাদিত 'মলয়া'র চৈত্র সংখ্যা আসিল। নীহারিকা দেখিল, কাগজের প্রথমেই আর একখানি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র সৃষ্টি হইয়াছে! প্রবন্ধের নীচে লেখা—"অভাগা"।

দুই ভগিনীতে খুব খানিকটা হাসিলেও প্রিয়জনকে কৌতুকের খাতিরে বেদনা দেওয়ায় নীহারিকা অন্তরে অন্তরে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। নীহারিকা বলিল, "না ভাই! আর বেচারাকে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, এবার বহরমপুর যাওয়া যাক্!"

প্রভাত রাজী হইল না—বলিল, "আচ্ছা, আর একটু দেরী করনা, বেদনা ও বিরহ আর একটু পেকে আসুক।"

বৈশাখের "মলয়ায়" নীহারিকা দেখিল—

তার ছবি বাহির হইয়াছে—চারি ধারে মোটা কালো 'বর্ডার' মধ্যে একটী করুণ মর্ম্মস্পর্শী সনেট! নীহারের ব্যথিত প্রাণ বহরমপুর যাইবার জন্য আবার অস্থির হইয়া উঠিল! প্রভাত বাধা দিল। আরো চারি মাস কাটিয়া গেল—ইহার মধ্যে "মলয়াতে" নীহারিকার শোকে অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে! সেই সঙ্গে সম্পাদকের ব্যঙ্গরসাত্মক কয়েকটী ক্ষুদ্র গল্পও আছে।

নীহার একটু আশ্চর্য্য হইয়া প্রভাতকে একদিন বলিল—"আচ্ছা! তাঁর যদি মন খারাপ তা হলে এমন হাসির লেখা বেরুচ্চে কেমন করে?"

প্রভাত হাসিয়া বলিল—"ঐটি পুরুষদের বিশেষ তো লেখক জাতের বাহাদুরী!—আরো এরকম কাণ্ড আমি দেখেছি!"

নীহারিকা বলিল, "তবে কি পুরুষের হাসাও মিছে কাঁদাও মিছে?—"

"ভাদ্রের রোদবিষ্টি কি মিছে?"

"মিছে নয় বটে কিন্তু কোন কাজেরও নয়—সে জলে মাটিও তেমন ভেজেনা, সে রোদে কাপড়ও শুখোয় না!

(৪)

আশ্বিন মাস। ছুটির আগেই 'মলয়া' বাহির হইবার কথা। নীহারিকা ভাবিতেছিল, এবার পূজার সংখ্যার ছদ্মাবরণে প্রিয়তমের ব্যথিত প্রাণের আর একটু ভাবতরঙ্গ পাইব —না জানি পূজার 'মলয়া'র ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে তাঁর কত ব্যথা কত মর্ম্মপীড়া কত অশ্রুসিক্ত ভালবাসা নিহিত আছে!—সত্যই আমি নিষ্ঠুর!—বড় নিষ্ঠুর—একজনের প্রাণের ব্যথা নিয়ে আমোদ কৌতুক!

এমন সময় প্রভাত পিছন হইতে বলিল—"নীহার! নাঃ! সুকুমারটা শেষে ফেল্-ই হ'ল।" কথাটা বলিয়া আশ্বিনের 'মলয়া'খানা তার সম্মুখে ফেলিয়া সে চলিয়া গেল!

"সুকুমার ফেল্!"—নীহারিকার মুখের রংটা পাঁশের মত হইয়া গেল। সে কম্পিত হৃদয়ে, 'মলয়ার' পাতা খুলিয়া দেখিল সুকুমারের নব-পরিণীতা স্ত্রীর ছবি—এমন সুন্দর অথচ এমন কুৎসিত বুঝি নীহারিকা জীবনে কিছু দেখে নাই! আবার ছবির তলে চারি লাইন কবিতা—

"ক্ষমা কর তুমি দেবী!—অতীত প্রতিমা!
তুমিই এসেছ ফিরে নব প্রতিমায়
ধুইয়া স্বর্ণদানারে মৃত্যুর কালিমা,
এই জ্ঞানে স্থাপিয়াছি এ চারুবালায়!"

নীহারিকার চক্ষু ফাটিয়া যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল! নীহারিকার মৃত্যুসংবাদ তার স্বামীকে ব্যথা দেয় নাই—কবিতার উপাদান যোগাইয়াছে মাত্র!—যে নারী স্বামীর স্মৃতি হৃদয়ে আমরণ জাগাইয়া রাখে, সেই স্বামী স্ত্রীর চিতার আগুন না জুড়াইতেই আবার ঘটকের দ্বারস্থ হয়!—নীহারিকা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই যেন তার বুকটা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল!

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে পরিচিত কণ্ঠে কে বলিল—"এ কি! নীহার তুমি বেচে!"

নীহার চমকাইয়া উঠিল—দেখিল,—তার স্বামী!

সুকুমার হাসিয়া বলিল "সতীনের হাতে স্বামীটিকে দিয়ে বুঝি স্বর্গে মন্ টিঁকল না? এখন সতীনটিকে আদর করে ডেকে আনো! গাড়ীতে বসে আছে।"

নীহার গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—"বেশত! চল না!"

সুকুমার বলিল—"ইস্—থাক্ না!—এখনি আবার স্মেলিং সল্টের দরকার হবে!"

নীহারিকা বলিল—"তুমি ত আচ্ছা লোক! কাগজে ছাপালে কেমন করে?"

এমন সময় প্রভাত ও অরুণচন্দ্র সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীহার তাঁর দিকে ফিরিয়া বলিল—"অরুণবাবু, শেষে আপনার এই বিশ্বাসঘাতকতা!"

অরুণবাবু সহাস্যে বলিলেন "কি করি বল! পাখোয়াজের দুদিকেই ঘা দিতে হয়, নহিলে যে বেসুরো বাজবে! তোমরা দুই বোনে এককাট্টা হয়ে বেচারাকে জব্দ করতে গিছলে, আমি একটু তাঁর পক্ষ নিয়েছিলুম—আবার কোন্ দিন আমায়ও তো অমনি করতে পারো! তখন কে সহায় হবে, বল!"

নীহারিকা বলিল—"নাঃ, আপনার জন্যই আমাদের এই হারটা হল!"

প্রভাত বলিল—"আচ্ছা, সে যেন হোল—কিন্তু সেই সঙ্গে 'মনীষা'র এতগুলি নিরীহ পাঠক কি অপরাধ করেছিল যে তারাও ঠকল!"

সুকুমার হাসিয়া বলিল—"ওগো ও কখানা আপনাদের জন্য স্পেশ্যাল কাপি!"

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্রশিল্প।

আশ্চর্য্যের বিষয় অজন্তার ছবির মধ্যে আমরা বাঙ্গলাদেশের দৃশ্যের আভাষ পাই। প্রথমত আমরা গুহার নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি, সবগুলিরই মাটীর ছাদ; কিন্তু, অজন্তার ছবিতে অবিকল বাঙ্গলার মত আটচালা! ও দেশের লোক নারকল গাছ চোখে দেখেনি; কিন্তু ছবিতে নারকল গাছ যথেষ্ট! বঙ্গদেশে যেমন উঁচু বৃষস্কন্ধ দেখা যায়, অন্য কোন দেশের ষাঁড়ের বোধ হয় তত উঁচু কাঁধ নয়; অজন্তার ১ নং গুহায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের ষাঁড়ই অঙ্কিত। এই সমস্ত দেখে অনেকে বলেন যে, বাঙ্গলা দেশ থেকে কোন ছাত্র অজন্তার শিল্পাশ্রমে চিত্রবিদ্যা শিখ্‌তে গিয়েছিলেন। কিছুই বিচিত্র নয়! আবার নয় নম্বর গুহায় থামের গায়ে আঁকা যে কয়েকটি বুদ্ধদেবের ছবি আছে—সেগুলি অবিকল চীন ছবির অনুরূপ! তা দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, চীন কারিকর এদেশে এসে আমাদের চিত্রশিল্প শিখে গিয়েছিলেন। আমি এখানে অনেক জায়গায় রোমশিল্পের আভাষও দেখেছি। গ্রীক প্রভৃতি বিদেশীয়গণও যে এ দেশে শিল্পশিক্ষার অভিপ্রায়ে এসেছিলেন—এ থেকে এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নয়। যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই এখানে নিজের দেশের শিল্পের কিছু কিছু রেখে গেছেন। চীন ও জাপান-বাসীরা ত স্বীকারই করেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

দেশের শিল্প-বিদ্যাও তাঁদের দেশে এবং অন্যান্য সকল দেশে গেছে।

অনেকে মনে করেন পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রের আদর্শ জাপান চিত্র হইতে গৃহীত—অজন্তার ছবি দেখলে কিন্তু এ ভ্রম একেবারেই দূর হয়ে যায়। তাঁর চিত্র - এমন কি সেই চিত্রের প্রাণ পর্য্যন্ত যে ভারতবর্ষীয় তাহা অজন্তার চিত্র দেখলে আর সন্দেহ থাকে না।

ইংরাজেরা নয় নম্বর গুহাকেই অন্যান্য সকল গুহার চেয়ে বেশী প্রাচীন বলেন, —কেন জানি না। তাঁরা বোধ হয়, গুহার অনেকগুলি ছবিতে অপকৃষ্ট অসভ্যের আকৃতি দেখতে পান বলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন! কিন্তু, সেই গুহাটাতেই আবার আমরা 'বুদ্ধদেবের প্রচার' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ছবিও দেখেছি। তবে, থামের গায়ে খোদা যে একটা লেখা আছে সেইটে ধরে' যদি—তাঁরা কিছু আবিষ্কার করে থাকেন ত' সে কথা স্বতন্ত্র!

আমরা অজন্তার ছবিগুলিতে মাত্র দু-এক যায়গায় পালি অক্ষরের মত লেখা দেখে-ছিলুম। আর পাথরের দেওয়ালের উপর খোদা লেখাও দুএকটা গুহাতে পেয়েছি। সেগুলিতে ঐতিহাসিকদের জানবার বিষয় অনেক থাকতে পারে। আমরা এক, নম্বর, দুই, নয়, দশ, ষোল, সতের, উনিশ প্রভৃতি নম্বরের কতকগুলি গুহা ভিন্ন, আটাশটা গুহার মধ্যে অন্য কোনটাতে বড় একটা ছবি দেখতে পাইনি। পথ না থাকায় একটা গুহাতে তো একেবারে যাওয়াই গেল না। অল্পসংখ্যক কতকগুলি গুহা অসম্পূর্ণ ভাবে পড়ে আছে। কোনটার কেবল বারান্দাটুকু খোদা মাত্র হয়েছে, কোনটা কেবলমাত্র খুদতে আরম্ভ করেছিল; পাহাড়ের গায়ে বাটালীর দাগ এখনও বেশ পরিষ্কার ফুটে আছে। দেখলে মনে হয় যেন এইমাত্র শিল্পীরা বসে বসে কাটছিল, পরিশ্রান্ত হয়ে যে যার বাড়ী গেছে। কতকগুলিতে পূর্ব্বে ছবি ছিল,—কিম্বা আঁকা হচ্ছিল—কালে মাটী চাপা পড়ে সেগুলি একেবারে অদৃশ্য হয়েছে! অজন্তার বেশীর ভাগ ছবি একেবারে লুপ্ত ও নষ্ট হয়ে গেলেও এখনও তাকে অক্ষয় ভাণ্ডার বলা চলে। যে সব ছবি এখনও বর্ত্তমান আছে সে গুলির আমরা কেউ যদি আজীবন ধরে প্রতিলিপি (copy) করি, তবে, এ জীবনে সেগুলি শেষ করে উঠতে পারি কিনা সন্দেহ!

আমি এইবার অজন্তার বিশেষ বিশেষ কয়েকটা ছবির বিষয় কিছু বো'লে আমার প্রবন্ধ শেষ ক'রব। প্রথম নম্বর গুহায় আমরা একটা বিশাল, সৌম্য, ও সুন্দর কান্তি বিশিষ্ট বুদ্ধদেবের ছবি গুহাটীকে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে দেখতে পাই। সেখানি বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের চিত্র ব'লে মনে হয়। সেই ছবি খানিতে চিত্র-শিল্পিরা বাস্তবিকই তাঁদের মহৎ ও উদার অন্তঃ-করণের পরিচয় দিয়ে গেছেন; কেন না, তাঁদের মন সেরূপ উচ্চ না হ'লে ছবিতে তেমন বিশ্বপ্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা ভাব কখনই দেখাতে পারতেন না। সাধারণতঃ কবিদের লেখায়, আর চিত্রকরের চিত্রে তাঁদের চিত্তের ভাব প্রতিফলিত হ'তে দেখা



বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ।
(অজন্তার প্রথম গুহার চিত্র হইতে)

যায়। এক নম্বর গুহার মধ্যে "বুদ্ধদেবের প্রলোভন" ছবি খানিও সুন্দর ভাব-ব্যঞ্জক চিত্র। সে ছবি খানিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরিবেষ্টিত হ'য়ে ভগবান বুদ্ধদেব অটল-গম্ভীর ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন! তিনি শত-সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থেকেও মনে মনে তাদের চেয়ে ঢের তফাতে যেন কোন শান্তির আলোকময় রাজ্যে ভাস্‌চেন! আর তাঁর জড় তনু খানি সেখানে প্রাণশূন্য হ'য়ে পুতুলের মত বসে আছে। এদিকে আশে পাশে চারিদিকে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুরা তাঁকে প্রলোভিত করবার জন্যে যার-যতদূর সাধ্য চেষ্টা করচে। কাম সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি ধরে, লোভ চারুবেশে, মোহ দানব সেজে, মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতিরা আরও রকম রকম মূর্ত্তি ধরে তাঁকে প্রলোভিত করার নানা রকম কৌশল করচে। রাজসভায় দুজন পণ্ডিতের তর্ক বিতর্কের ছবিখানি অত্যন্ত কৌতুকজনক! এক নম্বর গুহায় যে একটা প্রকাণ্ড ভীষণ দর্শন সাপের ছবি আছে, সেটা এত স্বাভাবিক যে, হঠাৎ দেখ্‌লে আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌তে হয়!

সতের নম্বর গুহায় উৎকৃষ্ট ছবির সংখ্যা কিছু বেশী। অন্যান্য ভাল ভাল ছবির মধ্যে ভিখারী বেশী বুদ্ধদেবের সাম্‌নে মাতৃমূর্ত্তির ছবি খানিতেই গিরিগুহাটী অলঙ্কৃত করে তুলেছে। মা ছেলের হাত ধরে তাকে দিয়ে বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিতে গেছেন, অবশেষে মহাত্মা বুদ্ধদেবের সৌম্যোজ্জ্বল কান্তি দেখে, ভক্তি-প্রেম-বিহ্বল হ'য়ে তাঁর চরণ-প্রান্তে পুত্র সমেত নিজেকে নিবেদন করতে যাচ্ছেন! অন্তর্য্যামী বুদ্ধদেবও যেন তার মনোগত ভাব বুঝ্‌তে পেরে নত হয়ে তাদের দেওয়া ভিক্ষা সাদরে গ্রহণ করছেন! ভিক্ষাপাত্রধারী বালকটীর মুখে সরল-নির্ভীক-হৃদয়ের মাতৃ-ভক্তি ও আনুগত্যের ভাব সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে! বুদ্ধদেবকে দেখ্‌লে মনে হয়, যেন তাঁর অন্তর-নিভৃতে কি এক কোমল করুণ সুর বাজচে, যেন তাই তিনি অপরের বেদনায় ব্যথিত, দুঃখে দুঃখিত, এবং ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল!—এক কথায়—ছবি খানিতে জননীর স্নেহ, ভক্তের প্রেম, বুদ্ধদেবের করুণা এবং পুত্রের আনুগত্যের ভাব সুন্দর ফুটেছে। বুদ্ধের ছবি খানি মাতৃমূর্ত্তির দ্বিগুণ বা ততোধিক বড়। তা'তে বোধ হয় যে, মাতৃমূর্ত্তির হৃদয় পটে মহাতাপস বুদ্ধদেবের যে বিশাল ও উদার ছবি খানি প্রতিফলিত হয়েছিল, সেই ভাবটা দেখাবার জন্যেই শিল্পী বুদ্ধ মূর্ত্তিটীকে ও রকম অস্বাভাবিক বড় করে এঁকেছিলেন। বুদ্ধদেবের ছবির এখন শুধু ব্লকটুকুই বর্ত্তমান! কিন্তু তাতেও তার সৌন্দর্য্য লোপ পায়নি।

সতের নম্বর গুহায় সিংহল বিজয়ের চিত্র-গুলিতে আমরা ধর্ম্ম যুদ্ধের আদর্শ দেখ্‌তে পাই। যাঁরা কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পুরাকালের যুদ্ধ-প্রণালী আর নারাচ, বজ্র, শেল, শূল আদি নানারকম অস্ত্র ও অস্ত্রের চালনা কিরূপ ছিল জানতে চান, তাঁরা সিংহল বিজয়ের ছবি গুলিতে তা' দেখ্‌তে পাবেন। কোন কোন যায়গায় (সম্ভবতঃ সিংহলের) দুর্গদ্বারে বিপক্ষের অশ্বারোহী আর পদাতিক যোদ্ধার দল বীর-দর্পে ও মহোল্লাসে যেন মেদিনী কাঁপিয়ে প্রবেশ করছে।

পরাজিতেরা এখনও সম্মুখ সমরে তৎপর। এই যুদ্ধ ব্যাপারের ছবিগুলি দেখলে মনে বাস্তবিক আলো আঁধারের মত আনন্দ ও আতঙ্কের উদ্রেক হয়! সিংহল বিজয়ের ছবিগুলিতে আমরা প্রাচীন অর্ণবপোতের ছবি দেখতে পাই। এক যায়গায় একটা মিছিলের চিত্রে কতকগুলি লোক আনন্দে চীৎকার করচে, কতকগুলি লোক হাতীর পিঠ থেকে ভেঁপু বাজাচ্চে। তাদের ভাব-ভঙ্গি একমনে কিছুক্ষণ দেখলে ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের কিম্বা কল্‌কাতার বড়লোকের বিবাহের সমারোহের বাদ্যকোলাহলময় শব্দ, কানে যেন খুব স্পষ্ট ভাবে এসে লাগে। ছবিতে এরকম ভাব দেখান কম ক্ষমতার কাজ নয়। মৃগয়ার ছবিগুলিও বেশ চিত্তরঞ্জক! সেগুলি আজ কালকার মত 'ফাঁসকল' পেতে শীকার করার ছবি নয়। তাতে অনেক বিষয় বোঝবার ও দেখবার আছে। হরিণদের স্বাভাবিক ভয়বিহ্বল চপলভাব আর শিকারীদের মৃগয়াকৌশল তাতে সুস্পষ্ট। নর-নারীর বিলাসচিত্র ও দাম্পত্য প্রেমের ছবিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। তার মধ্যে ১৭ নং গুহায়, প্রবেশ দ্বারের উপর কতকগুলি দম্পতির ছবি উল্লেখযোগ্য। আর এক জায়গায় কোন কামিনী বসন্ত আগমনে হৃষ্টচিত্তে বাসন্তি রঙের কাপড় প'রে দোলনায় দুলছে; তার আননে ও গঠনে যৌবনের ধীর ও প্রফুল্ল ভাব সুন্দর ফুটেছে! ৩ নম্বর গুহায় একস্থানে দুয়ারের দুধারে দুটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড একতলার সমান বড় বুদ্ধমূর্ত্তি আছে; সে দুটীর মধ্যে একটি এখন অস্পষ্ট ছায়াকার হয়ে পড়েছে আর একটীর কেবল শ্বেত শতদলের উপর চরণ কমল দুটী অবশিষ্ট! চরণ দুটী এত সুন্দর ও ভাবপূর্ণ যে, তার তলায় পড়ে থাকৃতে ইচ্ছে হয়! আবার ঐ গুহাতেই গগনচারিণী দেবকন্যাদের কতকগুলি পা দেখেছি অতি আশ্চর্য্য ভাবে আঁকা! সেগুলো দেখ্‌লেই তারা যে শূন্যে মেঘের কোলে ভাস্‌চে সে বিষয় কোন সন্দেহই থাকে না! ১৯ নম্বর গুহার এক জায়গায় একটা পুষ্পিত পলাশ গাছের গুঁড়ির উপর সারবন্দী পিঁপড়ের দল উঠছে। শিল্পীরা একটা সামান্য পিঁপড়ে থেকে হাতী ঘোড়া লোক লস্কর প্রাসাদ প্রাচীর—দুনিয়ার কিছুই যেন বাদ দেন নি।

খানিকক্ষণ ধরে ছবি দেখতে দেখতে আমরা এমন তন্ময় হয়ে পড়তুম যে বাইরের সমস্ত বিষয়, এমন কি নিজের বিষয়ও যেন ভুলে যেতুম! আমাদের মনে কেবল সেই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কাল জেগে উঠত। আমরা যখন যে ছবিটার কাছে দাঁড়াতুম, তখন, এজগতের সমস্ত বিষয় ভুলে গিয়ে তাতেই ডুবে যেতুম! হয়ত, আমি কোন একটা মিছিলের ছবি দেখচি, দেখতে দেখতে মনে হ'ত আমিও বুঝি সেই মিছিলের মধ্যের একটা লোক! কোলাহল দেখতে দেখতে কোলাহলে যোগ দিতে ইচ্ছা হ'ত। কখন হয় ত, কোন পারিষদ্‌বর্গ বেষ্টিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রাজার দরবারের ছবি দেখে মনে হত, যেন, ত্রেতাযুগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে কোন বিষয়ের প্রার্থী হয়ে এসেছি। কোথাও যদি গান বাজনা হচ্চে এরকম ছবি দেখতুম, তো

সেখানে শ্রোতা হয়ে যেতুম! চির-মৌন ছবি-তেও যেন রাগ-রাগিণী বেজে উঠ্‌তো! চিত্রে এরকম আশ্চর্য্য ভাব খুব কমই দেখা যায়। ছবিগুলি দেখে ঠিক্ যে ভাব মনে উদয় হতো তা' ভাষায় জানান আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব! আমি এ জীবনে সেই সব ভাব কখনও ভুল্‌তে পারব না। অজন্তার প্রথম নম্বর গুহা থেকে বুদ্ধদেবের জীবনের বাল্যের ঘটনা আরম্ভ করে, ২৬নং গুহায় তার চির নির্ব্বাণের চিত্র দেওয়া আছে। এবং প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক স্থানে তখনকার প্রচলিত উপকথা ও জাতকাদি গল্পের ছবি আছে।

অনেকে অজন্তার ছবিকে নগ্ন বলে উপ-হাস করে থাকেন; কিন্তু, এর নগ্নভাব আর বিলাতি নগ্নভাবের মধ্যে অনেক প্রভেদ! ইউরোপীয় ছবিতে নগ্নতা বিশেষ করে নগ্নতার ভাবই মনে করিয়ে দেয়, আর অজন্তার ছবিতে নগ্নতা কেবলমাত্র গঠনের সৌন্দর্য্য দেখায়! এ সম্বন্ধে মোগল ছবি অজন্তাচিত্রেরই অনুরূপ।

হেমেন্দ্র রায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ভারতীতে অজন্তা গুহাগুলির অবস্থা ও বিবরণ সুন্দর ভাবে লিখেছেন। তাই বাহুল্যভয়ে আর সে সব কথা এ প্রবন্ধে লিখতে চাইনা। মোট কথা,—সূক্ষ্ম কারুকার্য্য হিসাবে মোগল চিত্র শ্রেষ্ঠ হলেও চিত্র হিসাবে অজন্তার ছবি ঢের মূল্যবান।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

নর্ত্তকী।

কুশীলব।

বীরসিংহ···রাজ-সেনাপতি।
রাধাবাই···নর্ত্তকী।
হেমরাজ···অজ্ঞাতপরিচয় যুবক।
তরুণসিংহ...বীরসিংহের সহকারী।

দৃশ্য—সজ্জিত প্রমোদ-কক্ষ। মুক্ত বাতায়ন-পথে অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়া অদূরস্থ নদী দেখা যাইতেছিল। কাল, জ্যোৎস্না-রাত্রি।

রাধা বাতায়ন পার্শ্বে মখমল-আস্তীর্ণ উচ্চাসনে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে গান গাহিতেছিল।

রাধা—(গীত)

ক্যায়সে মুসে রহেনা যায় সামেলিয়াসে
প্রীতিকর পাছে তানি,
ক্যায়সে করু ক্যায়সে করু মেরি সজনি—
পিয়ারে সুরত সামেলিয়া—

বীরসিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বীরসিংহ—চারিধার নিস্তব্ধ হয়েছে, রাধা!

রাধা—এখনো তার দেখা নেই।

বীরসিংহ—বেচারা জানেনা সে কি ফাঁদে পা দিয়েছে—আজ সে বন্দী হবে! আমি আড়ালে সরে যাই! কিন্তু এখনো সে দেরী করছে কেন? সে কি কোন সন্দেহ করেছে?

রাধা—আসবে কি না, তাই বা কে জানে?

বীরসিংহ—তাহলে তোমায় ধিক! এমন

রূপের আগুন জ্বেলে রেখেছে'—তুচ্ছ এ পতঙ্গটা কি ঝাঁপ দেবে না'? রাধা—

রাধা—চুপ! কি সুন্দর রাত্রি! চাঁদের আলোয় চারিধার ছেয়ে গেছে—যেন আগাগোড়া স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে!

বীরসিংহ—থাক্—আমি তা দেখতে চাইনে! এমন চাঁদের আলো, এমন তুমি, তা হলে সব কাজ মাটি হয়ে যাবে! কি সুন্দর তোমাকে আজ দেখাচ্ছে, রাধা!

রাধা—একটা কঠোর দস্যুর প্রাণ টলাবার জন্য এত আয়োজন—

বীরসিংহ—সব কি পণ্ড হবে?

রাধা—না—কুহকিনীর কুহকের শক্তি অসাধারণ—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সেনাপতি, যদি সে আসে ত আজ রাত্রে বন্দী করে তাকে তোমার হাতে দেব, নিশ্চয়—

বীরসিংহ—আঃ কি সে সম্মান, কি সে গৌরব, তার পর, রাধা, তুচ্ছ সংসার, তুচ্ছ কর্ত্তব্য সব থেকে অবসর নিয়ে তোমারি প্রেমে ডুবে থাকব! সে কি সুখ, কি আরাম—

রাধা—সে কথার সময় আছে, সেনাপতি! এখন মোহের ফাঁদে ধরা পড়ো না—

বীরসিংহ—রাধা—রাধা—তুমি আমায় কি করেছ—জানোনা তুমি!—নারীকে কখনো আমি জানবার অবসর পাইনি! মানুষ মারার নানা কৌশলের মধ্যেই এতদিন মগ্ন ছিলাম। তার পর এই দুর্ব্বৃত্ত দস্যু চাঁদরায়কে ধরবার নানা চেষ্টা বিফল হল, শেষে তাকে ধরবার জন্য তোমার সাহায্য গ্রহণ করলাম—তুমি যখন একলা বসে নিজের মনে গান গাও, আমার প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা অগাধ হাহাকার করে ওঠে! তোমার পাশে বসে তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকতে শুধু সাধ যায়! আমাকে কি এক নেশায় তুমি মাতিয়ে তুলেছ—এমন বেণী দুলিয়ে রঙীন কাপড় পরে গোলাপী ওড়না উড়িয়ে যখন তুমি বসে থাকো, তখন আমার কি সাধ যায়—জানো—

রাধা—চাঁদরায় জানলার ধারে আমাকে প্রথম দেখে—চোরের মত সে এসেছিল! আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে ভেবে সে তা লুণ্ঠন করতে এসেছিল—জানেনা যে আমি ব্যাধের মত বসে আছি! আমি তখন গান গাচ্ছিলাম—তন্ময় হয়ে সে আমার পাশে এসে দাঁড়াল—তার পর পাগলের মত এসে কি সব বললে—আমার মনে যে কি আহ্লাদ হল—পাখী ধরবার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছিল—পাখী এসে আপনা-হতে সে ফাঁদে পা দিয়েছে—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আর কোন আশঙ্কা রইল না—যে কাজের জন্য সেনাপতির নিমক খেয়েছি—সে নিমকের মর্য্যাদা থাকবে—

বীরসিংহ—আর সেই সঙ্গে সেনাপতিকে এমন ভাবে জয় করে বসেছ যে সে চিরজন্ম তোমারি কাছে বন্দী থাকবে! এমন পরাজয় হয়েছে আজ তার!

রাধা—প্রেমের কথা তুলো না—সেনাপতি! আমি হীন নর্ত্তকী—রূপব্যবসায়িনী আমি, আর তুমি সম্রান্ত রাজপুত সেনাপতি—এ সাম্রাজ্যের ভিত্তি তুমি!

বীরসিংহ—যাক সে ভিত্তি রসাতলে!

রাধা—চাঁদরায়ই যে হেমরাজ কেমন

করে জানলে, তুমি? সে জানে, আমি কোন সর্দ্দার-কন্যা! আমার প্রেমে বিভোর হয়ে পড়েছে সে!

বীরসিংহ—এটা তার সুবুদ্ধিরই পরিচয়!

রাধা—সে জানেনা, সন্দেহ করবারো সে কোন অবকাশ পায় নি যে, আমি একজন সামান্যা নর্ত্তকী মাত্র—তাকে ধরবার জন্য বিরাট আয়োজন করে বসে আছি! সে এমন বশ মেনেছে যে আমার কথায় স্বচ্ছন্দে সহরে যেতে এখন সে এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা করবে না!

বীরসিংহ—রাধা, আমাকে ত আশ্বাসের কথা কিছু বললে না, তুমি!

রাধা—সে কথার এখনো ত সময় যায়নি, সেনাপতি!

বীরসিংহ—এমন সুন্দর তুমি, হায় নারী, আবার এমনি নির্ম্মম! পাষাণের প্রতিমা!

রাধা—সেনাপতি বীরসিংহ, প্রেমোচ্ছ্বাসের সময় এ নয়!

বীরসিংহ—সময় নয়, কি বল, রাধা? এমন জ্যোৎস্না রাত্রি, এমন নিস্তব্ধ দিক, এমন শান্ত সুন্দর তুমি, এমন নির্জ্জন—

রাধা—চুপ! দূরে ঐ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ! তুমি আড়ালে যাও—

বীরসিংহ—রাধা, ধিক এ কর্ত্তব্যে!

প্রস্থান।

রাধা—(আপনার মনে গান ধরিল।)

দেখে বিন্দু জল নাহি পরত চায়ন মোহে
ছিপি রহে বনোয়ারী মেরি সজনি,
কোই দেউনা বাতাওয়ে—

হেমরাজের প্রবেশ।

হেমরাজ—রাধা!

রাধা—হেম!

হেমরাজ—এত রাত্রে এখনো তুমি একলাটি বসে আছ!

রাধা—(হেমরাজের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।)

হেমরাজ—এখনো তুমি জেগে আছ, রাধা?

রাধা—হঁ! কিন্তু তোমার এত দেরী হল কেন, হেম! এত রাত্রে কি এমন তোমার কাজ ছিল!

হেমরাজ—সে কথা জিজ্ঞাসা করোনা, আমাকে! (রাধার হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইল) আমারি জন্য তুমি বসে আছ, রাধা?

রাধা—(হেমরাজের মুখের পানেই সে চাহিয়া রহিল—কোন উত্তর দিল না।)

হেমরাজ—(রাধার হাত ছাড়িয়া) তুমি জানোনা—আজ সারাক্ষণ কি যন্ত্রণা আমি ভোগ কচ্ছি!

রাধা—বল, আমাকে! (হেমরাজের হাত ধরিল) বলবে না?

হেমরাজ—আমাকে স্পর্শ করোনা, তুমি! তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাও আমার নেই! আমি আজ বিদায় নিতে এসেছি।

রাধা—বিদায়? কোথা যাবে, তুমি?

হেমরাজ—জানি না। তবে তোমার সামনে আর আসবো না, কখনো!

রাধা—আমাকে তুমি গ্রহণ করবে, বলেছ ত!

হেমরাজ—তা হয় না, রাধা!

রাধা—কেন? কি দোষ করেছি আমি?

হেমরাজ—দোষ তোমার নয়, রাধা, দোষ আমার!

রাধা—তোমার? কি, সে? এত ভালবাসা—

হেমরাজ—সেই ভালবাসার জন্য আমি দূরে যেতে চাই! রাধা, সূর্য্য তুমি, আমি পথের মলিন ধূলিমাত্র। তোমার দীপ্ত আলোর সামনে আমার মলিনতা আরো ব্যক্ত হয়ে ওঠে। তুমি আলো, আমি অন্ধকার!

রাধা—এ তুমি কি বলছো, আজ?

হেমরাজ—বুঝতে পারছ না? তবে শোন বলি—

রাধা—(বসিল) বল!

হেমরাজ—(চকিতভাবে) ও কিসের শব্দ?

রাধা—কিছু না!

হেমরাজ—আমার মনের তা হলে! রাধা যা বলব তা শুনলে এখনি সমস্ত আলো নিভে যাবে—বাতাস স্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশ কেঁপে উঠবে, তুমিও স্তম্ভিত হবে—তবু শোন। রাধা আমাকে চেননা তুমি, আমি সর্দ্দার নই, ওমরাহ নই, আমি ঘৃণিত দস্যু। রাজদণ্ডে দণ্ডিত!

রাধা—হেম——

হেমরাজ—আমি সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু চাঁদ রায়—তোমাকে যা বলেছি, মিথ্যা! সব মিথ্যা! তাই আজ তোমার পথ থেকে সরে যেতে চাই! এ মণি রাজার মুকুট-শোভার জন্য, হীন দস্যুর বুকের জন্য নয়, রাধা!

রাধা—আমি তোমায় ভালবাসি, হেম!

হেমরাজ—ভুলে যাও, রাধা, দুঃস্বপ্নের মত আমার কথা ভুলে যাও, তুমি! আমিও তোমাকে ভালবেসেছিলাম—অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল! কিন্তু তোমার নির্ম্মল প্রেমের যোগ্য নই, আমি!

রাধা—তবু আমি ভালবাসি, হেম! তুমি দস্যু হও, যে হও, তবু তুমি আমার সর্ব্বস্ব!

হেমরাজ না! তুমি ভালবাস সর্দ্দার হেমরাজকে, দস্যু চাঁদরায় তোমার ভালবাসার যোগ্য পাত্র নয়, রাধা!

রাধা—হেম।

হেমরাজ—কি?

রাধা—তবে আমারো কিছু বলবার আছে। শোন—আমিও মিথ্যা বলেছি—আমি সর্দ্দারকন্যা নই, হীন নর্ত্তকী, আমার নাম লছমি। তোমাকে ধরবার জন্য শুধু ফাঁদ পেতেছিলাম রাজার আদেশে,—কিন্তু কি ফাঁদে ধরা পড়েছি, তা তুমিই জানো!

হেমরাজ—নর্ত্তকী লছমী! রূপব্যবসায়িনী লছমী—

রাধা হাঁ, হীন, অতি হীন নর্ত্তকীর প্রাণ তোমারই প্রেমে সে আজ নূতন রূপে ভরে উঠেছে। জীবনে এই প্রথম সে ভালবাসার স্বাদ পেয়েছে! তা থেকে বঞ্চিত করোনা তাকে!

হেমরাজ—লছমী—

রাধা—না, লছমী নয়, লছমী মরেছে, আমি রাধা।

হেমরাজ—রাধা, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল, তুমি?

রাধা—কি কথা?

হেমরাজ—যে আমাকে তুমি ভালবাস, যে আমি তোমার সর্ব্বস্ব!

রাধা—বিশ্বাস কর, হেম, সত্য বলছি, এ

কথা বিশ্বাস কর, পৃথিবীতে এমন সত্য আর কিছু নেই!

হেমরাজ—আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ফাঁদ পেতেছিলে তুমি, অথচ...

রাধা—অথচ নিজেই আমি কি এক নূতন ফাঁদে ধরা পড়েছি!

হেমরাজ—এ কথা সত্য?

রাধা—সত্য, তোমার পদ স্পর্শ করে বলছি, এ কথা সত্য! আজ যখন তোমারি প্রতীক্ষায় এখানে এসে বসলাম তখন চারিধার জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে—কি সে সৌন্দর্য্য, কি সে শোভা—মনে তৃপ্তি ছিল না। তোমা'র জন্য প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল—কি অধীর তীব্র সে ব্যাকুলতা! সেই সময় প্রথম জানলাম এ খেলা নয়, প্রেমেরি জটিল বন্ধন! সে বন্ধন ছেদন করবার শক্তি আমার নেই! সে এমনি দৃঢ়!

হেমরাজ—রাধা, তুমি জানোনা, কাল যদি ঘুণাক্ষরে এ কথা সন্দেহও করতাম আমি, তাহলে তোমার ঐ কোমল বুকে ছুরি বসাতেও দ্বিধা করতাম না! (বক্ষ হইতে ছুরি বাহির করিল) এই দেখো!

রাধা—তাই করো—তোমার উপেক্ষার চেয়ে শাণিত ছুরিই আমার আদরের,গৌরবের, লাভের!

হেমরাজ—না—দূর হোক, এ ছুরি—(ছুরিকা বাহিরে ফেলিয়া দিল)—রাধা—

রাধা—কি?

হেমরাজ—জীবনে আমার আর কোন স্পৃহা নেই! সেনাপতিকে ডাক—প্রহরীদের ডাক—আমায় তারা বন্ধন করুক!

রাধা—না!

হেমরাজ—তবে আমি আত্মসমর্পণ করিগে, চাঁদরায়ের অস্তিত্ব এ পৃথিবী থেকে মুছে যাক!

রাধা—না, না!

হেমরাজ—তবে কি চাও, তুমি?

রাধা—চল হেম, লোকালয় ছেড়ে বনে যাই! দুজনে থাকব...দুজনে শুধু—তুমি প্রভু, আমি দাসী! বনের মাঝে হিংসা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, কোন কোলাহল নেই!

হেমরাজ—লছমী—

রাধা—না, রাধা আমি! আমার সমস্ত অতীত কলঙ্ক মুছে পায়ে যদি না স্থান দাও আমাকে, তবে হত্যা কর, এখনি হত্যা কর (হেমরাজের পদতলে লুণ্ঠিতা হইল।)

হেমরাজ—(নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া) রাধা, ওঠ—(রাধা দাঁড়াইল।) এ প্রেম কতদিনের জন্য! এমন মিথ্যা হতে, সন্দেহ হতে, প্রবঞ্চনা হতে যে প্রেমের সৃষ্টি, যে প্রেম সত্যের উপর, মর্য্যাদার উপর, ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে প্রেম কত দিন!

রাধা—তবু সে প্রেম!

হেমরাজ—কে জানে এ-ও ক্ষণিকের খেলা নয়? খেলায় আমার সাধ নেই! রুচিও নেই!

রাধা—উপরে ঐ অনন্ত আকাশ তার শপথ, এ প্রেম চিরদিনের—মেঘশূন্য ঐ আকাশেরই মত সুন্দর, উদার, নির্ম্মল এ প্রেম!

বীরসিংহ আসিয়া অন্তরালে দাঁড়াইল।

হেমরাজ—এ প্রেমে কোন পাপের স্পর্শ নেই?

রাধা—অনুতাপের অশ্রুতেও কি তা মুছে যাবে না?

হেমরাজ—কিন্তু স্মৃতি! সে যে বৃশ্চিকের মত মাঝে মাঝে দংশন করে উঠবে—তখন? না রাধা, আমি ধরা দিই—সকল খেলার অন্ত হোক!

রাধা—না, চলো হেম, এই রাত্রের নীরবতার মধ্য দিয়ে আমরা চলে যাই! সমস্ত অতীত, সমস্ত পাপ, রাত্রির মত পোহাবে—তারপর দিনের আলোয় নূতন প্রেমোজ্জ্বল জীবনে নবজাগরণ! আনন্দ ও পুণ্যের সে স্নিগ্ধ জ্যোতি!

হেমরাজ—কিন্তু লছমী—

রাধা—বুঝেছি, কোথায় তোমার বাধছে,—বেশ, নর্ত্তকী বলে ভুলতে না পারো যদি ত, দাসী বলে—

হেমরাজ—(সহসা রাধাকে বক্ষে ধরিল।) রাধা—

রাধা—হেম!

হেমরাজ—তাই হবে, সমস্ত অতীত ভুলবো—আমি চাঁদরায় নই, হেমরাজ! আর তুমি রাধা, আমার স্ত্রী! (চুম্বন করিল।)

রাধা—আঃ, কি সুখ!

হেমরাজ—যাক্, সমস্ত অতীত মুছে যাক্! আজ আমাদের পুনর্জন্ম! প্রেমের মোহন স্পর্শে সমস্ত মলিনতা ঘুচে যাক—নূতন আলো, নূতন পৃথিবী, নূতন জীবন!

রাধা—প্রভু, স্বামী—

হেমরাজ—এসো, রাধা,—

উভয়ে বাতায়ন-পথ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল!

বীরসিংহ আসিয়া নির্ব্বাকভাবে বাতায়নের ধারে দাঁড়াইল।

বীরসিংহ—দুর্ভাগা বীরসিংহ! যাও, প্রেমের বর্ম্মে আচ্ছাদিত হয়ে দুজনে চলে যাও! তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করবারও কারো সাধ্য হবে না!

তরুণের প্রবেশ।

তরুণ—কৈ, কোথা সে দস্যু, চাঁদরায়? সেনাপতি—

বীরসিংহ—(ফিরিয়া) তরুণ—

তরুণ—কি, পালিয়েছে? (শশব্যস্তে বাতায়নের ধারে আসিল।)

বীরসিংহ—না—আমারি ভুল হয়েছিল!

তরুণ—ভুল?

বীরসিংহ—হাঁ! দস্যু চাঁদরায় ও স্বাধীন সর্দ্দার হেমরাজ, দুজনে এক লোক নয়!

তরুণ সিংহ স্তম্ভিতভাবে বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

যবনিকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে বিবাহ-পদ্ধতি।

আজকাল ভারতের নরনারী আধুনিক বিবাহ-রীতিতে সন্তুষ্ট নহেন। পুরাকালে যে সকল রীতি আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা বহুকাল হইল অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আজকালকার রীতিগুলি সেই সকল প্রাচীন রীতির অপভ্রংশ মাত্র। সুতরাং আজকাল ব্যক্তিগত ও মতগত স্বাধীনতা লাভ করিয়া অনেকে সমাজকেও

মধ্যযুগের অন্যায় ও অযৌক্তিক বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

অনেকে মনে করেন যে আমাদের দেশেও বিবাহের পূর্ব্বে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট আকারে ভাবী পতিপত্নীর আলাপ ও পরিচয়ের অবসর থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে যে যাহাকে বিবাহ করিবে তাহাকে তাহার আপনি ভাল করিয়া দেখিয়া ও বুঝিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এরূপ করিতে হইলে বর্ত্তমান বিবাহপদ্ধতির সমূল উচ্ছেদ করিয়া বালকবালিকার স্থলে যুবকযুবতীর পরিণয়রীতি প্রচলিত করাই আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রাচীন ভারতে যে এরূপ যুবকযুবতীর স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাহার ফলে যে সমাজের মঙ্গলই হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং হিন্দু মাত্রেই এই সকল কাহিনী শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পবিত্র জ্ঞানে পাঠ করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে এই ভারতবর্ষেই যদি যুবকযুবতীর স্বয়ম্বরে ও বিবাহপূর্ব্বে আলাপ পরিচয়ে কোন ক্ষতি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে তাহার সমস্ত না হইলেও কতকাংশ বর্ত্তমান সমাজ মধ্যে প্রচলিত করিলে আমাদেরও বিশেষ ক্ষতি না হইয়া বরং অনেক ইষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের পুরাতন বিবাহপদ্ধতিতে আমরা পাশ্চাত্যজগতের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিকাশই দেখিতে পাই,—কেবল ইহার মধ্যে পাশ্চাত্য সমাজের যথেচ্ছ ব্যবহার ও শৈথিল্যটুকু নাই। তাহার কারণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মর্ম্মটুকু প্রতীচ্য সভ্যতার ন্যায় জড়বাদিত্বের পঙ্কে পূর্ণ ছিল না। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম বা চরিত্রনীতি আপামর সকলকেই এরূপ শিক্ষা দান করিয়াছিল, যদ্দ্বারা তাহারা কেহই পার্থিব বস্তুকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিতে শিখে নাই, সকলেই জগদতীত এক বৃহত্তর ও উচ্চতর লক্ষ্যের অনুসন্ধানে ছুটিত। ভারতবাসী পৃথিবীকে কর্ম্মভূমির চক্ষেই দেখিত—ইহাকেই সে কোনদিন চরম লক্ষ্যভূমি বলিয়া জ্ঞান করে নাই। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, আনন্দ, সুখ বা সম্ভোগ্য বস্তু, সে সকলকেই পরম লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান না করিয়া, এ সকলকে সে কেবল শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য লাভের উপায়স্বরূপ বলিয়া মর্ম্মমধ্যে বিশ্বাস করিত। এই বিশ্বনীতিটুকু উচ্চ নীচ সকলেই আপন আপন জীবনে সফল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। যে মহাপাপী ও অত্যাচারী সেও আপনাকে মানব চরিত্রের এই নীতিটুকুর অধীন বলিয়া জানিত। লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল সত্য, সীতার শুভাশুভ তাহার নিমেষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছিল সত্য, কিন্তু তথাপি রাক্ষসরাজ এই দীর্ঘকালের মধ্যেও সীতার অনিচ্ছায় তাঁহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করে নাই। সেকালের নীতিই ছিল যে তাহার ইচ্ছা ব্যতীত কোনও রমণীকে কেহ স্পর্শ করিবে না। সেকালের আপামর সকলেই কিরূপ ধর্ম্মানুরক্ত ছিল তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে অমর অক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন এরূপ ছিলেন, তখন আমরা যে এক্ষণে কতকাংশেও তাঁহাদিগের ন্যায় হইতে পারি না, ইহার কারণ কি?

পণ্ডিতগণ তাঁহাদের চিরপ্রচলিত সংস্কার অনুসারে বলিয়া থাকেন যে আধুনিক হিন্দু জীবনের বাহ্যিক অবস্থাগুলা প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের পক্ষে অনুপযুক্ত এবং এই সকল বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইলে আমাদের পুনরায় ভারতের প্রাচীন আদর্শ অনুসারে জীবনগঠন করা সম্ভব। কিন্তু এ স্থলে বিবেচ্য এই যে সেই সকল বাহ্যিক অবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করায় আমাদের যথার্থ বাধা কোথায়! আমাদিগের আপন অজ্ঞতা বা দুর্ব্বলতা ভিন্ন অপর কোন শক্তিই আমাদিগকে বিদেশী আদর্শের অর্থাৎ তাহার বিকৃত অনুকৃতির আদর করিতে, অথবা আপনার শ্রেষ্ঠ ধনকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে সেকালে নারী ও পুরুষের মধ্যে চরম স্বাধীনতা ছিল এবং পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতরমণীর আত্মরক্ষা করিবার পক্ষেও যথেষ্ট বল ও শক্তি ছিল। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে সেকালে ভারতের নরনারীর মধ্যে পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় স্বাধীনতার অপব্যবহার প্রচলিত ছিল না, অন্ততঃ সেরূপ প্রবল ও সাধারণ ভাবে নহে সেটা নিশ্চয়। সেকালে পতিপত্নী যথেচ্ছাচারকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে শ্রেষ্ঠ সন্তানোৎপাদনের জন্যই চেষ্টা করিতেন। বিবাহ ব্যাপারটা কেবল একটা লৌকিক অনুষ্ঠান মাত্র ছিল। যুবক যুবতী প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিত যে তাহাদের উভয়ের মিলন তাহাদের নিজেদের বা সন্তানের পক্ষে আবশ্যক কি না। তাহারা এরূপ আবশ্যকতা বোধ করিলে তবে সমাজ ও ধর্ম্ম তাহাদিগের মিলনকে স্বীকার করিত। আজকাল এ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সমাজের মতে বিবাহ কর্ম্মটা প্রথম হয়, তাহার পর উভয়ের মিলন-ইচ্ছা জাগ্রত হইতে থাকে। সে কালের কাহিনী হইতে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে তখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার রীতিটা অল্পাধিক প্রচলিত ছিল। অনেক ঋষি লোক-সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে বা পবিত্র নদীতীরে বাস করিয়াও সময়ে সময়ে আপনার বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য কোনও নারীর সহিত মিলিত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইবার পর আর কেহ কাহারও বিষয় চিন্তাই করিতেন না। স্বার্থ বা অপবিত্র মোহই অধিকাংশ সময়ে তাঁহাদের এ অস্থায়ী মিলনের যথার্থ কারণ। অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদনের জন্যও নরনারী এরূপ ভাবে মিলিত হইতেন।

বিশ্ববসু ও মেনকার মিলনে একটি কন্যার জন্ম হয়। তাহারা উভয়েই গন্ধর্ব্ব। বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ নহে বলিয়া তাহারা তাহাদের শিশু কন্যাটিকে স্থূলকেশী নামে এক ঋষির আশ্রমে ফেলিয়া যায়। শিশুর রূপে মুগ্ধ হইয়া মুনিবর তাহাকে ভূমি হইতে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাইলেন ও তাহাকে আপন পোষ্য-কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন। দিনে দিনে শিশুটির বয়সের সহিত রূপগুণ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং সকলেই তাহাকে ঋষিকন্যা বলিয়াই জানিল।

এদিকে প্রসিদ্ধ ভৃগুমুনির পুত্র রুরু স্থূলকেশীর আশ্রমে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন

এবং সেই অসামান্যা সুন্দরী ঋষিকন্যাকে দর্শন করিতেন। রুরু সেই সুন্দরীর রূপে এতই মুগ্ধ হইলেন যে তাহাকে না পাইয়া জীবন-ধারণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি তাহার নিকট আপনার অন্তরের গুপ্তপ্রেম প্রকাশ করিয়া জানিলেন যে কিশোরীও তাঁহার প্রেমে আত্মহারা। তখন তিনি তাহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিবার জন্য আপন পিতা ভৃগুকে স্থূলকেশী মুনির নিকটে প্রেরণ করিলেন। স্থূলকেশী যুবক-যুবতীর মনোভাব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, এক্ষণে ভৃগুমুনির মুখে এই প্রস্তাব শুনিবা মাত্র সানন্দচিত্তে সম্মতি দান করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাদের বিবাহ স্থির হইবার পরেই একদিন সেই ঋষিকন্যা অন্যান্য আশ্রম-বালাদিগের সহিত উদ্যানে ক্রীড়া করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে সহসা অজ্ঞাতে এক সর্পকে পদাঘাত করেন। সর্পটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করিল এবং অনতিবিলম্বেই ঋষিকন্যার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এই শোকসংবাদ অল্পকাল মধ্যেই তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলে তাহার সেই অচেতন দেহের পার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন সে মূর্ত্তিতে মৃত্যু-কালিমা কিছুই নাই,—নিদ্রাগতা স্বর্ণলতার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া আছে! চতুর্দ্দিকের যত মুনিঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিলোকখ্যাত ভরদ্বাজ ও গৌতম মুনিও তথায় উপস্থিত হইলেন। শোকবিহ্বল রুরুও তথায় গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ভূতলে তাঁহার প্রাণপ্রিয়ার মৃত দেহ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত এতই কাতর হইল যে তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে যাইয়া অবিশ্রাম অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাতরহৃদয়ে দেবতার নিকট তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন, কারণ তাহাকে হারাইয়া তাঁহার প্রাণধারণ করা অসম্ভব! তিনি নিজে একজন দেবতা-বিদিত তপস্বী, সুতরাং ইন্দ্রদেব তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া শোকার্ত্ত রুরুর নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন।

দেবদূত আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ঋষিপুত্র, তোমার এ শোকের কারণ কি? ইন্দ্রদেব তোমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন। মানুষ একবার মরিলে কি আবার বাঁচে? তোমার এ শোক নিতান্তই বৃথা!"

ঋষিপুত্র বলিলেন—"কিন্তু আমি এমন কোন কুকর্ম্মই করি নাই, যাহার জন্য আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর শাস্তি-বিধান হইতে পারে। শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি কোন অন্যায় কর্ম্মই করি নাই এবং কোন দিন মনুষ্য বা দেবতার প্রতি কর্ত্তব্যেও পরাঙ্মুখ হই নাই। ইন্দ্রদেব ইচ্ছা করিলে কি আমার প্রাণপ্রিয়াকে ফিরাইয়া দিতে পারেন না?"

দেবদূত—"তোমার প্রাণপ্রিয়া একজন সামান্যা মানবী ছিল না; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার ঔরসে তাহার জন্ম। এরূপ জীবের পৃথিবীতে কতকাল থাকা সম্ভব? সেই জন্য দেখ, তাহার এই অকালমৃত্যু হইয়াছে,—এ মৃত্যু বিধাতার বিধান অনুসারেই হইয়াছে।"

রুরু—"কিন্তু আমি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া পাইতে চাই, তাহার কি কোন উপায়ই নাই?"

দেব—"হাঁ আছে। ইন্দ্রদেব আমাকে

বলিয়াছেন যে যদি তুমি তোমার অর্দ্ধেক পরমায়ু ত্যাগ করিতে সম্মত থাক, তাহা হইলে সেই কাল পর্য্যন্ত এই রমণীকে জীবিত রাখা যাইতে পারে।”

রুরু—“আমি আমার নিজের অর্দ্ধেক জীবন ত্যাগ করিতে সম্মত হইলাম।”

এই কথা শুনিবামাত্র দেবদূত যমরাজের নিকট যাইয়া ঋষি-কন্যাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার আদেশ লইয়া আসিলেন। দেবদূত ফিরিবামাত্র ঋষিকন্যা নিদ্রোত্থিতার ন্যায় ভূমি হইতে উত্থিতা হইলেন,—সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল।

পরে উভয়ে বিবাহিত হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই আখ্যানের মধ্যে আমরা বিবাহের পূর্ব্বে যুবক যুবতীর প্রেমের প্রাচীন আদর্শটিকে পরিস্ফুট দেখিতে পাই, এবং অসাধারণ অবস্থার মধ্যে ব্রাহ্মণযুবার আন্তরিক প্রেমের কঠোর পরীক্ষা দেখিতে পাই।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে মনুষ্য-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি এরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহার মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও বিবাহ ব্যাপারের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। এখনকার ন্যায় মহাভারতের কালেও সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে বংশরক্ষার জন্য পূর্ব্বপুরুষগণের যন্ত্রণার সীমা থাকে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অগ্নিতেজা তপস্বী জরৎকারুকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে দেখিতে পাই।

জরৎকারু কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার দ্বারা দেবপিতা ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত তুষ্ট করিয়াছিলেন। আমরণ কুমার থাকিবেন বলিয়াই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু তাঁহার আর ছয়টি ভ্রাতাও কুমার অবস্থায় প্রাণত্যাগ করাতে পিতৃদেবগণ বংশলোপ হইবার ভয়ে দারুণ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

জরৎ এক অতল কূপের মধ্য হইতে তাঁহাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাঁহাদের শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পিতৃদেবগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া উত্তর করিলেন “হে অপরিচিত, আমাদের ইচ্ছা তুমি জরৎকারু নামক চিরকুমার-ব্রতী অভাগাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বল যে আমাদিগের উদ্ধারের জন্য তাহার বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করা আবশ্যক।”

জরৎ বলিলেন—“আমিই সেই অভাগা। আপনাদের যাহা কিছু বক্তব্য, আমাকে বলিতে পারেন।”

“আমরা জানি যে তুমি কঠোর তপস্যার দ্বারা সাধনমার্গে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছ, কিন্তু তুমি অপুত্রক বলিয়া আমাদিগের উদ্ধারের আর আশা নাই। সুতরাং তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।”

“আমি আজ পর্য্যন্ত বিবাহে মনোযোগী হই নাই। কিন্তু যখন আপনারা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন তখন আমি বিবাহ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে!”

“কি সর্ত্ত?”

“আমি সাধারণভাবে বিবাহ করিতে পারিব না ইহা স্থির, সে আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যাহাকে লেশমাত্রও ভালবাসি না, তাহার সহিত প্রেমের ছলনা করিতে পারিব না। তবে ভিক্ষা করিতে

করিতে আমি একটি পত্নী ভিক্ষা চাহিব। যদি কেহ আমারই ন্যায় নামবিশিষ্টা কোন কন্যাকে ভিক্ষাদান করে, তাহা হইলে আমার একটি সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত সে আমার পত্নী থাকিবে।"

এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে এই ব্রহ্মচারী পত্নী অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিন্তু তিনি দরিদ্র বলিয়া এবং অন্নভিক্ষার সহিত পত্নীভিক্ষা করিতেছেন দেখিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যাদান করিতে অগ্রসর হইল না। তিনি পত্নীলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিরত হইবার বাসনা করিতেছিলেন এরূপ সময়ে নাগরাজ বাসুকী তাঁহার ভগ্নীর জন্য এইরূপ একটি পাত্রের অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই অসাধারণ ঘটনাটি দেবগণের ব্যবস্থানুসারে হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে লিখিত আছে। রাজা পরীক্ষিতের পুত্র সর্পযজ্ঞ করিতেছেন দেখিয়া নাগগণ সবংশে ধ্বংশ হইবার ভয়ে ভীত হইয়া দেবতাগণের নিকটে যাইয়া প্রার্থনা করিল যে তাহাদের কতকগুলিকে ধ্বংশ করিয়া অবশিষ্টকে রক্ষা করা হউক। তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণের জন্য দেবগণ বলিলেন যে যদি তাহারা তাহাদের একটি কন্যাকে কোন পত্নীভিক্ষুকে ভিক্ষাস্বরূপ দান করে তাহা হইলে সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তান তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

সেইজন্য রাজা বাসুকী পুরবাসীদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রাসাদে কোন পত্নীভিক্ষু উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যেন অবিলম্বে সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার ভগ্নীকে ইতিপূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি ভিক্ষুকের পত্নী হইয়া তাঁহার স্বজাতিকে উদ্ধার করিতে সম্মত কি না, তাহাতে তিনি আপন আত্মোৎসর্গের অভিলাষ জানাইয়া বলিয়াছিলেন—"রমণী বিবাহ করে, হয় প্রেমের জন্য না হয় কর্ত্তব্যের জন্য। প্রেমের জন্য বিবাহ করা যদি আমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আমি কর্ত্তব্যের জন্য বিবাহ করিয়া স্বজাতিকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।"

সুতরাং জরৎকারু যখন নাগরাজ্যে অন্ন ভিক্ষা করিতে যাইয়া প্রতি দ্বারে তিনবার করিয়া পত্নী ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন, তখন এ সংবাদ অবিলম্বে যাইয়া রাজা বাসুকির নিকট উপস্থিত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভগ্নী বহুমূল্য বস্ত্রশোভিতা হইয়া সলজ্জ পাদক্ষেপে সেই ভিক্ষুকের নিকট উপস্থিত হইয়া সানন্দ চিত্তে আপনাকে ভিক্ষা স্বরূপ দান করিলেন।

নাগকন্যার ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া জরৎকারু বিস্মিত হইলেন। রমণীর নাম তাঁহার অনুরূপ কিনা এই সন্দেহে তিনি সেই মনমোহিনী সুন্দরীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি, সুন্দরী?"

নাগকন্যা ভাবী পতির এই প্রথম সাদর সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন—"আমার নাম জরৎকারু, আমি রাজা বাসুকীর ভগ্নী।"

এমন সময়ে স্বয়ং রাজা বাসুকী তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মুনিবর, এই কুমারী আমার সহোদরা। সে আপনারই জন্য এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিল, এক্ষণে আপনি তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন ইহাই প্রার্থনা।"

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন—"তুমি রাজগৃহে

জন্মগ্রহণ করিয়াছ আর আমি কঠোর তপস্বী। তোমাকে যে আমি ভরণপোষণ করিতে পারিব না তাহা জানিয়াও তুমি আমার পত্নী হইতে চাহিতেছ ?”

বাসুকি উত্তর করিলেন—“আমি তাহা বেশ জানি। আপনার যতদিন ইচ্ছা আমি আপনাকে ও আমার ভগ্নীকে রক্ষা করিব। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের জন্যই আমি এত দিন আমার সহোদরাকে কুমারী রাখিয়াছিলাম।”

এই কথা শুনিয়া জরৎকারু কঠোর স্বরে বলিলেন—“তবে বাসুকীরাজ শ্রবণ করুন।

আমি রাজকুমারীকে পত্নীস্বরূপ রাখিবার জন্য আমার দারিদ্র্য বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে চাহি না। অধিকন্তু আপনার সহোদরা লেশমাত্র অবাধ্য হইলে আমি তাহা সহ্য করিব না। যে মুহূর্ত্তে সে আমার অমনোমত কোন কথা বলিবে বা কর্ম্ম করিবে সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।”

বাসুকি লেশমাত্রও চিন্তা না করিয়া কহিলেন—“তথাস্তু।”

এইরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাবে নাগ-রাজ্যে সুন্দরী রাজকুমারীর সহিত এক কুৎসিৎ ব্রাহ্মণ কুমারের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ দিবসে রাজপ্রাসাদের আনন্দ—কোলাহলের মধ্যে রাজকুমারী বেশ প্রফুল্ল ও সুখী। ব্রাহ্মণকুমার কিন্তু তাপসোচিতভাবে রাজ-প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। বিবাহ সময়ে অভদ্র ব্রাহ্মণ যথাসম্ভব মধুরভাষী হইবার চেষ্টা করিয়া পত্নীকে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন—“ভদ্রে, তুমি কদাচ আমার বিরক্তিকর কোন কর্ম্ম করিও না বা অপ্রীতিকর কোন কথা উচ্চারণ করিও না। যে দিন এইরূপ করিবে সেই দিনই আমি তোমাকে ত্যাগ করিব, তুমি আর আমার পত্নী থাকিবে না।”

মনুষ্য প্রকৃতি তখনও আমাদের মতই ছিল। বিবাহের দিনে স্বামীর নিকট এরূপ সুমিষ্ট কথা শুনিবার জন্য কেহই প্রস্তুত থাকে না। সুতরাং মুনিবরের বাক্য শ্রবণমাত্র রাজকুমারী কম্পিত কলেবরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাশ্রুনয়নে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“ঋষিবর, আমি জীবনে একদিনের জন্যও আপনার অবাধ্য বা অপ্রীতিকর হইব না প্রতিজ্ঞা করিতেছি।”

বিবাহের পর ঋষিপত্নী প্রাণপণে স্বামী-সেবা ও তাঁহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সর্ব্বদাই ভয় পাছে তাঁহার কোন অজ্ঞাত ত্রুটির জন্য চিরপরিত্যক্তা হইয়া জীবনপাত করিতে হয়।

কিন্তু সে দুর্ঘটনা ঘটিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিন চারিমাস পরেই একদিন এক অভাবনীয় ব্যাপারে উভয়ের চিরবিচ্ছেদ ঘটিল।

একদিন বৈকালে এই কঠোর ব্রাহ্মণ পত্নীর অঙ্কোপরে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে-ছিলেন। সূর্য্য অস্ত গেল তথাপি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী মহা সমস্যায় পড়িলেন। সান্ধ্য আহ্নিকের সময় উপস্থিত, এ সময়ে স্বামীকে নিদ্রোত্থিত না করিলে তিনি কুপিত হইবেন, আবার তাঁহার অনিচ্ছায় নিদ্রাভঙ্গ করিলেও তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। এই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া স্বামীগতপ্রাণা ঋষিকন্যার মুখমণ্ডল স্বেদসিক্ত

হইয়া উঠিল, বাত্যান্দোলিত বল্লরীবৎ সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে মনে হইল যে সান্ধ্য-আহ্নিক না করিলে তাঁহার প্রাণেশ্বরের অমঙ্গল হইবে। আর তাঁহার দ্বিধা রহিল না। স্বামীর অমঙ্গলের অপেক্ষা আপনার অমঙ্গলকেই শ্রেয় মনে করিয়া তিনি পতির নিদ্রাভঙ্গের জন্য বলিলেন—"হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, জাগ্রত হও। সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সূর্য্য অস্তাচলগামী হইয়াছে। তোমার সূর্য্যোপাসনার সময় হয় নাই কি? দেবপূজার সময় উপস্থিত, সুতরাং অধীনার অপরাধ ক্ষমা করিও।"

জরৎকারু ধীরে পত্নীর অঙ্ক ত্যাগ করিয়া উঠিয়া নয়ন মুছিয়া দেখিলেন তাঁহার নিকটে কে উপস্থিত রহিয়াছে। পার্শ্বে তদ্গতচিত্তা পত্নীকে দেখিয়া বুঝিলেন তিনিই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। বিচ্ছেদভয়বিধুরা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"নাগরাজ দুহিতা, তুমি কোন্ সাহসে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিতে এবং আমি আমার আপন ধর্ম্মসাধনে অমনোযোগী বলিয়া আমাকে এইরূপে অপমানিত করিতে সাহসী হইলে? তুমি আমাদের উভয়ের সর্ত্তভঙ্গ করিলে বলিয়া আমি দুঃখিত, কিন্তু এক্ষণে তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিতে আমি বাধ্য।"

ভীতিবিহ্বলা রাজকুমারী কাতরে বলিয়া উঠিলেন—"হায় তাপসবর, আমি তোমাকে অপমানিত করিবার জন্য নিদ্রাভঙ্গ করি নাই, তোমার অমঙ্গলের আশঙ্কাতেই করিয়াছিলাম।"

পাষাণহৃদয় ঋষি উত্তর করিলেন—"আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভঙ্গ হইতে পারে না। এতদিন তোমাদের নিকটে বিবাহিত জীবনের সুখসম্ভোগ করিতেছিলাম। আজ বিদায়! তোমার ভ্রাতা বাসুকিরাজকে সংবাদ দিও! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম বলিয়া আক্ষেপ করিও না।"

ঋষিকন্যার সকল আশা দূর হইল। বেদনায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সর্ব্বদেহ কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার সেই প্রেমপূর্ণ নয়ন দুইটি অশ্রুভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং লজ্জাবতী লতার ন্যায় এই নিষ্ঠুর আঘাতে একেবারে মর্ম্মমধ্যে সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলেন। পরে চিরবিদায়ের পূর্ব্বে নৈরাশ্যের সাহসে ভর করিয়া কাতরে করযোড়ে কহিলেন—"স্বামী, প্রভু, আমি অনুক্ষণ তোমার সেবা ও পূজা করিয়াছি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন অন্যায় কর্ম্ম করি নাই, তবে বিনা অপরাধে আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে কেন প্রভু? রাজা বাসুকি তোমার ঔরসে সন্তান জন্মিয়া নাগজাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে বলিয়া তোমার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমাকে এ ভাবে ত্যাগ করিয়া যাইলে তিনিও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইবেন।"

জরৎকারু বলিলেন—"ভদ্রে, তুমি যাহা বলিতেছ সত্য, কিন্তু তুমি ভুল বুঝিতেছ। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছি বলিয়া তোমাদের কোন অনিষ্ট করিবার বাসনা আমার নাই। দেবতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আর কয়েকমাস পরে তোমার যে পুত্র হইবে

তাহার দ্বারা আমার পিতৃপুরুষগণ এবং নাগজাতি উদ্ধার পাইবে। এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতেছ তোমার শোকের কোন কারণ নাই ?"

এইভাবে ব্রহ্মচারীর অনিচ্ছাকৃত বিবাহের উপসংহার হইল। পতি পত্নীর মধ্যে ব্যবহার-বিধি সামরিক বিধির ন্যায় কঠোর ও প্রাণহীন! আজকালের গুরুজন-আদিষ্ট বিবাহের মধ্যে এইরূপ দাম্পত্য-সুখহীন সম্বন্ধ কত সুলভ তাহা পাঠক স্থির করিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মেয়ে-মজ্‌লিস।

(১৩১৬ পৌষের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রবন্ধ লেখা বড় দায়। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। আমার শত্রুমিত্র আত্মীয়কুটুম্ব সকলেই নানা দিক হতে নানা প্রকারে আমাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি যে সকল পত্র পাইয়াছি তাহার মধ্যে ২।৪ খানি ভারতীর পাঠকপাঠিকার গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি।

পত্র নং ১

ভাই দিদি—

আমরা গরীব বলে যে আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি নাই তা মনে কোর না। তুমি লিখেছ "সুশিক্ষিতা-মহিলা-মজ্‌লিসে বিশৃঙ্খলা হয় না," কিন্তু ভাই বিবেচনা করে দেখ, তাঁরা সুশিক্ষিতা বলেই বিশৃঙ্খলা ঘটে না অথবা ধনী বলে ঘটে না। তাঁদের প্রচুর দাসদাসী আছে, আয়া আছে গবর্ণেস্ আছে,—মাষ্টার পণ্ডিত আছে। তাঁরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে কি পরে বিকেলের আহারাদির হুকুম দিলেন বা ভাঁড়ার দিলেন। একটু বিশ্রামের পর ইচ্ছামত নিজের গাড়ীতে নিমন্ত্রণ স্থানে গিয়ে মিলিত হলেন। তার পর আহার,—তা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। মনে কর সেদিন তাঁর কোলের খোকাটি অসুস্থ—দেখ্‌ছেন আহারের দেরী আছে—সত্য মিথ্যা যে কোন প্রকার একটা ওজর করে তিনি চলে গেলেন। আমাদের ঘরে ভাই ওরকম সুবিধা হবার আশা করতেই পার না।

জান ত আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ বুড়ো মানুষ—সংসারের কোন কিছুর মধ্যে থাকেন না। আমার ৬টী সন্তান—বড়টী এই দশ বৎসরের; একটি মাত্র ঝি অবলম্বন করে ঘরকন্নার সকল কায চালাই। নিমন্ত্রণ যাবার দিন যদি তাদের কোনমতে ঘরে রেখে যেতেও পারি—'কন্তু খাবার কোথায় পাব? বিকালের রান্নাখাওয়ার সময়টা থেকে কোনমতে ছুটী নিয়ে তবে ত বাড়ীর বাহির হতে পারবো। তাদের জন্যে রেঁধে বেড়ে রেখে যেতে হলে আর যাওয়া হয় না। তা ভাই লোকলৌকতা ত রক্ষা করতে হবে! ছেলেদের কষ্ট হবে বলে কি আত্মকুটুম্ব সব ত্যাগ করবো? আজ তবে আসি।

তোমার ছোট বোন্।

পত্র নং ২

শ্রীচরণেষু

দিদিমা, তুমি যে দেখছি "সমাজ-সংস্কারক" হয়ে উঠ্‌লে। আর যা কর না কর মেয়ে-যজ্ঞির সময়টা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ো না। ভেবে দেখ তোমার এ সেবক যে কাজকর্ম্ম উপলক্ষে তোমাদের শ্রীচরণ দর্শন পায় তার কত না অন্তরায় ঘটবে। আমার ত এই কুড়ে ঘর—দিদিমার দল কি পরিমাণ জানইত। মনে পড়ে কি ঠাকুর মা বলে ছিলেন "বাপরে যেদিকে চেয়ে দেখি, দেখি বড় বৌএর বাপের বাড়ীর কুটুম!" তা তোমাদের তো কোন কায কর্ম্মে বাদ দিতে পারি না না ডাকলেও তো তোমরা ছাড় না। তার পর এ দাসের বিবাহ দিয়াছ; তা গৃহিণীর পিত্রালয়টী কিছু বাদ দেওয়া চলে না। বাকী রইলেন খুড়ী জ্যেঠাই মামী পিসি ভগিনী পাড়া প্রতিবাসী প্রভৃতি। এঁদেরও অনেককে না ডাক্‌লে হয় না। এঁরা না হলে কাজ কর্ম্ম করেই বা কে? তা আমার নিবেদনটা এই যে অনির্দ্দিষ্ট সময়েরও একটা সুবিধে আছে। কতক আসছেন, খাওয়া দাওয়া সেরে যাচ্ছেন— আবার কতক আসছেন,—এমনি করে মধ্যাহ্ন ভোজন থেকে আরম্ভ করে সায়াহ্ণ ভোজন পর্য্যন্ত খাওয়া দাওয়া চলতে থাকে। তাই বলছি আর যা কর সময়টা নির্দ্দিষ্ট করে কাজ নেই। আমার মত কুঁড়ে ঘরে অনেকেরই বাস। শুধু একেলা কি আমি?

ইতি সেবক রাজু।

পত্র নং ৩

শ্রীচরণ কমলেষু

মাসিমা আমার প্রণাম জানিবেন। ভারতীতে আপনার যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা আমরা পড়িয়াছি।

এ কি মাসিমা আমাদের উপর আবার আক্রমণ কেন? আপনার মা, মাসিমারা আমাদের যেমন শিখাইয়াছেন তেমনি শিখিয়াছি।

আপনাদের এমনি শিক্ষা দেবার ঝোঁক, যে কবে যে আমাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছিল তা ত মনেই পড়ে না। পাঁচ বছর বয়সে যখন আমরা ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হলুম তখন বাড়িতে মাষ্টার মশায় রাজর্ষি আর সেকেণ্ড বুক পড়াতেন। এ ত গল্প কথা নয় মাসিমা এ সত্যিকার ঘরের কথা। ভোরে সেই বিছানা থেকে উঠেই স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হত। ঘড়ির কাঁটায় ৮॥০ টা বাজলে আমরা গাড়ীতে উঠে স্কুল চলে যেতুম—আর সেই সন্ধ্যা ৫।৫॥০ টায় বাড়ীতে ফিরে আসতুম। রান্না বান্না ঘরের কায শেখবার অবসর পাওয়া দূরে থাক্ খেলা করতে অবসর পেতাম না। আবার সন্ধ্যাজ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টার মশায় এসে হাজীর হতেন। এমনি করে খেলার সুখের মুহূর্ত্ত টুকুও আমরা ভোগ করতে পাই নাই বল্লে হয়।

যাহোক তার পর বিবাহ। বিবাহের পর পরের ঘরে পরের হাতে পড়েছি। তাঁরা যেমন তেম'ন হতে হয়েছে। রান্না বান্নার কায ঘাড়ে পড়ে নাই—কাযেই তেমন পটু নহি যে তা স্বীকার করিতেছি।

আগুণতাতে গেলেই মাথা ধরে তাত সত্য। রান্নার কায তেমন অনায়াসে করতে পারি না বটে কিন্তু তা ছাড়া যে সব কায আমাদের

করতে হয় তার পক্ষে কি রান্নার কায করাটা এমনই শক্ত? অনভ্যাস বশতঃ শারীরিক ক্লেশ হয় কিন্তু কাযটা কঠিন নয়। তার চেয়ে সংসারের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রতি খুটি-নাটির দিকে দৃষ্টি রাখা সুকঠিন নয় কি? সন্তানদের দেখা শোনা, দাস দাসীদের পরিচালন করা, ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখা, আর যাঁহার হাতে আমাকে সমর্পণ করেছেন তাঁর সর্ব্ব কার্য্যে সহায়তা করা ও তাঁর সুখস্বচ্ছন্দের দিকে সর্ব্বপ্রকারে দৃষ্টি রাখতে আমাদের যত হয় এমনটি পল্লী মহিলাদের কিন্তু হয় না। আমি অনেক পল্লীগ্রামে গিয়েছি তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তাঁতে এইটুকু বুঝেছি যে আমাদের ঘরকন্নার দায়ীত্ব তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে পড়েছে। আজ তবে আসি।

আপনার স্নেহের বেণু

পত্র নং ৪

ভাই ঠাকুরঝি —

আর বোল' না জ্বলে মলুম। পুরুষদের চক্ষু যে ভগবান কেন দিয়েছেন বলতে পারি না। একটু কি পসন্দ নেই। মেজবৌমাকে চড়ুকের তত্ত্ব কোরবো বলে দুটো জ্যাকেট কিনে আনতে বলেছিলুম বোলবো কি ভাই তোমার দাদা মোটা মোটা দুটো সাটিনের জামা এনে হাজির। তাতে বিশ্বের জরী ফিতে লেস দেওয়া আছে। সে দুটো জ্যাকেট কি বালিসের খোল তার ঠিক নেই! দেখে ত অবাক। তোমাদের শিল্পবিদ্যালয় কেমন চলছে? রথের তত্ত্বর জন্য কয়েকটী জ্যাকেট আমাকে তৈরি করাইয়া দিতে পারবি কি? দেখো যেন ভাল রকম হয়। ছিঃ ছিঃ পুরুষ মানুষের কি কিছু পসন্দ নাই। এদিকে ত ভাল কাপড়খানি পরলে হাঁ করে চেয়ে থাকেন।

তোমার বৌদিদি

পত্র নং ৫

প্রিয় ভগিনি—

ভারতীতে আপনার মেয়ে যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। মহিলাবর্গের দোষগুণ, অভাব, অভিযোগ মহিলাদেরই করা উচিত। আপনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া ভাল করিয়াছেন। এক্ষণে মহিলাগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন প্রত্যেকে গৃহস্থালী বিদ্যাশিক্ষা শিশু পালন প্রভৃতির উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং এই সকল বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পত্রিকা প্রভৃতিতে আন্দোলন করেন। কেহ কোন বিষয়ের ত্রুটী দেখাইলে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যেন ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেন। নমস্কার।

আপনার শ্রীমতী দয়াবতী দেবী

এক্ষণে ভারতীর পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, মেয়েযজ্ঞির বিশৃঙ্খলা নিবারণের উপায় যাঁহার যাহা মনে হয় যেন ভারতীতে প্রকাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করেন

শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী।

পোষ্যপুত্র।

গড়ের মাঠের নির্জ্জন রাস্তা ছাড়াইয়া একখানা গাড়ি আফিস কোয়ার্টারের জনহীন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়িগুলাকে অতিক্রম করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই লোক চলাচল পূর্ণ আলোকিত হাওড়ার পুলের নিকট আসিয়া পড়িল, হঠাৎ সেই সময়ে স্তব্ধ শান্তি বিস্মিতনেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত পথটা দুজনেই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, কেহ কাহারও সহিত একটি কথা পর্য্যন্ত কহে নাই, আসিবার সময়েও এই প্রকারে আসিয়াছে কিন্তু সেবারে শান্তি সমস্ত পথটাই কাঁদিয়াছিল, এবারে সে কাঁদিতে পারে নাই।

হেমেন্দ্রও একবার চাহিয়া দেখিল, রাস্তার ধারে আলোকাধার হইতে অত্যুজ্জ্বল, তীব্র একটা আলোকের ছটা গাড়ির ভিতরকার অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাদের মুখে পড়িল; হেমেন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। শান্তি সন্দিগ্ধনেত্রে সেই অন্ধকারের মধ্যে স্বামীর মুখের ভাব দেখিতে চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল; "হাবড়া ষ্টেশনে নিয়ে এলো যে?"

হেমেন্দ্র উত্তর দিল না, যেন শুনিতেই পায় নাই এমনি করিয়া বসিয়া রহিল। শান্তির বুকটা এবার একটা কি যেন নূতন আশঙ্কার আভাষে হঠাৎ ধড়াস্ করিয়া উঠিল, চঞ্চল ভাবে সে পিছনদিকের একটা খড়খড়ি টানিয়া আবার উৎকণ্ঠিতনেত্রে বাহিরের দিকে চাহিল। গঙ্গার জলে সহস্র বিদ্যুতালোক জ্বলিতেছে, অগণ্য নক্ষত্র এখানে প্রভাহীন, সাদা ও লাল ফুলে গাঁথা মালার মতন পশ্চাতে আলোকের শ্রেণী পড়িয়া রহিয়াছে। শান্তি ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল "গাড়োয়ানটা ভুল করেচে, আমাদের সেয়ালদায় না নিয়ে গিয়ে হাবড়ায় নিয়ে এলো"—হেমেন্দ্র এবারেও কোন উত্তর করিল না।

গাড়ি আসিয়া যথাস্থানে থামিলে দরজা খুলিয়া হেমেন্দ্র গাড়ি হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। শান্তিকে নামিবার চেষ্টা বিরহিত দেখিয়া বলিল "নেবে এসো একখানা গাড়ি বোধ হচ্চে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

শান্তি নামিল না বরং গদির উপর একটু শক্ত হইয়া বসিল। হেমেন্দ্রের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াই ছিল, শান্তির অবাধ্যতায় গভীর বিরক্তিতে তাহা আরো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; তথাপি সংযতভাবে শান্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিল "শান্তি শুনচো নেবে এসো"। শান্তি এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্চ তা না বল্লে আমি নাবেবো না।"

শান্তির স্বরের দৃঢ়তায় ও কথার ধরণে হেমেন্দ্র প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার মুখের উপরে এমন জোরের সহিত প্রতিবাদ করা যে কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে নাই, বিশেষতঃ শান্তির মুখে এমন উদ্ধত স্বর সে একদিনমাত্র শুনিয়াছিল বটে কিন্তু সেদিনকার সে ভর্ৎসনা নারী হৃদয়ের উদ্গত অভিমানাশ্রুরাশির মতনই প্রেমপূর্ণ, কিন্তু আজ তাহার মধ্যে একি কঠোরতা একি বিচারকের অলঙ্ঘ্য আদেশের কঠিন

স্বর! হেমেন্দ্র ঘোর বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহাকে সামান্য কীটপতঙ্গগুলাও এখন হইতে অপমান করিতে পারিলে ছাড়িবে না বোধহয়! অদূরে গাড়ি ছাড়িবার বাঁশি বাজিয়া উঠিল। স্বল্পসংখ্যক লোক কেহ মাথায় মোট কেহ ব্যাগ হাতে ছাতা বগলে প্ল্যাটফরমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। হেমেন্দ্র উদ্যত রোষাগ্নি হৃদয়ে চাপিয়া ফেলিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "শিগ্‌গির এসো এখনও যদি গাড়িটা না পাই তা হলে হয়ত সকাল অবধি বসে থাকতে হবে।"

শান্তি নামিয়া আসিল, কিন্তু সে হেমেন্দ্রের অনুসরণ করিল না; প্রাচীরের গায় পিঠ রাখিয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। গাড়িভাড়া চুকাইয়া দিয়া হেমেন্দ্র দ্রুতপদে ষ্টেশনের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল; মনে করিয়াছিল শান্তিও তাহার পশ্চাতে আসিতেছে, কিন্তু টিকিট কিনিতে গিয়া একটু ভাবিবার জন্য দাঁড়াইল, তারপর হঠাৎ পিছনে চাহিয়া দেখিল শান্তি তাহার সঙ্গে আসে নাই, দারুণ বিরক্তি ও অপমানে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া টিকিট না কিনিয়াই ফিরিয়া আসিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ভোর হইয়া আসিতেছিল, দূরে আলোকের মালা ঈষৎ ম্লানপ্রভ হইয়া আসিয়াছে। লোকজনও খুব বেশি চলিতেছে না। ষ্টেশনের প্রবেশ পথের সম্মুখে কতকগুলি থার্ড ক্লাশের যাত্রী গাড়ির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ছোট বড় বোঁচকা পাশে রাখিয়া ঘুমে ঢুলিতেছে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে হেমেন্দ্র বলিল "এ কি রকম ব্যবহার তোমার শান্তি! সুধুসুধু ট্রেণটা ফেল করালে!"

শান্তি ক্ষিপ্রহস্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল "বলেছিতো আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চো না বল্লে আমি যাবো না, কোথা যাচ্চো?"

হেমেন্দ্র এবারও বিস্ময় বোধ করিল, কিন্তু নিজেকে পুনঃ পুনঃ অপমানিত করিতে দিতে আর সে সাহস করিল না। দিনের আলোয় কোন পরিচিত বন্ধুবান্ধবের চোখে এই অবস্থায় যদি পড়িয়া যায় তাহার চেয়ে অপমানের বিষয় তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। স্বরটা একটু কোমল করিয়া বলিল "কোথা যাচ্চি তা কেমন করে বলবো বলো, আমাদের স্থান কোথা? যেখানে হয় কোথাও চলে যাই এসো।" শান্তি রুদ্ধস্বরে বলিল—

"না আমরা লক্ষ্মীপুরেই যাবো, কেন তুমি এখানে নিয়ে এলে? চলো ফিরে যাই। সেখানে না গিয়ে কোথায় যেতে চাইছো?"

এবার আবার শান্তির চোখে জল ভরিয়া আসিয়া পতনোদ্যত হইল। তাহার স্বর কাঁপিতেছিল। হেমেন্দ্র পরুষ শ্লেষের সহিত সক্রোধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

"এ জন্মে আর নয়, জাহান্নমে যাব সেও ভাল তবু সেখানে নয়, তোমার খুসী হয় তুমি যাও।"—চারিদিকের আলোক মালা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া উষার অম্লোজ্জ্বলমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। আকাশে মেঘ ছিল না কিন্তু গত দিবসের বৃষ্টিচিহ্ন রাজপথকে পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছিল, লোকের ভিড় ও গাড়ীর শব্দে ষ্টেসন ভরিয়া উঠিল। শান্তির ঠোঁট কাঁপিতেছিল প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, স্থির

স্বরে কহিল, বেশ তাই তবে হোক, "আমি জ্যেঠামশায়ের কাছেই যাবো।" রোষে ক্ষোভে গুমরিয়া হেমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। এ সংসারে তাহার কোন দাবীই নাই! যে স্ত্রী ভিন্ন তাহার যথার্থ আপনার বলিতে গেলে কেহই বিদ্যমান নাই সেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চায়! সে কি এমনি অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল! কিন্তু না হেমেন্দ্র তাহাকে কিছুতেই এখন হাতছাড়া করিতে পারে না। সেই এখন তাহার অভিষ্ট সিদ্ধির একমাত্র অস্ত্র।

হেমেন্দ্র বড় বিপদেই পড়িল, শান্তি ক্রমেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে! এখন তাহাকে বুঝাইয়া ভুলাইয়া নিজের মতে লইয়া আসা সম্ভবই নয়। এদিকে আর কতক্ষণই বা এমন করিয়া সাধারণের কৌতুহল দৃষ্টির দৃশ্যরূপে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকা যায়! কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে একটু বেড়াইয়া আসিয়া আবার একটু কোমলভাবে কহিল—"দিন-কতোক পশ্চিমে বেড়িয়ে আসি চলো।" কথাটা অসঙ্গততায় নিজেই যেন সঙ্কোচে জড়াইয়া আসিল; শান্তির মুখেও একটা অবিশ্বাসের বিষন্ন হাসির ছায়া অতি সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিয়া-ছিল,—সেটুকু হেমেন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নাই, অপ্রতিভ হইয়া সে থামিয়া গেল। তার পর আবার বলিল "যাবে না?"

শান্তি কথা কহিল না,—শুধু তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া মাথা নাড়িল 'না'।

ক্রোধে অপমানে হেমেন্দ্রের আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল। কিন্তু সে কেমন করিয়া এই শান্ত শিষ্ট লজ্জানম্র শান্তিকে যে তাহার একটা মিষ্ট কথার জন্য লালায়িত, তাহার কৃপাদৃষ্টির উপর মাত্র যাহার সমস্ত জীবনের সুখশান্তি নির্ভর—কেমন করিয়া তাহাকে আজ নিজের মতে লইয়া আসে ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। এত লোকের মাঝখানে তো আর তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না।

চারিদিকের লোক হাঁ করিয়া তাহার-দিকেই চাহিয়া আছে, হেমেন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িল। এই সময় একখানা মেল আসিয়া প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল, কোলাহলে ষ্টেশন মুখরিত করিয়া আরোহীরা ক্রমে বাহির হইয়া যাইতেছিল;—হঠাৎ তাহার মধ্য হইতে যোগেশ আসিয়া হেমের হাত ধরিল "আরে ছোট বাবু যে, কোথায়?" বলিতে বলিতে হেমেন্দ্রের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া শান্তির পানে চাহিল "বৌ দিদিও সঙ্গে যে! ব্যাপারখানা কি বলো তো? যাওয়া হচ্চে কোথায়?"

শান্তি যোগেশকে দেখিয়াই মুখে ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। হেমেন্দ্র যেন সেদিকের ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল! যোগেশকে পাইয়া সে এই সঙ্কটের মধ্যে যেন একটা কুল পাইল। কিন্তু নিজের স্বভাবসিদ্ধ আত্মাভিমান ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব,—ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিল "পশ্চিম" "পশ্চিম!" বলিয়া যোগেশ একবার চারিদিকে চাহিয়া লোক জন বা লগেজ পত্রের অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থ হইল।

কই কাউকে তো দেখছিনা? আর এমন সময় পশ্চিমের গাড়ি কোথা? যোগেশ সকৌতূহলে হেমেন্দ্রের পানে চাহিল। হেমেন্দ্র বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল একটু খানি মাথা চুলকাইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল,

তা বটে এখনতো কোন ট্রেণ নেই ; তাহলে যোগেশ কি করা যায় বলো দেখি ?"

যোগেশ অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিল, চট করিয়া তাহার মাথায় বুদ্ধি খেলিয়া গেল, হেমেন্দ্রকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপারটা কি বলো দেখি ? শ্বশুরবাড়ি গেলেনা কেন ?"

হেমেন্দ্রের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু সব কথা খুলিয়া না বলিয়া কেবল মাত্র উত্তর করিল "না।" "বাড়িতে আর বনবেনা তা আমি আগেই জানতুম। তা কোন জায়গাটায় যাওয়া ঠিক হয়েছে ?" হেমেন্দ্র মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে উত্তর করিল "এখনও কিছুই ঠিক করিনি।" "ঠিক না করেই টিকিট কিনবে নাকি ? সঙ্গে কে আছে ? জিনিষ পত্র কই ?"

একি পরিহাস ! হেমেন্দ্রের লোকজন জিনিষ পত্র ! তার কি আছে ? কে আছে ? মৃদুহাসিয়া বলিল "সঙ্গে কে থাকবে ? যোগেশ যখন বাড়ি থেকে এসেছিলুম সঙ্গে কে এসেছিল ? আর কিছুই তো আনিনি, যেমন এসেছিলুম তেমনিই যাব। শুধু যে বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন সেইটেই বইতে হবে।"

"এর নাম পশ্চিম যাওয়া ! পশ্চিমে গিয়ে কি করবে ? চল্‌বে কেমন করে ?"

হেমেন্দ্রের আরক্তমুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল, সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী সংসার সমুদ্র, সে গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে আসিয়াছে, সাঁতারও জানেনা, তথাপি গর্ব্বের সহিত কহিল "কোথাও একটা চাকরী বাকরী চেষ্টা করব, ভিক্ষের ভাত আর খাবো না। যোগেশ আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে।"—যোগেশ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল ! বলিল "ভিক্ষে, সবিতো তোমার। খুড়র ভীমরথি হয়েচে বলে দেশের আইন আদালত সুদ্ধ কি উঠে গেল ? মাগী আদালতে প্রমাণ করুকনা কেমন সে বিনোদের স্ত্রী।"

হেমেন্দ্রের চোখের সম্মুখ হইতে যেন একখানা কাল পর্দ্দা কে সরাইয়া দিল। সত্যিতো মূর্খ বিনোদ কুমারের মতন সেও অভিমানে দেশ ছাড়া হবে নাকি ? তাহাতে ক্ষতিই বা কাহার ? সাগ্রহে বলিয়া উঠিল "কিন্তু শ্বশুর তো আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য কর্ব্বেনা আমার তো কিছুই নেই—"

যোগেশ বন্ধুর পিট চাপড়াইয়া তাহাকে তাহাকে উৎসাহিত করিয়া কহিল "কিছু ভেবনা সব আমি ঠিক করে ফেলব। এখন তবে কোথায় থাকবে ! ফরেস ডাঙ্গায় আমার এক শালীর বাড়ি আছে চলো বলত তোমাদের বরঞ্চ সেইখানেই নিয়ে যাই। তারা গেছে কাশীবাস করতে,—বাড়িখানা ভাড়াও হয়নি খালি পড়ে রয়েচে।"

একটু পরেই একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ি ছাড়িবে—যোগেশ গিয়া শান্তিকে বলিল,"বৌদি এখানে দাঁড়িয়ে কেন গাড়িতে এসে বসুন, চারিদিকে ভদ্র লোকের ভিড়।—" শান্তি দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া যোগেশের সহিত আসিল। হেমেন্দ্র দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত ভাবিল যোগেশ নাজানি কিউপায়েই তাহার মন ফিরাইয়াছে !

ট্রেন ছাড়িয়া দিলে একে একে জনকোলাহলময়ী নগরীর দৃশ্য চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে পর শান্তি যখন মুখ ফিরাইল, হেমেন্দ্র দেখিল একরাত্রির ভিতরে

তাহার যেরকম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে সেরূপ অনেক বৎসরেও হয় না। সে ভিতরে ভিতরে একটু শিহরিয়া উঠিল। একবার মনে করিল, কাজ নাই শান্তিকে লক্ষ্মীপুরে ফিরাইয়া লইয়া যাই—" কিন্তু দারুণ আত্মাভিমান পরমুহূর্ত্তেই তিরস্কার করিয়া উঠিল,—ভীরু! স্ত্রীর জন্যে নিজেকে লোকের কাছে নীচু করবে! হেমেন্দ্র জোর করিয়া মনের কোমলতাটুকুকে পদদলিত কীটের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া যোগেশের কাছে সরিয়া বসিল।

যোগেশ বন্ধুকে মৃদুস্বরে অনেক রকম পরামর্শ দিতে দিতে মধ্যে মধ্যে শান্তির ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। হেমেন্দ্র না বুঝিলেও সে বুঝিয়াছিল শান্তি বাহিরের লোকের সম্মুখে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই শুধু স্বামীর সঙ্গে আসিল।

তাহার মুখের আশাহীন বেদনার নিদারুণ আঘাতচিহ্ন কশাঘাত চিহ্নের মতনই সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সকরুণ-নেত্রে যোগেশ তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিল "তোমার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে; তুমি যার হাতে পড়েছ সে তোমায় চিনবে না সে তোমার আদর বুঝবে না। তবে আমি যেটুকু পারি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করবো।"

শ্রীঅনুরূপা দেবী

ব্রিটিশ মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্স।

সমস্ত ইউরোপে এই ব্যবস্থা যে শীতকালে তাঁহারা বাড়ীতে বা দেশে থাকিয়া কাজ করেন, আর গ্রীষ্মকাল পড়িলেই স্বাস্থ্যলাভ-উদ্দেশ্যে আনন্দে নানা দেশ বিদেশে বেড়াইয়া—সঙ্গে সঙ্গে নূতন জ্ঞান অর্জ্জনও করেন। Winter session বা শীতকালের কাজ তাহাদের দেশে ছয় মাস চলে, কিন্তু summer session গ্রীষ্মকালের কাজ তিনমাস মাত্র চলে। বাঁকী তিনমাস ছুটী ও বেড়াইবার বা বিশ্রাম করিবার সময়। তাই এই অবসর সময়েই যত সভা, সমিতি, ও সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া থাকে।

বিলাতে সব ডাক্তারদের একত্রে মিলিবার একটি সমিতি আছে তাকেই British Medical Association "চিকিৎসকসভা" বলে। পৃথিবী জুড়িয়া সকল পাস করা ডাক্তারই তাহার সভ্য হইতে পারেন। বৎসরে তজ্জন্য প্রায় বিশ টাকা দিতে হয়। বিভিন্ন দেশ হইতেও সেই বিলাতি সভার সভ্য হওয়া চলে। দূরে থাকিয়া কাগজ-পত্র পাঠাইয়া ও জ্ঞানের আদানপ্রদান করিয়া নিকটে থাকার মতই একত্রে কার্য্য করা যায়। আসল সভাটি বিলাতে বটে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে শাখা সমিতি আছে। আমাদের ভারতেও তার একটি খণ্ড সমিতি আছে। এইরূপে বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন রোগ পরীক্ষা ও রোগ চর্চ্চার ফল পরে একত্র হইয়া সেই পীঠস্থান বিলাতের প্রধান সমিতিতে যাইয়া মিলে। জ্ঞানোপার্জ্জনের সে দেশে এমনই পৃথিবী জুড়িয়া সুব্যবস্থা।

আমি যে সময়ে বিলাতে ছিলাম, সেই সময়েও গ্রীষ্মকালে সেই মহাসভায় পৃথিবীর সকল সভ্যকে নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রতিবৎসর এক স্থানে ইহার অধিবেশন হয় না। কখনও বা বর্মিংহামে, কখনও বা লণ্ডনে, কখনও বা এডিনবরায় এই মহাসভা আহূত হইয়া থাকে। সে বৎসর ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ডিভনসায়ারের "একসেটর" নামক একটি পুরাতন স্থানে এই অধিবেশন হইয়াছিল।

আমি এত নিকটে থাকিয়াও এই বাৎসরিক অধিবেশনের কথা কিছুই জানিতাম না। অধিবেশনের সবেমাত্র দুই দিন পূর্ব্বে আমার এক পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু একজন পার্শী ভদ্রলোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তাঁহার আর একজন বন্ধু সেই সভার সভ্য হইয়া যাইতেছিলেন। শুনিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলাম। সে সব দেশে যাত্রার উদ্যোগ করিতে বেশী সময় লাগে না। মৎলবেরও সহজে ঠিক হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করাও সহজ সাধ্য এবং যাতায়াতেরও অশেষ সুবিধা। সুতরাং একঘণ্টার মধ্যেই একটি হাতব্যাগ, ওভারকোট ও দুইটি সার্ট ও চারখানি রুমাল লইয়া গাড়ি ধরিতে চলিলাম। ১৭ শিলিং মাত্র দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়িতে উঠিলাম। গাড়িগুলি যদিও খুব দ্রুত চলে—তবুও লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার সময় সে স্থানে পৌছিলাম। যাইবার পথে কতই নূতন দৃশ্য দেখিলাম। সে অঞ্চলগুলি সবই পাড়াগাঁয়ের মত। শস্যক্ষেত্র, গোচারণ মাঠ, বাগান ও দরিদ্র-লোকের ছোট ছোট বসত বাড়ী। চারিদিকে গরু, বাছুর, ভেড়া, ঘোড়া চরিতেছে। সুস্থশরীর ও কর্ম্মপটু কৃষকেরা ও কৃষকবধূরা শস্যক্ষেত্রে হাতের আস্তেন গুটাইয়া পাশাপাশি নিজের হাতে কাজ করিতেছে।

আমাদের দেশে যেমন রেল দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে কত পরিত্যক্ত ঘর বাড়ী ও গ্রাম দেখা যায়, ও দেশে সেরূপ মোটেই দেখিলাম না। অভাব, অযত্ন দুঃসময়, বা মৃত্যুর চিহ্ন যেন কোথাও নাই। চারিদিকেই সমৃদ্ধির লক্ষণ; পুরাতনের উপরও পরিপূর্ণ নূতন সংস্কার। যাইবার পথে "বাথ" প্রভৃতি কত-গুলি নূতন সহরও দেখা যায়; সেগুলি সব লণ্ডনের ভাব ও নূতন সমৃদ্ধি লইয়া গঠিত। যাইবার কালে পথে কতগুলি সমুদ্রধারের স্বাস্থ্যনিবাসও দেখা গেল। সে গুলির বর্ণনা ব্রাইটন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে পূর্ব্বেই করিয়াছি। আনন্দমাখা মুখ ও হাবভাব লইয়া সব ছেলে মেয়েগুলি খালি পা করিয়া হাঁটু জলে ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতেছে ও ছিপ ও কুড়াজালি করিয়া মাছ ধরিতেছে। অনেক স্থলে অবগাহন স্নান করিবার জন্য ছোট ছোট ঢাকা গাড়ি। কোথাও বা প্রণয়ীদের নির্জ্জন গাছের তলায় গুপ্ত সম্মিলন স্থান। সেস্থানে অনেকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিত্য সময় কাটান।

সন্ধ্যা ছয়টায় গাড়িখানি একসেটরের ষ্টেসনে পৌছিল। সেটি একটি পুরাতন সহর। ষ্টেসনটিও তত বড় নয়। একাই সাহস করিয়া গিয়াছি কিন্তু নাবিয়া যে কোথায় যাইতে হইবে ও কোথায় থাকিব,

তার কিছুই জানিনা। কিন্তু ষ্টেশনে নাবিয়াই দেখিলাম সভ্যদের জন্য আহ্বান-সমিতির লোক সেই খানেই উপস্থিত আছেন।

এত দেশ বিদেশের লোক সেস্থানে তখন সমাবেশ হইয়াছিল যে আশ্রয় স্থান খুঁজিয়া পাওয়াই দুরূহ। সবাই আগে হইতে চিঠি লিখিয়া আপনার আপনার স্থান ঠিক রাখিয়াছে। আমার জন্য কোনই ভাল স্থান নাই। আহ্বান-সমিতির লোকেরা নিকটস্থ একটি বড় হোটেলে লইয়া গিয়া আমাকে আশ্রয় দিলেন। সেখানে একদিন মাত্র মাথা গুঁজিয়া ছিলাম তাহাতেই অনেক শিক্ষা হইয়াছে। যত বড় লোকের সেই হোটেলে আড্ডা। সুধু আহার করিবার জন্য ১২ শিলিং লাগে—সমবেত সভ্যেরা আহারের সময় যে সকল মদ্য পান করিলেন,—তার রং যেমন সুন্দর গন্ধ তেমনি মধুর। ফেণাগুলি দানা দানা হইয়া গেলাসের ধারে বৈদ্যুতিক আলোকে মুক্তার শোভায় শোভা পাইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল আজ ইহারা যেরূপ দামী মদ পান করিতেছেন অন্য দিন এমন করেন না।

দুইটি যুবতী রমণী হোটেল তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা ছিলেন। তাঁহারা সকলকেই এমনি মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিতেছিলেন যে লোভ হইতে লাগিল, বেশী পয়সা খরচ হইলেও সেস্থানে কিছু দিন থাকি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি যাঁহার স্থান দখল করিয়াছিলাম, পরদিন তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন। সুতরাং আমাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহারাই আমার জন্য অন্য স্থান ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু সে স্থানটি বড়ই অপছন্দসই। কি করি বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। হোটেলটির নামও বড় ভাল নয়—"প্যাক্ হস হোটেল।" সেখানেও দৈনিক এক পাউণ্ড খরচ করিয়া থাকিতে হইল।

শীতের দেশে বড় একটা ক্লান্তি আসে না। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পরও খানিক ক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিলেই শ্রান্তি দূর হয়। গাড়ি হইতে নামিয়া প্রথমেই এসোসিয়সেনের আপিশে যাই। সেখানে সব সই করিয়া তবে ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। একার্য্যে সনাক্ত করিবার দুইজন লোক চাই। আমাকে জানে না বলিয়া প্রথমে কেহই সনাক্ত করিতে চায় না। পরে একজন অবসর প্রাপ্ত I. M. S. কর্ম্মচারী আমাকে নিজে না জানিয়াও সই করিলেন, ও অন্য একজনকেও সই করিতে অনুরোধ করিলেন! এই সদাশয় পুরুষের নাম ডাক্তার "জইলাস্"। ইনি এখন কার্য্য হইতে অবসর লইয়া "প্লাইমাউথে" ডাক্তারী করেন। ইনি Tropical Journal-এর একজন সম্পাদক ও ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের উপর ইঁহার বড়ই দয়া। আমাকে দেখিবামাত্রই জানাশুনা না থাকিলেও ইনি নিজে আমার স্বাক্ষর নিম্নে সই করিলেন ও অপর একজন ডাক্তারকে দিয়াও সই করাইয়া দিলেন। ইনিই (St. Mary) "সেণ্টমেরী" হাঁসপাতালে ডাক্তার রাইটের (Sir Amruth Wright) কাছে আমাকে পরিচয় করাইয়া দিয়া চিঠি দেন। সেই চিঠি লইয়াই আমি সে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হই। সে চিঠির একস্থানে এই কথা লিখিত ছিল Dr. Mallick hails from India—and is our fellow-subject. He like all Indian, is very

shy, and hence the necessity of this introduction. অর্থাৎ—"আমরাও যেমন ব্রীটিশ প্রজা ডাক্তার মল্লিকও সেইরূপ। আর সকল ভারতবাসীই যেমন সকল বিষয়ে লাজুক ইনিও সেই প্রকৃতির। তাই ইঁহার হাতে আমি এই চিঠিখানি দিলাম।"

এই কথা কয়টির ভিতর কেমন একটু আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা মাখান আছে। ভারতবর্ষে উপস্থিতিকালে তিনি কত তন্ন তন্ন করিয়া ভারতবাসীর চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন তাহা এই চিঠিখানি হইতে বুঝা গেল।

অত বড় একটি বৃহৎ সমিতির স্থান হইবার মত একটি বড় বাড়ী সহজে পাওয়া যায় না। তাই সমিতির বিভিন্নশাখার অধিবেশন বিভিন্ন স্থানে হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এলবার্ট হল নামক বাটীতে গ্রীষ্মদেশের রোগ-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। Albert Hallটী অতি সুন্দর স্থান। সেইটিই ষ্টেশনের নিকট ও সহরেরও প্রায় মধ্যস্থলে। সকল দিক হইতে যাতায়াতের সুবিধা আছে। বাড়ীটিও বেশ বড়, সেখানে অনেক বিষয়ের মিউজিয়ম আছে। সবগুলিই অতি সুনিয়মে সাজান। একটি ঘরে চাষবাসের যত কল কারখানা সব একত্র পাশাপাশি সাজান ও তাহার কলকৌশলও বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আছে। একটিতে খনিজ পদার্থের প্রদর্শনী। আর একটিতে জীবজন্তু ও মনুষ্য কঙ্কাল সাজান। সকলগুলিই শিক্ষার উপযোগী। এই স্থানেই Polytechnic নামক শিক্ষা স্থান। এইখানে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় বক্তৃতা হয়। লোকেরা দিবসের কাজকর্ম্ম শেষে অবসর সময়ে এখানে আসিয়া তাহা শুনে। একটি স্থানে কতকগুলি সুন্দর ছবি ছিল। তার এক শ্রেণীর ছবিগুলি সবই দরিদ্র ঘরের ঘটনার চিত্র। সে চিত্রকর দরিদ্র লোকের বিভিন্ন অবস্থারই চিত্র লিখিয়া গিয়াছেন। একখানিতে একটি ছোট কুঁড়ে ঘরের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সামান্য সমিতি। ঘরে ছেলেরা সব আগুন পোহাইবার জন্য আগুনের ধারে ধারে বসিয়া আছে। একটি অনাথ বালকও আসিয়া তাদের দ্বারে আশ্রয় পাইয়াছে। দরিদ্রই দারিদ্র্যের ব্যথা জানে। একান্ত সহানুভূতির ভাব সে চিত্রে সুন্দর চিত্রিত।

সেখানে নানা রকমের বিভিন্ন সমিতি থাকিলেও আমি দুটি সমিতিতে মাত্র মিশিয়াছিলাম। "গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগের সমিতি" ও "জীবাণু বিস্তার সমিতি"। সে সকল স্থানে বক্তৃতার প্রথা এই যে, একজন কেহ একটি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সেই সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য বলেন, তারই উপর তর্কবিতর্ক চলিতে থাকে। তাতে বিভিন্ন লোকের মুখ হইতে অল্পসময়ে কত কথাই শেখা যায়। প্রথমেই গ্রীষ্মপ্রধান-দেশের মেলেরিয়া প্রভৃতি জ্বরের প্রাদুর্ভাবের কথা উঠিল। এ দেশে যত লোক মরে তার অর্দ্ধেক সংখ্যা জ্বরের তালিকাভুক্ত। এমন কি যাহারা মরে না তারাও জ্বরে ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাই এত জাতীয় দুর্ব্বলতা আসিয়াছে। মেলেরিয়া বিষ মশক দংশনে ঘটে। তাই মশা মারিয়া অনেক দেশে ফল পাওয়া গিয়াছে। মেলেরিয়া প্রকোপেই গ্রীসের পতন হয়। ইহাতেই দেশ

জুড়িয়া জাতীয় দুর্ব্বলতা আসে ও সঙ্গে সঙ্গে পতনও ঘটে। গ্রীসে ম্যালেরিয়া আসিবার প্রথম কারণ মেলেরিয়ার দেশ হইতে তথায় ক্রীতদাস ধরিয়া আনা হয়। আমি নিজে বহুমূত্র রোগের বিষয় কিছু বলিলাম। এই সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে ভারতবর্ষেই কেন এ রোগ এত অধিক হয়। তার উত্তর অনেক আছে—যথা আমাদের অসার আহার, বাল্যবিবাহ, ও মস্তিষ্কের বেশী চালনা। সমিতিতে সকলেরই বলিবার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, কেহই তার বেশী সময় লইতে পারেন না। সবই অতি সুব্যবস্থায় চালিত—কোনও গোলমাল নাই। আমাদের এদেশের সমিতিতে কত অব্যবস্থা ও গোলমাল উঠে। এইরূপ,—অস্ত্রচিকিৎসা, চক্ষুর চিকিৎসা, ধাত্রী-বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের শাখা ছিল। অন্যান্য স্থানে নানা বিষয়ের জিনিষপত্র দেখাইবার নানারূপ প্রদর্শিনীও চলিতেছিল। তার মধ্যে একটি কেবলই অনুবীক্ষণের ব্যাপার। রোগ নিরূপণে ও রোগ চিকিৎসায় সে যন্ত্রের আজকাল বড়ই আদর। সেখানে সকল রকম ডাক্তারী নূতন ঔষধ ও নূতন যন্ত্র ইত্যাদিরও প্রদর্শনী আছে। অনেক প্রকার (X ray) যন্ত্র দেখিলাম। যন্ত্র-ব্যবসাদারেরা নানা দেশ হইতে আপনাদের জিনিষ দেখাইতে ও বেচিতে লইয়া আসিয়াছে। সকল জিনিষেরই গায়ে দাম লেখা। বড় একটা দরদস্তুর করিতে হয় না। তার মধ্যে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার যন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান লইয়াছে। Cancer বা কর্কট রোগের চিকিৎসার জন্য কতনা বৈদ্যুতিক ও রেডিয়ম যন্ত্র দেখিলাম। তা ছাড়া নানারূপ নূতন ঔষধ ও খাদ্যসামগ্রীও ছিল। সবগুলিই লোক চক্ষু আকর্ষণ করিবার জন্য বিপুল আড়ম্বরে সজ্জিত। সকল গুলিই বুঝাইয়া দিবার জন্য ছাপা কাগজ আছে, ও দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবারও লোক আছে। তুমি কেনো বা নাই কেনো তাতে ক্ষতি নাই,আপাততঃ যন্ত্রগুলিতে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেই হইল। আর তখনই তোমার নাম ধাম খাতায় টোকা হইয়া গেল। পরে তার সুফল ফলিবে—এই আশায় চিরদিন তোমাকে তাদের জিনিষের বিজ্ঞাপন ছাপা কাগজ পাঠাইবে। আমি এখনও এখানে ওরূপ কাগজ কত পাই। বিলাতী ব্যবসায়ের এই দস্তুর।

অধিবেশন শেষ হইলেই কত স্থান দেখিবার ও নিমন্ত্রণ খাইবার আহ্বান আসিল। সে দেশের মিউনিসিপালিটি ও নিকটবর্ত্তী স্থানের বড় লোকেরাই অতিথিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিভিন্ন স্থান দেখাইতেন ও নানারূপে আপ্যায়িত করিতেন। খরচ তাঁদেরই সব; তবে কে যাইবে কে না যাইবে তাহা আগে হইতে ঠিক করিয়া বলা চাই। ওরূপ নিয়মবদ্ধ ঠিকঠাকের দেশে একবার যাইব বলিয়া শেষে 'না' বলা চলে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ডেভনসায়ারে এমন বেশী কিছু দেখিবার নাই। বিখ্যাত রাসায়নিক "ডেভী"র এইস্থানে জন্ম হইয়াছিল। তাছাড়া একটি বহু পুরাতন ও বড় গির্জ্জা আছে।

স্থানটি আয়তনে খুবই ছোট—তবুও রাস্তায় রাস্তায় বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি চলে। আর পূর্ব্বে মালপত্র যাতায়াতের সুবিধার জন্য কতকগুলি খাল কাটা হইয়া-

ছিল,—এখন তাহার তত দরকার না থাকিলেও সেগুলি যত্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের দেশে কত খাল এখন অযত্নে নষ্ট হইয়া গেছে। আর একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিলাম—যুবতী বালিকাদের সুবেশ পরিয়া হাবভাব দেখাইয়া পথে বেড়ান। যেস্থানে জনতা হয় সেই স্থানেই তাঁহাদের গতি।

অতিথি বলিয়া সমিতির অভিভাবকগণ আমাদের কত কি দ্রব্য স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উপহার দিলেন। তার ভিতর একখানি সাদা কাফ্‌ লেদারে বাঁধান সুন্দর সোনার জল দিয়ে লেখা, বহু ছবিবিশিষ্ট "Exeter" নামক সেই স্থানটিরই ইতিহাস। সে বইখানি আমার কাছে এখনও আছে। দেখিলেই সেই দিনের কথা মনে হয়।

সমিতি শেষ হইবার পরদিনই প্রাতে এই সব কাগজ ও খাতাপত্র সযত্নে থলির মধ্যে পুরিয়া ও হাতব্যাগ হাতে লইয়া সমুদ্র ধারের স্বাস্থ্যনিবাস "তর্কী" নামক স্থানে যাইবার জন্য গাড়ি ধরিতে ছুটিলাম। তাহাতে কোন ক্লান্তিই বোধ করি নাই। ঠাণ্ডা দেশে ও উদ্যমশীল বীরজাতির সংসর্গে মনে তখন কত উৎসাহ দেহে তখন কত বল! আজ এদেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কিছুই নাই! সকলই আবহাওয়ার গুণ!

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

রসেটা প্রস্তর।

হার্মিস্ ত্রিস্ মেজিষ্টাস্ নামক মিশরীয় দার্শনিক স্বদেশকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,"হা মিশর, তোমার ধর্ম্মের অনিশ্চিত কিংবদন্তী মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ভবিষ্য-বংশীয়গণ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। প্রস্তরোৎকীর্ণ শব্দাবলী মাত্র তোমার ধর্ম্ম-জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সিথীয় অথবা ভারতীয়গণ, অথবা অন্যতর বর্ব্বর প্রতিবেশী আসিয়া মিশরে বাস করিবে। দেবতাগণ স্বর্গে প্রতিগমন করিবেন। মানব ও দেবতা-বর্জ্জিত মিশর মরুভূমিতে পরিণত হইবে।"

স্বদেশপ্রেমিক দার্শনিকের সেই করুণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। পারসীক গ্রীক ও রোমকগণ একে একে মিশর জয় করিয়া তথায় স্ব স্ব বিজয় পতাকা উড়াইয়াছে। অবশেষে মুসলমানগণ প্রাচীন সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। প্রাচীন মিশরীয় সাম্রাজ্য শুধু কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মিশরীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের কাহিনী বহুদিন যাবৎ শুধু কিংবদন্তীতেই নিবদ্ধ ছিল। সে কিম্বদন্তীও মিশর ত্যাগ করিয়া গ্রীক ও রোমক সাহিত্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। মিশরে ছিল শুধু প্রস্তরোৎকীর্ণ শব্দাবলী। দুই সহস্র বৎসর যাবৎ তাহাদের মধ্যে মিশরীয় রহস্য লুক্কায়িত ছিল। দুই সহস্র বৎসর যাবৎ তাহারা মানবের অনুসন্ধিৎসা ব্যর্থ করিয়াছিল। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অতর্কিতভাবে সেই রহস্য

কুহেলিকা পরিষ্কৃত হইয়া পড়ে এবং মিশরীয় সাহিত্য সুধীগণের কৌতূহল তৃপ্তি করিতে সক্ষম হয়।

গ্রীকগণ যখন মিশর জয় করিয়াছিল তখনও প্রাচীন ভাষাভিজ্ঞ লোকের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই। কিন্তু এই ভাষা শিক্ষা করিতে গ্রীকগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দুই একজন চেষ্টা করিয়া থাকিলেও তাহার শিক্ষা বিবরণ পাওয়া যায় নাই। অন্ততঃ কোন গ্রীক পণ্ডিতই মিশরীয় ভাষা শিক্ষা ও পড়িবার উপায় সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া যান নাই। মিশরীয় লিপিকে গ্রীকগণ যে নামে অভিহিত করিত—তাহা হইতে বোধ হয় গ্রীকগণ উক্ত লিপিকে ধর্ম্মের গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশক সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলিয়া মনে করিত। (Hieroglyphics—hieros sacred, glyphein—to carve) কিন্তু মিশরীয়গণের দৈনিক ব্যাপারেও যে ঐ একই লিপি ব্যবহৃত হইত তাহা পরে জানা গিয়াছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশর রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীন মিশরীয় ভাষা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। মিশরের পূর্ণ অভ্যুদয়ের সময়ও কতিপয় সুধীগণ ভিন্ন অন্য কেহই প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় কথা বলিতে বা লিখিতে পারিত না। প্রাচীন ভাষা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক স্বতন্ত্রভাষায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। মিশর রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইবার পরে প্রাচীন ভাষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন প্রাচীন ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে এমন লোকের সম্পূর্ণ অভাব হইয়া পড়ে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির মিশরাভিযানের সহিত কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিশরে গিয়াছিলেন। মিশরে উপনীত হইয়াই তাঁহারা মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এবং মিশরের পুরাবস্তু সমূহ ফ্রান্সে অন্তরিত করিতে প্রয়াসী হন। ইংরেজের প্রতিবন্ধকতায় ইহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংরেজগণ অনেক পুরাবস্তু স্বদেশে লইয়া যান। রসেটাপ্রস্তর তাহাদিগের অন্যতম। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে নীলনদের মোহানায় রসেটা নগরের সান্নিধ্যে সেণ্ট জুলিয়ান দুর্গের ভগ্নাবশেষের মধ্যে ফরাসীগণ রসেটা প্রস্তরখানা প্রাপ্ত হন। আলেকজান্দ্রিয়ায় সন্ধির পরে প্রস্তরখানি ইংরেজদিগকে অর্পিত হয়। ইংরেজগণ বৃটিশ মিউজিয়মে ইহাকে রক্ষা করেন।

রসেটা প্রস্তরের উপর ত্রিবিধ লিপি খোদিত আছে। প্রথমে মিশরীয় চিত্র লিপি, তৎপরে রেখা, কোণ্ ও চিত্রার্দ্ধসম্বলিত এক প্রকার লিপি। ইহা দেখিয়া একরূপ সংক্ষিপ্ত লিপি বলিয়াই ধারণা হয়। ইহাকে প্রাকৃত লিপি (Enchorial or demolic) বলে। সর্ব্ব নিম্নে গ্রীক লিপি। একত্র সমাবেশিত ত্রিবিধ লিপি দেখিয়া প্রথমেই মনে হয় একই কথা ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিকও পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, একই কথা তিন লিপিতে খোদিত আছে। ১৯৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে মেম্ফিস্ নগরের যাজকগণ মিশরের গ্রীক রাজা পঞ্চম টলেমি, এপিফেনস্কে দেব-সম্মান প্রদান করেন,—প্রস্তর লিপি তাহারই নিদর্শন।

বৃটিশ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষগণ রসেটা

প্রস্তর দেখিয়াই তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, এবং সমগ্র প্রস্তরীয় লিথোগ্রাফ চিত্র প্রকাশিত করেন। ইউরোপের যাবতীয় দেশের পণ্ডিতগণ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়াও প্রস্তর খোদিত মিশরীয় লিপিদ্বয় পড়িতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে ইংরেজ টমাস্ ইয়ং ও ফরাসী চ্যাম্পোলিন কর্ত্তৃক এই সমস্যার সমাধান হয়।

রসেটা প্রস্তরের পাঠোদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া ইয়ং বর্ত্তমান মিশরীয় ভাষা কপ্ত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রচুর অধ্যবসায় সহকারে এক বৎসরের মধ্যে তিনি কপ্ত ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন, এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা হয়—প্রাচীন মিশরীয় ভাষার সহিত কপ্ত ভাষার সাদৃশ্য আছে। প্রস্তরে খোদিত লিপি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বনিম্নস্থ গ্রীক ভাষায় খোদিত বাক্যাবলীর অর্থ তিনি উপরিস্থ লিপিদ্বয় হইতে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন এবং অবশেষে নিম্নলিখিত বিষয় আবিষ্কার করেন।

(১) চিত্রলিপির অনেক চিত্রদ্বারা চিত্র-সূচিত পদার্থ সূচিত হইয়াছে। মানুষের চিত্রদ্বারা মানুষ, সিংহের চিত্রদ্বারা সিংহ ('শব্দ' নহে শব্দসূচিত পদার্থ) সূচিত হইয়াছে।

(২) অনেক চিত্রদ্বারা তৎসূচিত পদার্থ সূচিত না হইয়া পদার্থান্তর সূচিত হইয়াছে। শব্দসূচিত পদার্থের সহিত পদার্থান্তরের সম্বন্ধই এই ব্যাখ্যার কারণ।

(৩) পুনরুক্তিদ্বারা বহুবচন সূচিত হইয়াছে।

(৪) রেখাদ্বারা সংখ্যা সূচিত হইয়াছে।

(৫) দক্ষিণ অথবা বাম উভয় দিক হইতেই চিত্রলিপি পড়া যায়। কিন্তু যেদিকে জন্তুগুলির মুখ থাকে—সেই দিক হইতে পড়িতে হয়।

(৬) লোক অথবা পদার্থটি (proper nouns) শেষের নামসূচক চিত্রগুলি এক-প্রকার ডিম্বাকার রেখাদ্বারা বেষ্টিত থাকে। ইয়ং এই ডিম্বাকার রেখাকে কার্ত্তুস্ (cortoushe) আখ্যা দিয়াছেন।

(৭) রসেটাপ্রস্তরস্থ কার্ত্তুস্গুলির মধ্যে "টলেমির" নাম লিখিত আছে।

(৮) কার্ত্তুসের পরে কোনও স্ত্রীলোকের চিত্র থাকিলে তদ্বারা কার্ত্তুস্মধ্যস্থ নামের স্ত্রীত্ব সূচিত হয়।

(৯) কার্ত্তুস্মধ্যস্থ চিত্রগুলি শাব্দিক চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে (phonetic symbol)। কোথাও তাহারা মৌলিক ধ্বনির চিহ্নস্বরূপ (alphabetical), কোথাও কতিপয় সমবায়ে গঠিত শব্দাংশের চিহ্নস্বরূপে syllebic রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১০) একাধিক চিত্রদ্বারা একই ধ্বনি সূচিত হইতে পারে।

চতুর্দ্দশটী ধ্বনিসূচক চিত্রের নির্দ্দেশ ইয়ং করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছয়টী মাত্র পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। ইয়ং শুধু কার্ত্তুসের মধ্যেই বর্ণমালার ব্যবহার স্বীকার করিয়াছিলেন। বস্তু অথবা ব্যক্তি বিশেষের নাম ভিন্ন অন্যত্রও যে মিশরীয় ভাষায় বর্ণমালার ব্যবহার হইত—ইয়ং তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ফরাসী চ্যাম্পোলিন এই তথ্য অবাধে স্বীকার করেন।

রসেটাপ্রস্তর ও অন্যান্য অনেক মিশরীয়

লিখন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চ্যাম্পোলিন বুঝিতে পারেন মিশরীয়গণ একপ্রকার বর্ণমালা ব্যবহার করিত। তিনি মিশরীয় ভাষায় সম্পূর্ণ বর্ণমালার আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে স্বরবর্ণের সংখ্যা অতি কম।

কিন্তু চ্যাম্পোলিনের মতও সুধীগণ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। মিশরীয় ভাষার চিত্র দ্বারা শুধু বর্ণ ই যে সূচিত হইত তাহা নহে। অনেক চিত্র দ্বারা পূর্ণ শব্দ ও অনেকগুলি দ্বারা শব্দাংশও সূচিত হইত। আবার অনেক চিত্র দ্বারা শব্দ সূচিত না হইয়া শব্দ নির্দ্দিষ্ট পদার্থ ই সূচিত হইত।

চ্যাম্পোলিনের পরে তৎশিষ্য রসেলিনি ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত তৎপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া বিস্তর মিশরীয় পুরাবস্তু আবিষ্কার করতঃ মিশরের ইতিহাস গঠন করিয়াছেন। এই সমস্ত পণ্ডিতের গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে—মিশরীয়গণের মধ্যে প্রথমে চিত্রলিপিই প্রচলিত ছিল বর্ণমালার ব্যবহার প্রথমে হয় নাই। এবং বর্ণমালার ব্যবহার প্রচলিত হইবার পরেও চিত্রগুলি পরিত্যক্ত হয় নাই। বর্ণমালার অলঙ্কারের পূর্ব্বে প্রথমে চিত্র দ্বারা পদার্থ সূচিত হইত। প্রতি পদার্থ বুঝাইতে এক একটি চিত্র ব্যবহৃত হইত। তৎপরে চিত্র দ্বারা পদার্থ সূচিত না হইয়া তৎকালে শব্দ সূচিত হইত। একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইলেও একই চিত্র দ্বারা শব্দ বিশেষ সূচিত হইত। একাধিক শব্দাংশের (Syllable) সমবায়ে শব্দ ও একাধিক মৌলিক ধ্বনির সমবায়ে শব্দাংশ গঠিত। প্রথমতঃ শব্দাংশের জন্য চিত্র ব্যবহার করিয়া অবশেষে মৌলিক ধ্বনির জন্য স্বতন্ত্র চিত্রের ব্যবহার পর্য্যন্ত মিশরীয়গণ শিখিয়াছিল। প্রতি মৌলিক ধ্বনির জন্য স্বতন্ত্র চিত্র ব্যবহার করা ও বর্ণমালার ব্যবহার একই কথা। প্রথমে যে চিত্রগুলি মৌলিক ধ্বনি প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হইত—কালে সরলীকৃত হইয়া তাহারাই অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এই অক্ষরমালার ব্যবহার শিখিয়াও মিশরীয়গণ চিত্র ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। কোনও শব্দ বর্ণ সাহায্যে বানান করিয়া তৎপরে তৎসূচক চিত্রও তাহারা ব্যবহার করিত। ফিনিসীয়গণ মিশরীয়গণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অবলম্বিত লিপিপ্রণালী অবলম্বন করে। কিন্তু তাহারা মিশরীয় লিপির অনাবশ্যক চিত্রগুলি ত্যাগ করিয়া শুধু অক্ষরগুলি গ্রহণ করতঃ লিপিবিদ্যাকে অনেক সরল করিয়া দেয়। ফিনিসীয়গণের নিকট হইতেই যাবতীয় ইয়োরোপীয়গণ আপনাদের অক্ষরমালা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

জোনাকি ও আঁধার।

জোনাকি কহিল হাসি—শোন গো আঁধার,
আমার প্রকাশে বাড়ে সৌন্দর্য্য তোমার!
আঁধার কহিল—নাহি কর অহঙ্কার,
তোমার প্রকাশ হয় উদয়ে আমার!

দীপ ও রজনী।

দীপ কহে—হে রজনী আলোকে আমার,
ধরা মাঝে হয় সদা প্রকাশ তোমার!
রজনী কহিল হাসি—মোর অবসানে,
হে দীপ, তোমার কথা কেহ নাহি জানে!

শ্রী প্রফুল্লশঙ্কর গুহ।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

রাজ-পরিবার, সৈন্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র।

ক্ষত্রিয়গণই রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইঁহারা সময় সময় বলপ্রয়োগে ও রক্তপাতে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। ইঁহাদিগকেও বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়।

জনমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী তাঁহাদিগকেই বিশিষ্ট সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। যেহেতু পুত্র পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করে, সেই জন্য ইহারা শীঘ্রই যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শী হয়। শান্তির সময় ইহারা রাজ-প্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ শিবিরে বাস করে কিন্তু যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয় তখন ইহারা সকলের অগ্রবর্ত্তী হয়। সৈন্যগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম, পদাতিক, দ্বিতীয় অশ্বারোহী, তৃতীয়, রথী এবং চতুর্থ গজারোহী। হস্তীগণকে সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃত করা হয় এবং তাহাদের দন্তেও তীক্ষ্ণ কণ্টক থাকে। সেনাপতি রথে উপবিষ্ট থাকিয়া আদেশ প্রদান করেন এবং তাঁহার দক্ষিণে ও বামে দুই জন করিয়া চালক রথ চালনা করে। এই সকল রথ চতুরশ্বযোজিত। সৈন্যাধ্যক্ষ রথেই থাকেন; এবং চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণ তাঁহার রথচক্রের নিকটে থাকে।

অশ্বারোহী সৈন্য আক্রমণ প্রতিরোধ জন্য সর্ব্বাগ্রে থাকে এবং পরাজয় হইলে সংবাদ বহনের জন্য ইতস্ততঃ গমন করে। পদাতিকগণ ক্ষিপ্রকারিতার জন্য প্রতিরোধে নিযুক্ত থাকে। সাহস ও শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহাদের নির্ব্বাচন হয়। ইহারা দীর্ঘ বর্ষা ও প্রশস্ত ঢাল বহন করে। কখন কখন ইহারা তরবারীও ব্যবহার করে এবং প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হয়। ইহাদের যুদ্ধোপযোগী সকল অস্ত্রই তীক্ষ্ণধার ও শুক্ষ্মাগ্র। বর্ষা, ঢাল, তীর, ধনুক, তরবারী, কুঠার, টাঙ্গী, এবং নানা প্রকার ফিঙ্গা যন্ত্র ইহারা ব্যবহার করে। এই সকল অস্ত্রাদি ইহারা বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

রীতিনীতি, বিচার, পরীক্ষা প্রভৃতি।

সাধারণ ভারতবাসীগণ যদিও লঘুচিত্ত, তত্রাপি তাহারা সৎ ও অপকার্য্যবিমুখ। অর্থাদি বিষয়ে তঞ্চকতা জানেনা এবং বিচার কার্য্যে ইহারা সতর্ক। পরকালের শাস্তির জন্য ইহারা বিশেষ ভীত কিন্তু বর্ত্তমানের বিষয় ইহারা বিশেষ চিন্তা করে না। ব্যবহারে ইহারা প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লয় না এবং প্রতিজ্ঞাপালনে বিশেষ তৎপর। রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী সাধুতাপরিপূর্ণ এবং ইহাদের ব্যবহার অত্যন্ত সরল ও মধুর। দেশে অপরাধীর সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং অতি অল্প সময়ই ইহারা উপদ্রব করে। যখন কেহ আইন-বিরুদ্ধ আচরণ করে, তখন সেই বিষয় সুক্ষ্মাণুসুক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করা হয়। শারীরিক কোন প্রকার শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না। শীলতা অথবা ন্যায়ের বিধিলঙ্ঘন, দাম্পত্য-সম্বন্ধ ভঙ্গ, বা পিতৃমাতৃভক্তিতে ঔদাসীন্য দেখিলে সেই ব্যক্তির নাসাকর্ণ ছেদন অথবা হস্তপদাদি কর্ত্তন করিয়া অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত বা মরুভূমিতে তাড়িত করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। অন্যান্য দোষে, সামান্য অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অপরাধী ব্যক্তির দোষানুসন্ধানের জন্য কোনরূপ বেত্র বা দণ্ড ব্যবহৃত হয় না। অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি নিজ দোষ স্বীকার করে তবে তাহাকে লঘুশাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু যদি অপরাধী নিজ দোষ স্বীকার না করে অথবা অপরাধ করিয়া থাকিলেও দোষক্ষালনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিয়া নিম্ন লিখিত কোন প্রকারে শাস্তি প্রয়োগ করা—যথা (১) জল, (২) অগ্নি (৩) পরিমাণ প্রয়োগ অথবা (৪) বিষ।

প্রথমোক্ত বিধিতে অপরাধীকে থলিয়ায় করিয়া প্রস্তর পাত্রসহ গভীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি জলমগ্ন হয় ও প্রস্তর পাত্র

ভাসিয়া ওঠে তাহা হইলে সে অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যদি প্রস্তর জলমগ্ন হয় ও ঐ ব্যক্তি ভাসিয়া ওঠে তাহা হইলে সে নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হয়।

দ্বিতীয়ত :—ভারতবাসীরা লৌহপাত্র উত্তপ্ত করিয়া অপরাধীকে তাহার উপর উপবেশন করায়। এবং ঐ উক্ত লৌহপাত্র অপরাধীকে ক্রমান্বয়ে হস্ত, পদ ও জিহ্ব'দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়। যদি ইহাতে কোন ক্ষত না হয় তবে সে নির্দ্দোষ এবং ক্ষত হইলে দোষী বলিয়া গণ্য হয়। কোন দুর্ব্বল ভীরু ব্যক্তি এইরূপ পরীক্ষায় অসম্মত হইলে, তাহাকে একটি ফুলের কলিকা অগ্নির দিকে নিক্ষেপ করিতে হয়। যদি কলিকাটি প্রস্ফুটিত হয় তবে সে ব্যক্তি নির্দ্দোষ এবং পুষ্পটী দগ্ধ হইলে অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়।

তৃতীয় দণ্ডের নিয়ম, অপরাধীর সমপরিমাণ প্রস্তর একত্র তৌল করা হয়। যদি তৌলকালীন অপরাধীর ওজন প্রস্তরাপেক্ষা কম হয় তবে তাহাকে নির্দ্দোষ বলা হয়। আর যদি সে প্রকৃত অপরাধী হয় তবে, প্রস্তরের ভারই বেশী হয়।

চতুর্থ দণ্ডের নিয়ম ; একটী মেষের দক্ষিণ উরুতে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সকল প্রকার বিষ ও অপরাধীর আহার্য্যের কিয়দংশ দেওয়া হয়। যদি ঐ ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী হয় তবে মেষটী মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং নিরপরাধ হইলে বিষে কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

উপরোক্ত চারিটী উপায়েই দুষ্কার্য্যের পথ রোধ করা হইয়া থাকে।

সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম।

নিম্ন লিখিত নয় প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।—(১) অনুরোধ কালীন মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া (২) সম্মান প্রদর্শনের জন্য মস্তক অবনত করিয়া (৩) হস্তোত্তোলন করিয়া এবং নত হইয়া (৪) হাত জোড় করিয়া এবং নত হইয়া (৫) জানু নীচু করিয়া (৬) সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া—(৭) জানু ও হস্তের উপর ভর দিয়া (৮) পঞ্চচক্রে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া এবং (৯) পঞ্চাঙ্গে প্রণত হইয়া এবং মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া।

এই কয় প্রকারের মধ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং পরে জানু পাতিয়া সম্বোধিত ব্যক্তির গুণকীর্ত্তনই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাননীয় ব্যক্তি দূরে থাকিলে অবনত হইয়া প্রণাম করাই বিধেয়। নিকটে থাকিলে পদ চুম্বন এবং সম্বোধিত ব্যক্তির গুল্ফ স্পর্শ করাই উচিত।

উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির আদেশ গ্রহণের সময়, পরিধেয় প্রান্ত ভাগ উত্তোলন করিয়া ভূমিতে প্রণত হইতে হয়। উচ্চ পদস্থ বা সম্মানীয় ব্যক্তি—যাঁহাকে উপরোক্ত রূপে সম্মান প্রদর্শন করা হয়—তিনি মস্তক স্পর্শন বা পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া মিষ্ট বাক্যে উপদেশ দান অথবা স্নেহ প্রদর্শন করেন।

যখন কোন শ্রমণকে—যিনি ধর্ম্ম চর্চ্চায় নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—এইরূপ অভিবাদন করা হয়, তখন তিনি প্রত্যুত্তরে শুভ কামনা করেন।

ভারতবর্ষে প্রণামই একমাত্র সম্মান উপায় নহে। তাহারা নানা প্রকারে প্রদক্ষিণ করিয়াও সম্মান প্রদর্শন করে।

ঔষধ, সৎকার প্রভৃতি।

কাহারও কোন রূপ ব্যাধি হইলে তিনি সাত দিবস উপবাসী থাকেন। অনেকে এই উপবাসকালীনই আরোগ্য লাভ করেন কিন্তু ইহাতে আরোগ্যলাভ না করিলে তখন ঔষধ সেবন করেন। এই সকল ঔষধের ফল ও নাম বিভিন্ন। চিকিৎসকগণ রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী।

যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, যাহারা সৎকার করে, তাহারা বিশেষরূপে শোক প্রকাশ করে এবং সকলে একত্র হইয়া ক্রন্দন করে। তাহারা তাহাদের বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন, এবং কেশবন্ধন উন্মুক্ত করিয়া মস্তকে ও বক্ষে আঘাত করিতে থাকে। অশৌচকালীন কিরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে এবং কতদিন অশৌচ পালন করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

মৃতদেহ সৎকার করিবার তিনটী প্রণালী আছে। প্রথম দাহ, চিতা সজ্জিত করিয়া কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করা হয়। দ্বিতীয়, গভীর জলে মৃতদেহ নিক্ষেপ; এবং তৃতীয় পশুপক্ষীর আহারের জন্য মৃতদেহ নির্জ্জন স্থানে বিসর্জ্জন।

রাজার মৃত্যু হইলে, প্রথমতঃ তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হয়। কেননা উত্তরাধিকারীকেই রাজার সৎকার কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং প্রজাগণকে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। রাজার গুণানুসারে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে উপাধি ভূষিত করা হয়। মৃত্যুর পরে আর কোন প্রকার উপাধি দেওয়ার রীতি নাই।

যে বাড়ীতে মৃত্যু হয়, তথায় যতক্ষণ মৃতের সৎকার না হয় ততক্ষণ আহারাদি স্থগিত থাকে। সৎকারের পর পূর্ব্ববৎ আহারাদি ও ক্রিয়া কলাপ হয়। মৃতের জন্য কোন প্রকার বাৎসরিক অনুষ্ঠানের রীতি নাই। যাহারা সৎকারে ব্যাপৃত থাকে তাহারা নিজেদের অপবিত্র বিবেচনা করে। তাহারা নগরের বহির্ভাগে স্নান করিয়া পরে গৃহ প্রবেশ করে।

বৃদ্ধ ও স্থবির অথবা যাহারা গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত তাহারা যদি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাসনা করে, অথবা যদি কেহ সংসারের ভোগাদি হইতে মুক্তির বাসনা করে, তবে তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধুগণ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণাদি করিয়া বাদ্যসহকারে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে আনয়ন করিলে, এই সকল ব্যক্তি গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয়। এই ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলে উহারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিবে—এইরূপ ইহাদের বিশ্বাস।

পুরোহিতগণ মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ বা ক্রন্দন করিতে পারে না। যখন কোন পুরোহিতের মাতার বা পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাহারা মন্ত্র পাঠ করে এবং অতীতের বিষয় স্মরণ করিয়া সৎকারে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের বিশ্বাস যে এইরূপ করিলে ইহাদের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায়।

রাজনীতি, রাজকর প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের রাজনীতি মঙ্গলজনক বিধির সহিত জড়িত বলিয়া, শাসনকার্য্য অত্যন্ত সহজ। অধিবাসীদিগের নামধাম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা নাই এবং তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিবারও নিয়ম নাই। রাজাদিগের নিজ ভূম্যধিকার আয় প্রধানত চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ রাজকীয় কার্য্য এবং পূজা হোমাদিতে,—দ্বিতীয়াংশ মন্ত্রী ও রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীবর্গের বেতনাদিতে,—তৃতীয়াংশ রাজ্যের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের পুরস্কারার্থে, এবং চতুর্থাংশ ধর্ম্মসভা প্রভৃতিতে ব্যয় হইয়া সুবৃত্তি সকলের অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকে। এই প্রকারে প্রজার রাজকরের পরিমাণ অল্প এবং তাহাদের ব্যক্তিগত যে পরিশ্রম করিতে হয় তাহাও পরিমিত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দ্রব্যাদি শান্তিতে রক্ষা করিতে পারে এবং জীবিকার জন্য স্ব স্ব ভূমি কর্ষণ করে। যাহারা রাজকীয় ভূমি কর্ষণ করে, তাহাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজকর রূপে দিতে হয়। বণিকগণ ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে পারেন। সামান্য কর প্রদত্ত হইলেই জলপথ ও স্থলপথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য আবশ্যক হইলে প্রজাদের কাজ করিতে হয় বটে কিন্তু তজ্জন্য তাহারা বেতন পায়। কার্য্যের অনুপাতানুযায়ী বেতন দেওয়া হয়।

সৈনিকগণ সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করে অথবা অবাধ্যদিগকে শাস্তি দিতে বহির্গত হয়। সৈন্যগণ, শাসনকর্ত্তাগণ, মন্ত্রীগণ, নগরপাল এবং কর্ম্মচারীগণ নিজ নিজ ভরণপোষণের জন্য নির্দ্ধারিত ভূমি লাভ করেন।

তরুলতা, কৃষি, আহার্য্য, পানীয় এবং পাক ক্রিয়া।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জলবায়ু বলিয়া, ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। পুষ্প, লতা, ফল, বৃক্ষ নানা প্রকারের এবং তাহাদের নামও বিভিন্ন। আমলা, মাধুক, ভাদ্র, কপিত্থ, তিন্দুক, মোচা, নারিকেল, এবং পানস ফল প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এদেশের সকল প্রকার ফলের নামকরণ

অসম্ভব। খর্জ্জুর, বাদাম, এদেশে পাওয়া যায় না। আঙ্গুর, পীচ প্রভৃতি ফল কাশ্মীর হইতে আনীত। দাড়িম্ব ও মিষ্ট কমলা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

উপযুক্ত সময়ে কর্ষণ, বপন, কর্ত্তন হয়। কার্য্য শেষে কৃষকেরা কিছুকাল বিশ্রাম করে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউলই প্রধান। আদা, শরিষা, তরমুজ, লাউ, কদু, যথেষ্ট পাওয়া যায়। পেঁয়াজ ও রসুন বেশী পাওয়া যায় না। যদি কেহ পেঁয়াজ বা রসুন ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাকে নগরের বহির্ভাগে নির্ব্বাসন করা হয়। দুগ্ধ, মাখন, সর, চিনি, গুড় *শর্ষপতৈল, এবং পিষ্টকই সর্ব্বজন খাদ্য।* মৎস্য ও মেষ মাংসও সচরাচরই লোকে খায়। কখন কখন নোনা মৎস্যমাংসও ব্যবহৃত হয়। গো, গর্দ্দভ, হস্তী, অশ্ব, শূকর, কুক্কুর, শৃগাল, নেকড়ে সিংহ, বানর এবং লোমশ পশুর মাংস নিষিদ্ধ। যাহারা এই সকল পশুমাংস ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখা হয় এবং সকলেই তাহাদের নিন্দা করে। ইহারা নগরের বহির্ভাগে বাস করে এবং কদাচিৎ ভদ্র মনুষ্যের সহিত মিলিত হয়।

নানা প্রকার মদ্য আছে। ক্ষত্রিয়গণ আঙ্গুর ও ইক্ষু নির্ম্মিত সুরা পান করে। বৈশ্যগণ তেজস্কর মদ্য পান করে। শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ আঙ্গুর অথবা ইক্ষু সরবৎ পান করে। এই সরবৎ তীক্ষ্ণতেজ নহে।

বর্ণসঙ্কর ও নীচ জাতিগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আচার ব্যবহারে বিভিন্ন নহে। কেবলমাত্র ইহারা যে পাত্র ব্যবহার করে তাহা অন্যরূপ। ইহাদের গৃহকার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদির অভাব নাই। যদিও ইহাদের কড়াই ও হাঁড়ী আছে কিন্তু তত্রাপি ইহারা অন্নপাকের জন্য ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার জানে না। নানা প্রকার মৃন্ময় পাত্রাদি ইহারা ব্যবহার করে। সকল প্রকার দ্রব্য একটী পাত্রে একত্র করিয়া অঙ্গুলি সংযোগে মাখিয়া আহার করে। ইহারা চামচ বা পেয়ালা ব্যবহার করে না। পীড়িত হইলে ইহারা তাম্রপাত্র ব্যবহার করে।

বাণিজ্যাদি—

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, শ্বেত অশ্ব এবং মুক্তাই এই দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত নানারূপ মূল্যবান রত্ন এবং নানা প্রকার প্রস্তরাদি এদেশে পাওয়া যায়। ইহারা অন্যান্য দ্রব্যের সহিত এই গুলি বিনিময় করে। ইহাদের স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা নাই।

ভারতবর্ষ এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের সীমা উপরে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা হইল। জলবায়ু ও ভূমির বিষয়ও বর্ণনা করা হইয়াছে। এইক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইবে। (ক্রমশঃ)

তৈমুর লঙ্গ।

প্রথম সম্রাট। (মাসুশি হইতে)

যে বীরপুরুষ তাতার দেশের এক সামান্য গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ শক্তি ও প্রতিভার বলে ভারত হইতে পশ্চিমে ম্যাসিডোনিয়া পর্য্যন্ত আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে এক বৃহৎ পুস্তক রচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তৈমুর লেন বা তৈমুর লঙ্গ দুইটি তাতার কথার সংযোগে রচিত হইয়াছে। তৈমুর অর্থে লৌহ। চিরদিন লৌহ অস্ত্রে পরিবেষ্টিত ও কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া তাঁহাকে তৈমুর বলা হইত। লঙ্গ অর্থে খঞ্জ। তৈমুরের জন্মাবধি একটি পা খোঁড়া ছিল। তাতার দেশের কাশ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। মুসলমানদিগের ইতিহাসে এই সম্রাটের জন্ম সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অসাধারণ প্রতিভাশালীর জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ কোন গল্প রচনা করা প্রাচ্যজাতির অভ্যাস।

শুনা যায় তৈমুরের মাতার নাকি বিবাহের পূর্ব্বেই সহসা পুত্রবতীর লক্ষণ প্রকাশ পায়। কুমারীর পিতা নিতান্তই ভীত হইয়া পড়িলেন; কন্যাকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দুষ্টা কন্যাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্বীয় অপমানের প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন। এরূপ সময়ে যুবতী পিতার পদতলে পড়িয়া তাহার অবস্থার আশ্চর্য্য কাহিনী প্রকাশ করিল। সে বলিল "তাহার গৃহের জানালায় একটি সামান্য ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া তাহাকে এরূপ ভাবে বেষ্টিত করিয়া ধরিল, যে মনে হইল যেন সে উজ্জ্বল আলোক-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছে। পরে সেই রশ্মি তাহাকে আদর করিতে লাগিল। পরে কুমারী কাতরে কহিল, পিতা, আপনার আমার প্রতি ক্রোধ সঙ্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার এ অবস্থার কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।" পিতা সন্ধান লইয়া জানিলেন কন্যার কথাই সত্য। অবশেষে তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, সকল তেজের আকর সূর্য্যের অনুগ্রহে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার গৌরব-কীর্ত্তিতে তাঁহার বংশের নাম অমর হইবে।

এই গল্পটি নিতান্ত গল্প হইলেও তৈমুরের পিতার নাম হইতেই এই গল্পের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নাম ছিল টার্গে অর্থাৎ "আলোকের উৎপত্তি-স্থল।" হুসেন নামে এক নৃপতি সে সময়ে তুর্কিস্থান ও তাতারের একছত্র অধিপতি ছিলেন। এই হুসেনের রাজসভায় মধ্যে টার্গে একজন অতি বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত সভাসদ ছিলেন। "মোগল" এই কথাটার আদি অর্থে কোন দেশবিশেষকে বা সাম্রাজ্য বিশেষকে বুঝায় না। "মোগল" একটা পরিবার বিশেষের নাম মাত্র। এই পরিবার বহুদিন হইতে তাতার প্রদেশের দক্ষিণভাগে রাজত্ব করিত। এই পরিবার হইতেই তৈমুরের উৎপত্তি। ইঁহারই পূর্ব্ব-পুরুষ চেঙ্গিস খাঁ আসিয়ার প্রধানতম রণবীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ মোগল বর্ত্তমান উভয় তাতার প্রদেশকেই শাসন করিতেন। নিজ ভুজবলে তিনি চীনদেশ পর্য্যন্ত পদানত করিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধরগণ চীনে সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হিজরা ৭৩৬ অব্দে অর্থাৎ ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের জন্ম হয়। এই সময়ে হুসেন নামে চেঙ্গিসের এক বংশধর দক্ষিণ তাতারে রাজত্ব করিতেন। মোগলদিগের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, তৈমুর রাজসভা ও রাজধানী হইতে দূরেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে তিনি বাল্যকালে তাঁহার পিতার মেষ পালন করিয়া বেড়াইতেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার বাক্যে ব্যবহারে একটা অদম্য তেজের ভাব প্রকাশ পাইত। তাহা ছাড়া সেই অল্প বয়সেই তিনি চতুর্দ্দিকস্থ মেষপালক বালকগণের উপর যেরূপ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে তিনি যে প্রভুত্ব করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝা যাইত। পল্লীর বালকগণ সকলেই তাঁহাকে দলপতির ন্যায় সম্মান করিত এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হইলে তাঁহাকেই বিচারক বলিয়া মনোনীত করিত। মেষ চারণের স্থান লইয়া যখন বিবাদ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত, তাহারা বালক তৈমুরের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিত এবং তিনি যাহা বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন তাহার বিরুদ্ধে আর কোন আপিল করা তাহারা আবশ্যক মনে করিত না। একবার এক উষ্ট্র দলভ্রষ্ট হইয়া বালকদের মেষ-চারণের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। বালকেরা তাহাকে ধরিয়া রাখিবে কি ছাড়িয়া দিবে স্থির করিতে না পারিয়া, তাহাদের অভ্রান্ত বিচারক তৈমুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৈমুর বিচার করিয়া বলিলেন—"এই উষ্ট্র যদি নিম্নভূমি হইতে তোমাদের নিকটে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া স্বদলে যুক্ত হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য, আর যদি সে পার্ব্বত্য ভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে পুনরায় স্বদলে মিলিত হওয়া সম্ভব নয় বরং বন্যজন্তুর দ্বারা হত হওয়াই সম্ভব, সুতরাং সেরূপ স্থলে উহাকে রাখিয়া দেওয়াই তোমাদের কর্ত্তব্য।" বালকগণ তাহাই

করিল, উষ্ট্রটিকে নিজেদের নিকটেই রাখিয়া দিল। এইরূপে বালকদের ক্রীড়ার মধ্যেই পৃথিবীর অভূতপূর্ব্ব বিরাট সাম্রাজ্যের প্রথম ভিত্তি গঠিত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে সেই মেষপালক বালকগণ বড় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তৈমুরেরও তাহাদের উপর প্রভুত্ব ও প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই প্রভুত্বের অধিকার-বলে তিনি অনুচরদিগকে যেরূপ কঠোরভাবে শাসিত করিতেন, তাহাতে ক্রমে তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল, তাঁহার প্রতিবাদ করিতে আর কেহই সাহসী হইত না। একদিন তৈমুর শুনিলেন এক নেকড়ে বাঘ একটি মেষকে লইয়া গিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মেষপালককে তাহার অসাবধানতার জন্য সমুচিত দণ্ড দানের ব্যবস্থা করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার এক প্রজা একটি গরু চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়ে। নবীন নৃপতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে শূলদণ্ডে বধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। এই বিচারের ফলে মেষপালকের অধিনায়ক তাঁহার শক্তির বল বুঝিলেন এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধির আকাঙ্খায় প্রণোদিত হইলেন। মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা মনে করিলেন মেষপালকগণ বালক তৈমুরের হস্তে যে ক্ষমতা দান করিয়াছে তৈমুর একেত্রে তাহার অপব্যবহার করিয়াছে। এই বিশ্বাসে তাহারা বিচারক ও তাঁহার নৃশংস শাসনের পরামর্শদাতাগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। শাস্তিটা যে অসঙ্গত হইয়াছিল তাহা তাহারা মনে করে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্তি দান করিয়াছিল তাহাকে শাসনকর্ত্তারূপে স্বীকার করিতে তাহারা প্রস্তুত নহে। সেই জন্য এই অন্যায় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য দুই গ্রামের অধিবাসীরা অর্থাৎ দুই পরিবারের পরিজনবর্গ নিকটবর্ত্তী মেষচারণ-ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তৈমুর তাঁহার অল্প বয়স্ক বীরগণকে লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং এই দুই পরিবারকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গ প্রথম জয়গৌরব লাভ করিল। তৈমুরের সাহস ও দক্ষতার বিবরণ শুনিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ সাহসী যুবকগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। ইহারা সকলেই তাঁহার প্রজা হইবার জন্য উৎসুক, এবং যথার্থ রাজার ন্যায় তৈমুরের আজ্ঞাপালন করিয়া ইহারা এক প্রকার গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

তৈমুরের যে সকল মেষপাল ছিল তাহাদের চারণোপযোগী যথেষ্ট ভূমি লাভ করিবার জন্য এবং এতগুলি অনুচর মেষপালকের অধিকার বৃদ্ধির জন্য, তাঁহার নূতন ভূমি জয় করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। সুলতান্ মামুদই তাঁহাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন। তাহারা তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ করা সঙ্গত বলিয়া স্থির করিল, এবং তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে রাজধানী অধিকার করিবার পরামর্শ করিল। এই রাজধানীতে সেই প্রদেশের যত অল্পবয়স্ক মেষপালকগণ যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত।

যুদ্ধ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এই অল্পবয়স্ক মেষ-পালকগণ তাহাদেরই ন্যায় অল্পবুদ্ধি ও অল্পবয়স্ক এক নায়কের নেতৃত্বে চালিত হইয়া রাজধানীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তৈমুরের সৈন্যগণ যে কোথায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল তাহার ঠিক নাই। অবশেষে তৈমুর অনুচর-বিহীন ভাবে একাকী পদব্রজে ভিক্ষা করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। একদিন এক গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে তিনি খাদ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেন। এক বৃদ্ধা তাঁহাকে চিনিত। সে তাঁহাকে তাহার আপন কুটীরে লইয়া গেল এবং রাখালরাজকে এক সঙ্কীর্ণ রেকাবে করিয়া দুটি গরম ভাত দিল। ক্ষুধায় কাতর হইয়া তৈমুর রেকাবের মধ্যস্থল হইতে ভাত লইয়া তাড়াতাড়ি যেমন খাইতে গেলেন, অমনি তাঁহার মুখ পুড়িয়া গেল। বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল, "প্রভু, এই ঘটনা হইতে শিক্ষা করুন যে ভবিষ্যতে আর কখনও মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিবেন না, প্রান্তভাগ হইতে আরম্ভ করিবেন। প্রথমে সীমান্ত দেশ জয় না করিয়া ব্যস্ততা সহকারে দেশের মধ্যস্থলে

যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে বিপদ ও ব্যর্থতা অনিবার্য্য।"

এই উপদেশ তৈমুর কখনও বিস্মৃত হন নাই। ভবিষ্যতে যাবতীয় যুদ্ধে তিনি সর্ব্বদাই এই নীতির অনুসরণ করিতেন। তাঁহার যাত্রার ব্যাঘাত করিতে পারে বা পলায়নে বাধা প্রদান করিতে বা জয়লাভকে ব্যর্থ করিতে পারে, এরূপ কারণ তিনি সেই অবধি কখনও পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতেন না। যাহা হউক তাঁহার জীবনের এই প্রথম বাধায় তিনি ভগ্নোদ্যম হন নাই। তাঁহার বিচ্ছিন্ন অনুচরবর্গ বিভিন্ন পথ দিয়া পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট যাইয়া সমবেত হইল। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই তাঁহার অনুগত রহিল। কিন্তু এই দুর্ঘটনার পর হইতেই তৈমুর যেন কিছু অত্যধিক উদ্ধত ও কঠোর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তিনি নিকটবর্ত্তী ভূমিসমূহ অধিকার করিতে লাগিলেন। প্রতি স্থলেই জয় লাভ করিয়া রাখালরাজ তাঁহার পূর্ব্ব পরাজয়ের স্থানটির এত নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন যে তিনি সেই নগরটিকে পুনরায় অধিকার করিতে চেষ্টা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নগর অধিকৃত হইল এবং এই সংবাদে বহুদূর পর্য্যন্ত সকলে ভীত হইয়া পড়িল।

এই সকল রাখাল ও তাহাদের অধিনায়কের অসমসাহস দেখিয়া হুসেন ও তাঁহার সভাসদ্বর্গ ভীত হইয়া উঠিলেন। তাতার প্রদেশে তাঁহার রাজ্যমধ্যে তৈমুর একপ্রকার রাজশক্তি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। হুসেন এই নবীন বিজেতার অগ্রসরের পথ বলপূর্ব্বক রোধ করা আবশ্যক স্থির করিলেন। মামুদের পরাজয়ে তৈমুরের শক্তি দেখিয়া বস্তুতঃ অনেকেই ঈর্ষা বোধ করিত। অমাত্যবর্গ হুসেনকে পরামর্শ দিল যে এরূপ যুদ্ধকর্ম্মে অনভিজ্ঞ মুষ্টিমেয় অর্ব্বাচীন ও অল্পবয়স্ক মেষ-পালককে পরাজিত করার জন্য অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ সৈন্যই যথেষ্ট। অস্ত্রের প্রভেদ হিসাবে এরূপ অসমান যুদ্ধ কখনও হইয়াছে কি না জানি না। রাজসৈনিকেরা উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ও তরবারি লইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাতার দেশীয়গণ এ সময়ে বন্দুকের ব্যবহার জানিলেও তাহা যুদ্ধে ব্যবহার করা তখনও প্রচলিত হয় নাই। তৈমুরের লোকেরা কেবল শড়্কি ও বর্শা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তৈমুরের লোকেরা সকলেই যৌবনের অদম্য তেজে উদ্দীপ্ত,—তাহাদের দেহ ক্লান্তি জানে না, মন সঙ্কোচ জানে না। তাহা ছাড়া তাহাদের মনোনীত নায়কের আদর্শে ও জয়োল্লাসে তাহারা সকলেই উৎফুল্ল; যুদ্ধ ব্যাপারে তৈমুরের একপ্রকার ঐশী শক্তি ছিল। অনভিজ্ঞ হইলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে তিনি সুদক্ষ বীরের ন্যায় সৈন্যচালনা করিতেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল; মেষপালকগণের প্রবল ব্যূহ হুসেন কোনমতেই ভেদ করিতে পারিলেন না। তৈমুর স্বয়ং ব্যূহমুখে উপস্থিত থাকিয়া অসমসাহসে শত্রুসংহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে তৈমুরই জয়ী হইলেন, হুসেন জীবন ও রাজমুকুট দুইই হারাইলেন।

(ক্রমশঃ)

যবদ্বীপে।

বৃহস্পতিবার।

একটি উৎকৃষ্ট টাটুঘোড়ার উপর চড়িয়া, প্রাতঃকাল পাঁচটার সময় ব্রমোর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার পথপ্রদর্শক—একটি যাবা-দেশীয় যুবক—মুখে একটি বেশ মধুর সরল ভাব। গায়ে একটা সাদা ছোটো জামা, এবং আ-জানু-লম্বিত একটা খাটো স্কচ্-কোর্ত্তা। জঙ্ঘা ও পদদ্বয় নগ্ন।

দুই ঘণ্টা ধরিয়া, শাক্‌সব্‌জির ক্ষেতের উপর দিয়া, বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিলাম।

পরে, হঠাৎ একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের চূড়া হইতে, একটা বিরাট দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। বালু-সমুদ্র। এই ধূসর বালু-সমুদ্র, একটা বিশাল পরিসর ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার চারিদিকে, আগ্নেয় গিরির প্রাচীর। বোধ হয় ইহা আগ্নেয় গিরির একটা পুরাতন অগ্নি-গহ্বর। এই বিরাট গহ্বর হইতে ৪।৫টা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড আগ্নেয় গিরি সমুত্থিত হইয়াছে :—বাটক্,—উদ্ভিজ্জে সমাচ্ছন্ন; তাহার পশ্চাতে ব্রমো; আরও দূরে, আর কতকগুলা আগ্নেয় গিরি; দক্ষিণে, Smeroe গিরি; তাহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে; দেখিলে মনে হয় যেন টুপির মাথায় পালোকের থোপ্না উঠিয়াছে...এই অনন্য-সাধারণ বিরাট-গম্ভীর দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখিয়াও ক্লান্তি বোধ হয় না। আর-কি নিস্তব্ধতা! বাতাসের শব্দমাত্র নাই—একটি পাখীর ডানার শব্দও নাই : এই বিরাট-গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া মনোমধ্যে যে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য-রস অনুভূত হয়, তাহা আর কিছুতেই বিক্ষিপ্ত হইবার নহে।···

পাহাড়ের পাদদেশে নামিয়া বালু-সমুদ্রে পৌঁছিলাম। নীচে হইতে দৃশ্যটা আর এক হিসাবে আরও জমকালো। - নীচে হইতে আগ্নেয় গিরিগুলার প্রশস্ততা আরও বেশী উপলব্ধি করা যায়। উপর হইতে শুধু কল্পনা করা যায় মাত্র। আবার ঘোড়ায় চড়িয়া, বাটকের মধ্য দিয়া,—বায়ু সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে, স্ফীতকায় উদ্ভিজ্জ-শ্যামল যে গিরি-প্রাচীর আছে—তাহার প্রায় চূড়াদেশে আরোহণ করিলাম। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে এরূপ উন্মত্ত হইলাম যে সেই বালু-সমুদ্রের উপর দিয়া আমার টাটুকে খুব ছুটাইয়া ব্রমোর পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। ব্রমোর পশ্চাতে, আগ্নেয় পদার্থসমূহের সূক্ষ্ম রেণুরাশি জলদ-জালের ন্যায় সমুত্থিত হইয়াছে। আমার পথপ্রদর্শক এত পিছনে পড়িয়া গিয়াছে যে, সে একটি বিন্দুর ন্যায় অদৃশ্য প্রায়। তাহার এই ক্ষুদ্রতা হইতে, চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থসমূহের বিশালতা আরও যেন বেশী উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

আমি ব্রমোর দুরারোহ ঢালুর উপর পদব্রজে উঠিলাম। একটা বন্ধুর সুঁড়ি-পথ, তার পর এক প্রকারের সোপান ধাপ—এই পথ ও ধাপের উপর দিয়া একেবারে চূড়ায় উঠিলাম।

এই শৈল-প্রাচীরের চূড়া হইতে, পাদদেশের গহ্বর দেখা যায়—এই আগ্নেয় গহ্বরটা অতীব বিশাল। শৈল গাত্রে দ্রব ধাতু গড়াইয়া পড়িতেছে; ফিকা হলদে কিংবা ঘোর-সবুজ রঙ্গের গন্ধকের বড়-বড় পস্তর। অসংখ্য রন্ধ্রপথ দিয়া ধূমের ফোয়ারা নিঃসৃত হইয়া খুব উচ্চে উঠিয়াছে। একেবারে তলদেশে, জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে; ঐ ফুটন্ত জল পর্য্যায়ক্রমে ধূসর, সাদা, কালো, সবুজ—এইরূপ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিতেছে। একটা বাষ্প উঠিতেছে—এই বাষ্প কখন কুয়াসার মত পাতলা কখন মেঘের মত ঘন··· সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় একটা গভীর শব্দ ক্রমাগত শুনা যাইতেছে—যেন সৈকত বেলার উপর তরঙ্গাঘাত হইতেছে। সময়ে-সময়ে এই মূল-ধ্বনির সহিত, সোঁ-সোঁ শব্দ, ঘোর গর্জ্জন, ও বজ্রনিনাদ মিশ্রিত হইতেছে...

এই নৈসর্গিক নাট্য, নাট্য-সঙ্গীত, নাট্য-

সজ্জা সমস্তই অতীব অদ্ভুত। আমি ভাবিতে লাগিলাম—আমার অন্তরাত্মা যদি ধর্ম্মপ্রবণ ও উপধর্ম্মভীরু হইত এবং মধ্যযুগের যোগীদিগের ন্যায় আমার প্রবল কল্পনা শক্তি থাকিত, তাহা হইলে এই আগ্নেয়গহ্বর দেখিয়া নিশ্চয়ই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত: আমার মনে হইত, আমার পাদদেশে একটা নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—যে নরকে,—প্রেমময় ঈশ্বরের ইচ্ছায়, অসংখ্য পাপী অনন্তকাল ধরিয়া দগ্ধ হইতেছে!

কিন্তু আমি উনবিংশতি শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আধুনিক বিজ্ঞান, আমার অন্তরে শান্তিতর ভাবের অঙ্কুর, উচ্চতর চিন্তার অঙ্কুর স্থাপন করিয়াছে। বিজ্ঞান নিরাকুলভাবে এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবীর গর্ভকেন্দ্রে একটা বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে।—বিজ্ঞানের এই আভাস ইঙ্গিতে, মানুষের কল্পনা ছুটিয়া চলিয়াছে। না জানি এই পৃথিবীর গর্ভস্থ উত্তাপ কতদূর হইতে আসিয়া, আমার নিকটবর্ত্তী এই জলরাশিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে! কি প্রকাণ্ড আমাদের পৃথিবী! কি প্রকাণ্ড আমাদের সৌরজগৎ—যাহার নিকট আমাদের এই পৃথিবীও একটি ক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র। আর এই সমস্ত অসংখ্য তারা, এই সমস্ত গ্রহ, এই সমস্ত সূর্য্য লইয়া যে ব্রহ্মাণ্ড—এই ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড, কি অমেয়, কি অসীম!...এই যবদ্বীপের আগ্নেয়-গিরি আমার মনে অনন্তের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে—তারা-সঙ্কুল নির্মেঘ আকাশ দর্শনে যেরূপ অনন্তের ভাব উদ্বোধিত হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ।

আমার এইরূপ মনোভাবের হেতু নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে করিতে, ব্রমোর শিখরে উঠিয়া, বিরাট্-রস (sublime) সম্বন্ধে ক্যাণ্টের (kant) সিদ্ধান্ত আমার মনে পড়িয়া গেল। ক্যাণ্টের মতে,—মানুষ যখন যুগপৎ আপনাকে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব ও জ্ঞান-নীতি সম্পন্ন উন্নত জীব বলিয়া মনে করে, তখনই মানুষের মনে বিরাট্-রসের আবির্ভাব হয়। ক্যাণ্ট যেভাবে বিরাটের অর্থ করেন, সেই অর্থে এই যবদ্বীপের আগ্নেয়-গিরি, বিরাট ভাবোদ্দীপক। এই সকল আগ্নেয় গিরি আমাদের মনে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত করে; পক্ষান্তরে ইহাও মনে করাইয়া দেয়, প্রকৃতি যতই বৃহৎ হোক্ না কেন, মানুষ প্রকৃতি অপেক্ষা বড়, প্রকৃতি অপেক্ষা বুদ্ধিমান, প্রকৃতি অপেক্ষা প্রীতিভাজন। বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ যখন বাস্তবকে বুঝিতে পারে, মানুষ যখন বিশ্ব-বাসী কতকগুলি জীবের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, তখনই মানুষ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দী।

৩০

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আমি বসিয়াছিলাম—অতীতের সমস্ত কথা মনে পড়িতেছিল—স্বপ্নের মত বিচিত্রমধুর কৈশোরের কথাগুলি! দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার এই ভীষণ কণ্টক, সে কথাগুলি তাহারি পার্শ্বে যেন সুন্দর, শুভ্র কুসুমের রাশি!

প্রফুল্ল মুখ, নিশ্চিন্ত হৃদয়, উল্লসিত প্রাণ—কি সে মধুর দিন! উদ্যানের মাঝে ছুটাছুটি খেলা, সঙ্গীদের প্রাণভরা ভালবাসা, সে কি সুখ! তার পর কৈশোরের স্বপ্নরাজ্যে নূতন আলোকের উন্মেষ! নিরালা কাননে পার্শ্বে ছিল তরুণী সঙ্গিনী!

সুদীর্ঘ টানা চক্ষু, কেশের রাশি, গৌর তনু, রক্তাভ অধর—অপূর্ব্বরূপিণী চতুর্দ্দশী পেপা! বাগানে আমরা একত্রে কত খেলা করিয়াছি! কত হাসি, কত গল্প!

কলহেরো অন্ত ছিল না! তার প্রকৃতিটি ছিল শান্ত মধুর! পাখীর বাসা চুরি করিয়া হৃষ্টমনে ধীরে ধীরে যখন আমি গাছ হইতে নামিতাম তার ম্লান চোখ দেখিয়া আমি জ্বলিয়া যাইতাম। সে দিন সে মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, "কেন তুমি বাসা চুরি কর—আহা, ছোট ছানাগুলি—বড় নিষ্ঠুর তুমি!" এত বড় একটা বীরত্বের কাজ সারিয়া আসিতেছি কোথায় সে উৎসাহ দিবে, না, তিরস্কার! পাখীর বাসা ছুড়িয়া তাহাকে আঘাত করিলাম! গৃহে ফিরিলে যখন তার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এখানে কি হয়েছে রে?" সে অমনি অসঙ্কোচে বলিয়া উঠিল, "পড়ে গেছলুম, মা!"

তার পর কতদিন আমার স্কন্ধে ভর দিয়া নদী তীরে সে বেড়াইয়াছে! কখনো ধীর, কখনো-বা দ্রুত গতি! তীরে দাঁড়াইয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতাম—সন্ধ্যা নামিয়া আসিত—চারিদিক ধীরে ধীরে আঁধারে অস্পষ্ট হইয়া উঠিত—মৃদু সঙ্গীতের মত নদীর জল তটের কূলে আছাড়িয়া পড়িত—আমাদের কণ্ঠস্বরও মৃদু হইত! কত গল্প করিতাম—কত রাজকন্যার কথা, ব্যর্থ প্রণয়ের কত করুণ কাহিনী! মাঝে মাঝে কেমন সঙ্কোচে-সরমে সে মুখ নত করিত!

পেপার হাতের রুমাল পড়িয়া গেল—আমি তাড়াতাড়ি সেখানি তুলিয়া তাহার হাতে দিলাম—স্পর্শে হাত কাঁপিয়া উঠিল!

সে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যা! বাগানের কোণে বাদাম গাছের তলায় আমরা বসিয়াছিলাম।

সহসা পেপা কহিল, "এস খানিক ছুটি!" সূক্ষ্ম তনুটি লইয়া সে ছুটিয়া চলিল—বোল্তার মত লঘু তার সে গতিটুকু! কেশের গুচ্ছ উড়িয়া পড়িতেছিল—মাঝে মাঝে গলার সুন্দর রঙ ফুটিয়া উঠিতেছিল—যেন তামাটে মেঘে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছিল!

একটা কূপের পার্শ্বে সে বসিয়া পড়িল—ললাটে স্বেদের বিন্দু মুক্তার মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম—সে হাঁকাইয়া পড়িয়াছিল—নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া

যাইতেছিল—কৃষ্ণ পক্ষ্মের তলে চক্ষু দুটি যেন শ্বেতপদ্মের মত! আমি তাহারি প্রতি চাহিয়াছিলাম।

পেপা বলিল, "একটু পড়ি এস! এখনো ত আলো রয়েছে; বই নেই তোমার কাছে?"

পকেটে একখানি ভ্রমণকাহিনী ছিল—তাহার পৃষ্ঠা খুলিলাম। আমার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া সে পড়িতে লাগিল—আমার পূর্ব্বেই তার পাঠ শেষ হইতেছিল—তার বুদ্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ!

পাঠ শেষ করিয়া আমার পানে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পড়া হয়েছে?" আমি তখন সবেমাত্র পড়া সুরু করিয়াছি!

আমাদের উভয়ের কেশাগ্র পরস্পর স্পর্শ করিল, তার নিশ্বাস বায়ু আমার গালে লাগিল, তার পর উভয়ের ওষ্ঠও মিলিল! আবার যখন বই খুলিলাম, তখন মাথার উপর এক আকাশ নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে!

গৃহে ফিরিয়া সে ডাকিল, "মা, মা, আজ আমরা খুব ছুটেছি!" আমার মুখে কথা বাধিয়া গেল!

তিনি বলিলেন, "তুই যে কিছু বলছিস না রে? তোর মুখ যে শুখিয়ে গেছে—মনে দুঃখ হয়েছে নাকি কিছু?"

দুঃখ! আনন্দে আমার হৃদয়ের দুই কূল যে ছাপিয়া গিয়াছে! সেই স্নিগ্ধ সুন্দর সন্ধ্যার কথা, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি ভুলিতে পারিব না যে!

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত—? হায়, তার আর বিলম্বই বা কি?

৩১

কয়টা বাজিয়াছে জানি না! কিসের একটা মিশ্র শব্দ ভ্রমর-গুঞ্জরের মত কাণে আসিতেছে! বুঝি আমারি শেষ চিন্তাগুলা মাথার মধ্যে এক বিরাট কোলাহল বাধাইয়া দিয়াছে!

আমার অপরাধের কথা ভাবিতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে, কিন্তু এ অনুতাপ আর কতটুকু সময়ের জন্যই বা!

দণ্ডের পূর্ব্বে অনুতাপের বোঝা যে বুকে চাপিয়াছিল, এখন মৃত্যুর কথা ছাড়া আর কিছুর জন্য ত আমার হৃদয়ে স্থান নাই! অতীতের কথা ভাবিতে গেলেও—ফাঁসির রজ্জুর কথাটা যে ভুলিতে পারি না! মধুর শৈশব, গৌরবোজ্জ্বল কৈশোর, আজ এমনি রক্ত মাখিয়া সে অবসিত হইবে! অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে একটা রক্ত-নদীর ব্যবধান! যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমার এ জীবনের কাহিনী পাঠ করেন ত ঘৃণায় বিভীষিকায় কতখানি তিনি শিহরিয়া উঠিবেন! এ কি বিশ্বাসের যোগ্য কথা! কি রক্তপিপাসী আইন! হা নিষ্ঠুর মানুষ—আমি কি এমনি মন্দ? না, কখনো না!

আর কয় ঘণ্টা পরেই সকল চিন্তা সকল ভাবনার সুগভীর সমাপ্তি! অথচ সে আজ কত দিনই বা, যখন শুদ্ধ স্বাধীন চিত্তে নদীর তীরে, বৃক্ষের তলে, পত্র-মর্ম্মর পথে স্বচ্ছন্দ গতিতে বেড়াইয়া আমার দিন কাটিত!

৩২

আমার এ রুদ্ধ ঘরেরই অনতিদূরে সুখের গৃহগুলি তরুণতরুণীর সুখগুঞ্জন, ও শিশুর কলোচ্ছ্বাসের বিহ্বল রাগিণীর উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ—আশা-নিরাশার ও সুখ-দুঃখের ভার লইয়া অসংখ্য নরনারী পথে চলিয়াছে!

বালকের দল হাঁকিয়া সংবাদপত্র বিক্রয় করিতেছে! জীবনের কি বিরাট স্ফূর্ত্তি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে, আর আমি? —কিন্তু আর কেন সে চিন্তা!

পুরানো এক দিনের কথা মনে পড়ে। তখন আমি বালকমাত্র! নোতরদমের ঘণ্টা দেখিতে আসিয়াছিলাম। অন্ধকারে আঁকা-বাঁকা বিস্তর সোপান অতিক্রম করিতে আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল—উপরে উঠিয়া দেখি সারা পারি সহর যেন আমার চরণতলে বিচিত্র গালিচার মত বিছানো রহিয়াছে!

তারপর ঘণ্টা দেখিলাম! কি সে প্রকাণ্ড ঘণ্টা! কিন্তু আমি পারি সহর দেখিতে-ছিলাম—নোতরদমের গগনস্পর্শী ভবনশির হইতে নিম্নে পথের লোকগুলাকে পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল! এমন সময় সহসা আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া ভীমরোলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—বজ্রের মত ভীষণ সে নিনাদ! চূড়া কাঁপিয়া উঠিল! আমার পা কাঁপিয়া গেল আমি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম—স্তব্ধ নির্ব্বাক পাষাণের মত আমি বসিয়া-ছিলাম! ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গেলেও তার প্রতিধ্বনি অসংখ্য ভ্রমরগুঞ্জনের মত কাণে আসিয়া লাগিতেছিল!

আজো আমার তেমনই মনে হইতেছে! ঘণ্টাধ্বনি নাই, তবু যেন চারিধারের কোলাহল একটা অস্পষ্ট শব্দের ঝঙ্কারে শ্রুতিটাকে ভরাইয়া তুলিয়াছে—আমার ললাটের শিরগুলাও দপ দপ করিতেছে! ছায়ার মত অস্পষ্ট যেন আমি দেখিতেছি—আমারি চারিদিকে অসংখ্য নরনারী হর্ষকোলাহলে মাতিয়া চলাফেরা করিতেছে, তাদের উল্লাসের চীৎকার না ঐ শুনা যায়! আর আমি নিস্পন্দ জড়ের মত বসিয়া রহিয়াছি—কোথায় শান্তি—কোথায় আরাম!

৩৪

ভিলা হোটেলের সূক্ষ্ম চূড়ার গায়ে স্থাপিত বিচিত্র ঘড়িটা যে ঐ দেখা যায়! প্লে দী গ্রীভের পরুষ কঠিন প্রাচীরের দিকেই ঘড়িটা যেন চাহিয়া রহিয়াছে! কতকালের প্রাচীন জীর্ণ প্রাচীর—রং কালো, এমন কালো যে দীপ্ত সূর্য্য কিরণেও তার সে কৃষ্ণাভা দূর হয় না!

যেদিন কাহারো জীবন ফাঁসির রজ্জু ধরিয়া অজানা লোকের ভীমান্ধকারে ঝুলিয়া পড়ে সেদিন প্লে দী গ্রীভের সকল দ্বারগুলার সম্মুখে অসংখ্য প্রহরীর চক্ষু যেন কি এক কৌতূহলের দৃষ্টি লইয়া জাগিয়া উঠে; হতভাগ্য মরণপথের যাত্রী সে ব্যগ্র দৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য! লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সে আপনার জীবনের সকল কাহিনী শেষ করিয়া দেয়, আর সন্ধ্যার ম্লানিমার মধ্যে দীপ্ত চন্দ্রের মত হোটেলের ঐ জ্বলন্ত ঘড়ি ফুটিয়া উঠে!

৩৫

একটা বাজিয়া পনেরো মিনিট হইয়াছে!

আমার এখন অবস্থাটা! মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা! যেন কে মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে! যখনি বসি, কিম্বা উঠিয়া দাঁড়াই, মনে হয় মাথার মধ্যে কিসের একটা রুদ্ধ স্রোত যেন আমার মাথার খুলি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

কেমন একটা আতঙ্কে সারা অঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। অঙ্গুলি হইতে লেখনী খসিয়া

পড়িতেছে—হাতে যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ লাগিয়াছে!

দুই চোখের কোণ জলে ভরিয়া গিয়াছে, যেন আমি ধূমাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি! বাহুমূলে কি একটা বেদনা! কিন্তু আর পৌনে তিন ঘণ্টা মাত্র! তাহার পর আমার সকল যন্ত্রণা জুড়াইবে—আঃ, চিরদিনের জন্য বিরাম লাভ করিব! সে কি তীব্র অসহ্য সুখ!

৩৬

কেহ বলেন, যন্ত্রণা—সে-ত কিছুই নহে—বিজ্ঞানের এমনি অপূর্ব্ব কৌশল যে মৃত্যুর পথে যন্ত্রণা আমার মোটেই হইবে না! যন্ত্রণা কিছু নয়?

এই ছয় ঘণ্টা ধরিয়া আমি যে বেদনায় সারা হইয়া যাইতেছি—ইহাপেক্ষা মৃত্যুযন্ত্রণা কি এমনি ভীষণ? এই যে প্রতিমুহূর্ত্তটি এমন ধীরগতিতে চলিয়াছে—আমার মনে হইতেছে সে কি দ্রুত! বেদনার অসংখ্য সোপান বহিয়া মৃত্যুলোকে চলিয়াছি! কি অসহ্য এ যন্ত্রণা!

তবু, ইহা কিছুই নয়?

প্রতি শিরা হইতে যেন রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে! বুকের উপর কে যেন পাষাণ ভার চাপিয়া ধরিয়াছে—শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে!

কি এ যন্ত্রণা! বুঝিবে কে, বুঝাইবে বা কে? ফাঁসির পরমুহূর্ত্তে, দ্বিখণ্ডিত নরশির যদি একবার আসিয়া এ বেদনাটা বুঝাইতে পারিত তবে আর যাহাই বলুক বিজ্ঞানের কৌশলের তারিফ্ সে নিশ্চয়ই দিত না—কখনো না!

চক্ষের পলক পড়িবারো অবকাশ মিলিবে না। এখনি সব সমাধা হইবে! এই যে অসংখ্য কৌতূহলী দর্শক, এই যে অগণ্য রাজপুরুষের দল,—ইঁহারা এ যন্ত্রণার মাত্রা কি বুঝিবেন! ভীষণ রজ্জু এখনি একটি নিমেষে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিবে—সমস্ত শিরার মুখ সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে দেহের রক্ত স্তম্ভিত স্তব্ধ হইয়া যাইবে! সমুদ্রের গতি রুদ্ধ হইলে রোষে সে যেমন ফুলিয়া উঠে,—তেমনি বাধা পাইয়া সমস্ত ভিতরটা ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য যে বিরাট দ্বন্দ্ব বাধাইবে, হা রে হতভাগ্য, তাহারি নিষ্ঠুর ভীষণ চাপে সব শেষ! ভিতরে বাহিরে প্রবল সংঘর্ষ—সে কি ভয়ঙ্কর! ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সূর্য্য ও সৌরজগত।

সূর্য্যদেবকে আমাদের আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে এ পৃথিবীতে কিরূপ অভিনব ঘটনা সম্ভব, এই বিষয় লইয়া বিলাতের টাইমস্ (Times) পত্রিকায় একটি মনোহর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধকার লিখিতেছেন—

"একবার এক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে তাঁহার মতে গত শতাব্দীর কোন্ আবিষ্ক্রিয়াটিকে মানব-সমাজের পক্ষে যুগান্তরকারী বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি উত্তর করিলেন, "সাধারণ দোকানে যে একপ্রকার খেলেনা বিক্রয় হয়, যাহার মধ্যে দুইটি ছোট ছোট চাকা সূর্য্যরশ্মির প্রভাবে আপনি ঘুরিতে থাকে, সেইটিই তাঁহার মতে অতীত যুগের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্ক্রিয়া"

বস্তুতঃ কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক নুকোসেনড়ে

(Fessenden) বায়ুর বেগ ও সূর্য্যতাপের শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজিও যে আমরা ইহাদিগকে লইয়া খেলা করা ভিন্ন অন্য কিছু আবশ্যকীয় ব্যবহারে ইহাদিগকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি এরূপ কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাহা যে নিতান্তই কল্পনা মাত্র তাহাও নহে।

যদি কোনদিন আমরা সূর্য্যতাপের শক্তিকে আমাদের নিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদের আর্থিক অবস্থারও যে বিশেষ উন্নতি ঘটিবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেন্ একটু বিদ্রূপের সুরে বলিয়াছিলেন যে সূর্য্যতাপ প্রয়োগ করিবার পক্ষে ইংলণ্ড বেশ উপযুক্ত স্থান নহে। তবে সেই সঙ্গে সান্ত্বনা স্বরূপ ইহাও বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডের বায়ুর বেগ সাধারণত বেশ প্রবল। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মাত্রেই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম। উত্তরের এই তুষারাচ্ছন্ন দেশে সূর্য্যরশ্মি যেরূপ চঞ্চল অস্থায়ী, তাহাতে এদেশে সূর্য্য শক্তির অধিক ব্যবহার সম্ভব নহে সত্য।

এ বিষয়ে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বড়ই সুবিধা। এ সকল দেশে সূর্য্য হইতে উদ্ভূত শক্তিকে সঞ্চিত ও নিযুক্ত করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা। প্রথমে হয় ত মনে হইবে এরূপ আবিষ্ক্রিয়া যদি কোনও দিন সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে পরিণামে সভ্য জগতের সমস্ত প্রাধান্যই নষ্ট হইবে। যে সকল দেশে স্বাভাবিক সম্পদ অধিক, স্বাভাবিক উর্ব্বরতা অসাধারণ, পরিশ্রম করিবার জন্য অগণ্য লোক অল্পমূল্যে পাওয়া সম্ভব এবং সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে শক্তিলাভ করা যায়, সে সকল দেশের নিকট কালে উত্তরের সভ্য জাতিদিগের পরাজয় অনিবার্য্য। কিন্তু অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেনের স্বপ্ন সত্য হইলেও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও আর্থিক কেন্দ্রস্থল কি কোন কালেও উষ্ণ কটিমণ্ডলে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব?

আমাদের ত তাহা মনে হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা কোনও দিনই নির্দ্দিষ্ট হইবার নহে, মানবসমাজের চরিত্র ও গুণই উচ্চ নীচ স্থান স্থির করিবে। সূর্য্যশক্তি ব্যবহারের অপেক্ষা মানব শক্তি ও উৎসাহের সাধনাই ভবিষ্যতে পার্থিব উন্নতির প্রধান নিয়ন্তা হইবে।

দেশের জলবায়ুই মানবের গতিশক্তির প্রধান নিরূপক। আমরা চিরদিনই দেখিতেছি যে শীতপ্রধান দেশের জলবায়ুর সহিত যাহাদিগকে অবিরাম সংগ্রাম করিতে হয়, তাহারা স্বভাবতঃ এরূপ সবল, সতেজ ও কঠিন হয় যে মানবের ইতিহাসে তাহারাই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্র জলবায়ুর প্রবলতর ও সজীবতর শক্তিকে পরিবর্ত্তিত করিতে কোনদিনই পারে নাই। হিমপ্রধান দেশের দুর্জ্জয় প্রকৃতির সহিত যাহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, কোন নূতন আবিষ্ক্রিয়াই তাহাদের অন্তর্জাত শক্তিকে নষ্ট করা সম্ভব নহে। কঠোর প্রকৃতির মধ্যে লালিত হইলে যে শ্রেষ্ঠ অন্তর্শক্তি জাগিয়া উঠে, নগরের বিলাসবহুল জীবন তাহা আজিও নষ্ট করিতে পারে নাই এবং আরও দুই চারিশত বৎসরেও যে পারিবে এরূপ মনে হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন যে সভ্যতার অভিব্যক্তি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল। এ কথাটা সম্ভবতঃ সত্য, কিন্তু সভ্যতার আদি জন্মভূমি যে ঠিক কোথায় তাহা আজিও স্থির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া অনেক প্রোথিত নগর আবিষ্কার করিতেছেন সত্য, কিন্তু সভ্যতার প্রথম প্রভাত যে কোন্ দেশবিশেষে হইয়াছিল, আজিও তাঁহারা তাহা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা আমাদিগকে প্রাচীন নানা জাতির কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আজও সেই সকল জাতির উৎপত্তির এমন কোনও যুক্তি-সঙ্গত নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই যাহা দ্বারা আমরা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের আভাষ পাইতে পারি। যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় যে প্রাচীনতম সভ্যজাতিরা পার্শ্ববর্ত্তী বা উত্তর দিকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন, দক্ষিণে অগ্রসর হইতে বড় একটা দেখা যায়

না। ভারতবাসীর ন্যায় যাঁহারা দক্ষিণে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলবায়ুর প্রভাবে অবিলম্বেই কোমল প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সকল শ্রেষ্ঠ সভ্যতার দৃষ্টান্ত দেখা যায় তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই জন্ম হইতেই একটা আশু ও অকাল অধঃপতনের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতেরাই কেবল প্রবল শৌর্য্য বীর্য্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, কারণ বালুময় মরুর মধ্যে জীবনধারণ করিতে তাহাদের যে নিত্য সংগ্রামের আবশ্যক হইত, তাহা অনেকটা উত্তর দেশের কঠোর অবস্থার অনুরূপ। এই কারণেই আরবগণ প্রবলতেজে চতুর্দ্দিক মথিত করিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের উত্থানের অব্যবহিত পরেই উত্তর দেশের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। যে সকল বিজয়ী জাতির কীর্ত্তিকলাপ পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া আছে, তাহাদের অধিকাংশই জনহীন শস্যহীন কঠোর পার্ব্বত্য ভূমি হইতে উত্থিত, প্রকৃতির ভীষণ লীলার মধ্যেই তাহাদের চরিত্র গঠিত ও পুষ্ট; যে সকল অবস্থার মধ্যে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, কর্ম্মক্ষম হয় ও শ্রেষ্ঠত্বলাভ করে, ঠিক সেই সকল অবস্থার মধ্যেই তাহারা পালিত। আর অন্তহীন সূর্য্যকিরণ মনুষ্যকে অধঃপতনের পথেই অগ্রসর করিয়াছে। মানব সমাজ চিরদিন এই একই নিয়মে চলিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং অধ্যাপক ফেসেনডেনের শৌর শক্তিভাণ্ডার একটা সম্ভব ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইয়ুরোপবাসীর ভীত হইবার কোনই কারণ নাই।

এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে শীতপ্রধান দেশের জাতিগণ হইতে অসংখ্য ব্যক্তি নূতন জলবায়ুর দেশে যাইয়া বাস করিতেছে, কিন্তু আজিও তাহাদের যথার্থ কোনও অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। গত তিন শতাব্দীর মধ্যে ইয়ুরোপ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক নূতন নূতন মহাদেশে যাইয়া বাস করিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী প্রায় সকলেই প্রাচীন পৃথিবীর উত্তর দেশ সমূহ হইতে আগত। আমরা এখানে থাকিয়া অনেকেই মনে করি যে যাহারা সমুদ্রপারে দেশান্তরে গিয়াছে তাহাদের চরিত্রে আর কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। অনেক সময়ে আমাদের মনে হয় যেন তাহাদের চরিত্রে আমরা নূতন গুণের পরিচয় পাই, কিন্তু অন্তরে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যাহারা দেশান্তরে গিয়াছে, চরিত্রগত তাহারা আমাদের অনুরূপই আছে। মোটের উপর এ কথা আজিও সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু চিরদিন এরূপ থাকিবে না বলিয়াই বোধ হয়। মানবসমাজের অভিব্যক্তির পক্ষে তিনশত বৎসর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও হইতে পারে। আমাদের এ অভিব্যক্তি যে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। পৃথিবীর আদিকালের মানুষের ভঙ্গুর অস্থি এতদিনে লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু পর্ব্বত পাষাণে এখনও তাহাদের অস্তিত্বের ক্ষীণ স্মৃতি জাগিয়া আছে।

যে সকল জাতি আজ নব নব দেশে যাইয়া বাস করিতেছে, তাহাদের বাহ্যিক জাতিগত গর্ব্ব, স্বদেশপ্রেম বা রাজনৈতিক ভাবের অন্তরালে যে যথার্থ জাতীয় চরিত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা চিরদিন একই ভাবে থাকিবে কি না, তাহা আজ বলিতে যাওয়া দুরদৃষ্টির প্রতি কিছু অযথা অত্যাচার করা হইয়া পড়ে। এক থাকিবে বলিয়া ত মনে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এখন হইতে ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনের ভয় দেখাইলে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্টই আছে। এই যেমন অষ্ট্রেলিয়ায় যাইয়া সে ইংরাজ জাতির চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে এখন এ কথা বলাটা আমরা নিতান্ত অন্যায় বলিয়াই মনে করি। পাঁচশত বৎসর পরে অবশ্য সে কথার আলোচনা করা সঙ্গত হইবে। আসল কথা এই যে প্রেম দয়া আশা সাহস ইত্যাদি আমাদের যে প্রকৃতিগত প্রধান গুণ আছে তাহা কোন দেশে বা কোন কালেই নষ্ট হইবার নহে।"

অধ্যাপক ফেসেনডেনের প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রবন্ধকার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপকের প্রস্তাবটা যে কি তাহা এখনও ভাল করিয়া বলা হয় নাই। বায়ু ও সূর্য্য হইতে শক্তি গ্রহণ

করিয়া তাহাকে আমাদের কর্ম্মে নিযুক্ত করাই যে অধ্যাপকের আলোচ্য বিষয় তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সম্বন্ধে তিনি ইংলণ্ডের প্রধান বিজ্ঞান সমিতিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা হইতে মনে হয় যে এরূপ শক্তি সংগ্রহ করিয়া আমরা তাহা বাণিজ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারি। তবে প্রথমেই একটা মহা বাধা এই যে সূর্য্যতাপের পরিমাণ সকল স্থানে সমান নয়। অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেন্ বলেন যে ইহা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক বর্গ ফুটের উপর প্রায় ১৫০ পাউণ্ড ভারের তুল্য, কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার এ হিসাব বোধহয় আসলের অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত হইবে। অপর কোনও অধ্যাপকের মতে ইহা ৬৩-৪২ পাউণ্ড, আবার অপর একজনের মতে ইহা ৯১-৩৫।

অধ্যাপক ভেরি (Very) যে হিসাব করিয়াছেন তাহা হইতেও আমরা দেখিতে পাই যে সংগ্রহযোগ্য সূর্য্যশক্তি দেশকাল ও অবস্থা ভেদে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এরূপ শক্তি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে যে ব্যয় হইবে বলিয়া অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেন্ বলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এখন কোনও মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব, কারণ আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির বিষয় তিনি এখনও সাধারণের নিকট কিছুই প্রকাশ করেন নাই।

এই সকল শক্তিভাণ্ডারে সুবিধামত বায়ু চালিত কল থাকিবে, তাহার শক্তিও ইহার সহিত যুক্ত হইবে। অধ্যাপক বলেন, যে সকল স্থানে জলের শক্তি সংগ্রহ করিবার সুবিধা নাই, সেই সকল স্থানে সূর্য্য বা বায়ুর শক্তি অনায়াসেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। দিন দিন খনির পদার্থের যত অভাব ঘটিবে, তাহার পূরণার্থে এইরূপ কোনও একটা উপায় অবলম্বন করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। সূর্য্য ও বায়ু এতদিন আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা রাবণের যেরূপ আজ্ঞাপালন করিয়া চলিত একদিন যে আমাদেরও সেইরূপ আজ্ঞাবাহী হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

বিবিধ।

পৃথিবীর বয়স।

বহুকাল হইতেই দুই বৈজ্ঞানিক দলের মধ্যে পৃথিবীর বয়স লইয়া মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন পৃথিবীর জন্ম ৩০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানবিদগণের মতে ২ বা ৩ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রথম জন্ম হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক ক্লার্ক ও বেকার সাহেব সম্প্রতি গণনা করিয়া বলিয়াছেন,—বর্ত্তমান পৃথিবীর বয়স ৭ কোটি বৎসরের অধিক নহে এবং ৫ কোটি ৫০ লক্ষ বৎসরের কম নহে। আধুনিক কালের যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক একটা নূতন বয়স স্থির করিয়াছেন; কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। লর্ড কেলভিন (Lord kelvin) ১৮৬২ সালে গণনা করিয়া বলেন ২ কোটি হইতে ৪০ কোটির মধ্যে, সম্ভবতঃ ৯ কোটি ৮০ লক্ষ বৎসর। ১৮০৩ সালে কিং ও বেরাস (Clarence King and Carl Baras) বলেন ২ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর। ১৮৯৭ সালে পুনরায় গণনা করিয়া লর্ড কেলভিন বলেন ২ কোটি হইতে ৪ কোটির মধ্যে। ১৮৯০ সালে ল্যাপেরাণ্ট (De Lapperant) বলেন ৬ কোটি ৭০ লক্ষ হইতে ৯ কোটির মধ্যে। ১৮৯৩ সালে ওয়ালকট (Charles D. Walcott) বলেন ৭ কোটির অধিক হইবে না। ১৮৯৯ সালে জোলি (J. Joly) বলেন পৃথিবীর

সমুদ্রের বয়স ৮ কোটি হইতে ৯ কোটির মধ্যে। ১৯০৯ সালে সোলাস (W. J. Sollas) বলেন, সমুদ্রের বয়স ৮ কোটি হইতে ১৫ কোটির মধ্যে।

প্রাচীন মিশরের স্মৃতি।

সম্প্রতি এক অধ্যাপক মিশর দেশের ভূগর্ভ হইতে এক স্ত্রীলোকের প্রলেপ রক্ষিত মৃতদেহ 'মামি' বাহির করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্ত্রীলোকটি প্রায় নয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল। তাহার দেহটি আজও অটুট রহিয়াছে। কিন্তু সেই দেহের সহিত এমন সকল আশ্চর্য্য রত্নরাজি ও নিত্যব্যবহারোপযোগী সুবর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে, যে সেগুলি খৃষ্টীয় শতাব্দীর সাত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গঠিত বলিয়া কোন মতেই মনে হয় না। অলঙ্কারগুলি সমস্তই আধুনিক ফ্যাসানের সুন্দর ও মনোহর। তাহার মধ্যে আধুনিক কণ্ঠহার, কর্ণফুল হইতে ব্রোচ পর্য্যন্ত সবই আছে।

ইহা ছাড়া এই স্ত্রীলোকটি মাথার দুই পাশে দুই খানি চিরুনি পরিত, সেগুলিও প্রায় আমাদের চিরুনির অনুরূপ। কিন্তু তাহার ছোট ছোট রত্নখচিত সোনার বাক্সগুলিই সব চেয়ে আশ্চর্য্য। ইহার কোনটিতে অঞ্জন থাকিত, কোনটিতে গন্ধদ্রব্য বা অন্যান্য প্রলেপাদি থাকিত। সেগুলি ঠিক আজকালের বড় বড় দোকানের শিল্পবহুল মূল্যবান কৌটার মত। ইহা হইতেই মনে করা যায় যে বেশভূষার বিলাস হিসাবে আজকালের সুন্দরীগণের সহিত সেই অতীত যুগের মিশর-নারীদিগের বড় একটা প্রভেদ ছিল না। তবে আজকাল পাশ্চাত্যদেশে সাধারণ মহিলাগণ যে সকল রত্নখচিত অলঙ্কার ব্যবহার করেন তাহা প্রাচীন মিশরে দুই চারিটি রাজরাণীর ভাগ্যে জুটিত কিনা সন্দেহ। তাহার একটা কারণও আছে। সেকালে মিশরে আজকালের মত নানা প্রকারের রত্ন পাওয়া দুর্লভ ছিল। হীরা, মুক্তা, পান্নার অলঙ্কার প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না, কিন্তু বিচিত্র শিল্পচাতুর্য্যে তাহারা অতুলনীয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। আজিও কোন জাতি তাহার অনুরূপ অনুকরণ করিতে পারিল না। সেকালে রাজারা অলঙ্কারের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইতেন না। যে অলঙ্কারের শিল্পকলা যত মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে হইত, সেই অলঙ্কারকে তাঁহারা তত অধিক প্রশংসা করিতেন। সেকালে নীলকান্ত মণির সন্ধান তাঁহারা জানিতেন না, তৎপরিবর্ত্তে নীল কাচ ব্যবহার করিতেন। কাচ লইয়া তাহারা এরূপ সুন্দর অলঙ্কার প্রস্তুত করিত যে তাহাতেই রত্নের অভাব অনেক অংশে দূর হইত। তাহারা যেরূপ নানাবর্ণের কাচ লইয়া মালা ইত্যাদি করিত, আজ পর্য্যন্ত আর তাহার অনুকরণ সম্ভব হইল না। পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহারা কাচ হইতে এরূপ শুক্তি ও রত্নাদি প্রস্তুত করিত যে দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, হঠাৎ স্বাভাবিক বলিয়াই ভ্রম হয়।

গুপ্ত জাতির অনুসন্ধান।

বহুকাল হইতেই ইয়ুরোপের সভ্য জাতির মনে একটা ধারণা আছে যে উষ্ণপ্রধান দেশের গভীরতম প্রদেশে চতুর্দ্দিকের কৃষ্ণকায় অধিবাসীর মধ্যে গুপ্তভাবে এক শ্বেতকায় আর্য্য জাতি অজ্ঞাতবাস করিতেছে। এরূপ ধারণা যে কেবল কৌতূহলজনক তাহা নহে, কল্পনার একটা মধুর মোহও ইহার সঙ্গে মিশ্রিত আছে।

পুরাকালে যে সকল সাহসী পর্য্যটক মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতেন, তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া তথাকার দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালার পরপারে অভিনব প্রচ্ছন্ন জনপদের কাহিনী প্রচার করিতেন। দক্ষিণ-আফ্রিকাতে প্রচলিত এইরূপ একটি জনরব অবলম্বন করিয়াই রাইডার হ্যাগার্ড (Rider Haggard) তাঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর যে সকল দেশ সম্বন্ধে আমরা এখনও কোনও বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সেই সকল স্থান সম্বন্ধেই এইরূপ একটা জনরব আজিও প্রচলিত আছে। আর এই জনশ্রুতি অনেক বিষয়ে প্রায় একরূপ ও এক প্রকৃতির। প্রায় সকল স্থানেই এই রহস্যময় জাতি কোন এক পর্ব্বতমালার পরপারের নিভৃত আশ্রয়ে বাস করিতেছে বলিয়া শুনা যায়; চতুর্দ্দিকের অধিবাসীদের নিকট হইতে তাহারা সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র থাকে; সচরাচর তাহাদিগকে দেখাই যায় না। কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকে যে তাহারা নিকটস্থ কৃষ্ণকায় জাতিদিগের অপেক্ষা অধিক সভ্য ও শিক্ষিত।

এই সকল জাতি যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইল বা কোন দেশ হইতে আসিল তাহা কেহ বলিতে পারে না; দেশীয় জনশ্রুতিতে তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে আমরা মনে করিতাম যে, বহুদিনের বিস্মৃত শ্বেতকায় পর্য্যটকেরা হয়ত এই সকল ভীষণ স্থানে বহুযুগ হইতে অজ্ঞাতবাস করিতেছে। কিন্তু একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এই কাল্পনিক শ্বেতকায়জাতির অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। কিন্তু তত্রাচ এই ধারণাটা আমাদের মস্তিষ্কে এরূপ অটল আসন পাতিয়া বসিয়াছে যে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও লোকে এই ব্যাপারটাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে ঠিক প্রস্তুত নহে। প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে ফিলিপাইন দ্বীপে মুর-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধকর্ম্মে ব্যাপৃত একজন আমেরিকান সৈনিক মিনডানাও দ্বীপের অভ্যন্তরে এক শ্বেতকায় জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। এই দ্বীপের পর্ব্বত প্রদেশের মধ্যে সভ্যজগতের কেহ কখনও প্রবেশ করে নাই, এমন কি ইহার সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধেও আমরা অল্পই জানি।

কিন্তু এই দ্বীপভীয় অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ একটা বিশ্বাস প্রচলিত যে, অভ্যন্তর প্রদেশের অরণ্যানিবিড় গিরিমালার অন্তরালে এক প্রবল শ্বেতকায় জাতি-বাস করে। অনেকে বলে যে তাহারা এক শ্বেতাঙ্গী সুন্দরী বালিকাকে তাহাদের দেখিবা-মাত্র পর্ব্বতের দিকে পলাইয়া যাইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। যে সকল সাহসী কৃষ্ণকায় কৌতূহল বশতঃ পার্ব্বত্য-প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহারা নাকি শ্বেতকায় নরনারী দেখিতে পাইয়াছে। এই সকল সংবাদ শুনিয়া সেই আমেরিকান সৈনিক এতদূর উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন যে তিনি একটী দল বাঁধিয়া সেই দ্বীপের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু বোধ হয় সেই অজ্ঞাত শ্বেতজাতি তাঁহাদের যাত্রার সংবাদ পাইবামাত্র অদৃশ্য হইয়া থাকিবে, নচেৎ এতদিনে আমরা তাহাদের অস্তিত্বের পরিচয় পাইতাম।

আরব দেশে কিন্তু এরূপ একটা শ্বেতকায় জাতি থাকা অধিক সম্ভব। বহুবৎসর হইতেই পারস্য উপসাগরে এরূপ জাতির কাহিনী শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মস্কটের এক খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক লিখিয়াছিলেন—"এখানকার কফি-পানের দোকানে এক অজ্ঞাত শ্বেতকায় জাতি সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি শুনা যায়। তাহারা পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে, অপরিচিত হইতে দূরে থাকে, এবং অভিনব ভাষা ব্যবহার করে।

এই ধারণার উৎপত্তির মীমাংসা করিবার জন্য অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ১৮৭৫ সালে কর্ণেল মাইল্‌স্ (Colonel Miles) নামে এক ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর ভ্রমণ কাহিনী হইতেই এই অদ্ভুত বিশ্বাসের উৎপত্তি। তিনি ভ্রমণ কালে শেরাজি নামে একটি নগরে যাইয়া উপস্থিত হন। নগরটি একেবারে পর্ব্বতমালার মধ্য স্থলে একটি অত্যুচ্চ বন্ধুর গিরিচূড়ার উপর পক্ষী-নীড়ের ন্যায় অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীদের বর্ণ দেশের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা অধিক গৌর। তাহারা সচরাচর সমতল ভূমিতে নামেই না, এবং সাধারণ আরবদিগের সহিত বিবাহাদি কোন সম্বন্ধই রাখে না।

কর্ণেল মাইলস্ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে দশম শতাব্দীতে যে পারসিক সেনা ওমান আক্রমণ

করিয়াছিল ইহারা তাহাদেরই কতকগুলির বংশধর। ইহাদের বাসস্থানের দূরত্ব এবং আচার ব্যবহারের বিশেষত্ব হইতেই তীরবর্ত্তী স্থানের হাটে বাজারে নানারূপ অতি রঞ্জিত কাহিনীর প্রচার হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না।

এখনকার পৃথিবী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিতে হইবে। প্যারাগুয়ে হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত দেশ আবিষ্কারকের কর্ম্মও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিষিদ্ধ নগরের মধ্যে কতলোক প্রবেশ করিয়াছে! গুপ্ত নগর এখন কেবল উপন্যাস লেখকের কল্পনা রাজ্যেই অধিষ্ঠান করিতেছে। এ কালে আর প্রচ্ছন্ন শ্বেতকায় জাতির অজ্ঞাতবাসের স্থান নাই।

আফ্রিকার মধ্যস্থল দিয়া এখন রেলের এঞ্জিন ছুটিতেছে। আফ্রিকার মধ্যস্থলে এক অভিনব গৌরজাতি বাস করে বলিলে এখন আর কেহ সহজে বিশ্বাস করিবে না। হ্যাগার্ড সাহেব তাঁহার উপন্যাসে যে জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা সম্ভবতঃ বাহিমা জাতি। অনেকে বলেন যে এই জাতি দেখিয়াই আফ্রিকাতে শ্বেতকায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি উঠিয়াছে। তাহাদের বর্ণ বেশ গৌর এবং তাহারা দেশের সাধারণ লোকের সহিত মেশে না। সত্যের সম্মুখে কল্পনা নিতান্তই সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

রেডিয়াম রহস্য।

রেডিয়াম এতদিনে ধাতুর আকারে পরিণত হইল। বর্ত্তমান যুগে যতগুলি অভিনব আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে ইহা তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ম্যাডাম কুরিই যে সর্ব্ব প্রথমে এই নূতন ধাতু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা আরও আনন্দের বিষয়। তিনি ও তাঁহার স্বর্গগত স্বামী উভয়েই এই ধাতুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলেন, এবং এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব ধাতু আবিষ্কার করিবার জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে তাঁহারা উভয়েই পিচব্লেণ্ড (Pitchblend) নামে পদার্থের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এই পদার্থ লক্ষ লক্ষ মণ প্রস্তরের মধ্যে বালুকণার ন্যায় সামান্য অংশে পাওয়া যায় মাত্র। অসাধারণ অধ্যবসায় ও কৌশলের ফলে ইঁহারা বহুবৎসরের সাধনায় সামান্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এতদিনে সেই সাধনার সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইল। কিন্তু পতিহীনা ম্যাডাম কুরি এখন একাকিনীই উভয়ের চেষ্টার সার্থকতায় আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

বহুকালের বিপরীত ধারণা সত্ত্বেও বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিক জগতে এমন সকল সত্য প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে, তাহা দ্বারা অনেকেরই মনে ক্রমে একটা বিশ্বাস জন্মিতেছিল যে, বায়ুর অপেক্ষা লঘু ও জটিল কোন অমিশ্র পদার্থ থাকা সম্ভব এবং হয়ত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ হইতে বায়ুস্থিত অম্লজান পর্য্যন্ত সেই একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন। এক ধাতু হইতে যে অপর এক ধাতু উৎপন্ন করা সম্ভব তাহা রসায়ন নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া এতদিন বিজ্ঞানবিদেরা হাসিয়া উড়াইতেন, কিন্তু এখন আবার তাহা সম্ভব বলিয়া অনেকের মনে বিশ্বাস জন্মিতে আরম্ভ হইল। প্রথমে যখন আবিষ্কৃত হইল যে কয়েকটি ধাতু এমন রশ্মি বিকীর্ণ করে যে তাহারা সাধারণ একটি শুষ্ক ফটোগ্রাফের প্লেটে নিজেদের চিহ্ন রাখিয়া দেয়, তখন হইতেই এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। যে কেহ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। একখানি শুষ্ক প্লেটের উপর অনেক ভাঁজ কাগজ জড়াইয়া তাহার উপরে একখণ্ড সাধারণ দস্তা রাখিয়া দিন। দুই এক মাসের মধ্যেই প্লেটের উপরে সেই দস্তা খণ্ডের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া সম্ভব; সকল ক্ষেত্রেই যে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা নহে। দস্তাটি যদি প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় হয়, তাহা হইলে প্লেটে

আর কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। ইয়ুরেনিয়াম (uranium) যে শুষ্ক প্লেটকে নষ্ট করে এ অপবাদ তাহার বহুকাল হইতেই ছিল। ইয়ুরেনিয়াম সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভার ধাতুগুলির মধ্যে একটি।

ম্যাডাম কুরির এই যুগান্তরকারী আবিষ্ক্রিয়ার পর ইহা বলা সহজ যে সেই গুরুভার ধাতু ইয়ুরেনিয়াম নিশ্চয়ই নিজেকে কোন সরলতর পদার্থে চূর্ণ করিয়া, তাহার লঘু অণুগুলিকে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ফেলে, এবং এই উপায়ে যাহাতে পেষিত হইয়া ইহা বর্ত্তমান ঘনত্বে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ পরিত্যাগ করে। কিন্তু রাসায়নিক তুলা-দণ্ডে যতদূর জানিতে পারা যায় তাহ তে মনে হয় যে এই ভাবে নিজেকে চূর্ণ করিয়া কাগজ ভেদ করিয়া ইয়ুরেনিয়াম যে ফটোগ্রাফের প্লেটকে নষ্ট করে, তাহাতে ইহার ভার বা শক্তি কিছুই কমে না। সুতরাং খনিজ ধাতুর মধ্যে যে এমন কোন বৈজ্ঞানিক জগতের বস্তু বা ধাতু লুক্কায়িত ছিল যাহা বহুদিনের যত্নশ্রমে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না ইহাও দেখা গিয়াছিল যে ইয়ুরেনিয়াম মিশ্রিত পদার্থই সকল পদার্থ অপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন। সেই জন্যই যে খনিজ পদার্থ হইতে ইয়ুরেনিয়ম প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যেই কুরী দম্পতি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সেই খনিজ পদার্থ পিচব্লেণ্ড।

প্লেটের উপরে কালিমা চিহ্ন পড়া ভিন্ন অন্য কারণেও পিচব্লেণ্ডের উপরই ইঁহাদের প্রথম দৃষ্টি পড়ে। তাড়িৎ পূর্ণ একটি তাড়িৎ পরিচালক দণ্ড এই খনিজ পদার্থের সম্মুখে ধরিলে তাহা একেবারে তাড়িৎ শূন্য হইয়া যায়। ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে এতৎ সংঘর্ষে তাড়িৎ পরিচালক দণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু কোন না কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া নিজের স্বাভাবিক অপরিচালকত্ব ত্যাগ বলিয়া পরিচালকত্ব লাভ করে। এই দুই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই কুরি দম্পতি তাঁহাদের কঠোর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। রেডিয়ামের অন্বেষণ যে সময়ে আরম্ভ হয় ঠিক সেই সময়েই ক্যাথোড (cathode) তাড়িৎরশ্মি, এক্স তাড়িৎরশ্মি (Xrays) এবং অন্যান্য বহু প্রকারের অদৃশ অংশু-বিকিরণ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। সম্ভবতঃই বিজ্ঞ নবিদগণের মনে হইল যে সেই অজ্ঞাত ধাতুর অন্তর্নিহিত পদার্থ হইতেই এই তাড়িৎরশ্মি বিকীর্ণ হয়।

কুরি দম্পতি তাঁহাদের পরীক্ষার প্রথমেই দেখিলেন যে কারখানায় যে সকল অব্যবহার্য্য বস্তু ফেলিয়া দেওয়া হয় সেগুলি তাঁহারা যে ইয়ুরেনিয়াম প্রস্তুত করিতেছিলেন তাহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও অংশুবিকিরণকারী (radio active)। সুতরাং ম্যাডাম কুরি সেই সকল অব্যবহার্য্য বস্তু লইয়াই তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন।

এস্থলে একটা কথা বলিবার বিষয়। আজও পর্য্যন্ত যত রেডিয়াম প্রসবকারী পিচব্লেণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অষ্ট্রিয়া দেশে পাওয়া গিয়াছে। ইয়ুরেনিয়ামের চতুর্দ্দিকে যে আবর্জ্জনাস্তূপ পড়িয়া আছে, তাহাই এ পৃথিবীর রেডিয়াম উৎপাদনের প্রধান উপাদান। অষ্ট্রিয়ার গবর্মেণ্ট এ সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। ম্যাডামকুরির রেডিয়াম আবিষ্ক্রিয়ার কথা যেমন প্রচারিত হইল অমনি অষ্ট্রিয়া হইতে পিচব্লেণ্ড বা ইয়ুরেনিয়াম কারখানার আবর্জ্জনার রপ্তানি একেবারে বন্ধ হইল। কাজেই রেডিয়ামের উৎপাদন শক্তি অষ্ট্রিয়া একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন বলিলেও হয়। তাহার পরে রেডিয়ামের উপযুক্ত খনিজ পদার্থ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এবং ইংলণ্ডের তিন চারিটি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও আজিও অষ্ট্রিয়াই এ বিষয়ে অগ্রগণ্য।

এই রেডিয়ামের অনুসন্ধান করিতে ম্যাডাম কুরির যে কিরূপ একান্ত অধ্যবসায়ের আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা পাঠককে বুঝান অসম্ভব। সহস্র সহস্র মণ প্রস্তরখণ্ড হইতে এক এক চামচ পরিমাণ প্রস্তর লইয়া, ধীরে ধীরে সেগুলিকে তাহাদের অন্তর্নিহিত উপাদানে বিশ্লেষিত করিতে হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে যে গুলির অংশুবিকিরণ শক্তি দেখা গিয়াছে সেগুলিকে একত্রিত করিতে হইয়াছে। প্রথমে যখন এই অসামান্য নারী প্রায় দুই শত মণ প্রস্তর হইতে এমন কয়েক বিন্দু নূতন পদার্থ বাহির করেন যাহা অন্ধকার

খদ্যোতের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, তখনই ইঁহার কঠোর সাধনার প্রথম পুরস্কার লাভ হয়। এই বিন্দুগুলি অশুদ্ধ রেডিয়াম ব্রোমাইড্। সত্যই যে রেডিয়াম বিন্দুগুলি জ্বলিতেছিল তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের বিকীর্ণ আলোক রশ্মিতে ব্রোরামের (brorum) অংশগুলিকে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। এই রেডিয়াম ব্রোমাইড অধ্যাপক কুরি লণ্ডন নগরের রয়েল ইনষ্টিটিউটে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদগণকে দেখাইবার জন্য আনিয়াছিলেন। এই বহুমূল্য দ্রব্যের মোড়কটি তিনি তাঁহার ওয়েষ্ট কোটের পকেটে করিয়া ইংলণ্ডে আনেন এবং সেই ভাবেই পুনরায় প্যারিস নগরে লইয়া যান। কয়েক দিন পরে তিনি ঠিক সেই পকেটের নীচে গায়ে একটি দাগ দেখিতে পাইলেন। এই দাগটি ক্রমে সাংঘাতিক ঘায়ে দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এই ঘটনা হইতেই পৃথিবী জানিল যে রেডিয়াম অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকিলে এমন তেজ বিকীর্ণ করে যে অসাবধান হইলে তাহা আমাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতে পারে।

এই নূতন সরল পদার্থ রেডিয়ামের ব্যবহারের কথা অনেকে অনেক রকম বলিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃই তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করে। ধীরে ধীরে ইহা যখন অন্য কোন পদার্থে পরিবর্তিত হয়, তখন ইহা প্রভূত পরিমাণে শক্তি ত্যাগ করিতে থাকে। সেই জন্য অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে ইহা আমাদের এঞ্জিন চালাইবে ও অন্যান্য নানাবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য করিবে। পরে যখন অধিক পরিমাণে রেডিয়াম প্রস্তুত হইতে লাগিল তখন চিকিৎসকেরা এই পদার্থের সাহায্যে নানা প্রকার দুরারোগ্য চর্ম্মরোগের চিকিৎসা করিলেন এবং ক্যান্সার রোগীর যন্ত্রণা উপশমের জন্য ইহা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ম্যাডাম কুরি ইহাকে ধাতুতে পরিণত করিয়া রেডিয়াম সম্বন্ধে চরম সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাড়িতের সাহায্যে তিনি ব্রোমাইডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক প্রকার উজ্জ্বল ধাতু বাহির করিয়াছেন। প্রকৃতির রহস্যময় বিধানে ইহা প্রবল বেগে একত্রিত এবং ক্রমশঃ চূর্ণ হইয়া সরলতর পদার্থে পরিণত হইতেছে এবং বাহিরের বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া ধীরে ধীরে অবিরামগতিতে এরূপ উত্তাপ বিকিরণ করিতেছে, যে ইহার সংস্পর্শে এক টুকরা কাগজ আনিলে তাহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে।

সৃষ্টির কোন্ আদি অবস্থায় প্রকৃতির প্রবল শক্তির পেষণে এই রেডিয়াম প্রস্তুত হইয়াছিল, আর আজ আমরা এতদিন পরে তাহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনিতে পাইলাম। প্রকৃতির রহস্য যেমন নিগূঢ়, মনুষ্য বুদ্ধির চেষ্টাও তেমনি অজেয়।

শ্রীভঃ

পর্ত্তুগালে সাধারণ তন্ত্র।

পর্ত্তুগালের রাজনৈতিক আকাশে অনেকদিন হইতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। শাসন বিশৃঙ্খলায়, পুরোহিত ও ধনী সম্প্রদায়ের অত্যাচারে পর্ত্তুগালবাসী অনেকদিন হইতেই পীড়িত হইতেছিল। বর্ত্তমান রাজার পিতাকে কয়েকজন উন্মত্ত প্রজা :পথের মধ্যে যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে বোমা মারিয়া হত্যা করে—তাহা আমরা আজিও ভুলি নাই। রাজা মানুয়েল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি প্রজারঞ্জনে প্রতিশ্রুত হইয়া অনেককে আশ্বাস দান করেন। কিন্তু শেষে যখন প্রজারা দেখিল দেশের অবস্থা 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং,' তখন সেনাবিভাগের ও নৌ-বিভাগের কতিপয় অধিনায়ক মিলিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন

এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য যে, ব্যক্তিগত ন্যায়নীতির বশবর্ত্তী হইয়া আধুনিক ভাবে প্রতিশোধ বা লাভের চেষ্টা তাহা নহে। স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি করাই



রাজা ম্যানুয়েল ও রাজমাতার ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিবার পরে গৃহীত ফটোগ্রাফ।

বিদ্রোহীদের প্রধান লক্ষ্য। যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয় আডমিরেল রীস (Reis) সাহেবই এই বিদ্রোহের প্রধান সহায় ও অধিনায়ক। পূর্ব্ব হইতেই তিনি রাজপক্ষের সহিত সংগ্রামের সমস্ত হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনিই বিদ্রোহীদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন স্থির ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মসম্মান বোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে ভ্রান্ত

অভিমানে এরূপ অসঙ্গত কর্ম্ম করিয়া বসিতেন যে অপরের পক্ষে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। রীস সাহেব স্থির করিয়াছিলেন যে অক্টোবরের প্রথম মঙ্গলবারের রাত্রি ১টার সময়ে বিদ্রোহ আরম্ভ হইবে। স্থির ছিল যে



অ্যাডমিরেল রিস্।

তিনি ১টার কিছু পূর্ব্বে এক নৌকায় করিয়া কতিপয় সহচর সঙ্গে লইয়া বন্দরের 'সান্ রাফেল' নামে রণতরির উপর যাইবেন। পরে তথা হইতে এক দল বিদ্রোহী সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করিবেন। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের ব্যর্থ করিবার নানাবিধ আয়োজন করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যদি কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া অঙ্কুরেই ইহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের এত শীঘ্র এরূপ শোচনীয় পরাজয় হইত না। যাহা হউক বিদ্রোহের নির্দ্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে নৌ-সচিব রণতরি-সমূহে টেলিগ্রাফ দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে আক্রমণকারী শত্রুকে পরাজিত করিতে তাঁহারা প্রস্তুত কি না। এই অনুসন্ধান দেখিবামাত্র ষড়যন্ত্রীরা ভীত হইয়া পড়িল। তাহাদের ভয় হইল, বোধ হয় সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে এবং বিদ্রোহের সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হইয়াছে। আডমিরেল রীস কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। বার বার তিনি তাঁহার সহচরদিগকে নৌকাযোগে রণতরীতে যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে গবর্মেণ্ট সাবধান হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহ ঘোষণা করাই তখন তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহার সহচরেরা দেখিলেন যে এরূপ স্থলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হওয়ার ত সম্ভাবনা নাইই, বিপদের সম্ভাবনা ও আশঙ্কাই প্রবল। এই ভাবিয়া শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহারা তাঁহাদের এই কঠোর ব্রতসাধনে পশ্চাৎপদ হইলেন। আর বিলম্ব নাই। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত! নৌকা অপেক্ষা করিতেছে, রণতরিতে দলবল আত্মদানের জন্য উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! এমন সময়ে রাজধানী লিসবনের ষড়যন্ত্রীরা তাহাদের অধিনায়ককে উপেক্ষা করিল, ত্যাগ করিল! এই প্রকারে বিদ্রোহের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এ অবস্থায় পরিণামে ব্যর্থতাই অবশ্যম্ভাবী! আডমিরেল রীস্ সমস্ত বিষয়ে স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার আত্মসম্মানবোধ অতি প্রবল ছিল। তাঁহার মনে

ধারণা হইল যে তিনিই তাঁহার স্বদেশকে ও বন্ধুবর্গকে বিপদসাগরে ডুবাইলেন, সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর পরাহত করিলেন। এই সকল অমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি উন্মাদের ন্যায় হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কে যে কি করিবে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না, অনেকেই মনে করিল বিদ্রোহের সকল আশা বার্থ হইল!

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে অন্যান্য অধিনায়ক আসিয়া উপস্থিত হইল। মেকাডো সান্টেস (Machado Santes) নামে এক নৌ-কর্ম্মচারী এই সময়ে অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নেতৃত্বশক্তির পরিচয় দিলেন। তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় আডমিরেল রীসের অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্রবেগে তিনি সৈনিকগণকে, সাধারণ প্রজা ও ছাত্রবৃন্দকে একত্রিত করিয়া বিদ্রোহীদলের সৈন্যরচনা করিলেন। রাজধানীর পথে পথে আত্মরক্ষার জন্য প্রাচীর গঠিত করিলেন। এই প্রতিভাবান পুরুষের প্রবল চেষ্টায় রীসের মৃত্যুর প্রায় ৪৫ মিনিট পরে বিদ্রোহীর কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। সংগ্রামসচিব তখন কোমল শয্যায় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন। প্রধানসচিব তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া রাজপ্রাসাদে বসিয়া আছেন। রাজধানীর পথে পথে বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিল। রাজপক্ষীয়েরাও সশস্ত্রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। বিদ্রোহীদের অসমসাহস ও আত্মোৎসর্গের সম্মুখে তাঁহারা পদে পদে পরাজিত হইতে লাগিলেন। রাজা মানুয়েল সেই রাত্রেই রাজপরিবার লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া জিব্রালটারে পলাইলেন। দুই দিনের মধ্যেই একপ্রকার বিনা রক্তপাতে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার।

যুদ্ধের পরে সাধারণ-তন্ত্রীরা রাজপক্ষীয় সেনাপতি কনসিরোকে (conciro) ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন রাজা যখন সিংহাসনত্যাগ করিয়াছেন তখন তাঁহার রাজপক্ষ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তিনি ঘৃণাভরে তাহাদের সে অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন। রাজা যে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন এ কথা তাঁহার কোনমতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি যে বিদ্রোহদমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন এই কথা স্বয়ং রাজাকে জানাইতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদে গেলেন। কিন্তু রাজা কোথায়! ক্ষোভে অন্ধ হইয়া বিদ্রোহীদের নেতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন—"এখন আমি তোমাদের শাসন স্বীকার করিলাম এবং তোমাদের প্রজা হইতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু আমি তোমাদের পক্ষ লইয়া অস্ত্রধারণ করিতে অক্ষম। আমি আমার সেনাপতিত্ব আজ হইতে ত্যাগ করিলাম।" এই সেনাপতির অস্ত্রত্যাগেই বিদ্রোহীদল পরিণামে জয়ী হইল।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে অল্পবয়স্ক রাজা মানুয়েল যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহা হইতেও অধিক অকস্মাৎভাবে রাজ্যচ্যুত, সিংহাসনচ্যুত হইলেন। কালের খেলা এমনি দুর্ব্বোধ্য! এক রাত্রির মধ্যে রাজা ভিখারী!

এই প্রসঙ্গে ভারতের সহিত পর্ত্তুগালের সম্বন্ধ বিবরণ কিছু বলিলে বোধ হয় পাঠকের অপ্রীতিকর হইবে না।

আজ পর্ত্তুগাল ইয়ুরোপে এক প্রকার নগণ্য বলিলেও হয়। কিন্তু একদিন এই পর্ত্তুগালই বাণিজ্যব্যাপারে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে ইয়ুরোপের অগ্রগণ্য ছিল। পর্ত্তুগাল নাবিকগণ প্রাচ্য জগতের যে কত দেশ ও দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জলপথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ সর্ব্ব প্রথম পর্ত্তুগালই বাহির করে। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ নাবিক ভাস্কো ডি গামা যেদিন আফ্রিকার গুডহোপ অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া কালিকাটে (calicut) পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতেই পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তরের সূচনা হইল। তাহার পূর্ব্বে ভারত ও প্রাচ্য দেশের সহিত সমুদয় বাণিজ্যই আরবদিগের হস্তগত ছিল। এই বহুমূল্য বাণিজ্য হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকাও সভ্যজগতের সহিত সংযুক্ত হয়। সে সময়ে পর্ত্তুগালের রাজার নাম ছিল এমানুয়েল (Emmanuel)। তাঁহাকে সকলেই সৌভাগ্যবান বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তাঁহার প্রজাগণের এই সকল আবিষ্ক্রিয়ার সফলতা যে রাজসাহায্যে বা উৎসাহে সম্পন্ন হইয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার করিবার পর ভাস্কো ডি গামা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে পুনরায়—ভারতে আগমন করিয়া তিনি মালাবার তীরে একছত্র বাণিজ্যসত্ব লাভ করেন। ফ্রান্সিস্ (Francis at Almedia) ভারতে প্রথম পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি। ফ্রান্সিস ভাস্কোর বিজিত রাজ্যে অনেকগুলি কারখানা স্থাপিত করেন এবং সিংহল ও মালডিভ্ দ্বীপপুঞ্জ পর্ত্তুগালের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু ভারতে পর্ত্তুগীজ শাসন কর্ত্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরুষ ছিলেন আবুকার্ক (Albuquerqu) ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গোয়া নগর অধিকারই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তাঁহার এই যুদ্ধজয়ের ফলে পর্ত্তুগালই পারস্য উপকূল হইতে জাপান পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচ্য জগতের বাণিজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা রহিল, এবং প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া পর্ত্তুগালের রাজাই আসিয়ার দক্ষিণ ভাগের সর্ব্বময় অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। আবুকার্কই সর্ব্বপ্রথম সুয়েজ পর্য্যন্ত রণপোত লইয়া অগ্রসর হন। এই বাণিজ্য পথটি তাঁহাদের জাতীয় সম্পত্তি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেকালে পারস্য উপসাগরে আর্ম্মাজ নগর একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। আবু অনেক কষ্টে তাহা অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি ও শক্তি দেখিয়া রাজদরবারে তাঁহার অনেকগুলি শত্রু জুটিয়াছিল। অরমাজ অধিকার করিয়া ফিরিতেছেন, এরূপ সময়ে গোয়া বন্দরের মুখে একখানি জাহাজ তাঁহাকে তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির আদেশপত্র দান করিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার একজন চিরশত্রু তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। এ অপমান তাঁহার সহ্য হইল না, তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইল না, পথেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার রাজাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার

শত্রুদিগের রটনা যে মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিয়া যান এবং তাঁহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য পুরস্কারাদি তাঁহার পুত্রকে দিতে অনুরোধ করেন। পত্র পাইয়া রাজার জ্ঞান হইল, কিন্তু তখন আর আবুকে ফিরিয়া পাইবার কোনও উপায় নাই। অগত্যা তাঁহার পুত্রকেই তিনি সম্মান ও সম্পদে ভূষিত করিলেন। আবুর প্রকৃতি উদ্ধত ও যথেচ্ছাচারী ছিল সত্য, কিন্তু তিনি এরূপ বীর এবং সুদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পরে, হিন্দু মুসলমান তাঁহার সমাধি স্তম্ভের নিকটে গিয়া পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিত।

যেদিন হইতে পর্ত্তুগাল স্পেন রাজ্যের অধীন হইল এবং স্পেনের সহিত অন্যান্য ইয়ুরোপীয় গণ যোগদান করিল সেই দিন হইতেই ভারতে তাহার শক্তির অধঃপতন আরম্ভ হইল। পর্ত্তুগালের শক্তি হ্রাসের আরম্ভেই ডাচেরা প্রাচ্যদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য একটি কোম্পানি গঠিত করিল। ১৬০২ হইতে ১৬১০ সালের মধ্যে তাহারা পর্ত্তুগালের প্রাচ্য রাজ্যসমূহ প্রায় সবই অধিকার করিয়া লইল। ভারতে দুই চারটি ক্ষুদ্র স্থান ভিন্ন পর্ত্তুগালের আর কিছুই রহিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল ও যবদ্বীপ সমস্তই ডাচেরা অধিকার করিল। পর্ত্তুগাল প্রথমে পথ দেখাইল বটে, কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য জাতিরা আসিয়া একে একে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। ১৬০০ সালে ইংরাজ, ১৬০৪ সালে ফরাসী ও ১৬১২ সালে দীনেমারেরা আসিল। আজিও গোয়া ও যে দু' চারিটি ক্ষুদ্র স্থানে পর্ত্তুগাল উপনিবেশ আছে সে সকল স্থানেও সাধারণ তন্ত্রের অধীনে এখন স্বায়ত্ত শাসন স্থাপিত হইতে চলিল।

পৃথিবীর ইতিহাস।

বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় "পৃথিবীর ইতিহাস" সঙ্কলনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা এগ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলাম। এক্ষণে "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড-ভারতবর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রাচীন ভারতবর্ষ আখ্যায়, বেদ চতুষ্টয়, ষড়বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, প্রভৃতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই কাগজ প্রভৃতি দিব্য পরিপাটি। গ্রন্থকার সূচনায় বলিয়াছেন, "এই পৃথিবীর ইতিহাস এক বিরাট কল্পনা। অন্যূন ত্রিংশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। * * পৃথিবীর সকলদেশের সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় এই পৃথিবীর ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট করিব।" বর্ত্তমান খণ্ড এই সুবিরাট গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র।

একের চেষ্টায় এ ব্রত-উদ্‌যাপন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। বিষয়টি যেমন গুরুতর এবং বিশাল, তাহাতে বিশেষজ্ঞগণের সম্মিলিত চেষ্টা এতৎপ্রতি প্রযুক্ত হইলে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যে

"পৃথিবীর ইতিহাস" এক অভিনব সম্পদ স্বরূপ হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। সম্ভবতঃ, দুর্গাদাস বাবু এরূপ আয়োজনে ক্রটি করেন নাই।

আলোচ্য খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা, পাঠানুরাগ, ও সুগভীর জ্ঞানের প্রভূত পরিচয় পাইয়াছি। অদ্ভুত তাঁহার তত্ত্বসংগ্রহশক্তি, অপূর্ব্ব তাঁহার সরল বিবৃতিভঙ্গী। এক-একটি বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা করিয়া তবে অপর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এইগ্রন্থ পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণকে নূতন পথ দেখাইবে, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। বিষয়ের প্রভূত্ব ও অসীমতার কথা



শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী।

ভাবিয়া দেখিলে, গ্রন্থকারের সহিত স্থানে স্থানে মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে, বরং তাহা একান্ত স্বাভাবিক। তবে গ্রন্থকারের যুক্তি পরম্পরাও নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে। এই টুকুই ইহার বিশেষত্ব! গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আরো মুগ্ধ হইয়াছি আমরা গ্রন্থকারের বিনয় সন্দর্শনে! গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমি যদি কোন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হই, পাঠকমাত্রকেই যে তাহা মানিয়া লইতে হইবে, সেরূপ স্পর্দ্ধা সেরূপ উদ্দেশ্য আমার

আদৌ নাই।" তিনি শুধু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ মত পরম্পরার পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ কোন্ বিষয় কিভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহারি আভাষমাত্র দিয়াছেন; প্রাচীন বিষয়ের আলোচনায় প্রধানতঃ শাস্ত্র মতেরই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন।

আরো দুই চারি খণ্ড না দেখিলে গ্রন্থের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট কিছু ধারণা করিতে পারিতেছি না, তথাপি এইটুকু বলিতে পারি "পৃথিবীর ইতিহাস" বাঙ্গালা লাইব্রেরীটিকে অপূর্ব্ব শোভায় ভূষিত করিবে! যে বয়সে সকলে বিশ্রামের জন্য লালায়িত হয়েন, দুর্গাদাস বাবু সেই বয়সে এই মহাব্রত সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহার এ অধ্যবসায় ও জ্ঞানচর্চ্চা সকলের পক্ষে অনুকরণীয়! তাঁহার সাধু সঙ্কল্প সফল হউক, বঙ্গভাষা ধন্য হইবে! গ্রন্থের দুই একটি ছোটখাট ত্রুটি আমাদিগের চোখে পড়িয়াছে তৎপ্রতি গ্রন্থকারের মনোযোগ আমরা সবিনয়ে আকর্ষণ করিতেছি। মাঝে মাঝে একদেশদর্শিতা এবং ব্যক্তিগত উচ্ছাসের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিককে রীতিমত উদার ও সমদর্শী হইতে হইবে, ব্যক্তি বা জাতিধর্ম্মগত পক্ষপাতিত্বে ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় একথা প্রবীণ গ্রন্থকার মহাশয়কে নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। তবে স্বজাতি বা স্বদেশের গৌরব স্মরণে ভাবের রশ্মি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। তাই বিশেষ করিয়াই কথাটির উল্লেখ করিলাম। পরিশেষে সাহিত্যানুরাগী, বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীগণের আদর্শস্থানীয় দানশীল, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় এই খণ্ডের ব্যয়ভার সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য সাধারণের তরফ হইতে তাঁহাকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অনারেবল মিষ্টার সায়েদ আলি ইমাম।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভারতের ব্যবস্থাসচিবের পদ ত্যাগ করায় লর্ড মিন্টো ও লর্ড মর্লি মাননীয় আলি ইমামকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহার এই নিয়োগে আমরা আন্তরিক সুখী হইয়াছি। মুসলমান সমাজ ভারতে হিন্দু সমাজের পরেই, সুতরাং এবার মুসলমান সমাজ হইতে এই পদের জন্য লোক নির্ব্বাচিত হওয়াতে মুসলমানদের স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকার করাই হইয়াছে। তা ছাড়া মিষ্টার আলি ইমাম মুসলমান সমাজের মধ্যে একজন শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহার পরিবারের সকলেই বংশানুক্রমে মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা ও পদে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার ভ্রাতা আমাদের জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান সভ্য ও সহায়। তাঁহার শিক্ষা ও উদারতার বিষয় আমরা সকলেই

জানি। মিষ্টার আলি ইমামের প্রতিভার তিনি যে এই কঠিন কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ
বা শাসন-শক্তির কোন বিশেষ পরিচয় করিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসালাভে
আমরা এখনও পাই নাই সত্য, কিন্তু সমর্থ হইবেন এরূপ আশা করা যাইতে



অনারেবল মিষ্টার সায়েদ আলি ইমাম।

পারে। ইনি পূর্ব্বে বাঁকিপুরে ব্যারিষ্টারি করিতেন। তখন ইঁহার পরিচয় আমরা বড় একটা জানিতাম না। পরে 'মোসলেম-লিগ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই আমাদের তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়। এখন তিনি কালকাতা হাইকোর্টে গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল পদে অধিষ্ঠিত।

এরূপ পদ হইতে কাউন্সিলের মেম্বর পদ প্রাপ্ত এদেশে নিতান্ত বিরল। কিন্তু ইহা আমাদের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। কেননা এখানে গুণেরই আদর প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে গুণের সমাদরই যথার্থ পক্ষে দেশের পক্ষে প্রল্যাণপ্রদ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা কর্ত্তৃপক্ষকে বলা আমরা সঙ্গত বিবেচনা করি। বিলাত হইতে যখন বিলাতী সচিব নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল তখন তাঁহার ব্যারিষ্টার হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির হইয়াছিল। ভারত হইতে ভারতবাসী যখন এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে তখন—কি ব্যারিষ্টার কি প্লিডার যোগ্যতানুসারে আইন ব্যবসায়ী মাত্রেরই এ পদ লাভে অধিকার থাকা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, মাননীয় শামসুল হুদা ইত্যাদি প্রতিভাবান লোকেরা যে আইন বিষয়ে ব্যারিষ্টার অপেক্ষা অজ্ঞ বা ব্যবস্থাসচিবের কর্ম্মের পক্ষে অনুপযুক্ত এ কথা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। গুণের যথার্থ আদর করিতে হইলে কোন গণ্ডী বিশেষের মধ্যে অন্বেষণ করা ঠিক সঙ্গত নহে। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বেড়া যাহাতে শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

কবি রজনীকান্ত সেন।

পাবনা সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

রজনীকান্তের ক্ষুদ্র জীবন কেবলমাত্র ৪৪ বৎসরের সমষ্টিমাত্র; এই অনতিদীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত এমন ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার বিচ্ছেদ আমাদের সাহিত্যের পক্ষে গুরুতর ক্ষোভের বিষয়।

১২৭২ সালের ১৭ই শ্রাবণ সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে রজনীকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতার সস্নেহপালনে তাঁহার কিশোর জীবন বিকশিত হইয়া উঠে। পুত্রের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির দিকে এই পিতার অনলস সতর্ক দৃষ্টি দেবতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদের ন্যায় কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। বালক রজনীকান্ত অটুট স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। ব্যায়ামের প্রদর্শনীতে প্রতিবারই তিনি প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। পুরস্কারও কোনবার ফাঁক যায় নাই। আর তাঁহার মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে বঙ্গীয় পাঠকের নিকট আমাকে বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে হইবে

না,—তাঁহার বাণী, কল্যাণী এবং অন্যান্য কবিতাই সে বিষয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ দুর্লভ কবিত্ব সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার "পদচিন্তা মণিমালা" একখানি সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থ। ভাবে এবং ভাষায়, সরস কবিত্বে এবং ভক্তি-প্রগাঢ়তায় তাহা বৈষ্ণব কবিদিগের অতুলনীয় গানগুলির মতই কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে। রজনীকান্তের এই অমর কবিত্ব—স্নেহাতুর জনকের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান।

কান্ত কবির বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতা বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ,ভক্ত এবং রসিক সকলেরই সমান উপভোগ্য—সকলেরই সমান আদরের বস্তু। একদিকে যেমন তাঁহার "তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা" প্রভৃতি গান উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তথ্যের অবতারণা করিয়া শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে অন্য দিকে আবার তেমনি "এস এস কাছে, দূরে কি গো সাজে" প্রভৃতি গান সাধারণের ভিতর কোমল স্পর্শে আনন্দের শতদল পদ্মকে বিকশিত করিয়া তোলে। একদিকে যেমন "আমিত তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ" ভক্তের চক্ষু হইতে বিহ্বল আবেশের ধারা-প্রবাহ উৎসারিত করিয়া দেয়, অন্যদিকে আবার তেমনি "যদি কুমড়োর মত হতো পাশিতোয়া" মূর্ত্তিমান রহস্তের হাস্তরসপ্রিয় শ্রোতার মুখের উপর অট্টহাস্তের তরঙ্গ রেখা পরিস্ফুট করিয়া তোলে। শতদীপপুলকিত প্রাসাদে তাঁহার সঙ্গীতসমূহ যেমন দেয়ালে বাধিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফিরিয়া আসে তেমনি আবার রৌদ্র দগ্ধ প্রান্তরে, "পাখী ডাকা, ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে" তাঁহারই গীতাবলী গগন পবন পূর্ণ করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

চরিত্রের দিক দিয়াও তাঁহাকে দেখিতে গেলে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র সকলকেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধহাস্যে এবং মধুর বাক্যে পরিতুষ্ট রাখিতেন। তাঁহার গান ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধের অপেক্ষা রাখিত না। যে কেহ ধরিলেই কল্লোলময়ী নির্ঝরিণীর মত তাহা নামিয়া আসিত।—নিদাঘের ধারাপাতের ন্যায় হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি ধৌত করিয়া নির্ম্মল করিয়া দিত। সঙ্গীতে তাহার ক্ষমতাও এমন অদ্ভুত ছিল যে তিন, চারি ঘণ্টা অবিশ্রান্ত কণ্ঠ পরিচালনার পরও কেহ তাঁহাকে ক্লান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখে নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অসাধারণ ছিল তাঁহার বাক্ পটুতা এবং পরিহাস করিবার ক্ষমতা। তাঁহার উপহাসের ভিতরেও এমন একটা ঋজুতা এবং স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা ছিল যাহা কোনো মানুষকেই আঘাত করিতে জানিত না—অথচ সরল সুন্দর হাস্যে সকলকেই উৎফুল্ল করিয়া তুলিত।

হিন্দু বলিলে যাহা বুঝায় রজনীকান্ত তাহাই ছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম্মকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন কিন্তু গোঁড়ামিকে কখনো প্রশ্রয় দেন নাই। বরং সমাজকে এজন্য তীব্রকণ্ঠে শাসন করিতে তিনি কোন দিন বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠানুভব করেন নাই। সমাজ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির আলোচনা করিলে—

আমাদের এই অধঃপতিত সমাজের জন্য তাঁহার চক্ষুতে যে অশ্রুর অভাব ছিল না তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কবিতা হিসাবে সেগুলির স্থান খুব উচ্চে না হইতে পারে—ভাবের নূতনত্বে, চিন্তার বিশালতায় তাহা পরিণত মস্তিষ্কের উপযুক্ত না-ও হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গলার জাতীয় সাহিত্য এগুলিকে কখনও উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

নবযুগের পুণ্য মন্ত্রে নির্জ্জীব বাঙ্গালা যে দিন সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিল সেদিনও তাহাতে রজনীকান্তের কৃতিত্ব বা প্রভাব কম ছিল না। নিত্য নূতন সঙ্গীতে তিনি মাতৃপূজার অর্ঘ্য রচনা করিয়া দিতেন আর সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহারই কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া সেই তীব্রতাহীন খাঁটি স্বদেশী উপহারে মাতৃচরণ অর্চ্চনা করিত। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও কবি তাঁহার দেশ মাতাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। একনিষ্ঠ পূজক যেমন মৃত্যু কালে তাহার পাথরের ঠাকুরকে বিশ্বস্ত হস্তে সঁপিয়া যায় রজনীকান্তও তেমনি করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে যথার্থ—উপযুক্ত সন্তানের হাতে তাঁহার দেশমাতাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুবিবর্ণ কবির "কুমার, করুণা-নিধে, দেখো র'ল দেশ"—এ প্রার্থনা ভক্তের প্রার্থনা—সাধকের প্রার্থনা—একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

দীর্ঘদিন হইতে কান্ত কবি ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। এই রোগই তাঁহাকে আমাদের ভিতর হইতে কাড়িয়া লইয়া তিল তিল করিয়া মৃত্যুর মুখে তুলিয়া দিয়াছে। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে তাঁহার নাক দিয়া নিশ্বাস লইবার ক্ষমতা রুদ্ধ হইয়া যায়। গলায় অস্ত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাঁহাকে এতদিন জীবিত রাখা হইয়াছিল। তাঁহার চিরমুখর কণ্ঠ সেই দিন হইতেই চিরনির্ব্বাক। আর গত ২৮শে ভাদ্র রাত্রি ৮—৩০ মিনিটের সময় তাঁহার বুকের স্পন্দনও চিরদিনের জন্য থামিয়া গিয়াছে। অনাহারই কান্ত কবির জীবন নাটকের শেষ অঙ্কের যবনিকা এত সত্বর টানিয়া দিয়াছে।

কবি তাঁহার জীবনের শেষ অঙ্কে, অমৃত আনন্দময়ী, অভয়া এবং বিশ্রাম এই পুষ্প চতুষ্টয়ে তাহার চিরারাধ্যা বীণাপাণির পূজার শেষ অর্ঘ্যরচনা করিয়া গিয়াছেন।—যে মায়ের সাধনায় তাঁহার সমস্ত জীবন ব্যয়িত হইয়াছে সেই মায়ের পূজা করিতে করিতেই তিনি মায়ের কোলে মিশিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীর গীতি কবিতায় রজনীকান্তের স্থান কোথায় তাহা নির্দ্দেশের সময় এখনও আসে নাই। কবে আসিবে আমরা তাহাও বলিতে পারি না। আমাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয় কেবল এই মাত্র বলিতে পারে যে, তিনি আমাদের কবি—সমাজের কবি—বাঙ্গলার কবি ছিলেন—তিনি যেখানেই থাকুন সেখান হইতেই আমাদের ভক্তি প্রীতি ভালবাসার অর্ঘ্য গ্রহণ করিবেন।

"Thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on."

তুমিও যবে মরিবে তবে আমাদের এবুকে
চিরাভিনব স্মৃতিটি তব ঘুমায়ে রবে সুখে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

সমালোচনা।

পারস্য উপন্যাস। (গার্হস্থ্য সংস্করণ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কর্তৃক সম্পাদিত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। বটতলার দুর্দ্দশাপন্ন জঘন্য পারস্য উপন্যাস ভদ্র সমাজের অযোগ্য ছিল সে অভাব দূর করিবার জন্য এই নির্দ্দোষ সর্ব্বজনপাঠ্য ও সুমুদ্রিত গার্হস্থ্য সংস্করণের আবির্ভাব। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে কবিত্ব রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই—সুরুচিও সর্ব্বত্র সুরক্ষিত হইয়াছে। বালকবালিকাগণের হস্তে অসঙ্কোচে উপহার দেওয়া যায়। গ্রন্থখানিকে সর্ব্বতোভাবে রমণীয় করিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে আটখান সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তন্মধ্যে একখানি তিনবর্ণে মুদ্রিত। চিত্রের পরিকল্পনা রমণীয়। গ্রন্থের সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ। সে হিসাবে মূল্য বেশ সুলভই হইয়াছে।

রবিন্সন ক্রুশো। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কর্তৃক অনূদিত। এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডিফো রচিত রবিন্সন ক্রুশো ইংরাজ বালকবালিকার নিকট বিশেষ আদরের সামগ্রী। এমন কৌতূহলপূর্ণ শিশুপাঠ্যগ্রন্থ জগতের সাহিত্যে অল্পই আছে। চারুবাবু সেই গ্রন্থের এমন সুন্দর সমগ্র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ সবিশেষ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। অনুবাদে কোন অংশ বাদ পড়ে নাই। ভাষা দিব্য লঘু ও সরল, কোথাও এতটুকু বাধাবন্ধ নাই। মূলের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা। বহিখানি আবালবৃদ্ধবনিতার পক্ষে যে উপাদেয় হইয়াছে তাহার একটি প্রমাণ, সমালোচ্য গ্রন্থখানি বহুদিন বহুপাঠকপাঠিকার হাতে ফিরিয়া তবে সমালোচকের হাতে পড়িয়াছে। গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুরস্কারযোগ্য ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ তালিকায় রবিন্সন ক্রুশো উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

জোলেখা। শ্রীআবদুল লতিফ কর্তৃক সঙ্কলিত। হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। হিতবাদী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। "বাইবেলের পুরাতন নিয়মাবলী" ও কোরাণ শরিফের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ধর্ম্মাত্মা ইউসফের জীবন কাহিনী অবলম্বনে কবি জামি কাব্য রচনা করেন—আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ। উপাখ্যানে শিক্ষার সহিত রোমান্সের সুন্দর সমন্বয় আছে। তবে অনুবাদকের রচনায় রোমান্সের রসটুকু ভালো ফুটে নাই। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল কিন্তু উচ্ছ্বাসের ঘটা কিছু অতিরিক্ত, তজ্জন্য স্থানে স্থানে একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। এ ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

শিশির। শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। চট্টগ্রাম শ্রীশ্রীগৌরীশঙ্কর লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। তেমন বিশেষত্ব কিছুই নাই।

জাপান। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ২০৩।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকামাত্র। গ্রন্থকার সার্দ্ধ চারিবৎসরকাল জাপানে শিক্ষালাভার্থ বাস করিয়াছিলেন। সেখানে অনেক ভদ্র পরিবারের সহিত মিশিবার পক্ষে তাঁহার সুযোগ ঘটিয়াছিল—সেইহেতু তাঁহাদের পারিবারিক, জীবন রীতিনীতি জাপানী সমাজ প্রভৃতি রীতিমত দেখিবারও অবসর মিলিয়াছিল। গ্রন্থখানিতে জাপানের রাজধানী, সমাজ, শিক্ষা, জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব প্রভৃতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক বেশ হৃদয় দিয়া আগাগোড়া বর্ণনা করিয়াছেন। দেখিবার শক্তিও তাঁহার সাধারণের মত নহে।

উপন্যাসের মত গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। গ্রন্থের ছাপা কাগজ মলাট প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট। সর্ব্বসমেত ৪৩ খানি চিত্রে পরিশোভিত। চিত্রগুলিরও বিশেষ মূল্য আছে। কারণ তাহা হইতে লেখকের বক্তব্য প্রস্ফুটতর হইয়াছে। ভাষাটুকু সরল, কিন্তু মাঝে মাঝে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্রণে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

আদর্শ রমণী। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। চারু আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। সখিনাখাতুন, জোবায়দা খাতুন, দেবী রাবিয়া, সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল প্রভৃতি কয়েকটি আদর্শ রমণীর কাহিনী লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত। লেখকের ভাষাটুকু সরল ও মিষ্ট; রচনায় বেশ একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। মুসলমান লেখকের এমন রচনাকুশলতা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি হিন্দু মুসলমান সকলের নিকটই আদর পাইবার যোগ্য। মুসলমান মহিলাগণের ত অবশ্য পাঠ্য।

মদিনা-শরীফের ইতিহাস। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। মূল্য এক টাকামাত্র। গ্রন্থের ভাষা সরল প্রাঞ্জল। ইসলাম জগতের বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার মুসলমান ও হিন্দু উভয় সমাজেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

শুক্লা। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় বি, এ প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি কাব্যগ্রন্থ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। উপাখ্যানে কোন বিশেষত্ব নাই। খণ্ডকাব্য রচনায় লেখকের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা। ভাষা ও ছন্দ অত্যন্ত জটিল; ভাবও আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

পুণ্যের জয়। শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থখানির প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা পূজার সময় সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট শিল্পসমিতির বিধবাশ্রমের সাহায্যে ভিক্ষা প্রার্থনা করি। মহিলাগণ অনেকেই যেরূপ আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ ভাবে এই আবেদন রক্ষা করিয়াছেন—তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই। প্রকৃত পক্ষে এ কাজ আমাদের দুই একটি মহিলার কাজ নহে, ইহা সমগ্র বঙ্গরমণীরই কাজ। তাই এই আহ্বানে, তাঁহাদিগকে সাড়া দিতে দেখিয়া আমাদের হৃদয় এত আনন্দগর্ব্বে স্ফীত। আমরা বুঝিতেছি আমাদের ব্রত নিষ্ফল হইবে না,—বঙ্গের অভাগিনী ভগিনীদিগের দুঃখাশ্রু মুছাইতে সমগ্র ভাগ্যশীলা রমণী সস্নেহে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইবেন। এ আশা যে দুরাশা নহে তাহা শ্রীমতী জ্ঞানদাবালার নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে সকলে বুঝিবেন।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বিহিত প্রণাম পুরঃসর নিবেদন মিদং

আপনি যে মহদুদ্দেশ্যে আপনার আশ্বিনের ভারতীতে পূজার ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন কয়েকটী কারণে ঐ সদুদ্দেশ্য আমার সংসারমগ্ন চিত্তকে প্রবলভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। তাই আপনার বৃহৎ ভিক্ষাঝুলির আদর্শে নিজে একটী সামান্য রকম ভিক্ষাঝুলি লইয়া যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি। এই সংগ্রহ কার্য্যে এখানকার যে কয়েকজন ভদ্রমহিলা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আনন্দের বিষয় এই যে, ইঁহাদের সকলেই আপনাদের সমিতির বিষয় শুনিয়া আন্তরিক আগ্রহে ও অসঙ্কোচে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বেশ মনে হয়

যে আমার অপেক্ষা বেশী সামর্থ্য, বিদ্যাবত্তা ও অবসর যাঁহার আছে তিনি এই সংগ্রহ কার্য্যে নিয়োজিত হইলে সিমলা পাহাড়ের বাঙ্গালী মহিলাদের নিকট আরও বেশী চাঁদা উঠিত। * * *

যে কয়েকটী কারণে আপনার ভিক্ষা প্রার্থনা আমাকে বিচলিত করিয়াছে তাহার একটি এখানে ব্যক্ত করা আবশ্যক মনে করি। হিন্দু বিধবার সাংসারিক দুর্দ্দশা দেখিয়া আজকাল অনেক সুশিক্ষিত লোক সমাজের উচ্চস্তরে পর্য্যন্ত বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইঁহারা বোধহয় অনুভব করেন নাই অবিকৃতস্বভাব হিন্দু-মহিলার নিকট বিধবার ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রাচীন সুমহান্ আদর্শ কতদূর সম্মান ও আদরের বস্তু। * * এই সঙ্কট সময়ে আপনার হিন্দু-বিধবাশ্রম বিধবার আর্থিক অসহায়তা দূর করিবার প্রয়াসী হইয়া সমস্ত হিন্দুনারী সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছে। * * *

ইতি কার্ত্তিক সন ১৩১৭ সাল।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিনী—মিত্রজায়া জ্ঞানদাবালা।

শ্রীমতী উষা দেবী,	সিমলাপাহাড়	১০৲
„ সরলা দেবী বি, এ,	ঐ	৫৲
„ শরৎসুন্দরী মিত্র,	ঐ	৫৲
„ জ্ঞানদাবালা মিত্র,	ঐ	৫৲
„ নীরদবালা দেবী,	ঐ	৪৲
„ সরযূবালা দাসী,	ঐ	৪৲
„ গোপাঙ্গনা দাসী,	ঐ	২৲
„ গোলাপসুন্দরী সিংহ,	ঐ	২৲
„ কুমুদিনী দেবী,	ঐ	২৲
„ গঙ্গা দেবী,	ঐ	২৲
„ প্রেমবালা মজুমদার,	ঐ	২৲
„ লতিকা ঘোষ,	ঐ	২৲
„ বিষ্ণুপ্রিয়া বসু,	ঐ	১৲
„ নগেন্দ্রবালা দেবী,	ঐ	১৲
„ প্রকাশনলিনী মিত্র,	ঐ	১৲
„ হেমলতা রায়,	ঐ	১৲
„ নিত্যকুমারী দেবী,	ঐ	১৲
„ মাধুরীবালা দত্ত,	ঐ	১৲
„ হরকুমারী দেবী,	ঐ	১৲
„ মৃণালিনী ঘোষ,	ঐ	১৲
„ ভবানী সুন্দরী দেবী,	ঐ	১৲
„ প্রীতিময়ী ঘোষ,	ঐ	১৲
„ মণিবালা দে,	ঐ	১৲
„ মৃণালিনী বসু,	ঐ	১৲
„ তুষারবালা সরকার,	ঐ	১৲
„ নবনলিনী সরকার	ঐ	১৲
„ নলিনীবালা দেবী,	ঐ	১৲
„ নির্ম্মলাবালা দেবী,	ঐ	১৲
„ নীহারিকা দেবী,	ঐ	১৲
„ চারুবালা ঘোষ,	ঐ	১৲
„ অমূল্যসুন্দরী দত্ত,	ঐ	১৲
মিসেস্ কে, পি, দে,	ঐ	১৲
শ্রীমতী মোহিনী বালা গাঙ্গুলী,	ঐ	৷৹
„ নবকুমারী দেবী,	ঐ	৷৹
„ সরযূবালা দেবী,	ঐ	৷৹
„ সুশীলাবালা ঘোষ,	ঐ	৷৹
„ দুর্গা দেবী,	ঐ	৷৹
„ নীলনলিনী দেবী,	ঐ	৷৹
„ গোপেশ্বরী ঘোষ,	ঐ	৷৹
মিসেস্ বিনোদদাস,	সিলেট	১৲
শ্রীমতী হেমনলিনী সেন,	পাটনা	১৲
মিসেস্ গিরীন্দ্রনাথ সেন,	কলিকাতা	২৲
মিসেস্ ওদেদার,	লক্ষ্ণৌ	১০৲
শ্রীমতী কনকলতা রায়,	ঐ	৫৲
„ কমলা গুহ ওদেদার,	ঐ	৩৲
কুমারী অমিয়লতা গুহ ওদেদার,	ঐ	২৲
শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী,	শিলং	১৲
মিসেস্ শরৎচন্দ্র বাগচী,	কলিকাতা	২৲
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী,	কাশীধাম	১৲
শ্রীশৈলজানাথ চক্রবর্ত্তী আশুগঞ্জ,	ত্রিপুরা	২৲
বাবু যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	দেবগ্রাম	১৲
		৯৯৷৹

কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।